প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীপার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন

মা ও বাবার

করকমলে-

যাঁদের প্রসাদে লভিনু ভুবনে এ জীবন দুর্লভ,
যাঁদের আশিস ও শুভ কামনায় এতদূর আসিলাম—
প্রণাম তাঁদের, কী বা দিতে পারি ?—একটুকু সৌরভ,
কথা-কুসুমের প্রথম মালাটি 'করে' শুধু সঁপিলাম।

ভূমিকা

কবি মোহিতলাল মজুমদার যখন কলিকাতার বিদ্যালয় শিক্ষকতার কাজ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া গিয়া অধ্যাপনা কর্মে প্রথম যোগদান করেন, তখনই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ছাত্র রূপে ভর্তি হই। সুতরাং তাঁহার অধ্যাপক জীবনে আমিই তাঁহার প্রথম ছাত্র ছিলাম। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী তিন বৎসর অনার্স এবং এক বৎসর এম. এ ক্লাসে তাঁহার নিকট পড়িয়া সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ে এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বিষয় কিংবা বিভাগ ছিল না, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ বশতঃ বাংলা বিষয় লইয়া এম. এ পড়িতে চাহিতেন, তাঁহাদের অর্ধেক বিষয় সংস্কৃত পড়িতে হইত এবং সংস্কৃত ও বাংলা উভয় বিষয়েই তাঁহাদের পরীক্ষা দিতে হইত। বিভাগের নামও ছিল সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ। মোহিতলাল এই বিভাগেরই অধ্যাপক (লেকচারার) নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। তখন সেই বিভাগের প্রধান যিনি ছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য সুবিদিত ছিল, তাঁহার নাম আচার্য সুশীলকুমার দে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই একক আগ্রহে মোহিতলাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কেবল মাত্র বি. এ পাস হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ আচার্য সুশীলকুমার দে নিজে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তিনি জীবনে গভীরতর সাহিত্য সাধনার সুযোগ পাইতেন না। কারণ, তখন মোহিতলালের নাম বিশেষ পরিচিত ছিল না। তাঁহার 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থখানি তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বে তাঁহার একখানি মাত্র কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা 'স্বপন-

পসারী।' সুতরাং কেবল মাত্র তাহার ভিত্তিতেই আচার্য দে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিবার কার্যে নিযুক্ত করিয়া যেমন দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই এক দুঃসাহসিকতারও পরিচয় দিয়াছিলেন, কারণ, সেই পদের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রার্থীও ছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের দাবি উপেক্ষা করিয়াও একজন মাত্র বি. এ. পাস স্কুল শিক্ষককে উক্ত পদে নিযুক্ত করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই। সুতরাং মোহিতলালের পরবর্তী জীবনের সামগ্রিক প্রতিষ্ঠার মূলে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীর কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইবার উপায় নাই।

মোহিতলালের ছাত্র হওয়া বিষয়ে আমার আরও একটি সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমি সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে তাঁহার একমাত্র ছাত্র ছিলাম। তাহার ফলে তিন বৎসর কাল তিনি একা আমাকেই পড়াইতেন। যেদিন আমি কোন কারণে আসিতে পারিতাম না, সে দিন ক্লাস হইত না; তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু আমাকে ব্যতীত কোন ক্লাসই তিনি করিতে পারিতেন না, সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহা সমগ্র ভাবেই পাইয়াছি, অন্যান্য সাধারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দশ জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে যাহা পায়, তাহা আমাকে পাইতে হয় নাই। সেইজন্য অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার সমগ্র রূপটারই আমি আনুপূর্বিক পরিচয় পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।

তখন মোহিতলালের বয়স চল্লিশের বেশি নয়। সংসারে দুইটি কন্যা এবং পত্নীকে লইয়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মন্দিরের অদূরে নীলক্ষেত নামক এক জন-বিরল পল্লীতে বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজস্ব একটি 'বাংলো'র মত বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ির সামনে এবং পিছনের দিকে অনেক জায়গা ছিল। অল্প দিনের মধ্যে এক মালী রাখিয়া সমস্ত জায়গা জুড়িয়া তিনি গোলাপ ফুলের বাগান

তৈরী করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস খুব বেশি ছিল না, ক্লাস শেষ হইবার পর কোন দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট পাঠাগারটিতে ঢুকিয়া সেখানে বসিয়াই পড়িতেন, কোনদিন বা সেখান হইতে বই সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাড়িতে চলিয়া আসিতেন, সেখানে আসিয়া স্বহস্তে বাগানের কাজ করিতেন, মালীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। ফুলের চাষ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করিয়া তিনি গোলাপ চাষে বিশেষজ্ঞ বলিয়াও দাবি করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বাগানে আশি রকমের গোলাপ ফুটাইয়াছেন বলিয়া দাবি করিলেন এবং কোন সাহিত্যিক বন্ধু কিংবা ছাত্র তাঁহার সঙ্গে সাহিত্যালোচনার জন্য গেলেও গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য এবং তাহার মহত্ত্ব সম্পর্কে অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতেন এবং নিজের বাগানের বিভিন্ন রকমের গোলাপের মধ্যে রঙের ও পাপড়ির যে কি সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। অনেক দিনই সাহিত্যালোচনার মধ্যে প্রবেশ করিবার আর সময় পাইতেন না।

কিন্তু এই সকল বিষয় বিস্তৃত করিয়া এখানে বলিয়া কিছু লাভ নাই। তাঁহার জীবনীগ্রন্থ কোনদিন রচিত হইলে এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যেও তাহার মানস প্রকৃতির অনুসন্ধান করা যাইবে। এইখানে সংক্ষেপে কেবল তাঁহার জীবনের দুই একটি অপরিজ্ঞাত ঘটনার উল্লেখ করি। আমি মনে করি, তাঁহার কবি-প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে তাহা সহায়ক হইবে।

আগেই বলিয়াছি দুইটি কন্যা সন্তান লইয়া ঢাকায় তিনি তাঁহার বাস স্থাপন করেন। বছর দেড়েকের মধ্যেই তাঁহার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হইল। কিছুদিনের মধ্যেই এক পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার সংসার কিছুদিনের জন্য ভাঙিয়া গেল; বাগানের ফুল শুকাইল, তার কিছুদিন পর আবার সংসার স্থাপন করিলেও বাগানে সেই ফুল আর ফুটিল না। আমার মনে হইল, কবিতা হইয়া যেন সেই ফুল তখন ফুটিতে লাগিল। বরং যতদিন বাগানে ফুল ফুটিত, ততদিন

মনের বাগানে কবিতা হইয়া তত ফুল ফুটিত না, তারপর সেই ফুল অজস্র ফুটিতে লাগিল।

পারিবারিক দুর্ঘটনাটির বিষয় এখানে একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক। আমাদের তখন পরীক্ষা আসন্ন বলিয়া ক্লাস বন্ধ ছিল এবং এইজন্যই মোহিতলালের বাড়িতে অনেক দিন যাওয়া হয় নাই। সুতরাং অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার পারিবারিক জীবনের কোন সংবাদ রাখিতে পারি নাই। সহসা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমার নিকট আসিয়া বলিল, মোহিতবাবুর বড় মেয়েটির টাইফয়েড হইয়াছে, রাত্রি জাগরণ করিয়া সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন, কিন্তু তেমন কোনও লোক নাই। আপনাকে যাইবার জন্য তিনি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।

আমি তৎক্ষণাৎ নীলক্ষেতে তাঁহার বাড়িতে ছুটিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, বড় মেয়ে পলার (মনে হয় উৎপলা তাহার ভাল নাম ছিল, পলা বলিয়া ডাকিতেন।) ১০।১২ দিন যাবৎ জ্বর, জ্বর টাইফয়েড বলিয়া স্থির হইয়াছে। সেইভাবেই চিকিৎসা চলিতেছে। প্রত্যহ রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা করিবার লোক নাই। তাঁহারা স্বামি-স্ত্রী ইতিমধ্যেই রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত এবং অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, এখন অন্য কাহারও সাহায্য ব্যতীত রোগিণীর শুশ্রূষা অসম্ভব। 'ক্লোরো-মিসাইটিন' আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে টাইফয়েড রোগ যে কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা এখনও অনেকেই স্মরণ করিতে পারেন। তখন সেই অবস্থা ছিল। উৎপলার বয়স দশ বছরও বোধহয় হয় নাই; খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে, পিতার ডাকে হাঁকে সর্বদাই উপস্থিত থাকিত, আমাদিগেকে গেলেই দরজা খুলিয়া বসিতে দিত।

নিকটে গিয়া দেখিলাম, উৎপলা প্রায় জ্ঞানশূন্যা, অবস্থা দেখিয়া আমার মনে হইল, বাঁচিবার আশা কম। মোহিতলাল আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্থিরভাবে কিছুই ভাবিয়া দেখিতে পারিতেছেন না।

সে যুগে টাইফয়েডের কোন চিকিৎসা কিংবা ঔষধ ছিল না,

কেবলমাত্র ধীরভাবে ধৈর্য ধারণ করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়া যাইতে হইত, তারপর যাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিত।

এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল, রোগিনীর অবস্থার ক্রমে অবনতি হইতে লাগিল, তারপর একদিন উৎপলা ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহাকে রক্ষা করা গেল না।

সন্তানের মৃত্যুতে মোহিতলাল সেই প্রথম শোকের আঘাত পাইলেন। কিন্তু সেই আঘাতের তীব্রতা অনুভব করিবার পূর্বেই তাঁহার উপর সঙ্গে সঙ্গেই আর এক আঘাত আসিয়া পড়িল।

সকলেই জানেন টাইফয়েড এক অতি সংক্রামক রোগ। পলার মৃত্যুর দুই তিন দিন আগে হইতেই তাহার ছোট বোনটিও শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল; দেখা গেল, তাহারও টাইফয়েডের আক্রমণ হইয়াছে এবং আট দশ দিনের মধ্যে সেও জ্যেষ্ঠার অনুগমন করিল। মাত্র দশ বারো দিনের ব্যবধানে দুইটি কন্যা সন্তানের অকাল মৃত্যুতে মোহিতলাল উন্মাদের মত হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় কন্যার মৃত্যুর কথা যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার সেই শোকোন্মত্ত মূর্তির দিকে তাকাইয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তিনি ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই!" তাঁহার চোখ সে দিন অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল, কণ্ঠস্বরে যেন বজ্র নির্ঘোষিত হইল— "ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই।"

সংযত ভাবে শোক সহ্য করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। সেইজন্য এক একবার আমার মনে হয়, তাঁহার সেদিনকার শোকের সেই উন্মত্ত রূপ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সংহত হইয়া তাঁহার পরবর্তী জীবনের ধ্যান-ধারণার মধ্যে কি কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই? যাঁহারা মোহিতলালের জীবনী রচনা কিংবা সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহার সাহিত্যের আনুপূর্বিক বিচার করেন নাই, কারণ, তাঁহার জীবন-কথা বহুল প্রচারিত হইবার মত তাঁহার ভাগ্য ছিল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস,

রোমান্টিক চিন্তাধারার যাঁহারা অনুগামী তাঁহারা কখনও তাঁহাদের জীবনের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন সৃষ্টিকেই সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন না। মোহিতলালের কাব্য-ভাবনায় যে বিষাদের সুর মধ্যে মধ্যে বাজিয়া উঠে তাহার উৎস কোথায় তাহা কি সে ভাবে কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন? এমন কি, তাঁহার ভোগবাদের মধ্যেও যে একটু বিষণ্ণতার স্পর্শ ছিল, তাহাই বা কোন সূত্র ধরিয়া তাহার কাব্যে স্থান লাভ করিয়াছে তাহা কি জীবনী অনুসন্ধান করিয়া কেহ দেখিয়াছেন?

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন যেমন পর্বে পর্বে বিভক্ত, মোহিতলালেরও তাহাই। সুতরাং তাঁহার ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যে জীবনের বিকাশ হইয়াছে, সেই জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ব্যতীত তাঁহার কাব্য-বিশ্লেষণও সার্থক হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভেরই বা উপায় কি? তাহা এখন পর্যন্তও অন্ধকারেই রহিয়া গিয়াছে।

মোহিতলাল নিজে তাঁহার কাব্য-ভাবনার উপর তাঁহার পূর্ববর্তী একজন বাঙালী কবির প্রভাবকে স্বীকার করিতেন, কিন্তু নিজে তাঁহার কোন রচনায় তাঁহার কথা উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। এই কবির নাম গোবিন্দচন্দ্র দাস। তিনি ইংরেজি লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা কাব্যে ভোগবাদের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। মোহিতলাল মৌখিকভাবে এইকথা বারবার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেমন মহত্তর প্রতিভার অধিকারী হইয়াও বিহারীলালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মোহিতলাল গোবিন্দদাস সম্পর্কে তাহা করেন নাই। তবে মুখে সর্বদাই তাহা তিনি বলিতেন। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, "গোবিন্দদাসের স্মৃতিরক্ষার একটা আয়োজন কর, তাঁহার বিষয়ে অনুসন্ধান এবং আলোচনা কর।" সেই ভার আমাদের উপর তিনি দিয়াছিলেন। কিন্তু নিজে তাহা করেন নাই। অনাহারে কবি গোবিন্দদাস যখন মৃত্যুশয্যা হইতে 'ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মরলে তোমরা

আমার চিতায় দিও মঠ, এখন আমি ক্ষুধার জ্বালায় করছি যে ছটফট'—এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া কলিকাতায় একটি সভা করিয়া তাঁহার নিকট কিছু সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন, ইহার কিছুদিন পরই হাসপাতালে কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যু হয়। আজ গোবিন্দচন্দ্র দাসের নাম প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া গুরুকে অমর করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম 'প্রেম ও ফুল'। মোহিতলাল তাঁহার 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থের একটি দীর্ঘ কাহিনী কাব্যকে 'প্রেম ও ফুল' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন, অথচ গোবিন্দচন্দ্র দাসের নিকট এইজন্যও কোন ঋণ স্বীকার করেন নাই। এই সম্পর্কে 'স্মরগরল'এর প্রকাশের সময় নিজেই একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, "প্রেম ও ফুল" নামটি কি চমৎকার। আমার কেবলই ইচ্ছা হচ্ছে নামটি আমার একটি কাব্যে ব্যবহার করি, অথচ বুঝতেই ত পাচ্ছ, অবিকল নামটা অনুকরণ করাও ঠিক হয় না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাই তিনি করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই। সুতরাং যাঁহারা মোহিতলালকে আধুনিক বাংলাকাব্যে ভোগবাদের জনক বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা মোহিতলাল নিজের মুখেই এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন, তাহা জানেন না।

যাহাই হোক, মোহিতলালের জীবন কিংবা তাহার পটভূমিকায় তাঁহার সাহিত্য বিচার করা এই ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। ইহার এইটুকু বলা উদ্দেশ্য যে তাঁহার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার সাহিত্য বিচার নির্ভুল হইতে পারে না। তাঁহার ভোগবাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল নহে, বরং জীবনোপলব্ধির অভিব্যক্তি। সুতরাং সেই জীবনকে সম্মুখে রাখিয়াই তাহার বিশ্লেষণ সম্ভব, জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র অধুনা কৃতী অধ্যাপক ডঃ শ্রী দুর্গা-

শঙ্কর মুখোপাধ্যায় বহু আয়াস স্বীকার করিয়া মোহিতলালের 'কাব্য ও কবিমানস' গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনায়ও মোহিতলালের 'জীবনকথা' এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রভাবের বিষয় উপেক্ষিত হয় নাই। মোহিতলালের কবিমানসের স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং কাব্যের রসরূপ-বিচারে তাঁহার রসজ্ঞতা আমাকে বিশেষভাবে আশান্বিত করিয়াছে। আমি মোহিতলালের প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম বলিয়াই তিনি আমাকে তাঁহার গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মোহিতলালের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করা আমার নিজেরই কর্তব্য ছিল, সেই কর্তব্য পালন করিয়া উঠিতে পারিব কি না জানি না। তথাপি আমার একজন কৃতী ছাত্র যে তাঁহার সম্পর্কে আগ্রহশীল হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়াও আমি আমার গুরুপূজার সন্তোষ লাভ করিলাম।

মোহিতলালের সমগ্র অধ্যাপক-জীবনের সঙ্গেই আমি জড়িত ছিলাম। প্রথমতঃ তাঁহার ছাত্ররূপে, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার সহকর্মীরূপে, দুইভাবেই তাঁহাকে খুব নিকট হইতে আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। দুইভাবেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। মোহিতলালের সমগ্র জীবনের সাধনার অর্থ উভয় দিক হইতেই উদ্ধার করা যায়। তাহার বিপুল অংশ আজও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। একদিন তাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার সম্পর্কে পূর্ণতার পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইবে। এই বিষয়ে আমার নিজের যে দায়িত্ব আছে, বর্তমান গ্রন্থকার আমাকে সেই বিষয়ে সচেতন করিয়া দিলেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

প্রাক্ প্রস্তাবনা

কয়েক বৎসরের প্রয়াস ও পরিশ্রমে মোহিতলালের কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ লিখে শেষ করেছিলাম। সেই দীর্ঘ আলোচনার প্রথমার্ধ 'মোহিতলালের কাব্য ও কবি-মানস' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। আলোচ্য কবির কাব্য মননশীলতায় যেমনই দুরূহ, কবি-মানসও অতিরিক্ত ব্যক্তিকতায় তেমনই জটিল। এমন কবির কাব্যের রস-বিশ্লেষণ ও কাব্যের অন্তরালবর্তী কবিপুরুষের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন সহজ নয়। তথাপি সীমিত শক্তি নিয়েই এই দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী হয়েছিলাম। কতখানি কৃতকার্য হয়েছি, রসিক সুধীজনই তা বিচার করবেন।

কাব্য-সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও কোনো একটি রীতির ওপর আত্যন্ত নির্ভরশীলতাকে নিরাপদ মনে করতে পারি নি। নানা দিক থেকে আলোকসম্পাত না ঘটলে রহস্যময় কবিপ্রতিভাকে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। কাব্যের সৌন্দর্য-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবিকে অনুভব করার বস্তুনিষ্ঠ বিচার-রীতিকে বর্তমান গ্রন্থে মুখ্য করা হলেও অন্যান্য রীতিরও আবশ্যক মতো সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রস্তুত গ্রন্থটির জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থকারকে ডি. ফিল. উপাধি-দানে সম্মানিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা-কর্মটি সম্পন্ন হয়। অপর দুজন পরীক্ষক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক কবি অজিত দত্ত ও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইউ. জি. সি অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। তিন জন পরীক্ষকই আলোচনায় প্রসন্ন হয়ে লেখকের আশাতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন। এঁদের সকলকেই আজ প্রণাম জানাই।

একথা বলা ভাল যে পরীক্ষার জন্যে লিখিত গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যকে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে প্রস্তুত গ্রন্থকে কতকটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকার জীর্ণ জঠর থেকে সংগৃহীত গ্রন্থবহির্ভূত কবির প্রচুর কবিতা স্বত্ব-সংরক্ষণের প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট থাকায় বর্জন করা হয়েছে। উদ্ধৃতির আয়তন এবং উদাহরণের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়েছে। গ্রন্থ-বহির্ভূত ও গ্রন্থভুক্ত অধিকাংশ কবিতাবলীর প্রথম প্রকাশকালের তারিখ-তালিকাও সন্নিবিষ্ট করা হয় নি। অলংকার, চিত্রকল্প ও ছন্দের আলোচনায়ও সংযম রক্ষা করতে হয়েছে।

পুস্তকের মূল্য, বিপুলায়তন গ্রন্থ পাঠে ক্লান্তি, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার রুচি, গ্রন্থের সংহতি—প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ কাজ করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ থেকে প্রকাশ কাল পর্যন্ত শুভকামনা ও স্নেহাশীর্বাদ নিয়ে যাঁরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন, তাঁরা হলেন আমার পরম ভক্তিভাজন পিতৃদেব শ্রীধরজাধারী মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্রীমতী কনকলতা দেবী। পেশায় আইনজীবী হয়েও পিতৃদেব ইংরেজি ও বাঙলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। বর্তমান লেখকের সাহিত্য-রসাস্বাদনে যদি বিন্দুমাত্রও অধিকার জন্মে থাকে, তাহলে পিতার চারিত্রিক আদর্শ ও স্বভাবপ্রকৃতিই তার জন্যে মূলত দায়ী। মাতা ও পিতাকে প্রথম গ্রন্থখানি প্রণতচিত্তে উৎসর্গ ক'রে তাই আজ বড়ই আনন্দ অনুভব করছি।

পুস্তকখানির পরিকল্পনা, রচনা, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা বিষয়ে যাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী ঋণী তিনি হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষাগুরু ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অধীনে গবেষণা-কর্মে নিয়োজিত থেকে প্রতি মুহূর্তে বলিষ্ঠ প্রেরণা, মূল্যবান দেশনা এবং সুচিন্তিত আলোচনার সহায়তা লাভ করেছি। আলোচনার ক্ষেত্রে যাবতীয় সংশয় ও সমস্যার অন্ধকার তিনি সানন্দে বিদূরিত করেছেন। তাঁর সাহায্য ও স্নেহাশিস ব্যতীত এ গ্রন্থ কোনোদিনই সমাপ্ত হত না। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে আজ তাঁকে প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ও লোকসাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বর্তমান গ্রন্থের একটি মূল্যবান 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ধীরভাবে গ্রন্থটি পাঠ করেছেন এবং কবির প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত ছাত্রের দাবিকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় সুলিখিত এই ভূমিকাটি গ্রন্থের বিশেষ গৌরব। বিনম্র চিত্তে শিক্ষাগুরুকে প্রণাম জানাই।

তথ্যাদির ব্যাপারেও অনেকের সহযোগিতালাভে ধন্য হয়েছি। গ্রন্থমধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সিটি কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক ও আমাদের শিক্ষক শ্রীমথুরেন্দ্রনাথ নন্দির নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নির্দেশে অধ্যাপক শ্রীতারাচরণ বসু, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডঃ সুশীলকুমার দে, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীজীবনকালী রায়, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতি, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতি ব্যক্তিদের

সংস্পর্শে আসি। অধ্যাপক তারাচরণ বসু ও কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক কবির কয়েকখানি পত্রের অনুলিপি দিয়ে লেখককে কৃতার্থ করেছেন। এছাড়া কবির নিকট আত্মীয় শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মজুমদার, শ্রীসনৎ গুপ্ত, কবিপুত্র অধ্যাপক শ্রীমণিলাল মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আজহারউদ্দীন খান প্রমুখ ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য লাভ করেছি। গভীর বেদনার সঙ্গে একথা বলতে হচ্ছে যে এঁদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন মুহূর্তে সে কথাই আজ বেশী ক'রে মনে পড়ছে।

কাজে অগ্রসর হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী অধ্যাপক, শিক্ষাগুরু, সহকর্মী, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে যে উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা লাভ করেছি তা কম আনন্দের কথা নয়। হাওড়া গার্লস্ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তী লেখককে বরাবরই অনুপ্রেরণা দান করেছেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় এবং বহু জটিল প্রশ্নের সমাধানে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী কবি শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী গবেষণা কর্মের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত লেখকের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। তাঁদের বিনির্মল স্নেহ-প্রীতি লেখকের জীবনের এক দুর্লভ সঞ্চয়। শুভকাম অধ্যাপকদের মধ্যে আরও কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। শ্রীদুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিমলকান্তি সমদ্দার, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ও শ্রীপাঁচুগোপাল দত্ত অনুজকল্প লেখকের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। শিক্ষাগুরুদের মধ্যে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ বৈদ্যনাথ শীল, শ্রীবিনয় সরকার, শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী, স্বর্গত ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্গত বিভূতি চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে এই সমস্ত শুভার্থী অধ্যাপক ও শিক্ষাগুরুদের নিকট যা পেয়েছি তা প্রণতচিত্তে আজ স্মরণ করছি। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীবীরেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ-প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এ গ্রন্থের ব্যাপারে নিরন্তর কৌতূহল প্রকাশ ক'রে আসছেন। সাহিত্য আলোচনায় এঁরা লেখকের নিত্য সহচর। গ্রন্থের সমাপ্তি ও প্রকাশ-বিলম্বে যে সব অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আনন্দ-ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, রেবা

শীল, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় চৌধুরী, ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ দিলীপ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ তপন দে, নির্মল বসু, বেচারাম ঘোষ, উদয়চাঁদ মাজি, সুহাস বিশ্বাস, বারীন্দ্র বসু, পরাণচন্দ্র পাঠক, অরুণকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার দত্ত, ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ও ভূপতি দত্ত। প্রীতি-শুভেচ্ছায় বহুজন-ধন্য লেখকের পক্ষে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব না হলেও তাঁদের সম্পর্কেও তিনি সচেতন। এঁদের প্রতি যথাযোগ্যস্থানে প্রীতি, শুভেচ্ছা, নমস্কার ও স্নেহাশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

আত্মীয়-স্বজনদের শুভেচ্ছা ও আনন্দের বিষয় তুলনাহীন। ডঃ কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গঙ্গোপাধ্যায় অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা চট্টোপাধ্যায় ও শীলা চট্টোপাধ্যায়ের কল্যাণী দৃষ্টি এবং স্বপন, কেষ্ট, লাচ্চু ও রত্নার নানা প্রশ্ন লেখকের যাত্রাপথে আনন্দ ছড়িয়েছে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ ক'রে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅনিলভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থের বহু অংশের ভাষাগত প্রাঞ্জলতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে, বহু অংশ কপি ক'রে দিয়ে এবং শ্রমসাধ্য বিরক্তিকর 'নাম-নির্দেশনী' তৈরি ক'রে আজ যাঁর পরমা পরিতৃপ্তি, তিনি হলেন শ্রীমতী জবা মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলেরই সঙ্গে লেখকের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নেই।

গ্রন্থ-প্রণয়নে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহায়তার কথাও বাদ দেওয়া চলে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, চৈতন্য লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী, হাওড়া সংঘ পাঠাগার, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও হাওড়া গার্লস্ কলেজ লাইব্রেরী থেকে প্রভূত সাহায্যলাভ করেছি। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের কর্মিগণকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাই। এই প্রসঙ্গে হাওড়া গার্লস্ কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহায়কদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

'করুণা প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের এ ধরনের গ্রন্থ-প্রকাশের অভিপ্রায়, আগ্রহ এবং লেখকের সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়াস ছিল বলেই এ পুস্তক প্রকাশিত হতে পারল। তাঁর প্রতি এই অবকাশে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আর একজন নীরব, নিরভিমান ও সুরসিক ব্যক্তি শ্রীতুলসী দাস। প্রুফ্ দেখার কাজে অনভ্যস্ত লেখকের সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সহযোগিতার কথা কিছুতেই যে বিস্মৃত হওয়া চলে না তা কৃতজ্ঞচিত্তেই স্মরণ করছি।

পরিশেষে বলি যে যথেষ্ট সাবধানতা সত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু কিছু ভুলত্রুটি রয়ে গেছে। দু'একটি চোখে পড়েছে। ৩৩ পৃষ্ঠায় 'বিত্তাভ্যাস' এর পরিবর্তে বিত্তাভাস, ৪০ পৃষ্ঠায় 'Bengalee'এর পরিবর্তে Bengali, ৫৬ পৃষ্ঠায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' বদলে শ্রীমদ্ভবদ্গীতা, ৮০ পৃষ্ঠায় 'সম্পূর্ণরূপে'এর স্থলে বিস্তৃত-রূপে, ১১৫ ও ১১৯ পৃষ্ঠায় 'শ্রাবণের কবিতা' স্থলে শ্রাবণের গান, ১৪০ পৃষ্ঠায় 'ভাস্তমহ্ভাতি'র স্থলে ভাতি অনুভাতি, ১৭৭ পৃষ্ঠায় 'প্রজনশ্চাম্মি'র স্থলে প্রজনশ্চাম্মি, ২০৪ পৃষ্ঠায় 'Helvetius'এর স্থলে Hellectius ২৮৪ পৃষ্ঠায় Spenserianএর স্থলে Spencerian, ২৮৮ পৃষ্ঠায় 'সাগর ও শশী'র স্থলে সাগর ও বাঁশী এবং 'প্রেম ও সতীধর্ম' এর স্থলে সতীধর্ম মুদ্রিত হয়েছে। এরূপ আরও কিছু থাকা সম্ভব। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার প্রশ্রয় কামনা ছাড়া লেখকের গত্যন্তর নেই।

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

চতুর্থ অধ্যায়

অনূদিত কাব্যবিচারণা, পৃষ্ঠা ২১৪—৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

বাণীরূপ রচনা, পৃষ্ঠা ২৪৪—৩০১

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভাব এষণা, পৃষ্ঠা ৩০২—৩২৭

প্রস্তাবনা

কবি মোহিতলাল মজুমদারের কবিকর্মের পূর্ণাঙ্গ বিচার এবং সেইসূত্রে তাঁর কবিমানসের স্বরূপ-উদ্ঘাটনই আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। কবির প্রতি সহমর্মিতা ব্যতীত কাব্যপাঠও যেমন কাব্যালোচনাও তেমনি নিষ্ফল। তাই স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমরা বিচার্য কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্র-সমসাময়িককালে রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবিরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রেও দৃষ্টি ও সৃষ্টির মৌলিকতায় কবি মোহিতলাল একটি গৌরবময় আসনের অধিকারী—এ ধারণা পেয়েছিলাম বহুপূর্বেই এবং একরূপ বাইরে থেকে। কিন্তু সে ধারণা তখনও কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই বহু-বিতর্কিত কবির শক্তিমত্তা সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী অভিমত সুধীজনের কণ্ঠে শুনতাম। এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তমূলক আলোচনার আবশ্যকতা তাই অনুভব করতাম। কিন্তু মোহিতলালের কবিকর্মের সামগ্রিকবিচারে সমালোচকদের উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব মনকে পীড়িত করত। 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের 'পূর্বভাষ'এ কবির সেই অভিমান মিশ্রিত আক্ষেপ "আমার গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে পণ্ডিত ও সাংবাদিক মহলে একটা 'Conspiracy of silence' আছে।" অথবা ১৩৫৯ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'বঙ্গভারতী' পত্রিকায় তাঁর সেই দ্বিতীয় পত্রের হতাশাব্যঞ্জক উক্তি, "রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্‌লা সাহিত্যে····· আমার স্থান কি তাহা আমি জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও জানিবে, কাহারও মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিল না।"—আমাদের মনে বিস্ময় ও বেদনার সৃষ্টি করত। এইভাবে মোহিতলালের কাব্য বিচারের আগ্রহটি মনের মধ্যে প্রবলতর হতে থাকে। মানসিক এই অবস্থার ক্রম-ঘনীভবনই মোহিতলালের কাব্য-মূল্যায়নের প্রধান কারণ। অভিনিবেশ সহকারে তাঁর কাব্য ও সমালোচনা-গ্রন্থগুলি পাঠ ক'রে আজ এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন অসামান্য শক্তিমান কবি। আমাদের আলোচনা গ্রন্থে মোহিতলালের সামগ্রিক কবিকর্ম বিস্তৃত-ভাবেই আলোচিত হয়েছে এবং এই কবিকর্মের অন্তরালে যে কবিপুরুষটি আছেন তাঁরও স্বরূপ-নির্ণয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

বাঙলাদেশে মোহিতলাল কবি অপেক্ষা সমালোচকরূপেই সমধিক খ্যাত। তাঁর সমালোচনা কর্মের পরিধি যেমন বহু-বিস্তৃত তেমনই তা সারগর্ভ। তৎসত্ত্বেও

শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকতার দিক দিয়ে তাঁর কবিসত্তা, সমালোচকসত্তা অপেক্ষা কোনো অংশই ন্যূন নয়। আমাদের বিশ্বাস, মোহিতলালের সমালোচকরূপে অসামান্য খ্যাতির মূলে তাঁর সৃষ্টিশীল কবিসত্তার নিগূঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল। তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা থেকে শেষ কাব্যগ্রন্থ 'হেমন্ত-গোধূলি'র কাল পর্যন্ত উভয়সত্তাই সক্রিয়। এই দুই সত্তার অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি পরিস্ফুট না হলে কবি মোহিতলালের স্বরূপ-প্রকৃতিটি ঠিক বোঝা যাবে না। সাহিত্যিক জীবনের উষালগ্নে 'মানসী' পত্রিকায় যখন তিনি কবিরূপে বাণীর দেউলে দণ্ডায়মান, তখন তাঁর সমালোচকসত্তার সসংকোচ উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। আবার তাঁর 'স্বপনপসারী'র সৌন্দর্যরস ও প্রেম-পিপাসার চিন্তালেশহীন উচ্ছল কবিতাগুলি যখন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন তিনি ঐ পত্রিকারই 'মাসকাবারি' অংশে সাহিত্যের সত্য-সুন্দর-সম্পর্ক রবীন্দ্রীয়-ভাবে ভাবিত হয়ে ব্যাখ্যা করছিলেন। যখন তাঁর জীবননিষ্ঠা, জীবনপ্রীতি ও জীবন-ভাবনা কাব্যে গভীরতালাভ করছে, তখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'কাব্যকথা'র আলোচনায় সাহিত্যকে জীবনের সত্য-সুন্দরের প্রতিরূপ রূপে ধারণা করার চেষ্টা প্রবল। 'স্বপনপসারী'র 'পাপ', 'অঘোরপন্থী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় এবং 'বিস্মরণী'র বিশিষ্ট জীবনবাদমূলক কবিতাগুলি রচনার কালেই জীবনবাদ বিষয়ক ধারণাটি সমালোচক মোহিতলালের চিত্তকে অধিকার করেছে। আবার সমালোচক হিসেবে যখন তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পাশ্চাত্যের গেটে, সোপেন-হাওয়ার, ক্রোচে, ম্যাথু আর্নল্ড, পেটার, মিডলটন মারি প্রমুখ সমালোচকদের সূত্রগুলি সমালোচনাকর্মে প্রয়োগ-তৎপর, তখন 'স্মরগরল' কাব্যেও কবিমন তত্ত্বরস-রসিক হয়ে উঠেছে। এই পর্যন্ত মোহিতলালের কবিসত্তার সঙ্গে সমালোচকসত্তা মোটের ওপর অবিরোধে অবস্থান করেছে। 'বিস্মরণী' পর্যন্ত কবির ভাবনা ও ধ্যান সমালোচকের রূঢ় রুক্ষ ভূমিতেও ছায়া ফেলেছে। 'স্মরগরল'এর কাল থেকে সমালোচকসত্তা প্রবলতর হয়ে কবিসত্তাকে কতকটা নিষ্প্রভ করেছে। এ-কাব্যে সমালোচকের তত্ত্ব-রসরসিকতা, মনন, যুক্তিধর্মিতা ও ভাবাভঙ্গীর প্রভাব অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমরা মনে করি, এইকালে তাঁর সমালোচকসত্তার সঙ্গে কবিসত্তার আত্মঘাতী বিরোধ তীব্রতম হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সেই বিরোধই অনিবার্য হয়ে উঠল—জাতিগত আত্যন্তিক দুর্ভাবনায় কবির মধ্যে বাঙালীসত্তার জাগরণে। আমরা দেখেছি মোহিতলালের মধ্যে এই সত্তারই আকালিক অভ্যুদয়ে তাঁর কবিসত্তা নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করছে। 'স্মরগরল'এর কালে এর সূচনা এবং 'হেমন্ত-গোধূলি'তে

তার বিকাশ ও পরে এই বাঙালীসত্তার পূর্ণ-জাগরণকালে তাঁর কবিসত্তার করুণ মৃত্যু। কবি মোহিতলালের বিচিত্রমুখী প্রবণতার মধ্য দিয়ে আমরা কবিকেই বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সমালোচক মোহিতলালের পানেও চাইতে হয়েছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, উভয়সত্তাই তাঁর একই প্রতিভার দুটি দিকমাত্র। কবি মোহিতলালের কবিমানসকে তাই সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে গিয়ে বারংবার সমালোচক মোহিতলালের প্রসঙ্গ এসেছে এবং আমাদের বক্তব্য সমর্থনের জন্যে সমালোচকের সমকালীন উক্তি যথেচ্ছ উদ্ধৃত করতে হয়েছে।

বিষয়-নির্বাচন এবং কবি ও সমালোচকের অন্তরঙ্গ-সম্পর্কের কথা এই পর্যন্ত। অতঃপর কাব্য-রসাস্বাদন-প্রসঙ্গ। আমরা কবির কবিমানসকে কাব্যের ভেতর দিয়েই অনুভব করার চেষ্টা করেছি। পূর্ব থেকে কোনো তত্ত্বের অনুমান ক'রে তার রস-ভাষ্যরূপে কাব্যপাঠ করি নি। মোহিতলালের অল্পবয়সের সাধারণ্যে অপরিচিত বহু কবিতা সংগ্রহ ক'রে, আমরা সেখান থেকেই তাঁর কাব্য ধারাকে অনুসরণ করেছি। তাঁর কাব্য-জীবনের দুর্গম ধারাটিকে ধীরভাবে অনুসরণ ক'রে দেখা গেছে যে তা নিরন্তর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিণামমুখী। তাঁর কাব্যপ্রবাহকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত ক'রে বিভিন্ন পর্বে ঐ দ্বন্দ্বের পূর্বাবস্থা থেকে সূচনা এবং পরিণতি পর্যন্ত কবিচিত্ত কিরূপে প্রাগ্রসর তা লক্ষ্য করা গেছে। আমাদের বিন্যস্ত 'উন্মেষপর্বে' জীবন ও মৃত্যু-চেতনা, প্রকৃতি-প্রীতি ও সৌন্দর্যপিপাসা এবং ঈশ্বর-ভাবুকতা কবির মধ্যে দেখা গেলেও তিনি স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত নন। কেবলমাত্র পরবর্তী কবি-জীবনের কয়েকটি মূলভাবগ্রন্থির এখানে সূচনা এবং কবির চিত্ত সম্পূর্ণরূপে এইকালে দ্বন্দ্বমুক্ত। বিকাশপর্বে কবির বলিষ্ঠ-দুরন্ত জীবনপিপাসা ও জগৎ-প্রীতি, মহৎ-আদর্শ-বরণের অভীপ্সা এবং সৌন্দর্যপিপাসা ও জন্মান্তর-বিশ্বাসের লক্ষণটি পরিস্ফুট হয়েছে। এই পর্বে মৃত্যু-চেতনা ও আস্তিক্যভাবনায় ক্ষীণ দ্বন্দ্বের তরঙ্গ উঠতে দেখা যায়। কিন্তু এ দুই দ্বন্দ্বকে রোমান্টিক কবি মনের উচ্ছলতার সঙ্গে কবি যেভাবে অতিক্রম করেছেন, তাতে এদের মূল কবিচিত্তের গভীরে প্রসারিত বলে মনে হয় না। কাজেই বিকাশপর্ব পর্যন্ত মোটের ওপর চিন্তালেশহীন দ্বন্দ্বমুক্ত একটি অবারিত প্রসন্নতার সুর লক্ষণীয়। সমৃদ্ধিপর্বে অর্থাৎ 'বিস্মরণী'র কালে কবির চিত্তে প্রবল দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে। জন্মান্তর-বিশ্বাস, মৃত্যুচেতনা, আদর্শ ও বাস্তব তথা সৌন্দর্য-পিপাসা এবং কবির বিশিষ্ট জীবনবাদ-ভাবনা ঘোরতর দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁকে নিক্ষিপ্ত করেছে। এই পর্বেই তাঁর মহৎ

জীবনাদর্শ-প্রীতিটি সংশয়-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ত্যাগ-তপস্যাপূত মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের দিকে অধিক ঝুঁকেছে এবং বিকাশপর্বের দুরন্ত-জীবন-পিপাসাটি পরার্থে আত্মোৎসর্গীকৃত জীবনের অনুধ্যানে আত্মস্থ হতে চেয়েছে। আর এই-কালেই কবি উপনিষদের নচিকেতার ভূমিকায় ত্যাগের মহিমাকে উপলব্ধি ক'রে মৃত্যু-ভাবনার দ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই মৃত্যু-ভাবনা ব্যতীত অন্যান্য অনুভূতিগুলির দ্বন্দ্বে কবিচিত্ত সকরুণ। তাঁর বিশিষ্ট জীবনবাদ-ভাবনা, দুঃখ-বাদ ও মৃত্যু-ভাবনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে এই পর্বেই সমন্বয়ের পথ খুঁজছে। সমৃদ্ধিপর্বের আর একখানি কাব্য 'রূপকথা'য় দ্বন্দ্বজর্জর কবির আত্মিক-শান্তি-লাভের প্রয়াস আছে। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দুঃখ-শোক এবং কাব্যজগতের বিভিন্ন অনুভূতিগুলির গভীর চিন্তা-সঞ্জাত দ্বন্দ্ব-সংশয়ের গুরুভার ক্ষণিকের জন্যে নামিয়ে রেখে শ্রান্ত-ক্লান্ত কবি 'রূপকথা'য় সন্ধ্যাকাশের একটি তারকার পানে চেয়ে যেন নিভৃতে আত্মবিস্মৃতির আনন্দে একখানি লঘু তালপাতার বাঁশি বাজাচ্ছেন। কবির ব্যক্তিগত ব্যথা ও ঐ দ্বন্দ্বের আঘাতকে সহনীয় করার জন্যে এরও প্রয়োজন ছিল। তাই শিশু বা কিশোরদের জন্যে রচিত এই কাব্যকে সমৃদ্ধিপর্বের অন্তর্গত করতে আমরা দ্বিধাবোধ করি নি। এরপর 'পরিণতি' পর্বের 'স্মরগরল' এ দেখি কবির চিত্ত পুনরায় দ্বন্দ্বাবর্তে নিক্ষিপ্ত। দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে ভিতরে ভিতরে কী গভীর সংগ্রাম! ভোগের আনন্দ বা দৈহিক মিলনের মিথুন-উল্লাসে কবির চিত্তে এখন অবসাদ এসেছে। দেহ-গত অথচ দেহাতিরিক্ত কবি-আত্মা ভোগের ভবনে হাহাকার ক'রে উঠেছে। যৌবনকে হারিয়ে এই পর্বেই কবিচিত্ত ক্রন্দন ক'রে উঠলেও কখনও স্মৃতির রাজ্যে আবার কখনো প্রকৃতির আশ্রয়ে তিনি এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

'বিস্মরণী'তে মৃত্যু-ভাবনার দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় নি। তাই 'স্মরগরল'-এ মানবজীবনের দুঃখ ও মৃত্যুবেদনার দ্বন্দ্বকে কবি প্রেম নামক এক রহস্যময় 'সিক্রেট অব্ লাইফ্' দ্বারা জয় করেছেন। কবির জন্মান্তর-বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এখানে অনুপস্থিত এবং আস্তিক্যবোধ সর্বসংশয়মুক্ত হয়ে গভীরতা লাভ করেছে। তাঁর আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্ব-মুক্তির প্রয়াসও এখানে কবিচিত্তের পরিণতিরই স্মারক। অবশ্য এই কালেই বাঙালীজাতির অধঃপতন-বেদনার একটি নূতন ভাবনা মোহিতলালের মধ্যে প্রথম জাগ্রত হয়েছে এবং 'হেমন্ত-গোধূলি' পর্যন্ত সেই ভাবনা উত্তরোত্তর পুষ্ট হয়েছে। তৎসত্ত্বেও কবির অন্যান্য ভাবনাগুলি পরিণতিপর্বের 'হেমন্ত-গোধূলি'তে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব হয়েছে এবং

কবিকে ক্রমশ অধ্যাত্মমুখী করেছে। 'স্মরগরল'-এ তিনি অধ্যাত্মরাজ্যের আলোকাভাস লক্ষ্য করেছিলেন, 'হেমন্ত-গোধূলি'তে তা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়েছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবির চিত্ত অধ্যাত্মরাজ্যে কেমন উন্মনা এবং স্মৃতির প্রশান্ত সরোবরে তাঁর কেমন অবগাহন-তন্ময়তা! কবি তাঁর ভাবনার পথ-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে পরিণামী সমন্বয়ের রাজ্যে উপনীত হয়েও কিন্তু স্বস্তি পেলেন না। জাতিগত দুর্ভাবনার আত্যন্তিক বেদনায় তাঁর মধ্যে বাঙালী-প্রীতি উদগ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। আর এরই ক্রমবিকাশে কবি মোহিতলালের কবি-জীবনের অবসান। আমরা তাঁর কাব্যজীবনে এইটেই অনুভব করেছি।

জীবন ও জগতের কয়েকটি আদি সমস্যা বা মূল ভাবনাই মোহিতলালের কাব্যের উপাদান। এই ভাবনাগুলি ভাবনা নয়, ভাবের আকারে প্রথমত কবিচিত্তকে অধিকার করছে। পরে সেগুলি বিপরীতমুখী ভাবের তটে প্রহত হয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে—আর কবি সেই দ্বন্দ্ব-সমাধানের জন্যে ভিতরে ভিতরে সংগ্রাম করছেন। পরিশেষে দ্বন্দ্ব-মুক্তির আনন্দেও কবিচিত্তে প্রসন্নতার সুর জাগছে। কবি মোহিতলালের কাব্যধারায় এই চিন্তাক্রমটি জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় পদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে আমরা যথাস্থানে ঐ সূত্রের আলোকেও তাঁর দিকে চেয়েছি। তাঁর কাব্যের বিভিন্ন দিক বিচারেও ঐ সূত্রটির সহায়তা আবশ্যকমতো গ্রহণ করা হয়েছে। কবি মোহিতলাল সম্পর্কে আমাদের বিশিষ্ট এই দৃষ্টিভঙ্গী—তাঁর কাব্যধারা সম্যকরূপে অনুধ্যান করার ফল। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে সূত্রাকারে ইঙ্গিত ক'রেই আমাদের কর্তব্য শেষ করি নি। আমাদের প্রস্তুত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর অধিকাংশ কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিস্তৃতভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কাব্যবিচারে তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে কখনো বিস্মৃত হই নি।

মোহিতলালের মতো কবিকে বুঝতে গেলে তাঁর জীবনীকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না। আবার তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং সমকালীন কাব্যের ঐতিহ্য স্মরণে না রাখলে তাঁর বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হবে না। যে দেশ-কালের পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব—সেখানে তাঁর স্থান কিরূপ সেকথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেইজন্যে আমরা প্রথম অধ্যায়ে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনকথা বিবৃত ক'রে তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং তাঁর স্বভাব-প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য কাব্যে কিরূপ ছায়াপাত করেছে, তার ইঙ্গিত করেছি। আবার অব্যবহিত পূর্বের ও সমকালের কাব্য-ঐতিহ্য কিভাবে কবিকে নিজস্ব সুর-স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা দিয়েছে সে-কথাও যেমন, তেমনই

সমকালীন দেশ-কালের আবহাওয়া তাঁর কবিমনকে কি অর্থে সঞ্জীবিত করেছে —তারও পরিচয় দিয়েছি। বাঙলা কাব্যাকাশে মোহিতলালের আবির্ভাব যে আকস্মিক নয়—এর গভীরে যুগ-মানসের প্ররোচনা বিশেষভাবে সক্রিয়—এ অধ্যায়ে কবির জীবনীর সঙ্গে সে-কথাও বিশদ করা গেছে।

তাঁর কাব্যে ভোগবাদ বা বিশিষ্ট জীবনবাদ তাঁকে সবচেয়ে বেশী স্বাতন্ত্র্যদান করেছে বলে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা পৃথকভাবে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন মনে করেছি। তিনি কোন্ অর্থে কতখানি ভোগবাদী—তাঁর বিশিষ্ট জীবনবাদের স্বরূপধর্ম কি এবং তাঁর ভোগ-ভাবনায় দুঃখবাদ অন্বিত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে কিরূপে ভোগ বিরতির কামনায় ভোগাতীত রাজ্যে নিয়ে গেছে তা যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনই এই সঙ্গে কাম ও প্রেম, দেহ ও আত্মা নারী ও প্রেম প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়েই মোহিতলালের সঙ্গে চার্বাক, এপিক্যুরস্, লুক্রেসিয়াস্ অ্যারিস্টিপ্-পাস্ ও ওমর খৈয়ামের ভোগবাদ-বিষয়ক ভাবনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রচুর তথ্য সহযোগে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কবি মোহিতলালের অনূদিত কবিতাবলীর গভীর ও সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদক কবির কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে কবিতানুবাদের বিভিন্ন হেতু, তাঁর সমগ্র অনুবাদ-কাব্যের প্রসার, এ-শ্রেণীর কবিতা রচনায় তাঁর নৈপুণ্য—প্রভৃতি প্রসঙ্গ সূক্ষ্মভাবেই আলোচিত হয়েছে। এই জাতীয় কবিতার অন্তরালে আমরা কবির কবিমানসের গহনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি।

অতিদীর্ঘ পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা মোহিতলালের কাব্যের বাণীরূপের বিচারণা করেছি। তাঁর কাব্যের ভাষা, স্টাইল, অলংকার, চিত্রকল্প, ছন্দ ও গঠনকৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই অধ্যায়েই লভ্য। কবিভাষা আলোচনায় তাঁর ভাষাদর্শের বৈশিষ্ট্য, তার প্রশংসনীয় ও নিন্দনীয় দিক, কবির চরিত্র ও ভাষা প্রয়োগে অভিমানপ্রসূত দ্বিধা প্রভৃতির কথা যেমন দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনি বিশেষ আলোচনায় তাঁর প্রযুক্ত দুরূহ তৎসম শব্দাবলী, অপ্রচলিত নূতন তৎসম শব্দসমূহ, তাঁর প্রিয় শব্দ ও ধাতু, নামধাতু, 'সু' ও 'আ' উপসর্গের প্রতি মমত্ববশত সৃষ্ট শব্দাবলী—প্রভৃতির পৃথক পৃথক তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই 'কবিভাষা' আলোচনায় স্টাইল সম্পর্কেও নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করা গেছে। শুধুই রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিকাল রীতির আলোচনাই নয়,—বেনেডেটো ক্রোচের স্টাইলতত্ত্বের আলোকে তাঁর

কাব্যকে দেখার আমরা প্রয়াস করেছি। এই আলোচনায় তাঁর বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্বের অন্তঃপুরে প্রবেশ করার দুঃসাহস কতকটা লক্ষিত হবে। তাঁর স্টাইল একদিকে যেমন কবিভাষাশ্রিত, অন্যদিকে তেমনই তা তাঁর ব্যক্তিত্ব-সমুদ্ভাসিত। একদিকে এ যেমন তাঁর বাক্‌ভঙ্গীর নিখুঁত রূপায়ণ, অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত হয়েও এ স্থলবিশেষে ব্যক্তিত্ব-অতিশায়ী। আত্ম-প্রত্যয়ে উজ্জ্বল, গূঢ়-গভীর ভাবনায় প্রদীপ্ত, বুদ্ধি ও মনীষার দীপ্তিতে শাণিত, আত্মাভিমানের প্রচ্ছন্ন বেদনায় রক্তিম এবং স্বীয় বোধ ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় বর্মাবৃত হয়েও আন্তর-বেদনার দ্বন্দ্বে বিশিষ্ট, অধীর ও অসহিষ্ণু যে একটি কবি-ব্যক্তিত্ব মোহিতলালকে স্বাতন্ত্র্যদান করেছে—সে কথা আমরা সর্বদা স্মরণে রেখেছি। অলংকার প্রয়োগে কবির ঔচিত্যবোধ, ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, রূপক ও সমাসোক্তি অলংকারের প্রতি কবির অতিরিক্ত পক্ষপাতের হেতু এবং সাধারণভাবে অলংকার প্রয়োগে কবির কৃতিত্বের বিচার, প্রভৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যে করা গেছে। চিত্রকল্প-সৃজনেও আমরা তাঁর দক্ষতাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। চিত্রকল্পের স্বরূপ, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিচারের সঙ্গে তাঁর কাব্যে প্রযুক্ত দুই প্রকার চিত্রকল্প প্রচুর দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যাত হয়েছে; তাঁর জ্ঞানলব্ধ বা পুঁথিগত চিত্রকল্পের উৎস নির্ণয়ে বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, কালিদাসের কাব্য, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণবসাহিত্য - প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে এবং মৌলিক জীবন-অভিজ্ঞতাসূত্রে লব্ধ চিত্রকল্পগুলির আরও দুটি সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ ক'রে সামগ্রিকভাবে কবির চিত্রকল্প-সৃষ্টির কৃতিত্ব বিচারিত হয়েছে। বাঙলা ছন্দ নিয়ে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলস্বরূপ তাঁর ছন্দের বৈশিষ্ট্য, অক্ষরবৃত্ত ও ষণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি অতিরিক্ত মমত্বের হেতু, অমিত্রাক্ষর, সনেট ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ রচনায় কবির সিদ্ধহস্ততা, বিচিত্রপ্রকার স্তবক বা পদবন্ধ-সৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা, মিলবিন্যাসে সচেতনতা ও অভিনব একটি রীতি-প্রবর্তনের গৌরব—প্রভৃতি বিস্তৃতভাবেই আমরা আলোচনা করেছি। কবির অন্তঃপ্রকৃতির-কোন্ প্রেরণায় এবং কোন্ কৌশলে কবিতাগুলি কিভাবে বিশিষ্টরূপ ধারণ করে, তা গঠন শিল্পের আলোচনায় দেখানো হয়েছে। নাট্যকাব্য ও স্বগতোক্তিমূলক নাট্যকবিতাগুলির অপরূপ গঠন-কৌশল যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি তাঁর লিরিক ও ওড্‌জাতীয় কবিতার কলা-কৌশলও বিশ্লেষিত হয়েছে।

গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরবর্তী বাঙলা কাব্যধারায় মোহিতলালের প্রভাব সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সূক্ষ্ম আলোচনা করা গেছে। এই

প্রভাবের স্বরূপ এবং তার বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ ক'রে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ বিভিন্ন কবির ওপর মোহিতলালের প্রভাব দেখানো হয়েছে। প্রভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কোনো অতিরঞ্জন করি নি। রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবি হয়েও অসামান্য শক্তির অধিকারী রবীন্দ্রোত্তর কবি মোহিতলাল সমকালীন বাঙলা-দেশের অনেক কবিকে প্রথম জীবনে প্রভাবান্বিত ক'রেও যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের আপনজন হতে পারেন নি—এ ইঙ্গিত আমাদের আলোচনায় পরিস্ফুট হয়েছে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গূঢ়-গভীর অনুভাবনা, বিশিষ্ট জীবনবাদ, মননের প্রাগর্য, বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, কাব্যে নাট্যিক উপাদানের অনুপ্রবেশ, স্টাইলের স্বাতন্ত্র্য, ভাষা ছন্দ ও চিত্রকল্প-প্রয়োগে মৌলিকতা, অনুবাদকাব্যে কৃতিত্ব—সর্বোপরি একটি বলিষ্ঠ পৌরুষধর্মী ব্যক্তিত্ব—প্রভৃতির জন্যে মোহিতলাল রবীন্দ্রোত্তর যুগের যে একজন অনন্যসাধারণ প্রথম শ্রেণীর কবি এতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবন-মৃত্যু, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি জগৎ ও জীবনের কতকগুলি একেবারে মুখ্য বিষয়ের অনুভূতি নিয়ে তিনি যেরূপ গহন-গাম্ভীর্যের পথে বিচরণ করেছেন এবং যেরূপ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত উৎকৃষ্ট স্টাইলের সাহায্যে তা প্রকাশ করেছেন, তাতে তাঁকে মুখ্য (Major) কবি বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। মোহিতলালের সমগ্র কবি-জীবনের ধারা নিরীক্ষণ করলে অনেক পাশ্চাত্য কবির বিশেষ বিশেষ দিকের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা মনে জাগা স্বাভাবিক।

কিন্তু পাশ্চাত্যের কবি-বিশেষের কোনো একটি দিকের সঙ্গে তাঁর কাব্যের সাদৃশ্যসূত্রে তাঁকে সেই কবির ভাবশিষ্য মনে করা অনুচিত। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এ-ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে টেনিসন, কীটস্ ও ল্যাণ্ডর মোহিতলালের প্রিয় কবি হলেও কবিধর্মে সুইনবার্ন ও ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গেই তাঁর কিছু অধিক সামীপ্য ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। সুইনবার্ন মোহিতলালের মতোই কবি-সমালোচক। প্রেমই তাঁর কাব্যের সর্বাপেক্ষা প্রিয়-উপাদান। 'Poems and Ballads' নামক কাব্যগ্রন্থের তিনটি পর্যায়ে তিনি প্রেমের কবিতায় যে উত্তপ্ত প্যাশন, গ্রীক প্যাগানিজমের নির্বাধ প্রকাশ ও দেহবর্ণনায় বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে মোহিতলালের বিশিষ্ট-জীবনবাদমূলক কবিতার বহিরঙ্গগত কিছু মিল লক্ষ্য করা যাবে। সুইনবার্নের ছন্দোমাধুর্য ও ধ্বনি-সম্পর্কে শ্রুতির অভ্রান্ততা কতকটা মোহিতলালের মধ্যেও লক্ষণীয়। আবার ম্যাৎসিনী-ভক্ত সুইনবার্নের ইটালির জাতীয়-মুক্তি কামনায় রচিত কবিতাগুলির আবেগ ও আদর্শ (spirit)

মোহিতলালের শেষজীবনের জাতির অবক্ষয়-বেদনায় রচিত কাব্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। সুইনবার্নের ব্যক্তি-তর্পণমূলক কবিতাগুলিও মোহিত-লালের অনুরূপ কবিতাগুলিকে স্মরণ করায়। তথাপি সুইনবার্নের অতিরিক্ত আঙ্গিক সচেতনতা, অতিরিক্ত সংগীতময়তা এবং নিছক দেহবাদের সঙ্গে মোহিতলালের মিল নেই। মোহিতলালের বিশিষ্ট জীবনবাদে শুধুই দেহ নয়—আত্মারও পূর্ণ-স্বীকৃতি আছে, আবার পরিশেষে দেহাত্মবাদকে অতিক্রম করারও ইঙ্গিত আছে।

ম্যাথু আর্নল্ডও মোহিতলালের মতোই একজন প্রথম শ্রেণীর কবি-সমালোচক। ম্যাথু আর্নল্ডের মতোই মোহিতলালের বহু কবিতা আত্মচিন্তামূলক। আর্নল্ডের বুদ্ধিবাদ, মনন ও সংযম যেমন তাঁর লিরিক কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্যদান করেছে, মোহিতলালেরও ঠিক তাই। আর্নল্ডের অনুরূপ মোহিতলালও খাঁটি মানবতাবাদী ও গ্রীক সাহিত্যের পূজারী। সমকাল-সম্পর্কে হতাশা ও বিষণ্ণতা দুই-কবির মধ্যেই লক্ষিতব্য। ক্ল্যাসিকাল ও রোমান্টিক রীতির সংমিশ্রণে কাব্যরচনার প্রবণতা দুই কবিরই। দীর্ঘ-লিরিক কবিতা রচনার আগ্রহও দুইজনের। আধুনিক কালের সংশয় ও যুক্তিবাদের দ্বারাও দুই কবি বহুলাংশে চালিত। দু'চারটি কবিতায় যেমন Tristram and Iseult, Thyrsis, Scholar Gipsy, The Forsaken Merman, Obermann প্রভৃতিতে আর্নল্ডের সিদ্ধি চরমে উঠেছে, মোহিতলালেরও সেইরূপ পান্থ, মৃত্যু ও নচিকেতা, মোহ-মুদ্গর, নারী স্তোত্র, বুদ্ধ, প্রেম ও জীবন—প্রভৃতি কবিতায় অনুরূপ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। Eternal passion ও Eternal painএর সুর দুই কবির কাব্যেই শ্রুত হয়। মননঋদ্ধ ভাবনার উৎসারে, দুরূহ আভিজাত্যযুক্ত শব্দের প্রয়োগে ও ক্ল্যাসিকাল রীতির ব্যবহারে—দুই কবির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হবে। তৎসত্ত্বেও মোহিতলাল কবিধর্মে পুরোপুরি সুইনবার্ন বা ম্যাথু আর্নল্ডের পন্থানুসরণ যে করেন নি—একথাও এই সঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর ক্রমোজ্জিয়মান কবিসত্তা ধীরে ধীরে পরিণতির তীরে এসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে রইল। বাঙালীজাতির প্রতি অতিরিক্ত মমত্ব এবং বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের অনুশীলনে আত্যন্তিক মনঃসংযোগ তাঁর কবিজীবনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনাকে খণ্ডিত না করলে তিনি আমাদের হাতে বাণীর কোন্ স্বর্ণফসল তুলে দিতেন, তাঁর কাব্যসাধনার পরিণতিপর্বেই সে আভাস দেওয়া গেছে। তাঁর কবিজীবনের অকালমৃত্যুতে আমাদের দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের মধ্যে সেইটুকুই সান্ত্বনা।

পরিশেষে বর্তমান গ্রন্থের নামকরণ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। 'মোহিতলালের কাব্য ও কবিমানস'—এই নামে আমরা গ্রন্থখানিকে আখ্যাত করেছি। কাব্য বলতে শুধুই কাব্যের ভাববস্তু নয়, ভাব ও রূপের যে অচ্ছেদ্য নিবিড়তায় ভাব বাণীরূপ পরিগ্রহ করে- সেই দুয়েরই পরিচয় বোঝায়। প্রস্তুত গ্রন্থে কবির কাব্য ও তাঁর রূপরীতির পূর্ণ-বিশ্লেষণেরই প্রয়াস আছে- আর সেই সঙ্গে কাব্যের মধ্যে সংগুপ্ত কবির শিল্পাত্মাকে নিরীক্ষণ করার প্রয়াস করা গেছে।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহ্য, যুগ ও জীবন-প্ররোচনা

রবীন্দ্রপ্রতিভার ভরাকোটালের কালেই কাব্যক্ষেত্রে মোহিতলাল মজুমদারের আত্মপ্রকাশ। কাব্যজীবনের প্রারম্ভে তিনি রবীন্দ্রীয় ভাব ও ভাষার জাদুমন্ত্রে অভিভূত ছিলেন। তাঁর স্বপনপসারী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব-পর্যন্ত তিনি ছিলেন অন্ধ রবীন্দ্রভক্ত এবং নিজ কাব্যাদর্শে রবীন্দ্রানুসরণে তিনি কিছুমাত্র অগৌরব-বোধ করেন নি। কাব্যজগতে প্রবেশকালে যখন তিনি স্বকীয় কাব্যমন্ত্রটিকে খুঁজে পান নি, তখন শুধুই রবীন্দ্রনাথ নয়, মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষাকে তিনি অনেকস্থলে অনুকরণ করেছেন। কিন্তু 'পাপ', 'অঘোরপন্থী' 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ', 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর', 'বেদূঈন' প্রভৃতি 'স্বপনপসারী'র কবিতাগুলি প্রকাশিত হলে বুঝা গেল, মোহিতলাল তাঁর কবিমন্ত্রকে লাভ করেছেন। তাঁর একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে—জীবনকে ভোগ করার এবং সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেহ-ধৃত বাস্তবজীবনকে দেখবার পদ্ধতি তাঁর এমনই যা 'ভারতী'র কবি-গোষ্ঠীর কারো নেই। মোহিতলালের এই স্বাতন্ত্র্যে অনেকেই ক্ষুন্ন হলেন এবং তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী কবি বলেও অভিহিত করা হল। এরপর তাঁর 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্য প্রমাণ ক'রে দিল তাঁর কবিস্বাতন্ত্র্য। মোহিতলালের জীবনবাদ বা ভোগবাদমূলক কবিতাগুলি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রীয় কাব্যাদর্শ থেকে পৃথক। তাঁর বস্তুসচেতন কবি-দৃষ্টি, তাঁর বুদ্ধিবাদ বা মননপ্রাধর্ষ, তাঁর কাব্যের নাটকীয় উপাদান ও তাঁর কাব্যের ভাস্কর্যোপম গঠন কবিহিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত্বকে প্রতিষ্ঠিত করল।

কিন্তু মোহিতলালের এই মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ কি? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই বিখ্যাত ভগবদুক্ত শ্লোকটি[১] উদ্ধার ক'রে বলা যেতে পারে যে তাঁর কবিপ্রতিভার মধ্যে শ্রীভগবানের বিভূতি প্রচ্ছন্ন থেকে তাঁকে এই দুর্লভ শক্তি দান করেছে। কিন্তু এ উত্তরে বিজ্ঞান-লালিত মন সন্তুষ্ট হয় না—এতে ইতিহাসের সত্য অস্বীকৃত হয়। আমাদের ধারণা, মোহিতলালের এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে সর্বব্যাপী রবীন্দ্রপ্রভাবের যুগ-প্রতিক্রিয়া। এই কারণে মোহিতলালের কবিমানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে কিঞ্চিৎ পূর্বগামী ও সমকালীন কাব্যধারা, রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ এবং এই সূত্রে যুগপ্রবৃত্তির প্রবণতা-বিশ্লেষণ একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক। আবার এই সঙ্গে কবির জীবনী ও

দেশকালের কথাও সর্বদা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা মোহিতকাব্যের সেই আপাতনীরস প্রেক্ষাপটের একখানি রেখাচিত্র অঙ্কন করছি।

১২৯৫ সালে মোহিতলালের জন্মকালে বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথই কাব্যজগতের মধ্যমণি। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেনের মধ্য দিয়ে বাঙলা মহাকাব্য রচনার ধারাটি প্রবাহিত। আবার এই তিনজন প্রধান কবিও খণ্ড কবিতা রচনায় নিরস্ত থাকেন নি। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী', হেমচন্দ্রের খণ্ড 'কবিতাবলী' এবং নবীন সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী'তে গীতিকাব্যিক আবেগ-উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছিল। এমন কি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এবং নবীন সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' কাব্যের মহাকাব্যিক বন্ধনের মধ্যেও গীতিকাব্যিক কবি-প্রাণের গুঞ্জন এবং উচ্ছ্বাস শ্রুত হয়েছে। আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর নবজাগরণের কালে তার চিত্তে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছিল, তাতে মহাকাব্যিক বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা, দৃঢ়-সংবদ্ধ কাহিনী-কায়া-নির্মাণ এবং মহাকবির নৈর্ব্যক্তিকতাকে রক্ষা করা সহজ ছিল না। ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য ও হাহাকার তখন কাব্যের মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এই কারণেই ঐ তিনজন মহাকবির কাব্যসাধনার কালেই বাঙলা কাব্যে একটি নূতন সুর বিহারীলালের কণ্ঠে বেজে উঠল।

বিহারীলালই আধুনিক বাঙলা গীতিকাব্যের জনক। মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের যে গীতিকাব্য তার সঙ্গে বিহারীলালের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিহারীলাল যুদ্ধ-বর্ণনাবহুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশ-প্রীতিবিষয়ক কাব্য, নীতিনিষ্ঠ সমাজকল্যাণের কবিতা বা পৌরাণিক আখ্যানসম্বলিত কাহিনীকাব্যও লিখলেন না। কাব্যে বিষয়বস্তুর মহিমাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি আত্মগত ভাবকল্পনার মাহাত্ম্যকে নিরঙ্কুশ করলেন। তাঁর কাব্যের ভাববস্তু ঐ তিনজন কবির মতো স্পষ্ট নয়, তাঁর প্রকাশরীতিও ঋজু ও সহজবোধ্য নয়। বিশ্ব-সৌন্দর্যের সারভূতা কল্পিতা এক মানসী সারদার কল্পনা ক'রে তিনি তাঁরই সঙ্গে মানসিক বিরহ-মিলনের যে সম্পর্ক স্থাপন করলেন, তার সঙ্গে উনিশ-শতকের ঐ প্রচলিত কাব্যাদর্শের কোনো মিল ছিল না। বিহারীলালে বাঙলা-কাব্যের এই যে যুগান্তর-সূচনা—তারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথে। বিহারী-লালের সৌন্দর্যচেতনা, ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সৌন্দর্যপিপাসা এবং মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ খুবই

পরিচিত ছিলেন। এ সকলের সঙ্গে নিজস্ব অনন্যসাধারণ স্বানুভবাত্মক অতিতীক্ষ্ণ ও অতিজাগ্রত দৃষ্টিভঙ্গীকে মিলিয়ে নিয়ে বাঙলা কাব্যে তিনি যে সৌন্দর্যতত্ত্বের সৃষ্টি করলেন, তা অতিশয় মৌলিক। বাস্তবজগতের সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে বিশুদ্ধ একটি সৌন্দর্যের জগৎ রচনা ক'রে এবং পরে একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক সৌন্দর্যবোধের মধ্যে বাস্তবজগতের সুখ-দুঃখ ও জীবন-মৃত্যুকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি সৌন্দর্যের যে পরিচয় দিলেন, যাতে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। তারপর এই সৌন্দর্যবোধই অবিমিশ্র একটি রহস্যময় প্রেরণার ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর কাব্যে জীবনদেবতা-তত্ত্বের আগমন ঘটিয়েছে। এই জীবনদেবতা কখনও তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী, কখনো তাঁর ব্যক্তিগত দেবতা, কখনো লীলাসঙ্গিনী আবার কখনো বিশ্বদেবতা বা অরূপ-দেবতার বেশে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চিত্তকে উদ্বোধিত করেছে। আবার নিজের সঙ্গে বিশ্বের যোগসূত্রের বন্দনায় সীমা-অসীমের বিচিত্র লীলাও তাঁর কাব্যে ঔপনিষদিক তত্ত্ব-চিন্তার পথ ধরে অভিনব মূর্তি ধারণ করেছে। আত্মগত ভাবকল্পনার জগৎ ও জীবনের যে একটি রসরূপ তিনি মানসলোকে গড়ে তুলেছিলেন তার বহুবিচিত্র কারুকার্য, অন্তহীন বর্ণবিন্যাস ও অপূর্ব কলাকৌশল, তাঁর কাব্যের বাণীরূপের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কাব্যের অতিসূক্ষ্ম মানস-পরিমণ্ডল এবং তাঁর বিচিত্র কোমল সংগীতাত্মক ভাবব্যঞ্জনা এবং বাণীরূপের ইন্দ্রজাল প্রচলিত কাব্যধারা থেকে সম্পূর্ণ অভিনব এবং এক বিহারীলালই তার কতকটা আভাস। রবীন্দ্রকাব্যের সেই সম্মোহনী আকর্ষণ এবং ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তখন অনেকেই বিস্ময়ে হতবাক্। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর এই বিশিষ্ট ভাববাণী নিয়ে বাঙলার বাণীমন্দিরে এলেন, তখন ঐ মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীন সেনের গীতিকাব্যরসে অভ্যস্ত রসিক-চিত্ত তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে পারে নি।

তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার কিছুপূর্বেই কাব্যে অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে একটি সাহিত্যসমাজ মুখর হয়ে উঠেছিল। ১২৯৩ সালের 'নবজীবন'এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাব্য সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে সেই আন্দোলন স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। "বাঙ্গালা সাহিত্য সূতিকাগার হইতেই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণের নন্দ যশোদা,—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী বৃন্দা চন্দ্রা, শ্রীদাম, সুবল— মান মাথুর রাসপ্রভাস সকলেই বর্ণনাগুণে আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থ। ... কেবল বৈষ্ণব কবিগণ বলিয়াই নহে, বাঙ্গালার পূর্বতন সকল কবিই সুস্পষ্ট চিত্রণে সমীচীন। কে-যেন, কি-যেন, কেন-যেন, কোথায় যেন, যেন-যেন করিলে কবিতা হয় না।

... কবিতার অস্থি আছে মজ্জা আছে, রক্ত আছে মাংস আছে, কবিতা কেবল ছায়াময়ী কান্নার বাষ্পময় দীর্ঘশ্বাস নহে।"

বলা বাহুল্য এই সমালোচনা বের হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাতসঙ্গীত' 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়েছে। মূলত বিহারীলাল-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'এর কিছু সংখ্যক কবিতা যে ঐ সমালোচনার লক্ষ্য—এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর যখন তাঁর কবিপ্রতিভা নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বিশ শতকের সেই প্রবল দশকে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি দল বেশ কিছুদিন আধিপত্য করেছিল। ঐ 'কাব্যসমালোচনা'য় যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল এঁদের বক্তব্যে তাই জোরালো ও ব্যাপকরূপে প্রকাশ পেল।

এই রবীন্দ্রবিরোধী ব্যক্তিদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং চিত্তরঞ্জন দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরোধী দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলেও রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকায় ওঁরা বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ ক'রে চলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁদের ত্রিবিধ অভিযোগ ছিল। প্রথমত রবীন্দ্রসাহিত্যের আদর্শ বিদেশী, দ্বিতীয়ত তার ভাববস্তু বস্তুতন্ত্রতাহীন এবং তৃতীয়ত তার প্রকাশরীতির ভাষা খাঁটি বাঙলা-ভাষা নয়। তাঁরা আরও বললেন—"উৎকট পাশ্চাত্যভাবের সহিত দেশীয় বৈষ্ণবসাহিত্যের ধার-করা মালমশলা মিশাইয়া তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যে খেচরান্ন প্রস্তুত করিতেছেন তাহা সুধীজনের সেব্য নহে, পরন্তু তাহাতে বাঙলাভাষা উৎসন্নে যাইবে।"[২] কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের 'মিঠে-কড়া' সমালোচনাকেই ঐ বিরোধী দল প্রকৃত রবীন্দ্র-সাহিত্য-সমালোচনা বলে সেদিন প্রচার করেছিলেন। তাঁদের রবীন্দ্র-বিদ্বেষ এতখানি উগ্র হয়ে উঠল যে একটি রবীন্দ্র-বিরোধী সভার[৩]ও প্রতিষ্ঠা হল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে বাঙলাকাব্যের আসরে প্রচণ্ড উত্তাপ সঞ্চার করেছিলেন।

রবীন্দ্র-বিরোধী ঐ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পাশাপাশি ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত কবিগণ। প্রথমে সংখ্যায় অল্প হলেও পরে এঁরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, (১৮৮২-১৯২২) ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪০), সতীশচন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯০৪), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৪), যতীন্দ্রমোহন

বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (১৮৭৩-১৯২৭), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৪৮), কালিদাস রায় (১৮৮৯-) প্রভৃতি কবিগণ রবীন্দ্রভক্ত কবিরূপেই বিশেষ পরিচিত। এই সমস্ত ভক্ত কবিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথকে সশ্রদ্ধ গুরুর আসনে বসিয়ে বিরোধীপক্ষকে রবীন্দ্র-কটাক্ষের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেন। বিরোধী-পক্ষকে আক্রমণের ব্যাপারে যারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, সতীশচন্দ্র রায়, যতীন্দ্র-মোহন বাগচী এবং দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙলার সারস্বত-সমাজে রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার যে মহিমাকে এঁরা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন —তাতে ভক্তের উচ্ছ্বাস বা অতিরঞ্জন হয়তো কিছুটা ছিল। কিন্তু মনে রাখা দরকার, রবীন্দ্র-প্রতিভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মতোই খরোজ্জ্বল ও স্বয়ংপ্রকাশ। বিরুদ্ধ দল যে-ভাবে এবং যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে তাঁদের অজ্ঞানতা এবং ব্যক্তিগত ঈর্ষার জ্বালা যে অনেকখানি ছিল—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেইজন্য অত্যল্প-কালের মধ্যে সেই বিরুদ্ধ-দল নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং বিশ শতকের প্রথম দশকের সেই অতি-উত্তপ্ত রবীন্দ্র-বিদ্বেষ দ্বিতীয় দশকে অনেকখানি শান্ত হয়ে এল। কবির পঞ্চাশৎ বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে ভক্ত ও বিরোধী দল তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন —১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরের বছর নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রপ্রতিভার মর্যাদা দেশে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করল। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে, রবীন্দ্র-বিরোধী দলের আক্রমণের মূলে যতই সংকীর্ণতা ও ব্যক্তি বিদ্বেষ থাক্ তাঁদের অভিযোগের মধ্যে যুগের একটি সত্যও ক্ষীণভাবে উঁকি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগের মধ্যে একথা খুবই সত্য যে তাঁর সৌন্দর্য-কল্পনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক কবিকল্পনার সঙ্গে বাঙলা-দেশের প্রচলিত কাব্যধারার সামঞ্জস্য নেই। এ-কল্পনা অভিনব। বিদেশীয় ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যই এর মূল উৎস। বিহারীলাল থেকেই বাঙলা কাব্যে এর সূচনা।

আর উনিশ শতকের পরিচিত বাঙলা কাব্যে যে বস্তুসচেতন এবং সহজ-বোধ্য কবি কল্পনার লীলা দেখা গিয়েছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের বাস্তবতাকে কখনই এক করা চলে না পূর্ববর্তী কাব্যে অতি-পরিচিত ভাব ও ভাবনাকে যে ভাষায় রূপ দেওয়া হয়েছিল তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনাধর্মী-সংগীতাত্মক ভাষার মিল হয় না। অথচ ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য সাহিত্যপাঠের ফল-স্বরূপ রবীন্দ্রকাব্যকে বরণ ক'রে নেবার জন্য উপযুক্ত আসর প্রস্তুত হয়ে গেছে।

সেইজন্যে বিরুদ্ধ দল রবীন্দ্রকাব্যকে সাদর অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠিত হলেও প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ অচিরেই পরিহার করল। সে যাই হোক, একথা মানতেই হবে যে তাঁদের বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি কবিদের প্রতিষ্ঠিত গীতি কাব্যধারাটির তলে তলে পুনর্জাগরণ-বাসনা নিহিত ছিল। কিন্তু এই জাগরণ যদি সম্ভবও হয়, তাহলে কি তা পুরাতনের বেশেই আসবে? তা কখনই সম্ভব নয়। পুরাতনের জঠরেই নতুন আসে, কিন্তু--নতুন কালের পতাকা নিয়ে। সাহিত্যের ইতিহাসে পুরাতন কখনও তার সেই প্রাচীন কলেবর ও প্রাচীন কণ্ঠস্বর নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না—যুগই তাকে নতুন বেশে সাজিয়ে দেয়।

নোবেল পুরস্কার লাভ করার পর থেকেই রবীন্দ্র যুগের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। তারও আগে বাঙলাদেশের তরুণচিত্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে মুগ্ধ-বিবশ হয়েছে। এই কালের কথা স্মরণ ক'রে বাঙলাদেশে রবীন্দ্র সূর্যের মহিমার কথায় স্বয়ং মোহিতলাল মজুমদারই লিখেছেন,—"তখন ১৯০৫-৬ সাল; রবীন্দ্রনাথ 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন'এর সম্পাদক, আমরা তখন কলেজে বিদ্যার্থী। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রবীন্দ্রনাথের বাণী হৃদয়ঙ্গম করা তখনকার তরুণদের সাধনার বিষয় ছিল। সারা বাঙলা জুড়িয়া সমগ্র শিক্ষাভিমানী তরুণ সম্প্রদায়ের মনে রবীন্দ্রনাথের আসন তপোবন বেদিকার অপেক্ষাও উঁচু ও পবিত্র ছিল।...সেইকালে রবীন্দ্রনাথকে সূর্য্য অপেক্ষাও জ্যোতিষ্মান এবং তারকার চেয়ে সুদূর বোধ হইত। মনে হইত, এই কবির অভ্যুদয়ে চিরকালের জন্য বাঙলাসাহিত্যের আদর্শ স্থির হইয়া গেল; সাহিত্যসাধনাই ধর্মসাধনার স্থান অধিকার করিবে। উৎকৃষ্ট রসবোধের সাহায্যে বাঙালীর মন উদার হইবে, জাতীয় জয়যাত্রার পথে বাঙালী দীর্ঘকালের পাথেয় সঞ্চয় করিবে। তাই সেদিন সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের পরমতম সাধনা বলিয়া মনে হইয়াছিল।"[৪]

এ উক্তিকে যদি বা রবীন্দ্র-ভক্তের উচ্ছ্বাস বলেও মনে করি, তাহলেও স্বীকার করতে হবে নোবেল পুরস্কার লাভের পর যাদের মনে রবীন্দ্র-প্রতিভার শক্তি সম্বন্ধে সামান্যও সংশয় ছিল তাঁরাও মনে মনে লজ্জিত হয়ে কবিকে স্বীকৃতি না জানিয়ে পারলেন না। তারপর ঐ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বাঙলাদেশে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রকাব্য-সৌরমণ্ডল। এই সৌরমণ্ডলে অবস্থিত অধিকাংশ ভক্ত কবি রবীন্দ্রসূর্যের সঞ্জীবনরসে এমনই তন্ময় ছিলেন যে নিজেদের স্বকীয়তা

দেখানোর কোনো প্রয়োজনই তাঁরা অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ও ভাষার সজ্ঞান অনুসরণের ফলে তাঁদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেছে।

কিংবা এমনও বলা যায় যে রবীন্দ্রকাব্যের বিশাল অরণ্যে তাঁরা পথ খুঁজে পান নি বা স্বকীয় পথে বিচরণ করবার মতো শক্তিও তাঁদের ছিল না। অবশ্য সকল ভক্তের ওপর রবীন্দ্র-প্রভাব সমান নয়। এঁদের মধ্যে কারো কারো শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। এঁদের ভাব-কল্পনা রবীন্দ্র বিরোধী নয়, আবার সর্ববিষয়ে এঁরা, অন্ধ-রবীন্দ্রানুকরণও করেন নি। তাই রবীন্দ্র-মণ্ডলের মধ্যে অবিরোধে বাস ক'রেও এঁরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কেউ কেউ দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এই সমস্ত কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী এবং কালিদাস রায়ের নাম উল্লেখ করা চলে। আবার এঁদেরও সকলের শক্তি সমান নয়। সত্যেন্দ্র-নাথের স্বাতন্ত্র্য নানা দিক থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

অক্ষয়কুমার বড়াল এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্র সমকালীন এবং দুজনেরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধুর প্রীতির সম্পর্ক। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের বর্ষীয়ান্ এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে কিছু সংখ্যক তরুণদের ওপর এঁদের কাব্যের প্রভাব পড়েছিল। কবিধর্মে অক্ষয়কুমার, বিহারীলালেরই ভাবশিষ্য এবং দেবেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল-প্রবর্তিত রোমান্টিক ধারার কবি হলেও তাঁর কবি-প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। এঁদের কাব্যে সজ্ঞান রবীন্দ্রানুসরণ নেই।

১৯০৮।৯ সালে মোহিতলাল মজুমদার যখন কাব্যরচনা শুরু করেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের (১৮৫৪-১৯১৮) সমস্ত কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে এবং ১৯২১ সালে মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' বের হওয়ার আগেই প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) এবং পদচারণ (১৯১৯)ও প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রভক্ত এবং রবীন্দ্র-আত্মীয়। কিন্তু এই তিনজনের কারো কাব্যেই রবীন্দ্র-প্রভাব নেই। রবীন্দ্র-পন্থী হয়েও যাঁদের কাব্যে স্বকীয়তার কিছু অধিক লক্ষণ আছে এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত এমন কয়েকজন কবির কবিধর্ম বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের বাইরে বাঙলা গীতিকাব্য কোন পথটিকে চিহ্নিত করতে চাইছিল। আর এর থেকেই আমরা জানতে পারব, মোহিতলাল রবীন্দ্রভক্ত এবং রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবি হয়েও কিভাবে সেই পথের নিশানা পেয়েছিলেন।

প্রথমেই দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। ইনি কাব্য-সাধনায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রীয় আদর্শ ও রীতিকে পরিহার করেছিলেন। 'আর্যগাথা' ১ম খণ্ড (১৮৮২) 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৩) আষাঢ়ে (১৮৯৯) হাসির গান (১৯০০) মন্দ্র (১৯০২)—আলেখ্য (১৯০৭)—এই কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আপন কবিকীর্তির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর প্রথম দুটি কাব্যে হেমচন্দ্র, মধুসূদন বা নবীন সেনের প্রভাব আছে, সেখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু 'আষাঢ়ে' থেকেই তাঁর মৌলিকতা ফুটে উঠেছে। 'আষাঢ়ে' এবং 'হাসির গান'-এ বাঙালীর চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে তিনি হাস্যরসই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে আকাশচারী কল্পনার পক্ষবিস্তার নেই। তার্কিকের মন নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাষায় তিনি বহু অসঙ্গতি-দোষকে তুলে ধরেছেন। পরিচিত মানবসমাজ ও সংসারের নানারূপ সমস্যা তাঁর চিত্তে প্রশ্ন-কাতরতা জাগিয়েছে 'মন্দ্র' কাব্যে। এতে তাঁর একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বও ফুটে উঠেছে। আর স্ত্রী-বিয়োগের পর রচিত 'আলেখ্য' কাব্যে তাঁর সংশয়-প্রবণ চিত্ত শান্ত হয়ে কবির আক্রমণাত্মক মনোভাবকে প্রশমিত করেছে। তাঁর কবিভাষার একটি নিজস্ব শ্রী আছে। তাঁর ছন্দের নতুনত্ব, বাক্যযোজনায় ও শব্দ-প্রয়োগের অভিনবত্ব এবং লোক-প্রচলিত গদ্যধর্মী ভাষা—সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর একটি স্বকীয় স্টাইল কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের তেজোগর্ভ হাস্যের অন্তরালে পৌরুষ ও সত্য-নিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রশংসা করেছেন। সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন,—"বলিতে কি দ্বিজেন্দ্রলাল নানা দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। ঋজুতা, বস্তুভিত্তি এবং ভাবসংযম, এ সমস্ত ক্লাসিক আদর্শের কাব্যশিল্পের প্রধান শক্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্লাসিক আদর্শে পরিচালিত হইয়াই আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের অত্যন্ত প্রবল অস্পষ্টতা-আদর্শের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।"[৫]

মোহিতলাল যে-কালে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলেন এবং যে-কালে সাহিত্যক্ষেত্রে সাবালক হয়ে ওঠেন নি, সেই কালের দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি স্মরণ ক'রে যা বলেছেন, তাও অত্যন্ত মূল্যবান।

"আমার বয়স তখন সতের কি আঠার, সেই কালের দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়; দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি নাটক 'রাণা প্রতাপ' হঠাৎ যেমন করিয়া আমার হাতে আসিয়া পড়ে· তখন সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পগুলির সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং তাহার ফলে এক অপূর্ব

সাহিত্যিক উন্মাদনা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু সে কাব্যের সেই খরতর আলোকেও আর একটি আলোকের আভা আমার মানস-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল—আজ তাহা স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারি।"৬

মোহিতলালের এই স্বীকৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেইকালে তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত হলেও দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের একটি নূতন আভা তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের অন্তর্গত 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের সেই সাহিত্যিক যুদ্ধে যোগ দেবার মতো তখনও তাঁর শক্তি না জন্মালেও মনে মনে রবীন্দ্র-দলভুক্ত হওয়ার কথা চিন্তা ক'রে পরে তাঁর অনুতাপ হয়েছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে কোথায় যেন একটি তাঁর যোগসূত্র ছিল, অথচ সেদিন বয়োধর্মের চাপল্যে তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন,—"রবীন্দ্র প্রতিভার যাহা শ্রেষ্ঠ দান তাহাকেই আদর্শ করিয়া আমরা সেকালে অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিক একটা উন্নত ভাব-জীবনের আরাধনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম। ঠিক এইকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এক নূতন ব্রতে ব্রতী হইলেন।...সেদিন আমরাও ইহা বুঝি নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন জাতির কল্যাণ। সাহিত্যকে মানব-সাধারণের ভাবভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে। যাহা সর্ব্বজন-হৃদয়বেদ্য, যাহা সবল ও সুস্থ চিত্তের পথ্য, যাহা মনের মোহ সৃষ্টি না করিয়া প্রাণে আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে, যাহার রস রামায়ণ মহাভারতের মতো লোকায়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছিলেন।.. সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ সম্বন্ধে আমি আজিও দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সকল বিষয়ে এক নহি ; কিন্তু আমাদের সমাজের তৎকালীন অবস্থায় সাহিত্যের নীতিনিরূপণে তিনি যে প্রেম ও বাস্তব বুদ্ধি, সুস্থ চিত্তবৃত্তি ও লিপিসংযমের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে আজিও সত্য।"৭

মোহিতলালের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন কেন দ্বিজেন্দ্রলালকে, 'বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী' বলেছেন আবার এও জানা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ ব্যাপারে সকল বিষয়ে মোহিতলাল এক না হলেও অনেক বিষয়েই তাঁরা এক। আমরা মনে করি, দ্বিজেন্দ্রলালের "বস্তুভিত্তি" ও ক্লাসিক 'সংযম'এর প্রভাব মোহিতলালকে ভারতী-কবিগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যদান করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ঋজুতা' মোহিতলালের কবিভাষায় সর্বত্র লভ্য নয়। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের তার্কিকতার

মধ্য দিয়ে যে মনন এবং পৌরুষ বা ব্যক্তিত্ব, তা মোহিতলালের কাব্যেও প্রাপ্তব্য।

গোবিন্দচন্দ্র দাস কবি হিসেবে বাংলাদেশে অনেকখানিই উপেক্ষিত। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি এবং ইংরেজি-সাহিত্যে তাঁর কিছুমাত্র অধিকার ছিল না। তাঁর কাব্যের দেহবাদ এবং তাঁর অশিক্ষিত-পটু কবিত্ব হয়তো সেকালের সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের রুচিসম্মত হয় নি। সেইজন্যে যতখানি মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য তা কোনোদিনই তিনি লাভ করেন নি। ভাওয়ালের এই কবির জীবন নিদারুণ দুঃখের একটি সকরুণ আলেখ্য। ভাওয়ালের জমিদারের উৎপীড়ন, এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় তাঁকে অনশনে অর্ধাশনে কাল কাটাতে হয়েছিল—বিনা চিকিৎসায় তাঁকে করুণ মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। অথচ এই অসহনীয় দুঃখ দারিদ্র্য ও অত্যাচারের মধ্যেও তাঁর কাব্যসাধনার বিরাম ছিল না। প্রেম ও ফুল (১৮৮৮) কুঙ্কুম (১৮৯২) কস্তুরী (১৮৯৫) এবং ফুলরেণু (১৮৯৬) তাঁর উল্লেখ্য কাব্য।

তাঁর কাব্যে সুতীব্র জীবনপ্রেম, জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং সেকালের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর নারীর দেহগত সৌন্দর্যের প্রতি উল্লাসময় আকর্ষণ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। নারীর প্রেম ও সৌন্দর্যকে তিনি কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতার আলোকে দেখতে চান নি। দেহের প্রতি অতি-প্রবল আকর্ষণবশত তিনি লিখেছিলেন,—

> "আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ!
> আমি ও নারীর রূপে
> আমি ও মাংসের স্তূপে
> কামনার কমনীয় কেলি কালীদহ—
> ও কর্দমে— ওই পঙ্কে,
> অই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
> কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
> আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংস সহ।"

নারীর প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়নে অশ্রুসিক্ত কবি বহু কবিতায় নারীর প্রতি শ্রদ্ধাও জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু এখানে আমরা তাঁর দেহ-বন্দনার দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। ১৩১০ সালে রচিত 'নৃসিংহ' কবিতায় প্রেমের নৃসিংহ-মূর্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে কবির চিত্ত নারীর দেহজ প্রেম প্রাপ্তির অধীরতায় কিরূপ চঞ্চল হয়ে উঠেছে তা নিম্নোদ্ধৃত অংশে লক্ষণীয়।

"যাও নারী যাও ফিরা নতুবা ও বক্ষ-চিরা
শুষে নিব হৃৎপিণ্ড, শুষে নিব হাড়,
প্রেমের ভীষণ দৃশ্য নিরখিয়া কাঁপে বিশ্ব
ভীষণ নৃসিংহ-রূপ প্রেমে অবতার।
দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার।"

গোবিন্দ দাসের কবিতায় আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। কিন্তু শিল্প-কর্মরূপে কবিতাগুলির রূপরীতিতে ত্রুটি আছে—ছন্দ ও ভাষা সর্বত্র সুললিত নয়। কিন্তু বাঙলাকাব্যে তাঁর ঐ দেহতান্ত্রিকতা বিশ শতকের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের পার্শ্বে একটি নূতন দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

মোহিতলালের দেহাত্মবোধ-মূলক কবিতাগুলির আগমনী-গীত একটুখানি অমার্জিত ভাষায় এই গোবিন্দ দাসের মধ্যে অনেক পূর্বেই যেন বেজে উঠেছিল। এই কবির কাব্যাদর্শ নিশ্চয়ই মোহিতলালকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় মোহিতলাল এই কবি সম্পর্কে চিরকালই নীরব। তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের কোথাও তিনি এ-কবির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখেছেন—"সত্যেন্দ্র প্রভৃতি কবির বন্ধুরা এই কবির (গোবিন্দ দাসের) পরিচয়ে চমৎকৃত হইতেন।"[৮] এই বন্ধুদের মধ্যে ভারতী-গোষ্ঠীর মোহিতলাল কি ছিলেন না? সে যাই হোক, অনেকদিন পর ১৩৩৬-এর শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রগতি' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে মোহিতলালের জীবিতকালেই লেখা হয়েছিল,—"গোবিন্দ দাস যদি তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট নির্লজ্জ দেহতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা না করে যেতেন, তবে আজকের দিনে বাংলা কবিতা কিছুতেই এতদূর পরিণতি লাভ করতে পারত না। গোবিন্দ দাসের এই ইন্দ্রিয়াসক্তিরই একটি ঘনীভূতরূপ আমরা 'বিস্মরণী'তে পাই।"

মোহিতলাল যদি গোবিন্দ দাসের কাব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এর প্রতিবাদ করতেন। 'প্রগতি'তে উক্ত ঐ মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, বাঙলাসাহিত্যে গোবিন্দ দাসই দেহতান্ত্রিকতার প্রথম উদ্গাতা নন। বাঙালীর অস্থি-মজ্জাগত এই দেহবাদের সুর গোবিন্দ দাসের বহুপূর্বে চর্যাগীতিকায়, শতশত সহজিয়া গানে, শাক্ততন্ত্রে ও আউল-বাউলদের গানে ব্যক্ত হয়েছে। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই এই দেহবাদের সুর কাব্যধারায় দীর্ঘকাল বহমান ছিল। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে তা শোধিত হয়ে কতকটা রূপান্তরিত হয় এবং উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে ও ব্রাহ্মনীতিবাদের ফলে ঐ সুর মিলিয়ে যায়। অবশ্য গোবিন্দ দাসের

কাব্যে বাঙালীর রক্তগত একটি বহু-কাললুপ্ত নিজস্ব সুর ধরা পড়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিপত্তির যুগে তাঁর কণ্ঠ সরব হতে পারে নি। তথাপি মোহিতলালের দেহাত্মবাদমূলক কবিতাগুলির পূর্বে গোবিন্দ দাসের এই দেহবাদ গভীর জীবন-প্রেমেরই যুগগত ফসল।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) ছিলেন কবি বিহারীলালেরই মন্ত্রশিষ্য। তাঁর কাব্যে নিসর্গ-প্রেম ও সৌন্দর্যই মূল উপজীব্য। আবার এ তিনের মধ্যে প্রেম-সৌন্দর্যের কল্পনায় তাঁর কবিচিত্ত অধিক মুখর। প্রদীপ (১৮৮৪), কনকাঞ্জলি (১৮৮৫) ভুল (১৮৮৭) শঙ্খ (১৯১০) এবং এষা (১৯১২)—এই কয়খানি কাব্যের মধ্যেই তাঁর কবি-পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটা ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি-জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সামাজিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, বন্ধুবৎসল ও সংসারাসক্ত সদানন্দ গৃহী। কিন্তু তাঁর 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি' ও 'ভুল' শীর্ষক কাব্যে তিনি যেখানে মানস-প্রয়াণ করেছেন, তার সঙ্গে বাস্তবজগতের কোনো সম্পর্ক নেই। হয়তো গুরু বিহারীলালের কাব্যের 'সারদা'কেই তিনি রোমান্টিক কবি শেলীর আদর্শে শোধন ক'রে নিয়ে নিজের মনোরাজ্যে এক চিরদুর্লভ 'অধরা'র কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই মানস-সুন্দরীর অনুসন্ধানতৎপর কবি সম্পূর্ণভাবেই নিঃসঙ্গ। এই তিনখানি কাব্য ঐ অপ্রাপনীয়ার জন্যে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে। 'ভুল' কাব্যের শেষের দিকে কয়েকটি কবিতায় কবি অবাস্তব-মনোহর ঐ রাজ্য থেকে নেমে আসবার চেষ্টা করেছেন বাস্তব-জীবনের কক্ষে। 'শঙ্খ' কাব্যে কবি পরিচিত মানবজীবনের আরও নিকটে এসে তাঁর ঐ অবাস্তব-সৌন্দর্যপিপাসাজাত চিত্তদ্বন্দ্বকে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'এষা'য় কবিচিত্ত সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত।

বাঙলাসাহিত্যের একটি অপরূপ শোককাব্য এই 'এষা'। পত্নীর মৃত্যুর পর বড়াল কবি যে সান্ত্বনাহীন ব্যথা ও দুঃখের রাজ্যে পতিত হলেন, তাতেই তাঁর জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হল। দীর্ঘ কবিজীবনে যার অনুসন্ধান-নেশায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন—স্নেহমমতাতুরা সহধর্মিণীর মধ্যে তাকেই দেখতে-পেয়ে তাঁর প্রাণ পরম আশ্বাসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। একদিকে 'এষা'য় আছে ঐ মৃতা প্রিয়ার জন্যে কবির মর্মান্তস্পর্শী হাহাকার অন্যদিকে ঐ পত্নীকেই সেই মনোসঙ্গিনীরূপে অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি ক'রে কবি তাঁকে অনন্তের সঙ্গে মিলিয়ে শোকমুক্ত হয়েছেন। শেষপর্যন্ত এ-কবির কাব্যে যে-পরিণতি ঘটেছে তাতে এঁর ব্যক্তিজীবনের সেই গৃহগত-প্রাণটি পূর্বের

ব্যবধান দূরীভূত ক'রে কবিজীবনের সঙ্গে একাত্মতালাভ করেছে। অক্ষয়-কুমারের কাব্য ভাবসংযম ও অর্থগূঢ় শব্দযোজনা এবং পরিচ্ছন্ন ভাষা-প্রয়োগে একটি ক্লাসিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

রবীন্দ্রযুগের এই কবির সঙ্গে কবি মোহিতলালের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। অক্ষয় বড়াল ইংরেজ কবি ফিট্‌জেরাল্ডের অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ-গুলির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'পান্থ' নাম দিয়ে। এই কবিতাগুলির বহু অংশ মোহিতলালের কণ্ঠস্থ ছিল এবং প্রথমজীবনে এ-গুলি তাঁর খুবই প্রিয় ছিল।[৯] তাছাড়া বরাবর কবি মোহিতলাল এই কবির একজন পরম ভক্ত ছিলেন।[১০] এই কবি আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে যে তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতির প্রসঙ্গ এনে 'প্রভেদে-অভেদ'এর কথা বলেছিলেন, সে-তত্ত্ব-কথা মোহিতলালের সাহিত্য-জীবনে নানাভাবে উঁকি দিয়েছে। কিংবা তাঁর "তৃপ্তির নরকে জ্বলি অতৃপ্তির খেদে' 'শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃতজ্ঞান বিষকণ্ঠ শূলপাণি, প্রলয়-পাগল,' 'আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি সুধা' 'মানবীর তরে কাঁদি যাচিনা দেবতা' 'তোমারি প্রণয় স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ, পাগলে করিল গৃহী ভূতে মহেশ্বর'—প্রভৃতি উক্তি বিচিত্রভাবে মোহিতলালের কাব্যে দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও দেবেন্দ্রনাথ সেন স্বকীয় মৌলিকতায় সেকালের বহু তরুণ কবিদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই কবির জীবনের দীর্ঘকাল বাঙলাদেশের বাইরে এলাহাবাদেই অতিবাহিত হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি কলকাতার ডাবলিউ সি ব্যানার্জী স্ট্রীটে বাস করতেন। তিনি বিশখানি কাব্য গ্রন্থ লিখে গেছেন এগুলির মধ্যে উর্মিলা কাব্য (১৮৮১) 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা' (১৯১২) 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' (১৯০৩)—প্রভৃতিতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কিছু প্রভাব আছে। মধুসূদনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পরিচয় কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণের মধ্যেই নিহিত। আবার তাঁর 'অপূর্ব নৈবেদ্য' (১৯১২) গ্রন্থের নামকরণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাও দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর কাব্যগুলি মৌলিকতায় ভাস্বর। ঐ কাব্যগুলি এবং অশোকগুচ্ছ (১৯০০) গোলাপগুচ্ছ (১৯১২) নির্ঝরিণী (১৮৮১) প্রভৃতি বহুকাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁর রূপ-পিপাসু অন্তর ও প্রেম-সৌন্দর্য-প্রীতিরস-স্নিগ্ধ কবি-প্রাণ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্যের দেবতা তাঁর চক্ষে এমন একটি অঞ্জন অনুলেপন করেছিলেন, যার ফলে বিশ্বভুবন তাঁর কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাঙালী-জীবন এবং ততোধিক পরিচিত গৃহসংসারের মধ্যেই তিনি সৌন্দর্যের অফুরন্ত প্রস্রবণকে

লক্ষ্য করেছিলেন। বিহারীলাল বা অক্ষয়কুমারের মতো তাঁর কবি-কল্পনার উদ্দাম-লীলা নেই। বাস্তব সংসারে প্রেয়সী নারীর বিচিত্র আচরণে তিনি যে সৌন্দর্যের রস আহরণ করেছেন তা অপরূপ। তাঁর অন্তরে রূপ-পিপাসা সদাজাগ্রত হলেও অবাস্তব-মোহিনীর কটাক্ষ-ঈক্ষণে তিনি কোনোদিন ধরা দেন নি। পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের রহস্য-মাধুর্য আবিষ্কার যদি রোমান্টিক কবির লক্ষণ হয়, তাহলে তিনি পারিবারিক রসেরই এক অভিনব রোমান্টিক কবি। তাঁর কবি জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না—কোনো ভাবনা বা কোনো সংশয় তাঁর কবিচিত্তে ছিল না। ইংরেজ কবি কীট্সের মতো তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই সৌন্দর্যের রস পান করেছেন। কিন্তু কীট্সের ইন্দ্রিয়াসক্তিতে যে Intellect কাজ করেছে দেবেন্দ্রনাথের তা ছিল না। মন নয়, জ্ঞান নয়, প্রাণের প্ররোচনায় তাঁর কাব্যে সৌন্দর্য-রসোপভোগের উল্লাস ও ভাব বিহ্বলতা। এই ভাব-বিহ্বলতার জন্যেই তাঁর কাব্যের রূপরীতির সৌষ্ঠব অনেক সময় চোখে পড়ে না। সনেট-গুলিতে তিনি অনেকখানি আত্মসংযম দেখিয়েছেন এবং এতে আদি সনেটের লক্ষণ সব সময় অক্ষুণ্ণ না থাকলেও মুক্তবন্ধ সনেট হিসেবে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান।

মোহিতলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয় এবং কবির অত্যন্ত স্নেহভাজন। মোহিতলাল তাঁর প্রথম কবিতাপুস্তিকা 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'-এ কবির উদ্দেশে অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৩২৭এ ভারতীর পৌষ-এ তিনি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন এবং তারও পরে ১৩৩৬-এর শনিবারের চিঠির পৌষ সংখ্যায় তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কবি দেবেন্দ্র-নাথের রূপতান্ত্রিকতা, বাঙালীর গার্হস্থ্যজীবন-প্রীতি, বাঙলাদেশ ও তার সকল বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ, বাস্তব নারী-আশ্রিত প্রেমের বিচিত্রতা এবং সর্বশেষে দেবেন্দ্রনাথের রূপসুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-বিগলিত অন্তর— মোহিতলালের কবিজীবনে বিভিন্নভাবে ছায়া ফেলেছে। সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের বিস্তার, প্রীতির উন্মেষ এবং পরিশেষে ভক্তি-ভাব—এই চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাব্যধারা প্রবাহিত হয়েছে বলে মোহিতলাল মনে করেন।[১১] সে যাই হোক, দেবেন্দ্রনাথের বহু শব্দ ও ক্রিয়াপদ মোহিতলালের কাব্যে লক্ষণীয়। 'দুর্জয় বানের মুখে, ভাসাইয়া দিব সুখে দেহের রহস্যে-বাঁধা অদ্ভুত জীবন'—দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি মোহিতলালের খুবই প্রিয় ছিল। তাঁর 'দাও দাও একটি চুম্বন'-এর অসহ্য হরষ মোহিতলালের কাব্যেও আছে।

এই কবির মৃত্যুর পর মোহিতলাল ১৩২৭ সালে যা বলেছিলেন সে-কথা উদ্ধার করলে দেখা যাবে তিনি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের যুগেও কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের জন্যে তিনি কিরূপ পৃথক আসন দাবি করতেন।

"রবীন্দ্রীয় যুগে যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপর যে দুইজন কবি তাঁহার যথার্থ সমসাময়িকরূপে বাঙলা কবিতায় বিশিষ্ট কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথ আজ উভয়েই পরলোকে।...তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) কাব্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ হইলেও মৌলিকতা ও প্রকৃত কবিশক্তিতে এযুগে অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে একেবারে বাদ দিয়া তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই।"[১২]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) রবীন্দ্রনাথের পরমতম ভক্ত-কবিরূপে খ্যাত হলেও স্বকীয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্যে একদিকে যেমন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই অসংখ্য তরুণদের চিত্তজয় করেন।

মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটলেও এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি বহু কাব্যগ্রন্থ, একখানি উপন্যাস ও একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বেণু ও বীণা (১৯০৬), তীর্থসলিল (১৯০৮, অনুবাদ কবিতা) তীর্থরেণু (১৯১০, অনুবাদ কবিতা), কুহু ও কেকা (১৯১২) অভ্র ও আবীর (১৯১৬) ফুলের ফসল (১৯১১) তুলির লিখন (১৯১৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রনাথে জগজ্জীবন সম্পর্কিত গূঢ়-গভীর ভাব ও ভাবনার পরিচয় অবশ্যই নেই। তাঁর স্বভাবগত বালসুলভ অস্থিরতা তাঁকে ম্যাথু আর্নল্ড কথিত সেই high seriousnessএর পথে বিচরণ করতে দেয় নি। তথাপি সদ্য-সংঘটিত আলোড়নময় ঘটনাগুলির সময়োচিত কাব্যিক রূপদানে এবং ছন্দের অসামান্য শ্রুতিসুভগতায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিল প্রগাঢ়। তাছাড়া তাঁর পড়াশোনার পরিধিও ছিল বহু বিস্তৃত। বহু বিদেশী ছন্দকে বাঙলা ভাষায় ধরে দিয়ে প্রচুর আরবী ফারসী শব্দকে বাঙলা কাব্যে অনায়াস-প্রবেশের সুযোগ-দান ক'রে এবং বিদেশী বহু কবির উৎকৃষ্ট কবিতার অনুবাদ ক'রে তিনি বাঙলা ভাষা-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রযুগে বাঙলা কাব্যে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হাসি-অশ্রু-সমন্বিত আমাদের এই মর্ত্যচারী বাস্তব-জীবনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ পোষণ, বাঙলা কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্য-সৃষ্টি এবং কাব্যে জ্ঞান ও মননের অনুপ্রবেশ-প্রয়াস। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অনেক পরে ১৩৩৪এর শ্রাবণে প্রগতির সম্পাদকদ্বয় কবি অজিত দত্ত ও কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই মৌলিকতার

দিকটি ইঙ্গিত ক'রে লিখেছিলেন—"সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা আমাদের মনকে সেই 'সব পেয়েছির দেশে' নিয়ে যায় না, যেখানে বসন্তের সৌন্দর্য-স্রোত নিত্য প্রবহমান—যেখানকার চিরজ্যোৎস্না চাঁদের কলঙ্কে মলিন হয় নি। তাঁর কাব্যজগৎ আমাদের এই মাটির রাজ্য, এই নিত্যকার হাসিকান্নায় বিজড়িত মর্ত্যভূমি। এই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি স্বর্গের আনন্দকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছেন। তাঁর গান যে সুরের ইন্দ্রজাল বুনে চলে, তা' আমাদের প্রতিদিনকার পুলক-বেদনায় গড়া।"

কবি মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ১৩৩৪এর 'কালিকলম'এর শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিত 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মোহিতলাল জানিয়েছেন যে তাঁর স্বরচিত 'নূরজহান' কবিতাটি তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি শুনে সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন "আমার 'কবর-ই-নূরজহান' ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।" ঐ প্রবন্ধটি ছাড়াও 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথের উপর মোহিতলালের আরও একটি অত্যন্ত উপাদেয় প্রবন্ধ আছে। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের প্রভাব[১৩] মোহিতলালের প্রথম-জীবনের কাব্যে দেখা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের আঙ্গিক-সচেতনতা অনেকখানি মোহিতলালেও আছে। সত্যেন্দ্রনাথের আরবী ফারসী শব্দ-প্রয়োগ মোহিত-লালকে উৎসাহিত করেছে। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের বাস্তব জীবনপ্রীতি ও মোহিতলালকে গভীরতর জীবন-ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করেছে এমন বলা চলে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্র-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলেও কাব্যে তিনিও নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সনেটপঞ্চাশৎ (১৯১৩) এবং পদচারণ (১৯১৯) মাত্র এই দুখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই তাঁর কবি-পরিচয় নিহিত। কবিধর্মে তিনি ঠিক রবীন্দ্রপন্থী ছিলেন না। বরং রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপক অনুসরণ এবং অনুকরণে তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি গতানুগতিক সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসকে বর্জন করে ক্ষুরধার যুক্তি, পৌরুষ ও মিতভাষণকে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সনেটগুলিতে বক্তব্যের চমক, শব্দ-প্রয়োগের অভিনবত্ব, যুক্তির তীক্ষ্ণতা এবং সংহত ভাবের গঠন-সৌষ্ঠব বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। প্রমথ চৌধুরীর ভাষার ঋজুতা, বস্তুভিত্তি এবং সংযম—এই লক্ষণগুলির সঙ্গে এক হিসেবে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সগোত্রতা আছে। আবার সত্যেন্দ্রনাথের মতো বৈজ্ঞানিক-সুলভ প্রত্যক্ষতায় বিশ্বাসী এবং যুক্তি-পন্থায় বিচরণশীল একটি মন তাঁর ছিল।

মোহিতলাল কবি প্রমথ চৌধুরীর প্রতি খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন একথা বলা যায় না। বরং 'বাঙলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে সনেটের আলোচনায় প্রমথ চৌধুরীর ছন্দোগত ত্রুটিকেই তিনি বড় ক'রে দেখেছেন। কিন্তু সে যাই হোক, রবীন্দ্রযুগেও যে একটি স্বতন্ত্র কাব্যধারা নানা দিক থেকে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে চলেছিল যুগের এই সত্যের দিকেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) রবীন্দ্র-অনুবর্তী কবিরূপেই পরিচিত। প্রসাদী (১৩১১), ঝরাফুল (১৩১৮), ধানদূর্বা (১৩১৮) শান্তিজল ১৩২০) কাব্যসংকলন শতনরী (১৩৩৭) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবি-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ইনি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁর ছিল অচলা ভক্তি। তাঁর কাব্যে প্রকৃতি-প্রীতিজাত রূপোল্লাস, অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথের মতো গার্হস্থ্য প্রণয়-রস, 'ভারতী'র কবিগোষ্ঠীর সাধারণ-প্রবণতার সূত্রে স্বপ্নরস, এবং ছন্দো-পারিপাট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। মোহিতলালের সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। প্রথম জীবনেই মোহিতলাল তাঁর 'শান্তিজল' ও 'ধানদূর্বা' পাঠ ক'রে যে-আনন্দ পেয়েছিলেন 'স্বপনপসারী'র অন্তর্গত একটি কবিতায় তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'বিস্মরণী' কাব্যখানি 'করুণানিধান'কে উৎসর্গ ক'রে একটি সনেটে তাঁর প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আবার করুণানিধানের মৃত্যুর পরও একটি দীর্ঘ কবিতা এবং তাঁর কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা ক'রে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি 'সাহিত্য বিতান'এ লিখেছেন। কবিধর্মে করুণানিধান ও মোহিতলালের মধ্যে পার্থক্য আছে। তথাপি করুণানিধানের স্বপ্নরস-রসিকতা, রূপচর্যা এবং কাব্যের আঙ্গিক সৌষ্ঠব মোহিতলালকে উৎসাহিত ক'রে থাকবে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)—রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। মোহিতলালের চেয়ে বয়সে মাত্র তিনি এক বৎসরের বড় ছিলেন।

দুই কবির মধ্যে পারস্পরিক একটি হৃদ্যতার সম্পর্ক বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবলতম প্রভাবের কালে বাঙলাকাব্যে যে অবাস্তব কল্পনাবিলাস, আত্মতৃপ্ত ভাবালুতা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং কোমল-পেলব ভ্রুতিশয় মসৃণ কবিভাষার যে ঘুমপাড়ানিয়া ঝঙ্কার শোনা গিয়েছিল, ইনি তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইঞ্জিনীয়র কবি একটি সদাজাগ্রত বস্তুসচেতন

কবি-মন নিয়ে অপার্থিব রোমান্টিক-বিলাসের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। মানুষের জীবনে এবং প্রকৃতির অন্তঃপুরে তিনি কোথাও সৌন্দর্য ও প্রেমকে দেখতে পান নি। সমাধানহীন দুঃখের একটি অনির্বাণ শিখাকে অন্তরের মধ্যে জ্বালিয়ে নিয়ে বাঙলার কবি যতীন্দ্রনাথ 'মরীচিকা' (১৯২৩) 'মরুশিখা' (১৯২৭) 'মরুমায়া' (১৯৩০)-কে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে 'দুঃখ' একটি বড় স্থান অধিকার ক'রে আছে। নিজেকে তিনি 'দুখবাদী বৈরাগী' বলে অভিহিত করলেও Pessimist বা বেদনাবাদী তাঁকে বলা যায় না। জগজ্জীবনের প্রতি অন্তরের গভীরে তাঁর প্রচ্ছন্ন একটি প্রেম ছিলই। অথচ বাইরের নানা অসঙ্গতি, সৃষ্টির নিয়মে গোঁজামিল এবং মানবজীবনের আধি-ব্যাধি-মৃত্যু-অভাব-অনটন-জনিত দুঃখ তাঁকে বিদ্রোহী করেছিল। কিন্তু এ-দুঃখ তাঁর সমগ্র অন্তরদেশকে কতখানি আলোড়িত করেছিল তা বলা কঠিন। তাঁর এই শ্রেণীর কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় যে তাঁর চিত্ততলে ঈশ্বরের প্রতি একটি গভীর আস্থা এবং জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি সুতীব্র অনুরাগ প্রচ্ছন্ন ছিল। আর তাই বয়োধর্মে তাঁর 'ত্রিযামা' 'সায়ম্‌' 'নিশান্তিকা' কাব্যে ধরা পড়েছে। সে যাই হোক, তাঁর কাব্যের বাস্তবতা, ভাষালক্ষ্মীর আটপৌরে সাজ, তাঁর তর্কপ্রিয়তা ও জিজ্ঞাসু মন কবি হিসেবে তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। গোবিন্দ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরীর মধ্য দিয়ে বাঙলা কাব্য যে একটি পৃথক খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল—সেই ধারায় আরও কিছু বিশ শতকীয় লক্ষণ যুক্ত ক'রে যতীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্যের আধুনিকতার ইতিহাসের স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মোহিতলালের কাব্যাদর্শ যতীন্দ্রনাথের নয়। উভয় কবির দুঃখবাদেও পার্থক্য আছে। মোহিতলালের দুঃখবাদের মূল আরও গভীর—সৃষ্টির ধারায়। দুঃখই জগৎকে রমণীয় করেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি দুঃখের নিবৃত্তি চান না—চাওয়া চলে না। দুজনের ভাষাভঙ্গীও স্বতন্ত্র। ১৯২১-এ মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' এবং ১৯২৩-এ যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা' বের হলেও দুজনেই আরও ৮-১০ বছর আগে থেকেই কবিতাগুলি লিখেছিলেন। রবীন্দ্র-কক্ষে থেকেও যে মাঝে মাঝে বাইরে এসে স্বতন্ত্রভাবে গান গাওয়া সম্ভব —এ দৃষ্টান্তের পরিচয় যতীন্দ্রনাথের মধ্যে পেয়ে মোহিতলাল কতকটা যে আত্মপ্রত্যয়লাভ করেছিলেন এমন কথা বলা দোষের নয়। হতে পারে, মোহিতলালের দ্বারা অনুরূপভাবে যতীন্দ্রনাথও উৎসাহিত হয়েছেন।

কবি মোহিতলালের আবির্ভাবপূর্ব বা আবির্ভাবকালে বাঙলা কাব্যধারার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। এই আলোচনার মধ্য থেকে সে-

যুগের যে-পরিচয়কে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি সংক্ষেপে আরও একবার তা নির্দেশ করা ভাল। আমরা দেখেছি মোহিতলালের সমকালীন বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-প্রতিভারই অচলা প্রতিষ্ঠা। গুরু বিহারীলালের কাব্যে কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে সূচনা—রবীন্দ্রনাথে তার পূর্ণ পরিণতি। আত্মগত ভাবকল্পনায় জগৎ ও জীবনকে অন্তরলোকে গ্রহণ করে—সেই স্বকীয় অন্তরলোকে পাশ্চাত্যের রূপ ও প্রাচ্যের ভাবের যে পরমাশ্চর্য সম্মেলন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা তাঁর 'নিয়তিকৃত নিয়মরহিত' প্রতিভারই স্বর্ণ-কীর্তি। সেকালের অসংখ্য তরুণদের মতো তরুণ মোহিতলালকেও রবীন্দ্রনাথের অভিনব কবিশক্তি আশ্বস্ত ও মুগ্ধ করেছিল। বিশুদ্ধ একটি সাহিত্যপ্রীতি-উদ্রেকে রবীন্দ্রনাথই তাঁর প্রথম সহায়ক হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার ইন্দ্রজালে তিনি দীর্ঘকাল অভিভূত ছিলেন। কিন্তু ঠিক এইকালেই তিনি মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীন সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রভৃতি কবির গীতিকবিতাগুলির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাসের কাব্যও তাঁর প্রিয় ছিল। তাঁর চোখের সামনেই রবীন্দ্রবিরোধী দলটি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলেন, তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এঁদের রবীন্দ্রবিরোধিতায় সেকালে তিনি খুশী হতে না পারলেও একথা তিনি বুঝেছিলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে দেশের চতুর্দিকে কর্মের আয়োজন চলছে বলেই কাব্যে বাস্তবপন্থায় জীবন ও জগৎকে বরণ করবার একটা আকৃতি দেখা দিচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী ও যতীন্দ্রনাথের কাব্য সেইজন্যই রবীন্দ্রীয় পথে ঠিক চলল না। উনিশ শতকের পূর্বোক্ত কবিদের কাব্য আর যাই হোক জীবনের বাস্তবক্ষেত্র থেকে দূরে ছিল না। যুগের প্রবৃত্তিই ঐসব কবিদের কাব্যে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছিল।

দেবেন্দ্রনাথের রূপতান্ত্রিকতা ও পারিবারিক বাস্তব স্নেহপ্রীতির রস, অক্ষয়কুমার বড়ালের দুঃখবাদ, পুরুষ প্রকৃতির অভেদ-তত্ত্ব ও দাম্পত্য প্রণয়-মহিমায় নারী অর্চনা,—রবীন্দ্রযুগেও বহু তরুণ কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। গোবিন্দ দাসের দেহবাদ, দ্বিজেন্দ্রলালের 'বস্তুভিত্তি স্পষ্টতা 'ভাবসংযম' ও 'তর্কপ্রিয়তা' প্রমথ চৌধুরীর যুক্তি, পৌরুষ ও বক্তব্যের চমক—রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে ফলপ্রসূ হয়েছিল। রবীন্দ্রভক্ত কবিদের মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের বস্তুপ্রীতি, মননাতিরেক, ছন্দোসৌকর্য, বিষয়-বৈচিত্র্যপ্রীতি ও করুণানিধানের বস্তুভিত্তিক স্বাপ্নিকতা ও ছন্দ-সুষমা—তাঁদের দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্য এনেছিল। আবার রবীন্দ্রনাথের

অনুকারীদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত যতীন্দ্রনাথের কাব্যের বাস্তবতা ও ভাবালুতা-বর্জিত অভিনব ভাব ও ভাষা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।

সদ্য আলোচিত এই সমস্ত কবিদের সম্মিলিত সাধনায় হয়তো বা অনেকেরই অজ্ঞাতে রবীন্দ্রযুগেই কাব্যের একটি নূতন পথ চিহ্নিত হচ্ছিল। কাজেই এমন একটি লগ্নে রবীন্দ্র-অনুবর্তী হয়েও যদি মোহিতলাল দৃষ্টিস্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন তাতে আশ্চর্যের কি আছে? বাঙলা কাব্যে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত এই কবির আবির্ভাব তাই আকস্মিক নয়। তলে তলে বহু পূর্ব থেকেই যুগমানসে এর প্ররোচনা ছিল।

মোহিতলালের আবির্ভাব-পূর্ব এবং আবির্ভাব-ক্ষণের বাঙলা কাব্যধারার এই আলোচনার পর তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা বিবৃত করছি।

কোনো কবির কাব্যবিচার ও কবিমানস-বিশ্লেষণে কবির ব্যক্তিজীবনের কাহিনীকেও সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া চলে না। কবির ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবনের মধ্যে আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে কিনা এ নিয়ে তর্ক চলে। যাঁরা কাব্যব্যাপারে প্লেটোর Divine Inspiration বা দৈবী প্রেরণায় বিশ্বাসী, তাঁরা বলবেন, কাব্যরচনাকালে কবির নবজন্মলাভ ঘটে। সে-মুহূর্তে তিনি লৌকিক জগতের যাবতীয় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত। দিব্য প্রেরণার বশে তখন তাঁর ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবন মহত্তর একটি দিব্যজীবনে উন্নীত। এ-জীবনের সঙ্গে তাই ব্যক্তিজীবনের কোনো সামঞ্জস্য নেই। অতএব কবির কবিমানস-উদ্‌ঘাটনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের আলোচনা নিরর্থক। এঁদের মতে কবির ব্যক্তিজীবনের ধারা ও কবিজীবনের ধারা এতই ব্যবহিত ও এতই স্বতন্ত্র যে দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-অনুসন্ধান মূঢ়তা। যাঁরা ঐ দুই জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে কবির কবি-ব্যক্তিত্ব, কবিচরিত্র বা কবিমানসের রহস্যোদ্ভেদ করতে যান, তাঁদের প্রতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী—"কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবন চরিতে"।

কিন্তু তবু মনে হয়, কবির ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনকে সম্পূর্ণরূপে দুই ভিন্ন কোটির স্বর্গ ও মর্ত্যরাজ্যকল্পনা অযৌক্তিক। একই মানুষের মধ্যেই দুই-জীবন—একই আধারে দুয়ের লীলা—অথচ দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র যোগ নেই, একথা মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। কাব্যসৃষ্টিকালে কবিজীবনেরই একাধিপত্য—ব্যক্তি-জীবন তখন সুপ্ত কিন্তু অবলুপ্ত নয়। আর এই কারণেই দুয়ের মধ্যে একটি অতি সূক্ষ্ম যোগ সৃজনলগ্নেও বর্তমান থাকে। আমাদের বক্তব্য এমন নয় যে ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ঘটনা বা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয় কাব্যে প্রতি-ফলিত হয়। দৈনন্দিন বাস্তবজীবনের সঙ্গে কবিজীবনের সেরূপ অবিচ্ছেদ্য

যোগসূত্রের অধীনতায় আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি, কবির কবি-মানসের রহস্যময় অন্ধকার-রাজ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কাহিনীও কিছু আলোকপাত করে। কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে কবিমানসের যে বিচিত্র অভিব্যক্তি, বিভিন্ন কবিতার জন্মমূলে যে দুর্জ্ঞেয়তা—কবির ব্যক্তিজীবনের কাহিনীতে তার কিছু সদুত্তর মিলতে পারে। কবি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—'কবির কাব্যকে জানিয়া লাভ আছে, কিন্তু কবিকে জানিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ'—এই উক্তি আমাদের বক্তব্যের পরিপোষক।

জানি, মোহিতলাল কাব্যরচনায় দৈবী প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন, জানি, তিনি বলেছেন,—"কবিধর্ম্ম বলিতে সাধারণ ব্যক্তিধর্ম্ম মনে করা চলে না। তাহার কারণ, কাব্যরচনাকালে মানুষটি আর সেই-মানুষ নাই, তখন একটা বৃহত্তর চেতনার আবেশে প্রাণের অবাধ স্ফূর্তি, কল্পনার দিব্যোন্মাদ ঘটে।"[১৪] আরও জানি তিনি 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' নামক গ্রন্থের গ্রন্থ-পরিচয়ে বলেছেন.—"কবির ব্যক্তিধর্ম্ম যেমনই হোক, তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) সেই ব্যক্তিজীবনের ভাবনা-চিন্তা, সংশয়-বিশ্বাস যেমনই হোক, সেই-সকলের ভাষ্যরূপে কবিতা পাঠ করিব না, অথবা কবিতার মধ্যে তাহারই সন্ধান করিব না।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা মোহিতলালের বক্তব্যকে পুরাপুরি মেনে নিতে পারি না। মোহিতলাল নিজেও কি পেরেছিলেন? 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে তিনি মধুকবির কবিমানস বিশ্লেষণ-কালে কবির ব্যক্তিজীবনের ঘটনাকে কিংবা বঙ্গাল-কবির মূল্যায়নে তাঁর জীবনীকে কি স্মরণ করেন নি? অতএব কবি মোহিতলালের কবিমানস ও কাব্যের আলোচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের ইতিবৃত্তও প্রাসঙ্গিক-বোধে কিঞ্চিৎ স্মরণের প্রয়োজন আছে।

মোহিতলালের প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবনেতিহাস এখনও রচিত হয় নি। ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস সেইকাল পর্যন্ত কবির জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৩৪৯ সালে প্রকাশিত 'কাব্যমঞ্জুষা' নামক একটি ছাত্র-পাঠ্য কাব্যসংকলনের শেষাংশে মোহিতলাল নিজেই তাঁর জীবনকথার কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কবির মৃত্যুর পর 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল' নামক গ্রন্থে লেখক আজহারউদ্দীন সাহেব 'মোহিতলালের জীবনী-কথা' অনেকখানি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছেন। লেখক দাবি করেছেন যে মোহিতলালের আত্মীয়-স্বজনদের দেখিয়ে তিনি ঐ জীবনী-অংশকে প্রামাণ্য করেছেন। মোহিতলালের

জীবনীর এই তিনটি আলোচনা এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা ও তাঁর পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনদের মুখে নানা তথ্য সংগ্রহ ক'রে এবং এ-সমস্তের ওপর ভিত্তি ক'রে আমরা মোহিতলালের জীবনী সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করছি।

১২৯৫ সালের ১১ই কার্তিক শুক্রবার (ইং ১৮৮৮, ২৬শে অক্টোবর) রাত্রি ৮'১৫ মিনিটের সময় নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে কবি মোহিতলালের জন্ম হয়। কবির পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার ও মাতার নাম হেমমালা দেবী। হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামেই নন্দলালের বাস ছিল এবং জাতিতে ইনি ছিলেন বৈদ্য। নন্দলালের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোনো সন্তানাদি ছিল না—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। এই পুত্রই কবি মোহিতলাল মজুমদার। কবির মাতা ও পিতা উভয়েরই বিশেষ বংশগৌরব ছিল। নন্দলাল ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের নিকট জ্ঞাতিভ্রাতা। কবির মাতামহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তপার্ষদ শিবানন্দ সেনের বংশধর এবং কবি ঈশ্বরগুপ্তও ছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়। পেশায় মোহিতলালের পিতা নন্দলাল কবিরাজ হলেও সাহিত্য বা কাব্য-বিষয়ে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশেষত ফার্সী ও ইংরেজি কাব্যে তাঁর দখল ছিল। এই দিক থেকে সাহিত্যসাধনায় রক্তগত অধিকার নিয়েই মোহিতলাল জন্মে ছিলেন। মোহিতলালের পিতা সংসার সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিলেন এবং তাঁর আয় নিতান্ত স্বল্প হওয়ায় সংসারের অবস্থাও খুব অসচ্ছল ছিল। তথাপি তিনি ছিলেন আত্মভোলা সদানন্দ পুরুষ। পিতার এই সংসার বিষয়ে অনাসক্তি এবং কাব্যরস-রসিকতা পুত্র মোহিতলালের চরিত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই পিতৃঋণের কথা উল্লেখ করে তিনি নিজেই লিখেছেন, —"তাঁহার (মোহিতলালের) মানস-প্রকৃতির উন্মেষে ও সাহিত্যিক সাধন পন্থার নির্দেশে তাঁহার পিতার চরিত্র ও তন্নিহিত আদর্শ এবং পিতারই কবিস্বভাব ও কাব্যপ্রীতি প্রকৃত সহায় হইয়াছে—সে বিষয়ে পিতাই তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। বাংলা সাহিত্যের সেবায় মোহিতলালের যদি কিছুমাত্র অধিকার জন্মিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য তিনি সর্বতোভাবে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী।"[১৫]

মাতা হেমমালা ছিলেন অতিশয় অভিমানিনী—'অতিশয় স্পর্শকাতরা (Sentimental) আবার পরদুঃখে অত্যন্ত অধীরা। মাতার ঐ অভিমান-প্রবণতা, স্পর্শকাতরতা এবং মানবপ্রেম পুত্রের চরিত্রেও স্থায়িভাবে প্রভাব

বিস্তার করেছিল। সংসারের শত কষ্টেও মায়ের মুখের হাসিটি কখনও মিলিয়ে যেত না। কষ্টের সংসারে কোনোদিন মোহিতলালকেও নিরানন্দ হতে দেখা যায় নি।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্তী মাতার মাতুলালয় হালিশহরের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে বাল্যে মোহিতলাল কিছুদিন বিদ্যাভাস করেন। তারপর তিনি বলাগড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানেই তাঁর বাল্য ও কৈশোর-জীবন অতিবাহিত হয়। এই সময় বাড়িতে পিতামাতার শাসন ছিল খুবই কঠোর। এই বয়সে সাধারণ বালকে যে স্বাধীনতাটুকু পায়, তাও তাঁর ছিল না। তথাপি বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরের পুস্তক পড়বার আগ্রহ তাঁর ছিল খুবই বেশী। সাহিত্যানুরাগী পিতার কিছু কিছু পুস্তক তিনি এই সময়ে গোপনে পড়ে ফেলেন। তাঁর বয়স যখন চার-পাঁচ, তখন তিনি কৃত্তিবাসী-রামায়ণ ও কাশীদাসী-মহাভারত পড়ে আনন্দে আত্মহারা হতেন। যখন তাঁর বয়স নয়, তখন রোমান্স পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখা যেত। এই সময়ই তিনি রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসগুলি সমস্তই পড়ে শেষ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' শুধুই পড়া নয়, তার বহু অংশ তিনি এই কালেই কণ্ঠস্থ করেছিলেন। বারো তেরো বৎসর বয়সে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণাপ্রতাপ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'এর কিছু কিছু গল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এই সব লেখার যে-সমস্ত অংশ ধ্বনি সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, সেগুলি তাঁর মুখস্থ ছিল।

বাইরের বই পড়তে বেশী ভালবাসতেন বলে বিদ্যালয়-পাঠক্রমের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি। অথবা এমনও বলা যায় যে বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ পাঠসীমার প্রতি তাঁর আগ্রহও তেমন ছিল না। এই কারণে শিক্ষাজীবনে ছাত্র হিসাবে তিনি কোনোদিনই কৃতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসামান্য। পাঠ্য-বিষয় একবার পড়ামাত্রই তিনি মনে রাখতে পারতেন। আর এই একটিমাত্র কারণেই তিনি সেকালের দুরূহ পরীক্ষায় কোনোদিন অকৃতকার্য হন নি।

বিদ্যালয়-জীবনে মোহিতলালের বাইরের পুস্তক পড়ার আগ্রহ ছাড়াও আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একটি তাঁর পেন্সিলের রেখায় চিত্রাঙ্কন ও মাটির পুতুল তৈরি করার নৈপুণ্য এবং অপরটি কাঁচা-হাতের কবিতা লেখার উৎসাহ। পরবর্তী জীবনে বড়িশায় বাসকালে কবি ছোট ছেলে-মেয়েদের

নিয়ে ঐ পুতুল নির্মাণ ক'রে বিচিত্রবর্ণে সেগুলিকে রঞ্জিত ক'রে বড় আনন্দ পেতেন। সমিল পয়ারবন্ধে ছোট ছোট কবিতা খাতায় লিখে রাখারও একটা অভ্যাস বিদ্যালয় জীবনেই মোহিতলালের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। মাসীমা ও বোনেদেরই (দেবেন্দ্রনাথ সেনের কন্যাদের) এগুলি তিনি পড়ে শোনাতেন যখন তাঁরা তাঁদের বাড়িতে আসতেন। আবার কখনও কখনও জ্ঞাতিভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মজুমদারকে[১৬]ও পড়ে শোনাতেন। শুধুই স্বরচিত কবিতা-পাঠ নয়, তার অর্থও তিনি তাঁদের কাছে মনোযোগ সহকারে ব্যাখ্যা করতেন। সে যাই হোক, ঐ চিত্রাঙ্কন, ঐ মৃত্তিকার সাহায্যে মূর্তি-নির্মাণ ও কবিতা লেখায় হাত মক্স করার উৎসাহ—সমস্তই ভাবী কবি-জীবনেরই সুস্পষ্ট সংকেত।

বলাগড় হাইস্কুলে পাঁচবৎসর পড়াশোনা ক'রে মোহিতলাল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাস করেন। তারপর কলকাতায় এসে ঐ মাসীর বাসায় থেকে তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসান (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) বি.এ. পড়তে থাকেন। চারবছর এখানে পড়ে তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এফ্‌.এ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাস করেন। বি.এ. পরীক্ষায় বাঙলা ও ইংরেজি আবশ্যিক বিষয় ছাড়া তাঁর সংস্কৃত ও দর্শন সহযোগী বিষয় ছিল। বি. এ. পাস করার পর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তিনি এম-এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং এই সঙ্গে তিনি আইন পড়তে থাকেন। কিন্তু এইকালে তাঁর সাংসারিক অসচ্ছলতা চরমে ওঠে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীলাভের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কবিকে তাই পড়াশোনা ত্যাগ করতে হয়। কলেজজীবনে কবির সাহিত্যপ্রীতি আরও প্রগাঢ় হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনে মনে গুরুরূপে বরণ ক'রে নেন। বি. এ. তৃতীয় বর্ষে পড়বার সময় কবির কবিতা 'জীবন ও মৃত্যু' জাহ্নবী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর বি.এ. পাস করার পর তাঁর সাহিত্যসাধনা 'মানসী' 'বীরভূমি' ও 'ভারতী' পত্রিকাকে আশ্রয় ক'রে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। কলেজজীবনেই মোহিতলাল ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

অভাব-অনটনে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অবসান ঘটলে কবি চাকরির সন্ধানে মনোযোগী হন। প্রথমে হাওড়ার সালকিয়ার একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার তালতলার হাইস্কুলে স্থায়িভাবে শিক্ষকতা করতে থাকেন। এর এক বছর আগে বাঙলা ১৩১৬ সালের ২৫শে বৈশাখ বারাকপুরের চিকিৎসক রায়সাহেব যোগেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা তরুলতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শিক্ষকতার জন্যে মোহিতলাল প্রচুর

পড়াশোনা করতেন। সাধারণ ছাত্রেরা তাঁর পাণ্ডিত্য অনেক সময় বুঝতে পারত না—কিন্তু মেধাবী ছাত্রেরা কখনই তাঁকে ভুল বোঝেন নি। তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে শিক্ষক মোহিতলালের যে-চিত্র অঙ্কন করেছেন তার কিয়দংশ উল্লেখযোগ্য।

"Our headmaster one day entered the class with an almost boyish young man by his side and introduced him as our new teacher of English. He was very dark, but possesed of decidedly handsome features, his eyes particularly being very fine. Though short and plump, he was not so much as to repel me with a suggestion of Corpulence. He provoked notice and criticism by being dressed in a navy-blue striped suit instead of in dhoti and shirt. He drew on himself greater criticism by introducing an unwonted fervour into his teaching of poetry. It was reported that he moved in literary circles and even contributed to magazines. The general opinion of his pupil was that he was not good, for literary enthusiam was considered bad form in teaching and useless, if not worse, for examinations...... For my brother and me, however, this teacher completed what my father and uncle Anukul had began....I remember him as something more than one of my teachers, for as Mr. Mohitlal Majumdar, the distinguished contemporary poet and critic, he exerted a very strong and beneficial influence on my later life."[১৭]

শিক্ষকতাকে মোহিতলাল অত্যন্ত ভালবাসতেন। এই বৃত্তিকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই তার কর্মব্রত পালন করতেন। শিক্ষকতাবৃত্তিতে তাঁর এই নিষ্ঠা তাঁর কাব্যসাধনাতেও সমভাবে লক্ষণীয়। কলকাতায় শিক্ষকতা করার সময় প্রথম দিকে মোহিতলাল তাঁর মাসীর বাড়িতেই থাকতেন। প্রতি শনিবার তিনি মায়ের কাছে কাঁচড়াপাড়া কিংবা শ্বশুরালয় বারাকপুরে যেতেন। এই সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। মানসী-পত্রিকার সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বি. এ. পড়বার সময়েই তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে মোহিতলাল ১৩১৫ সালের চৈত্রমাস থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত ঐ পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এতে তাঁর বহু কবিতা এবং কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বের

হয়। ১৩২১ সালেই তাঁর বিখ্যাত 'আমি' প্রবন্ধটি 'মানসী'তেই প্রকাশিত হয়। ১৩২১ সালেই কুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত 'বীরভূমি' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ, কবিতা এবং মোপাসাঁর কতকগুলি গল্পের বাঙলা-অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শিক্ষকতা করবার এই পর্বেই মোহিতলালের প্রথম কাব্যপুস্তিকা 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই কালেই তাঁর খুল্লতাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে কবি করুণানিধানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে এমনই একটি মধুর সম্পর্কে পরিণত হয় যে কবি পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁকে উৎসর্গ করেন। করুণানিধানের মাধ্যমেই মোহিতলাল কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। আবার যতীন্দ্রমোহনের চেষ্টায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রথম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। কিন্তু এই সময় শিক্ষকতার স্বল্প আয়ে মোহিতলালের পক্ষে সংসার-চালানো বড় কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে তিনি ১৩২১ সালেই জরিপ বিভাগে সরকারী চাকরিতে 'কানুনগো'র পদলাভ করলেন। এই চাকরির সূত্রেই তখন তাঁকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হল উত্তরবঙ্গে। বাধাবন্ধহীন উন্মুক্ত প্রকৃতির ভীষণ মূর্তি এবং সে-প্রকৃতির বুকে বিচরণশীল বিচিত্র সব মানুষদের নিবিড় সান্নিধ্য তিনি এই সময়েই লাভ করেছিলেন। তিন বৎসরের এই কর্মজীবন মোহিতলালের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। কবি নিজে পরবর্তী-কালে এই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ ক'রে যা লিখেছেন, তা বিশেষভাবে উদ্ধারযোগ্য।

"জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মধুর মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইয়াছিল। বনে জঙ্গলে মাঠে ও নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেই বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি।—জলপাইগুড়ি অবস্থানকালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই এক বৃক্ষচ্ছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজজীবনের বাহিরে নানাশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল,

এবং প্রকৃতির যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল—তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।”[১৮] এই জীবন-অভিজ্ঞতার ফলেই 'বেদূঈন', 'নাদিরশাহের জাগরণ' 'নাদিরশাহের শেষ' প্রভৃতি 'স্বপনপসারী'র বিখ্যাত কবিতাগুলি মোহিতলালের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমা-রজনী, প্রহরে প্রহরে চন্দ্রকলার ক্ষয়-বৃদ্ধি, তারাখচিত আকাশের গাম্ভীর্য, তরঙ্গময়ী পদ্মার ভয়ঙ্করী মূর্তি, নিদাঘের দাবদাহ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণবৈভব, উষা দিবা ও সন্ধ্যার বিচিত্র রূপ, অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান হয়ে যাযাবরী জীবনের তপ্ত-রসাস্বাদন—প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি এইকালেই লাভ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কালের লেখা কবিতাগুলিতে ঐ অভিজ্ঞতার ছাপ নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল।

কিন্তু এ-জীবনও তাঁকে বেশীদিন যাপন করতে হল না। এ-জীবনে অভিজ্ঞতার উপাদান আছে প্রচুর। কিন্তু কলকাতার সভ্য সমাজের সঙ্গে তার যোগ কোথায়? অথচ নিয়মিত কাব্যানুশীলনের পক্ষে কলকাতার জীবনই এখন কবির কাম্য। তাছাড়া সরকারী চাকরির একঘেয়ে ক্লান্তিকর পরিশ্রমও কবির কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। অবশেষে কবি সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার নেবুতলা লেনের একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পুনরায় শিক্ষকতাকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করলেন। এখন থেকে দীর্ঘ দশবছর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতা করেছেন এবং এইকালে পুরোদমে তাঁর সাহিত্য-সাধনাও চলতে থাকে। তাঁর এই সময়ের শিক্ষকতার কথা স্মরণ ক'রে প্রিয়-ছাত্র নীরদচন্দ্র চৌধুরী যা লিখেছেন, আমরা পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে মোহিতলাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং ধীরে ধীরে এই গোষ্ঠীরই তিনি অন্তর্ভুক্ত হন। তাঁর 'স্বপনপসারী' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা 'ভারতী'তে বের হয়েছিল—'বিস্মরণী' কাব্যেরও কিছু সংখ্যক কবিতা এতে প্রকাশিত হয়। ১৩২৫ সাল থেকে ১৩৩০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই পত্রিকাতেই মোহিতলালের সমালোচনা শক্তিরও বিকাশ ঘটে। ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে তিনি সত্যসুন্দর দাস এই ছদ্মনামে 'মানকাবারী' অংশে সাহিত্যের সত্যসুন্দর-তত্ত্ব-আলোচনার সূত্রপাত করেন। এর আগেই 'মানসী' পত্রিকায় 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম', 'তুমি', 'বিজয়িনী', 'গী দে মোপাসাঁ'—প্রভৃতি কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন—এখন তিনি সাহিত্যের

তত্ত্বালোচনায় মনোযোগী হয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহিমা ঘোষণা করতে থাকলেন। শুধু তাই নয়, ১৩২৭ ও ১৩২৮ সালে 'ভারতী' পত্রিকাতে তিনি শ্রীমধুব্রত এই ছদ্মনামে কিছু চিত্র ও পুস্তক-সমালোচনাও করেন এবং কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যুতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৩২৯ সালের বৈশাখ ও আশ্বিন সংখ্যায় 'ফারসী ফরাস' ও 'প্রেমাঞ্জলি' নাম দিয়ে শ্রীমধুব্রত ছদ্মনামে তিনি কিছু সংখ্যক ফারসী কবিতার ইংরেজি গদ্যানুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। ১৩৩০ সালের 'নব্যভারত' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যাতেও 'সত্যসুন্দর দাসের' বেনামীতে মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক কিছু সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

'ভারতী' গোষ্ঠীর কবিদের যে-সমস্ত সাধারণ লক্ষণ তা একালে মোহিতলালের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। চিত্রকলার প্রতি আকর্ষণ, স্বপ্নরস-রসিকতা, রোমান্টিক মনোভঙ্গি, গভীর রবীন্দ্রভক্তি, প্রকৃতি ও সৌন্দর্য-প্রীতি—প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর স্বপনপসারী কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। আর সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারক মোহিতলালের তত্ত্ব-পিপাসু মনের কিছু পরিচয় 'স্বপনপসারী'র 'আঁধারের লেখা', 'কল্পনা' কবিতায় প্রতিফলিত।

মোহিতলাল দাম্পত্যজীবনে অত্যন্ত সুখী ছিলেন। অন্তত একালের কিছু কবিতায় তার প্রমাণ আছে। ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র ফাল্গুন সংখ্যায় 'সে' নামক একটি কবিতার কথাই শুধু আমরা বলছি না— দাম্পত্যজীবনরসের মাধুর্য-সম্বলিত তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে আছে। এগুলিতে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের ঐ শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রভাব তো ছিলই—কিন্তু সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত দাম্পত্যজীবনের মাধুর্যকেও উপেক্ষা করা চলে না।

এই সময় মোহিতলাল ২৭ নং বাদুড়বাগান লেনের একটি মেসে থাকতেন। প্রতিটি প্রধান প্রধান সাহিত্যিক আড্ডায় তিনি এইকালে প্রায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। 'ভারতীর আসর' 'গজেন ঘোষের আড্ডা' 'যমুনা কার্যালয়' 'মোসলেম ভারত অফিস' দেবেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি, করুণানিধানের বাসা প্রভৃতি কোনো না কোনো স্থানে তাঁকে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যেত। কত খ্যাত-অখ্যাত সাহিত্যিকদের সঙ্গে এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তার হিসেব করা কঠিন। বাদুড়বাগানের মেসেই সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়।

'ভারতী'তে সংশ্লিষ্ট থাকাকালীন ধীরে ধীরে মোহিতলালের আত্মপ্রতীতি জন্মে এবং কবি-হিসেবে তাঁর একটি নূতন বাণীমন্ত্র আছে এমন একটি বোধ অস্পষ্ট আকারে তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে। 'ভারতী'র পাতায় তাঁর

'বেদুঈন' 'পাপ' 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা বের হলে অনেকে তাঁকে রবীন্দ্র-বিরোধী কবি বলে আখ্যাত করেন।[১৭] কিন্তু রবীন্দ্র-বিরোধী কবি তিনি হন নি—অন্ধ রবীন্দ্র-অনুকারীদের সঙ্গে 'ভারতী'র আড্ডায় নানাকারণে তাঁর তর্কযুদ্ধ ও বাদানুবাদ হয়েছিল। কাব্যে প্রচলিত প্রথানুবর্তনকে তিনি সুনজরে দেখতে পারেন নি। ঠিক এই কারণেই কবি করুণানিধানের বাড়িতে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় হাবিলদার কবি নজরুল ইসলামের 'নিকটে' 'বাদলপ্রাতের শরাব' 'খেয়াপারের তরণী' প্রভৃতি কবিতা পাঠ ক'রে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হন। পরে ঐ পত্রিকার সম্পাদককে একখানি দীর্ঘপত্রে নজরুলের কবিপ্রতিভাকে সানন্দে তিনি অভিনন্দন জানান। নানাকরণে এই পত্রখানি অত্যন্ত মূল্যবান। সেইজন্য পত্রের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করছি—

"আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, আপনার পত্রিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।…আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি,…

"কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।…

"বাঙ্গালার কবিমানসে আজকাল দারুণ গ্রীষ্ম আসিয়াছে, মলয়-সমীরণের অভাবে ব্যজনী-বীজন চলিতেছে। এহেন সময়ে নূতন দিক হইতে নূতন হাওয়া বহিতে দেখিয়া গুমটক্লিষ্ট প্রাণে বড়ই আরাম পাইয়াছি। বাঙ্গালা কাব্যলক্ষ্মীর ভূষণ-শিঞ্জন, তাহার নটিনী-লাঞ্ছন নৃত্যলীলা ও নূপুরনিক্কণ মনোহর হইয়া অবশেষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন শব্দসমষ্টি, কৃত্রিম নিয়ম-শৃঙ্খলিত নীরস কঠিন ধাতুর আওয়াজ, মানবকণ্ঠের অকৃত্রিম ভাবগভীর জীবনোল্লাসময় স্বরবৈচিত্র্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে; অসংখ্য কাব্যরসমাত্রবঞ্চিত অসার অপদার্থ কবিযশঃপ্রার্থীর ঝিল্লিস্বরে বাঙ্গালাকাব্যে অকালসন্ধ্যার অবসাদ ও নির্জ্জীবতা সূচিত হইতেছে।" (১৩২৭ ভাদ্র মোসলেম ভারত")

মোহিতলালের এই চিঠি পাঠ ক'রে নজরুল, সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোহিতলালের বাসস্থানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। এই

পরিচয়ের পর দুজনের সম্পর্ক একরূপ আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত হয়। অনুজের মতোই মোহিতলাল নজরুলকে স্নেহ করতেন—তাঁকে বড় কবি হবার জন্যে নিরন্তর উৎসাহ দিতেন, শেলি, কীট্‌স ও ব্রাউনিঙের ভাল ভাল ইংরেজি কবিতা পড়ে শোনাতেন ও ব্যাখ্যা করতেন, সাহিত্যিক মজলিশে ও গানের আড্ডায় নজরুলকে তিনি নিয়ে যেতেন।

এ ঘটনার কয়েক মাস পরে মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' কাব্যগ্রন্থ ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হলে কবি-সমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মোহিতলালের কবি-প্রতিভাকে কটাক্ষ করলেও Bengali, নব্যভারত, প্রবাসী পত্রিকা মোহিতলালের কবিপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানালো। উৎসাহিত হয়ে মোহিতলালের কাব্য সাধনা নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু এর মাস তিনেক আগে নজরুলের বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতাটি ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যার 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হলে—নজরুল ও মোহিতলালের মধুরতম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরল। ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যার 'মানসী'তে মোহিতলালের যে 'আমি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বের হয় সেটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র বাড়িতে একদা মোহিতলাল, নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহম্মদ সাহেবকে পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের ভাব ও ভাষার সঙ্গে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটির কোনো কোনো স্থলে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নজরুল সেকথা কিছুতেই স্বীকার করলেন না। এরপর 'ধূমকেতু' অফিসে বা নজরুলের বাসা ৮।এ, নওয়াব আব্দুর রহমান স্ট্রীটে মোহিতলাল নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন বটে, কিন্তু পূর্বের সেই সম্পর্ক-মাধুর্য আর দেখা যায় নি।

এই সময় বাঙলা ১৩৩১ সালের ১০ই শ্রাবণ সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে 'কয়েকটি যুবকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য' যোগানন্দ দাসের সম্পাদনায় 'শনিবারের চিঠি'র উদ্ভব। এই পত্রিকায় 'গাজী আব্বাস বিটকেল' ও 'আবাহন' শীর্ষক দুটি কবিতায় নজরুলকে কটাক্ষ করা হয় এবং সজনীকান্ত দাসের কামস্কাটকীয় ছন্দে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারডি—'আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই, আমি বুক দিয়া হাঁটি ইদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই'—প্রভৃতি বের হয়। এই প্যারডিতে আক্রমণের ধার এবং মোহিতলালের প্রিয় শব্দ 'বিটকেল'এর প্রয়োগ দেখে নজরুলের ধারণা হয় যে, সমস্ত লেখাগুলিই মোহিতলালের। তখনও পর্যন্ত কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে মোহিতলালের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সে যাই হোক, নজরুল ঐ

আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে মোহিতলালকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ ক'রে 'সর্বনাশের ঘণ্টা' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ১৩৩১ সালের 'কল্লোল'এর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এতে মোহিতলাল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন এবং এরই জবাব দিতে গিয়ে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৩৩১ সালের ৮ই কার্তিক মোহিতলাল অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় নজরুলকে 'দ্রোণগুরু' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতায় আক্রমণ করেন। এর পরের সংখ্যায় 'চামার খায় আম' বেনামীতে একটি এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি সংখ্যায় মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'তে বিদ্রূপাত্মক 'রুবাইয়াৎ-ই চামার খায় আম' লিখেছিলেন। যে-মোহিতলাল নজরুলকে গভীরভাবে ভালবেসে তাঁর দুর্দম প্রাণশক্তির প্রশংসা ক'রে 'স্বপনপসারী'র 'বাঁধন হারা' (এই নামেই তখন নজরুল অনেকের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন) কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই মোহিতলাল নিজের সঙ্গে নজরুলের কবি প্রতিভার তুলনা ক'রে তাঁকে নির্মম ভাষায় কটাক্ষ করলেন বিস্মরণীর 'সুইনবার্নের অনুসরণে' (কবিতাটি 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি' নামে প্রবাসীতে বের হয়) কবিতায়। আবার যে-মোহিতলাল এই সময় ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'তে লেখা দিতেন না এবং নজরুলকেও সেখানে লেখা দিতে নিষেধ করতেন—সেই মোহিতলাল এখন এই বিরোধকে উপলক্ষ ক'রে শুধুই 'শনিবারের চিঠি' নয় প্রবাসীগোষ্ঠীতেও যোগ দিলেন। নজরুলের সঙ্গে বিরোধ মোহিতলালের জীবনে একটি চরমতম দুঃখজনক ঘটনা। এ ব্যাপারে সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমারকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"নজরুল সম্বন্ধে আমি যে কঠিন মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তাহার একাধিক কারণ আছে; আমার জীবনে ওইটাই প্রথম বড় Shock—তাহার পরিমাণ বা গভীরতা অন্যে বুঝিবে না। যদি আমার 'স্মৃতিকথা' লিখিয়া যাইতে পারি, তবে তাহার একটা বড় অধ্যায় হইবে ওই কাহিনী।"[২০] 'বিস্মরণী' কাব্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবলম্বন ক'রে 'উৎসর্গ-কবিতা'য় কবির নৈরাশ্য ও হতাশার মূলে এই বেদনা যে একেবারেই নেই—এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

'ভারতী'র আসর ভেঙে গেলে মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি' 'নব্যভারত' 'প্রবাসী' 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। 'শনিবারের চিঠি' ও 'প্রবাসী'তে তাঁর যোগদানের কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য ১৩৩০ সাল থেকে ১৩৩২ সাল পর্যন্ত 'কল্লোল'

পত্রিকা ভাবে ও ভাষায় যে আদর্শ অবলম্বন করেছিল, তাতে যে-কোনো শক্তিমান তরুণ সাহিত্যিক আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না। কল্লোল-লেখকগোষ্ঠীর মোহমুক্ত সত্যসন্ধ দৃষ্টি, দুর্মদ প্রাণশক্তি এবং বক্তব্য ও প্রকাশের একটি অভিনব ভঙ্গী, সংস্কারমুক্ত শাক্ততান্ত্রিক মোহিতলালকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া মোহিতলালের 'স্বপনপসারী' কাব্যের কিছু কবিতায় যে ভাববৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছিল, তাতে সেকালের শিক্ষিত প্রগতিবাদী তরুণ সাহিত্যিকেরা বিস্মিত ও উল্লসিত হন। মোহিতলালের এই সব ভক্তের দল যখন তাঁকে 'কল্লোল'-এ লিখবার জন্যে আহ্বান জানালেন তখন তিনি সে-ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। তাছাড়া তখনও পর্যন্ত 'কল্লোল' রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে ওঠে নি এবং 'যৌনভাবনা' নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে নি। মোহিতলাল তাঁর বিখ্যাত 'পান্থ' (১৩৩২ ভাদ্র) ও 'প্রেতপুরী' (১৩৩২ অগ্রহায়ণ) কবিতা নিয়ে 'কল্লোলে'র আসরে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর আবির্ভাবকে স্বাগত জানানো হয়েছিল কি ভাবে তার পরিচয় বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখায় পাওয়া যায়। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন,—

"মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম। মনে হয়, যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম। আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্য ভাবিতা, সংস্কাররাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়। তিনি জানতেন না আমরা তাঁর কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম। তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল।"

এই 'কল্লোল'এর সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় মোহিতলাল 'উত্তরা'র সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু 'নূতন বৎসরের গোড়া হইতে (অর্থাৎ ১৩৩৩) জল-'কল্লোল' 'হঠাৎ যৌনকল্লোল হইবার সাধনায়'[২১] মেতে উঠলে মোহিতলাল 'কল্লোল' ও 'উত্তরা' থেকে সরে এলেন। 'উত্তরা'তে তাঁর কিছু অনুবাদ-গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা বের হয়। ১৩৩৩-এর বৈশাখে 'উত্তরা'তে মার্কিন কবি সিল্‌ভিস্টারের অনুসরণে তাঁর 'তীর্থপথিক' কবিতাটি বের হয়েছিল। আর এই বৈশাখ থেকেই মোহিতলাল 'কালিকলম'এ 'নাগার্জুন' কবিতা দিয়ে নিয়মিত এতে লিখতে থাকেন। ১৩৩৩-এর বৈশাখ থেকে ১৩৩৪ এর মাঘ পর্যন্ত এতে তাঁর অনেকগুলি কবিতা, দুটি গল্পের অনুবাদ এবং একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই 'স্মরগরল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৩৩৩ এর মাঘমাসে মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে—প্রবাসী,

'কালিকলম', 'কল্লোল', 'প্রগতি'—প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক সমালোচনা বের হয়। বঙ্গের সারস্বত-মন্দিরে মোহিত-প্রতিভার আসন স্থায়ী হয়ে গেল।

এরপরই দেখা যাচ্ছে মোহিতলালের চিত্তে একটি পরিবর্তন কাজ করছে। 'কল্লোল-গোষ্ঠী' এবং 'উত্তরা'র লেখকগোষ্ঠীর জীবনদর্শনকে তিনি অভিনন্দিত করতে পারলেন না। যে বলিষ্ঠ ভোগবাদ বা জীবনবাদ মোহিতলালের লেখনীতে একটি সংযম-শুভ্র শুচিতার বেষ্টনে সুন্দর হয়ে উঠছিল—অক্ষমের হাতে তাই কদর্য যৌনবিকারে পরিণত হচ্ছে, এইরূপ একটি ধারণা তাঁকে পেয়ে বসল। তাছাড়া অবিমিশ্র ভোগই যে জীবনের সব নয়—অতিরিক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে এ-ভাবটিও তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল। তাঁর চিত্তে এ নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল। এ দ্বন্দ্বের সূচনা 'বিস্মরণীতে'ই এবং 'স্মরগরল' ও 'হেমন্তগোধূলি'তে সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস আছে। সে যাই হোক, এই কারণেই তিনি 'কালিকলম'এ 'বিদায়বাণী'[২২] কবিতাটি লিখে সেখান থেকেও সরে এলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে মোহিতলালের সম্পর্ক দীর্ঘকালের। 'আমি ও শনিবারের চিঠি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (প্রবন্ধটি মোহিতলালের মৃত্যুর পর ১৩৬৬ সালের শারদীয় 'বিংশশতাব্দী'তে প্রকাশিত হয়।) এ বিষয়ে তিনি নিজেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে গেছেন। ১৩৩১ এর ৯ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' কিছুকালের জন্যে বন্ধ হয়। পরে ১৩৩৪ সালের ৯ই ভাদ্র মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম হয়। তখন থেকেই এ পত্রিকার মান ও আদর্শ রক্ষার গুরুদায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। 'শনিবারের চিঠি'র অতিশয় অসামাজিক ও শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক লেখাগুলির সঙ্গে মোহিতলালের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এগুলি তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সজনীকান্ত দাসের ওপর। কিন্তু এ-পত্রিকার ঐ আক্রমণাত্মক ও বিদ্রূপমূলক লেখাগুলির জন্যে সেকালের শুধু তরুণের দলই নয়, বৃদ্ধেরাও এর উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। "শেষে এমন হইল যে, ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে 'শনিবারের চিঠি'র নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল…'শনিবারের চিঠি'র জীবনে এই কালটা সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ; এইকালে আমি খাঁটি সাহিত্যের আদর্শ ও নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যেরূপ অবারিত লেখনী চালনা করিয়াছিলাম তাহার প্রমাণ সেই কালের 'শনিবারের চিঠি'র সর্বাঙ্গে পাওয়া যাইবে।" (আমি ও শনিবারের চিঠি) মোহিতলালের এই উক্তি খুবই সত্য। তথাপি

'চিঠি'র ঐ আদি প্রবর্তনা বা ব্যঙ্গ-প্রবণতার জন্যে তাঁরও যে অনেক দুর্নাম হয়েছে—একথা তিনিও ঐ প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন।

'শনিবারের চিঠি'কে কেন্দ্র ক'রে বাঙলাদেশে যে বিরোধ ও উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুনের তাপ মোহিতলালকে স্পর্শ করলেও তাঁর চিত্ত ছিল এ সকলের অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি ছিলেন যথার্থই সাহিত্যগতপ্রাণ। সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। এই সময়ে তিনি বাদুড়-বাগানের মেস ছেড়ে দিয়ে ৯৩/১ মানিকতলা স্ট্রীটে একটি বাসা ক'রে সপরিবারে বাস করছিলেন। তাঁর সেকালের একটি চিত্র সজনীকান্ত দাস 'দুইদিক' নাম দিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে তুলে ধরেছিলেন। "অত্যন্ত এঁদো গলিতে একটি জীর্ণ বাড়ী। তেতলায় দুইটি মাত্র ঘর। আর একটি নামমাত্র রান্নাঘর।...বাড়ীর চতুর্দিকের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া লজ্জিত হইতেছিলাম...ম বাবু বলিলেন, 'ভায়া, গিন্নী রান্না করুন, আমরা ততক্ষণে একটু কাব্যচর্চা করি। খুকী ঘুমিয়েছে।'...ম বাবু ৪৫৲ টাকা মাহিনার স্কুল-মাস্টার, মাসে ১৫৲ টাকা তাঁহার ঘর ভাড়াতেই লাগে। আজ মাসের ২৯ তারিখ, হয়তো কাল কি করিয়া রান্না চড়িবে তাহার ঠিক নাই। সেই লোক একটি স্বাস্থী অতিথিকে ঘরে আনিয়াও নিরুদ্বেগে কবিতা শোনাইতে বসিলেন। ধন্য কবিতাদেবী।"[২৩] মোহিতলালের চরিত্রের একটি সত্য পরিচয় এই চিত্রে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এই সজনীকান্ত দাসই যখন বাদুড়বাগান লেনের মেসে মোহিতলালের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন, তখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে সাহসী হন নি। মোহিতলালের কবিতা সুর ক'রে জোরে জোরে পাঠ ক'রে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আত্মস্মৃতির (১ম খণ্ড) যে অংশে তিনি সেকথা লিখেছেন সেখানেও মোহিতলালের কবিতাপ্রীতি, স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মোহিতলালের সমালোচনা-সাহিত্য লেখার দুর্লভ ক্ষমতা আগেই দেখা গিয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর সমালোচকসত্তা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেল। এইকালে মোহিতলালের অকৃত্রিম বন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে মোহিতলালের এই শক্তি লক্ষ্য ক'রে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার সুযোগ ক'রে দিলেন। ১৩৩৫ সালের জুলাই মাসে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদ লাভ ক'রে মোহিতলাল কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় নীলক্ষেত রমনায় সপরিবারে বাস করতে থাকেন। ঢাকা থেকেই তিনি কখনো নিজ নামে কখনো সত্যসুন্দর দাস নামে আবার কখনো নাম না

দিয়ে 'প্রসঙ্গ কথা'য় অজস্র প্রবন্ধ 'শনিবারের চিঠি'তে লিখে যেতে লাগলেন। এই সময় তাঁর কাব্যরচনার ধারা মন্দীভূত হয়ে এল। তথাপি ১৩৩৪ থেকে ১৩৪৩ সালের মধ্যে লিখিত কবিতাগুলিকে বাছাই ক'রে তিনি ১৩৪৩ এর অগ্রহায়ণে 'স্মরগরল' গ্রন্থখানি বের করেন। বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ গ্রন্থখানি ডঃ সুশীলকুমার দে'কে উৎসর্গিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর আধুনিক বাঙলা সাহিত্য (১৩৪৩), সাহিত্যকথা (১৩৪৫) বিবিধকথা (১৩৪৮) সাহিত্যবিতান (১৩৪৯) রবিপ্রদক্ষিণ (১৩৫৬) বাঙলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২) প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই এই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় মোহিতলালের সমকালীন সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন আন্দোলন ও সমস্যার সঙ্গে পরিচিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর লেখার সুখ্যাতি ক'রে পত্র দিয়েছেন অনেকেই, আবার অনেকেরই সঙ্গে মতবিরোধ ঘটেছে, বাদপ্রতিবাদ চলেছে—এ সব কিছুর প্রমাণ এই পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে। বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যকে একটি উন্নততর সুদৃঢ় বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনায় তিনি পরিণত করেন। সাহিত্যের নীতি ও আদর্শ বিষয়ে তাঁর মত ছিল নিজের কাছে অভ্রান্ত এবং এ বিষয়ে তিনি কারো সঙ্গে আপোস ক'রে চলতে ছিলেন নারাজ। সমালোচক ও কবির যুগ-আধিপত্য মোহিতলালের বহু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

অধ্যাপনার সূত্রে ঢাকায় যাওয়ার কয়েকমাস পরেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মোহিতলালের পর পর দুই কন্যার মৃত্যু হয়। এই গভীরতম শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। 'রূপকথা' কাব্যের কবিতাগুলি রচনার পশ্চাতে এই শোকের বেদনাই সক্রিয়।

বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে গিয়ে মোহিতলাল বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের দৈন্য বিশেষভাবে অনুভব করেন। আর এই জন্যেই তাঁর অতিপ্রিয় কাব্যসাধনাকে একরূপ ত্যাগ ক'রে বাঙলা-সমালোচনা সাহিত্যকে উন্নত করার জন্যে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এই সময় উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যের আশা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন নিয়েই তিনি আলোচনায় ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের সাহিত্য তখন তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। তাঁর সমালোচনাকর্মও মূলত উনিশ শতকের কবি ও সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মেরই মূল্যায়ন। বিশ শতকের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিকদের সাহিত্য তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি দেশের সাহিত্যকে জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। এই উৎসাহ ক্রমশ

এমনই বৃদ্ধি পেল যে কবি, সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যে শুধু বাঙালীয়ানাকেই বড় ক'রে দেখতে লাগলেন। সমালোচনার দুর্লভ শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কারণে তাঁর মধ্যে মানসিক অনুদারতা লক্ষ্য করা গেল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের সাহিত্য, অতি আধুনিক কবিদের নিশ্ছন্দ গদ্য কবিতা, তরুণ সাহিত্যিকদের যৌনবোধ-সম্পন্ন সাহিত্য ও রবীন্দ্র-অনুকরণমূলক কাব্য—প্রভৃতিকে তিনি নানাভাবে কটাক্ষ করতে থাকেন।

মোহিতলালের যে মনীষা পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে তাঁর জনপ্রিয়তা আনে নি—অধ্যাপনা জীবনে কিন্তু সেইগুলিই তাঁকে অনন্য-সাধারণ কৃতী অধ্যাপকে পরিণত করেছিল। বাক্‌ভঙ্গীর অনন্যতা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিশ্লেষণ—তাঁকে অসাধারণ ছাত্র-প্রিয় অধ্যাপক ক'রে তুলেছিল। তাঁর একজন ভক্ত ও গুণগ্রাহী ছাত্র তাঁর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃতির যোগ্য। "অধ্যাপনা ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। বইখানি যে পাঠ্য, এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন আসবে এবং সে প্রশ্নের জবাব লিখতে হবে—সেদিকে দৃষ্টি রেখে তিনি পড়াতেন না। কবিসুলভ একটি অখণ্ড ও সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে তিনি গ্রন্থের মর্মলোকে প্রবেশ করতেন। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে এবং স্রষ্টার মধ্যে সৃষ্টি-বীজকে তিনি আবিষ্কার করতেন। তারপর ধীরে ধীরে সমালোচনাচ্ছলে তিনি তার বিভিন্ন সৌন্দর্যরসের দিকটা শতদল-পদ্মের এক একটি পাপড়ির মতো মেলে ধরতেন।·· বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন ক'রে আমরা ধন্য হতাম। গুরুশিষ্যের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে সাহিত্যের সেই রসাস্বাদন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোকে সুধাস্নাত ক'রে রাখত। তাঁর অধ্যাপনা ছিল সৃষ্টি।"[২৪]

এই ঢাকায় বাসকালীনও সাহিত্য-বিষয়ক সংলাপ ও সাহিত্যালোচনায় মোহিতলাল সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতেন। আর অধ্যাপনা শেষ ক'রে বাকী সময়টুকু তিনি কাটাতেন স্বরচিত ফুল বাগানে। এখানে তিনি বিভিন্ন রকমের গোলাপফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। তাঁর এই পুষ্পপ্রীতি এবং ঐ সাহিত্য আলোচনার আগ্রহ দুইই কবি মোহিতলালের উপযুক্ত কর্ম। এখানেও সাহিত্য-প্রাণ মোহিতলালকেই আমরা দেখছি। ১৩৪৮ সালের শ্রাবণমাসে মোহিত-লালের 'হেমন্তগোধূলি' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। এর প্রায় দু'বছর পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

১৩৪০-৪২ সাল থেকেই মোহিতলালের মধ্যে বাঙালী প্রীতির ভাবটি দেখা

দেয়। ধীরে ধীরে তাঁর এই বোধটি প্রবল হতে থাকে এবং বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতির জন্যে তিনি অন্তরের গভীরে অত্যধিক একটি মমত্ব অনুভব করতে থাকেন। তাঁর মনে হতে থাকে যে তাঁর চোখের সামনে থেকে উনিশ শতকের সেই একটি সুস্থ প্রাণবান বাঙালী জাতি, যে সাহিত্যে কর্মে ও জ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বুঝি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে। ১৩৪৭ এর ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক অধিবেশনে 'জাতির জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি তিনি সভাপতিরূপে পাঠ করেছিলেন তাতে সেই মানসিকতা স্পষ্ট। তাঁর শেষ বয়সের বাঙলার নবযুগ (১৩৫২) জয়তু নেতাজী (১৩৫৩) ও বাঙলা ও বাঙালী (১৩৫৮) গ্রন্থে তাঁর জাতিগত ঐ ভাবনাই প্রধান। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা, কংগ্রেসী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাঙলাদেশের প্রতি উপেক্ষা এবং মহাত্মাজীর অহিংসা-নীতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুই বাঙালী-নিধন-যজ্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়—এ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় হয়। 'শনিবারের চিঠি' এই-সব বিষয়ে প্রতিবাদ না করায় 'শারদীয়া ১৩৫১' শীর্ষক শেষ প্রবন্ধটি দিয়ে তিনি এই পত্রিকার সঙ্গেও সকল সংস্রব ত্যাগ করেন।

১৩৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটনায় পঞ্চদশ প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলন এ মোহিতলাল সাহিত্যশাখার সভাপতি হন। ১৩৪৭ এর আষাঢ় মাসে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য বিতানের (টালা) সাহিত্যসভার সভাপতি হন। ১৩৪৭ সালেই ব্রাহ্মণ বেড়িয়া সাহিত্যসভার বার্ষিক শরৎ-স্মৃতি অধিবেশনেরও তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। ১৩৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী পদক দানে সম্মানিত করেন। ১৩৫৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপরে তিনি শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা দেন। ১৩৫৮ সালে নদীয়া জেলার সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। জীবনের শেষ পর্বে দেশের বহুস্থান থেকেই মোহিতলালকে সভাপতিত্ব করবার জন্যে ডাক আসে। কিন্তু অভিমানী মোহিতলাল মনে করতেন তাঁকে যতখানি সম্মান দেখানো দরকার, দেশ তা দেখাচ্ছে না। এরূপ একটি কল্পিত বেদনায় তিনি মনে মনে খুব কষ্ট পেতেন।

ঢাকা থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে মোহিতলাল কিছুদিন বারাকপুরে বাস করেন। তারপর বাগনানে ৩-৪ বছর কাটান। তারপর বাকী জীবনটুকু তিনি বরিশায় অতিবাহিত করেন। ১৩৫৮ সালে কলকাতায়-বঙ্গবাসী কলেজ খোলা হলে তিনি সেখানকার অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শেষজীবনে নিদারুণ আর্থিক কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তার ওপর বাঙালীর অবক্ষয়-ভাবনা দুঃস্বপ্নের মতো তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাঁর মনের সমস্ত সরসতা ও সজীবতা এ সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্যে অপ্রকৃতিস্থের মতো তিনি এই কালে ছাত্র, অধ্যাপক বন্ধু ও সাহিত্যিকদের যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তাতে তাঁর মনের ঐ জ্বালা ও ক্ষোভ মর্মান্তিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালী জাতিকে এই আত্মিক সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শে তিনিও 'বঙ্গদর্শন' (১৩৫৪ শ্রাবণ) নামে নিজেই একটি পত্রিকা বের করলেন। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গে মোহিতলালের বেদনার্ত চিত্তের হাহাকার ক্ষোভ এবং অভিমান ফুটে উঠেছে। তাঁর কিছু উৎকৃষ্ট সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, কিছু অনুবাদ রচনা এবং 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ—এই পত্রিকাতে প্রকাশিত হলেও পত্রিকার 'বঙ্গদর্শন' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সেই জ্বালা আর হতাশার সুরই ধ্বনিত হয়েছে। এইকালে মোহিতলালের মানসিক অবস্থার সম্যক্ পরিচয় লাভ করতে গেলে ঐ পত্রিকার কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করা দরকার। ১৩৫৫ সালে আচার্য গিরিশচন্দ্র ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সারস্বত সম্মেলনে ছাত্রদলাজের প্রতি সভাপতির অভিভাষণরূপে মোহিতলাল যা বলেছিলেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী "আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনুষ্য, আমি তোমাদের এই অগণিত নবরত্ন-মণ্ডলীর উজ্জ্বলিমা হইতে সসম্ভ্রমে অতিদূরে বনমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে বাস করি, খ্যাতি নয়, অর্থ নয়, পদ বা পদবী নয়—কিছুরই আকাঙ্ক্ষায় কাহারও বাড়াভাতে ছাই ফেলিবার কিম্বা পাকাধানে মই দিবার দুরভিসন্ধি আমার নাই। তথাপি সেই সকল মহাত্মা কেন যে আমাকে গালিগালাজ করেন—কেহ কেহ মিথ্যা কুৎসাও রটনা করেন, তাহা বুঝিতে পারি না।'[২৫]

অথবা অন্যত্র প্রকৃতি-প্রেমিক মোহিতলালকে বলতে শুনি—

"এখন এদেশে পূর্ণিমা নাই, বসন্ত নাই, শারদীয়া নাই, পৌষপার্বণ নাই, যাহা নাই তাহার মিথ্যা অভিনয় কেন? এ কথা যে বোঝে না সে বাঙলা-দেশে বাস করে না, সে বাঙালী নয়।... আমি সকলই দেখিতেছি—দেশের দুর্দিনের এই ঘনায়মান অন্ধকারে আমি বড়ই আশঙ্কা বোধ করিতেছি ...আমি যে কোন সান্ত্বনা কোন আশ্বাস কোন জনসম্মোহন গুরুবাক্যে কিছুমাত্র শান্তি পাইতেছি না—বড় একা বড় দুশ্চিন্তা ভোগ করিতেছি। রাজনৈতিক অবস্থার কথা বলিব না, সেখানে বাঙালীর উপর বাঙালীরই ধাপ্পাবাজীর চূড়ান্ত চলিতেছে।"[২৬]

এই সমস্ত উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মোহিতলালের শেষ জীবনে, মানসিক অবস্থা কোন্ স্তরে এসে পৌঁছেছিল। বলা বাহুল্য বাঙালীর যে অধঃপতনের চিত্র তিনি প্রত্যক্ষ ক'রে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছিলেন, সে চিত্র অনেকখানিই তাঁর স্বকপোল-কল্পিত। কাব্য, সমালোচনা সব ছেড়ে দিয়ে তিনি বাঙালীকে উদ্ধার করার কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর আশা ছিল তিনি উনিশ শতকীয় আদর্শে বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারবেন। কিন্তু সে আশার চিত্রও ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল। তাঁর বক্তব্যের মুখপত্র 'বঙ্গদর্শন' দু'বছর চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হল। ১৩৫৯ সালের বৈশাখে 'বঙ্গভারতী' নামে আরও একটি পত্রিকা একই আদর্শে প্রকাশিত হল। কিন্তু বাঙালী সম্পর্কে শেষ আশাটুকুও অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে এল। তিনি বলে উঠলেন—"বাংলার নাভিশ্বাস উঠছে, তার সর্বাঙ্গে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সত্যই বাংলার নিকটে শমন আমারও 'নিকট শমন'—এ কথা গর্জন করেই বলে যাচ্ছি।"[২৭] আর একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"আমি এক্ষণে আমার জীবনের শেষ দেনা পরিশোধের চেষ্টা করিতেছি। সকল দিকে এত নিরাশ হইয়াছি এবং দেহ মন এত ভাঙিয়া পড়িয়াছে যে জন্মান্তরের অপরিমেয় ঋণ এবারেও শোধ করিতে বোধ হয় পারিলাম না। এ জীবনে অনেক ঋণ করিয়াছি—বন্ধুবান্ধব বিমুখ হইয়াছে। সেই হৃদয়-ঘটিত দেনা-পাওনার দেনাটাই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাই এখন আমি এই নির্বান্ধব বনবাসে শেষ কয়টা দিন কাটাইতেছি।"[২৮]

বলা বাহুল্য মোহিতলালের অন্ধজাতিপ্রেমজনিত এই নৈরাশ্যই তাঁর কবিসত্তা ও সমালোচক সত্তাকে গ্রাস করেছে

১৯৫২ সালের ৫ই জুলাই বঙ্গবাসী কলেজের এম. এ র তিনি শেষ ক্লাসটি নেন। ক্লাসের পর সেদিনই তিনি বিশ্রামকক্ষে অধ্যাপকদের বলেছিলেন —'আমি আর তোমাদের বোধহয় বেশীদিন বিরক্ত করব না।'[২৯] তারপর ১০ই জুলাই থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন—বুকে ও পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়। পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার জানালেন—'করোনারী থ্রম্বসিস্'। বাড়িতে এ রোগের চিকিৎসা ঠিক চলে না। তাছাড়া, এ সময় বাড়িতেও তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছেলে গুরুতর অসুস্থ। কাজেই ভক্ত ছাত্র ও বন্ধুদের চেষ্টায় শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতালের মেকেঞ্জি ওয়ার্ডে তাঁকে ভর্তি করা হল। ২৬শে জুলাই শনিবার রাত্রি ৯।১৫ মিনিটের সময় কবি মোহিতলাল মজুমদার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নিজের নাড়ীর স্পন্দনটুকু

লক্ষ্য ক'রে হিন্দী-ভাষা-বিদ্বেষী মোহিতলাল উচ্চারণ করলেন—"মজাসে চল রহেঁ।"[৩০] তারপর সব শেষ।

এই হল মোহিতলালের সংক্ষিপ্ত জীবন।

মোহিতলালের এই জীবন-পরিচয় থেকে তাঁর কোন্ চিত্র আমাদের মানস-পটে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে? এক কথায় সে-চিত্র একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যপ্রাণ শিল্পীর। কিন্তু এই শিল্পীটির জীবনকথায় কি দেখছি? ধনীর দুলাল তিনি ছিলেন না—সমস্ত জীবনই তাঁকে অভাব-অনটনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। এই দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যেও কিন্তু তাঁর পড়াশুনায় বিরাম ছিল না—সাহিত্যা-নুশীলনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি ছিল না। এই একটি মাত্র নেশায় বাস্তবজীবনের সকল দুঃখকষ্টকে তিনি বিস্মৃত হয়ে 'আত্মভোলা মহেশ্বরে'[৩১] পরিণত হয়েছিলেন। আবার অল্পবয়সে অধিক পড়াশোনা করার ফলে তাঁর নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় জন্মেছিল। মায়ের অভিমান পুত্রের স্বভাবে বর্তমান তো ছিলই। তার ওপর ঐ আত্মপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'স্বপনপসারী'র কবিতাগুলি রচনার কাল থেকে কাবর মধ্যে একটা আত্মাভিমানবোধ জাগ্রত হয়। 'ভারতী'তে 'মাসকাবারি' অংশ লেখবার সময় থেকে ব্যক্তিগত ভাললাগা ও ও মন্দলাগার বিষয়টিকে অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলার প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। অগভীর মন্তব্য, চটুল রসিকতা এবং গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতি তাঁর মন ক্রমশ বিরূপ হতে থাকে। সর্ববিষয়েই একটা 'সিরিয়াস্‌নেস্' ও গাম্ভীর্যের লক্ষণ তাঁর আচরণে ও বক্তব্যে ফুটে উঠতে থাকে। মোটামুটিভাবে বলা যায় 'স্বপনপসারী' কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার কিছু পূর্বে থেকেই তাঁর একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্য ও বিশেষত রবীন্দ্র-অনুসৃত কাব্য বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা ক'রে আত্মতৃপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাব ও ভাবনার দিকে অধিক পক্ষপাত প্রদর্শন করছে—এই ধারণাটিও তাঁকে অহরহ পীড়িত করতে থাকে। ইংরেজ সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ডের জীবনবাদী সমালোচনার (Poetry is the Criticism of life) তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। তাছাড়া সমকালীন যুগমানসে একটি বাস্তবজীবনাকৃতিও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে তিনি একটু অধিকমাত্রায় জীবনরস-রসিক হয়ে ওঠেন। জীবনকে ভোগ ও তার পুরো মূল্য আদায় করার অতিপ্রবল আগ্রহও ঐ সময় তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু অতিরিক্ত পড়াশোনা ও চিন্তাশীলতার জন্যে নানা বিষয়ে তাঁর মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠতে থাকে। অথচ তাঁর অবচেতন মনে একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবও ছিল। একদিকে এই অবচেতন মনের স্বীয় মত ও পথ সম্বন্ধে

অবিচল বিশ্বাস অন্যদিকে সচেতন মনের উপরিস্তরে কেমন একটা দ্বিধা-সংকোচ—এর ফলে 'স্বপনপসারী'র পরবর্তী কাব্যগুলিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব জটিল হয়ে ওঠে। মনের প্রাখর্যের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ, গাম্ভীর্যের সঙ্গে অভিমান, কাব্যানুশীলনে আত্মবিভোরতার সঙ্গে সমালোচকের তর্ক-ভাবনা, বাস্তব বস্তু-সচেতনতার সঙ্গে বস্তু অতিশায়ী কল্পনা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেও কিঞ্চিৎ দ্বিধা—এ সমস্ত মিলে মোহিতলালের ব্যক্তিত্ব 'বিস্মরণী', 'রূপকথা' ও 'স্মরগরল' পর্বে একটি বিশেষ রূপ নিয়েছিল। আবার এই সময়ে জাতিপ্রীতির ভাবটিও দেখা দিতে থাকে। এই চেতনার স্ফূর্তিতেই অবশ্য তাঁর কবি-জীবনের অপমৃত্যু ঘটে। সমালোচক সত্তার অতিরিক্ত আধিপত্যের ফলে তাঁর রসের উৎস শুষ্ক হতে শুরু করেছিল—কিন্তু তখনও তাঁর কবিসত্তার অস্তিত্ব ছিল। মোহিতলালের ঐ ব্যক্তিত্ব জীবনের বিভিন্ন পর্বে যত বেশী বিশিষ্টতা লাভ করেছে তাঁর কাব্যও সেই সেই পর্বে অনেকখানি তদনুরূপ বিশিষ্টতার আলোকে রচিত হয়েছে। কাজেই কবির ব্যক্তিজীবন-পরিচয়কে তাঁর কাব্যালোচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে না।

অতঃপর দেশ-কালের কথা। সমকালীন বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীও মোহিতলালের কাব্যোপলব্ধির পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক নয়। সমকালীন ঘটনাবলীকে কাব্যে প্রতিফলিত করার দায় কবিমাত্রেরই—এমন উক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি না। আর এ-প্রবণতার আধিক্যেও কোনো কবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে না। তবে যুগের প্রবল আলোড়নকারী বিশেষ বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে কবির সম্পূর্ণ নীরবতা বা উদাসীনতা অনেক সময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সমসাময়িক দেশ-কালের আবহাওয়া সম্পর্কে মোহিতলালের অনীহার কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। কাজেই ঐরূপ ঘটনাবলীর কিছু পরিচয় দিয়ে এ-ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা কতখানি, তা দেখা দরকার।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহাওয়া যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশ দ্বিধাবিভক্ত হলে সারা দেশে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলে ওঠে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলনও প্রবল আকার ধারণ করে। অনুশীলন-সমিতি ও যুগান্তর দল ইংরেজ-বিতাড়নের জন্যে দেশের তরুণ সমাজকে উত্তেজিত করতে থাকে। এদিকে কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় দেশে যে জাতীয় আন্দোলনটি গড়ে উঠছিল, লর্ড মিণ্টো ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের পৃথক

নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রে তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিপ্লবের আগুন কিছুতেই প্রশমিত হবার নয়। বরং রুশ-জাপান-যুদ্ধে জাপানীদের হাতে শক্তিশালী রুশদের পরাজয়-বরণের দৃষ্টান্তে বাঙালী আরও মারমুখী হয়ে উঠলো। এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। নিজেদের ভাবী মঙ্গলের আশায় ভারতীয়েরা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন ও আন্তরিক সাহায্য করেছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে তাদের কামনা পূরণ হল না। রাউলাট অ্যাক্ট (১৯১৯ খ্রীঃ) ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে (১৯১৯ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকারের দানবিক মূর্তি প্রকটিত হল। এই কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন দুটি স্বতন্ত্রধারায় অগ্রসর হচ্ছিল। অ্যানি বেসান্ত, বালগঙ্গাধর তিলক ও পরে আফ্রিকা-প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটিতে 'হোমরুল' বা স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি এবং আর একটিতে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে বৈপ্লবিক পন্থায় ইংরেজ-হঠাও আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও অহিংস আন্দোলন জাতীয় ঐক্যকে ধীরে ধীরে ঘনীভূত করছিল বটে, কিন্তু শিক্ষিত তরুণদের মনে একটি অশিষ্টভাব ও সংস্কারবর্জনের মনোবৃত্তিও প্রশ্রয় পাচ্ছিল। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হল। সপ্তপুরুষের বাসভূমি পল্লীর ভিটা ত্যাগ ক'রে জীবিকার সন্ধানে বাঙালী শহরের দিকে ছুটল। কলকারখানার প্রসারের ফলে বাঙালী-শ্রমিক শহর বা শহর-সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করতে শুরু করল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্রতায় পল্লীর শান্তিময় একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে পড়তে লাগল। সমাজমানসের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের মন গভীরভাবে আন্দোলিত হল। গতানুগতিকতাকে পরিহারকামনা, স্বতন্ত্রপথে স্বাধীনচিত্ততার সঙ্গে চলবার ইচ্ছা—এককথায় সেকালের প্রবীণদের দৃষ্টিতে কতকটা ঔদ্ধত্যমূলক মনোভাব মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেখা গেল। অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহাত্মক মনোভাবও তাঁদের অস্থিমজ্জায় মিশে গিয়েছিল। আর এই সকলের ফলস্বরূপ শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব, মানুষের অভ্রংলিহ পৌরুষকে সদাজাগ্রত রাখার প্রয়াস, সকলশ্রেণীর মানুষের প্রতি নিঃসীম দরদ, নরনারীর যৌন-আকর্ষণ তথা জীবনের সমস্ত কিছুকেই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখবার আগ্রহ, বস্তুতান্ত্রিক পন্থায় জীবনচিত্রণের প্রেরণা, বিজ্ঞানীবুদ্ধি, যুক্তি ও মননের অনুশীলন—প্রভৃতির অনুপ্রবেশ সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটছিল।

আবার দেশ ও সমাজের এই ঘোরতম দুর্দিনে জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত কিছু সংখ্যক তরুণদের মনে পরিচিত বাস্তবজীবন-রঙ্গভূমি থেকে দূরে আরব-পারস্যের মরুবালুকায় অনাস্বাদিতপূর্ব উদ্দাম যাযাবরী এক কাল্পনিক নতুন জীবনযাপনের আহ্বান এসেছিল। নৈরাশ্য ও হতাশার অন্ধকারে সেই জীবনরসের আস্বাদনে তারা কতকটা প্রাণের স্বস্তি পাচ্ছিল। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'দুরন্ত আশা' কবিতাটির কয়েকটি চরণ যেন এঁদের জপমন্ত্র হয়ে উঠেছিল—'অদৃষ্টের বন্ধনেতে' বাঁধা পড়ে 'অন্নপায়ী' ও 'স্তন্যপায়ী' বাঙালী না হয়ে তাঁরা বলতে চাইছিলেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব-বেদুয়িন।
চরণতলে বিশাল-মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবন-স্রোত আকাশে
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।"

(দুরন্ত আশা)

আর এরই সঙ্গে জীবনের নশ্বরতার কথা ভেবে ওমরখৈয়ামী সুরে ভোগের নেশায় বুঁদ হওয়ার কামনা ও সমাজপ্রচলিত জীবনযাত্রার বিধিনিষেধগুলির উল্লঙ্ঘনপ্রয়াসও সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠছিল।

'স্বপনপসারী' কাব্যের কবি মোহিতলাল দেশ ও কালের এই সমস্ত প্ররোচনাকে অস্বীকার করেন নি। সমকালীন এই সমস্ত লক্ষণের অনেকগুলি তাঁর কাব্যে বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত। কাণ্ডারীহীন দেশে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে যেদিন দেশের কর্ণধাররূপে জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন—সেদিন জাতির আশ্বস্ত প্রাণের আনন্দতরঙ্গ মোহিতলালের 'মহামানব' ও 'আবির্ভাব' কবিতাদ্বয়ে রূপলাভ করেছিল। 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ' ও 'বেদুঈন' কবিতায় মানুষের অভ্রভেদী পৌরুষকে উন্মত্ত যাযাবরী জীবনের পটভূমিকায় এক নবরোমান্টিকতার সুরে বন্দনা করার প্রয়াস আছে। তাঁর বন্দোবস্ত বিভাগে চাকরির বালুচর-জীবনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই এই কবিতাগুলিকে বাস্তবতার রঙে উজ্জ্বল করতে সাহায্য করেছে। আবার 'পাপ' কবিতায় নরনারীর দেহজ আকর্ষণকে

সংস্কারমুক্ত সহজ দৃষ্টিতে দেখবার ইঙ্গিত আছে। মোহিতলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি রচনার পশ্চাতে দেশ ও কালের এই পটভূমিকাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। 'দিলদার', 'গজলগান', 'হাফিজের অনুসরণে'—প্রভৃতি কবিতায় ওমরখৈয়ামী সুরে ভোগনেশায় মত্ত হওয়ার কামনাও লক্ষণীয়। দেশ ও কালের প্রেরণা তাঁর কাব্যে কোনো তরঙ্গই তোলে নি বলে যাঁরা আক্ষেপ করেন—এইসব কবিতা তাঁদের বক্তব্যের যে প্রতিবাদ একথা অস্বীকার করা চলে না।

'স্বপনপসারী' ১৩২৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৩৪৮ সালে 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশের কাল পর্যন্ত বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিচিত্রভাবে আন্দোলিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি ভারতের জাতীয় আন্দোলন নরম ও চরমপন্থীদের নেতৃত্বে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল বিশ শতকের শুরু থেকেই। কংগ্রেসের 'মডারেট' বা নরমপন্থী নেতারা উচ্চকোটির মানুষদের সংস্কারবাদী ধারার পতাকাবাহী ছিলেন। আর নিম্নকোটির মানুষদের সংগ্রামী ধারাটিকে বহন ক'রে চলেছিলেন চরমপন্থী নেতারা। এঁদেরই প্রচেষ্টায় দেখা দিয়েছিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন, যুদ্ধকালীন হোমরুল আন্দোলন এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যবর্তীকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর শ্রমিক শ্রেণীও রাজনৈতিক শক্তিরূপে দেখা দিল—ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নতুন পর্যায় শুরু হল। পূর্বোক্ত দুটো দল তো থাকলই, তাছাড়া শ্রমিক আন্দোলনও শুরু হল। এর প্রমাণ পাওয়া গেল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পত্তনে, ধর্মঘটের অভ্যুদয়ে এবং কৃষক সভার সংস্থাপনে। সমাজতন্ত্রের চরম লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প এবং কৃষিবিপ্লবের কর্মপন্থা—এই তিনটি বিষয় নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা আবির্ভূত হলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিতরে এটি হল বামপন্থী ধারা।

১৯২৭ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। রাজনৈতিক অসন্তোষও বৃদ্ধি পেল। ফলে জাতীয় আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকল। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, যুবআন্দোলন, মহিলা আন্দোলন প্রভৃতি লক্ষ্য করা গেল। সমাজতন্ত্রীদল, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি বিভিন্ন

দলেরও সৃষ্টি হল। সব দলই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। এই কালে কত বড় বড় সংগ্রামের ঢেউ দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—যুদ্ধের সময় ১৯৪২এর আগস্ট আন্দোলন, একটানা শ্রমিক ধর্মঘট, যুদ্ধোত্তরকালের আজাদহিন্দ্ আন্দোলন, পুলিস ধর্মঘট নাবিকধর্মঘট প্রভৃতি। কংগ্রেসের অহিংস সত্যাগ্রহ তো ছিলই। এই সমস্ত আন্দোলনের সম্মিলিত শক্তিই শেষ পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।

তাছাড়া এই কালে বাঙলাদেশে ১৯৪৬ সালে যে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে তাও কম আলোড়নকারী ঘটনা নয়। ১৩৫০ সালে যে মন্বন্তর হয়েছিল তারও নজির বাঙলার ইতিহাসে দুর্লভ। আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর বঙ্গভঙ্গ এবং সেই হেতু দেশে উদ্বাস্তুসমস্যাও ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করেছে।

বলাবাহুল্য 'বিস্মরণী' কাব্যটির কবিতাগুলি লেখবার সময় থেকে মোহিতলাল সমকালীন যুগতরঙ্গ থেকে কতকটা দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। যুগের ঐ সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা তাঁর মন আন্দোলিত হয়েছে এমন প্রমাণ তাঁর কাব্যে অন্তত নেই। ১৩৩২ সালে অবশ্য দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি 'চৌঠা আষাঢ়' কবিতায় স্মৃতিতর্পণ করেছিলেন—কিন্তু সে কবিতাটিকে 'বিস্মরণী'তে স্থান তিনি দেন নি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের যুবকদের আত্মাহুতি অবশ্য তাঁকে অভিভূত করেছিল, তার প্রমাণ 'বিস্মরণী'র 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতাটি। জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও হতাশা গভীরতর রূপে মোহিতলালকে দুঃখভাবনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেছিল। যদিও তিনি ঐ দুঃখবাদকে তাঁর চিত্তজাত নানা দ্বন্দ্ব ও ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দুঃখের একটি গভীর অর্থনির্ণয় করেছিলেন, তথাপি এর প্রেরণামূলে যুগের দুঃখদুর্গতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু এই কয়েকটি নিতান্ত স্বল্প উপাদান বাদ দিলে দেখা যাবে যে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে চঞ্চল হন নি। তিনি অতিআধুনিক সাহিত্যিকদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে উনিশ শতকীয় আশা, বিশ্বাস ও স্বপ্নের রাজ্যে প্রয়াণ করেছিলেন। তাই সেকালের প্রধান প্রধান ঘটনায় আলোড়ন তাঁর কাব্যে তেমন ছায়া ফেলতে পারে নি। তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালী' ও 'জয়তু নেতাজী' গ্রন্থে এবং 'বঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গভারতী' পত্রিকায় তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে অতিসচেতনার প্রমাণ আছে। সেখানে তিনি গান্ধীর অসহযোগ ও অহিংসা মন্ত্রের পরিবর্তে বীরবিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভক্ত—মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের পূজারী।

উল্লেখপঞ্জী

১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকটি এইরূপ :—

"যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংংশসম্ভবম্।"৪১

(বিভূতি যোগঃ)

২ 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য'—(১ম সং ১৩৫১) গ্রন্থের লেখক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর মন্তব্য পৃঃ ১৭-১৮

৩ 'রবীন্দ্রনাথ' ও যুগসাহিত্য' গ্রন্থের লেখক এই সভা সম্পর্কে লিখেছেন, 'সেই সভা ও সম্মিলনী যে কয়েকটি প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, কয়েকজন অভিজাতবংশীয় ধনী ব্যবসায়ী ও উচ্চশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিগণের মিলনক্ষেত্র তাহা জানিতে পারিলাম। তাঁহারা সংখ্যায় ১৫-২০ জন। তন্মধ্যে কবির সুহৃৎকল্প সভ্যও দু'একজন ছিলেন। তখন কবির পাঠ্য পুস্তকের তত আদর ছিল না, বই বিক্রয়ও অল্পই হইত। সেই অপরাধ লইয়া কোন কোন রসিক কবি 'গুজনদবে তাঁহার কবিতা পুস্তক বিক্রয় হয় ও সেই বই কাটছে বটে পোকায় কিন্তু আলমারি কি সিন্দুকে' বলিয়া কবিতায় রসচেষ্টা করিয়া বিদ্রূপবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সভার নিয়মানুসারে কবির নাম করিয়া ফেলিলে চারি আনা জরিমানা দিতে হইত।…মনে আছে, ঐ প্রকারের সংগৃহীত অর্থে মাসে একদিন করিয়া তাহাদের পার্টি হইত, তাহাও দেখিয়াছি।" (পৃঃ ৩০-৩১)

৪ ১৩৩৫ সালের শনিবারের চিঠি' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিতলালের প্রবন্ধ 'আধুনিক সাহিত্যের পরিণাম'।

৫ 'বঙ্গবাণী'—শশাঙ্কমোহন সেন পৃঃ ১৮৩

৬ 'রবিপ্রদক্ষিণ' (১ম সং ১৩৫৬)—মোহিতলাল মজুমদার পৃঃ ৯

৭ মোহিতলালের 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধ পৃঃ ৮৮

৮ 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য.—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী পৃঃ ৩৬

৯ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' শীর্ষক মোহিতলালের প্রবন্ধটিতে অক্ষয় বড়ালের 'পান্থ' কবিতার বহু উদ্ধৃতি আছে।

১০ ১৩৩৪ প্রবাসী আষাঢ় সংখ্যায় 'বিস্মরণী'র আলোচনায় মোহিতলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে জানিয়েছেন যে মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় কবি ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল।

১১ মোহিতলালের 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের 'দেবেন্দ্রনাথ সেন' প্রবন্ধ।

১২ ১৩২৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'ভারতী'তে মোহিতলালের মন্তব্য।

১৩ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে এই প্রভাব কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়েছেন।

১৪ 'সাহিত্য বিচার' গ্রন্থে মোহিতলালের মন্তব্য, প্রবন্ধ 'কবি ও কাব্য' পৃঃ ৪।

১৫ 'কাব্যমঞ্জুষা'—গ্রন্থের কবি পরিচয় অংশে মোহিতলালের কথা।

১৬ হাওড়া নিবাসী কবির জ্ঞাতিভ্রাতা রাধিকাপ্রসাদ মজুমদারের নিকট এই সমস্ত তথ্য জেনেছি।

১৭ 'The Autobiography of an unknown Indian' নামক গ্রন্থের লেখক, মোহিতলালের প্রিয় ছাত্র শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য। পৃঃ ২৮৯

১৮ 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যার সম্পাদকীয় অংশে উদ্ধৃত মন্তব্য।

১৯ 'ভারতী'তে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের মন্তব্য। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৪র্থ খণ্ড) এ উদ্ধৃত।

২০ ১৩৫৯ সালের ভাদ্রসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে 'সত্যসুন্দর মোহিতলাল' প্রবন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উদ্ধৃত পত্র।

২১ সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থ (প্রথম সং ১৩৬১)

২২ ১৩৩৪ সালে মাঘ সংখ্যার 'কালি কলম'এ কবিতাটি বের হয়। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ,—

'এতদিনের আনাগোনা
এতদিনের জানাশোনা
আজকে গেল চুকে'।

২৩ শনিবারের চিঠি ১৩৩১, পঞ্চবিংশ সংখ্যা ২৫শে মাঘ 'দুইদিক' গল্প, সজনীকান্ত দাস।

২৪ ১৩৫৯ ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে—পৃথ্বীশ নিয়োগীর 'আচার্য্য মোহিতলাল' প্রবন্ধ।

২৫ 'বঙ্গদর্শন'-এর ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় 'সারস্বত সম্মেলন' প্রবন্ধে মোহিতলাল।

২৬ ঐ ১৩৫৫ সালের বৈশাখে দশম সংখ্যায় 'রবীন্দ্র জন্মোৎসবে' প্রবন্ধে মোহিতলাল।

২৭ ১৩৫৯ ভাদ্রসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশ।

২৮ ১৩৫৯ ভাদ্রসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সত্যসুন্দর মোহিতলাল' প্রবন্ধে উদ্ধৃত পত্র।

২৯ ১৩৫৯ ভাদ্রসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শিবদাস চক্রবর্তীর 'স্মৃতিপূজা' প্রবন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য।

৩০ ১৩৫১ ভাদ্রসংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের কথিত মন্তব্য।

৩১ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারভাঙ্গা হলে আয়োজিত মোহিতলালের স্মৃতিসভায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্য-আলোচনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মোহিতলালের সংক্ষিপ্ত কবিজীবনী, তাঁর অব্যবহিত পূর্বগামী ও সমকালীন কাব্যধারা এবং যুগপ্রবৃত্তির কথা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর কাব্যপ্রবাহ-অনুসরণ ও সেই সঙ্গে কবিমানসের গতিপ্রকৃতি-নিরীক্ষণ। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "দেবেন্দ্রমঙ্গল" কবি মোহিত-লালের প্রথম কাব্য পুস্তিকা। এরপর 'স্বপনপসারী' 'বিস্মরণী' 'স্মরগরল' 'হেমন্ত-গোধূলি' 'রূপকথা' ও 'ছন্দ-চতুর্দশী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়।' 'ছন্দ-চতুর্দশী' কবির শেষ কাব্যগ্রন্থ হলেও এর অন্তর্গত সনেটগুলি বহুপূর্বে লিখিত এবং তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কবির মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে 'ছন্দ-চতুর্দশী'র প্রকাশ এবং কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনকে গ্রন্থটি উৎসর্গিত। ১৩৫২ সালের পৌষমাসে তাঁর কিশোরকাব্য 'রূপকথা' প্রকাশিত হয়। এতে মোট পনেরটি কবিতা আছে। ১৩৩৬ সাল থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে এর অধিকাংশ কবিতা লিখিত ও প্রকাশিত। পুরাতন এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত ক'রে এবং তার সঙ্গে আরও দু'একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ যুক্ত ক'রে মোহিতলাল 'রূপকথা' অনেক পরে প্রকাশিত করেন। এ দু'খানি কাব্যের কবিতাগুলির রচনা কালের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে গ্রন্থপ্রকাশকাল কবিমানস-উপলব্ধির সহায়ক নয়। মোটকথা 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল' থেকে 'হেমন্ত-গোধূলি' পর্যন্ত কালসীমায় মোহিতলালের কাব্যধারার বিবর্তনই আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচিতব্য বিষয়। কিন্তু 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'এর পূর্বেও অল্পবয়সে কবি বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা লিখেছিলেন। সেগুলির অধিকাংশই ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও পূর্বে 'জাহ্নবী' ও 'জন্মভূমি' পত্রিকায় তাঁর দু'একটি অপরিণত রচনার সাক্ষাৎ মেলে। এই সমস্ত কবিতা পরবর্তীকালে মোহিত-লালের কোনো কাব্যগ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট হয় নি।

কবির কাব্যধারার আলোচনায় আমরা ঐ গ্রন্থবহির্ভূত ও অপরিণত কাঁচা হাতের লেখাগুলিকে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করেছি। আলোচনায়

সুবিধার জন্তে মোহিতলালের কাব্যধারাকে এই কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করা গেছে।

(ক) উন্মেষপর্ব: গ্রন্থবহির্ভূত 'স্বপনপসারী'র পূর্ববর্তী কবিতাসমূহ ও 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'।
(খ) বিকাশপর্ব: 'স্বপনপসারী'।
(গ) সমৃদ্ধিপর্ব: 'বিস্মরণী' ও 'রূপকথা'।
(ঘ) পরিণতিপর্ব: 'স্মরগরল' ও 'হেমন্তগোধূলি'।

উন্মেষপর্ব

১৩১৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রিকায় মোহিতলালের 'জীবন ও মৃত্যু' নামক দু'টি চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি বের হয়। কবির বয়স তখন উনিশ এবং তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৩১৫ সালে বি. এ. পাস করার পর অর্থাভাবে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয় এবং এই সময় সম্পাদক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে তিনি 'মানসী' পত্রিকায় লেখবার সুযোগ পান। ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত মোহিতলাল এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এইকালের কবিতাগুলির আলোচনা করার পূর্বে কবির ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথমটি ১৩১৩ সালের ২৫শে বৈশাখ শ্রীমতী তরুলতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ এবং দাম্পত্যজীবনে তাঁর অপরিমেয় সুখ ও শান্তিলাভ। দ্বিতীয়টি গুরুতর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্তে তাঁর বহু-ঈপ্সিত স্নাতকোত্তর শিক্ষার বেদনাদায়ক অবসান ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব-গ্রহণ। আর তৃতীয়টি এইকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সীমাহীন শ্রদ্ধা-ভক্তি। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি কবির একালের লিখিত কবিতাগুলিতে গভীরভাবে ছায়াবিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আর্থিক দুর্গতি শুধু একালেই নয় পরবর্তীকালে আরও কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও কবিকে কিছুমাত্র যে হতাশ করে নি—তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১] ঐ দুটি ঘটনার মধ্যেও আবার রবীন্দ্রপ্রভাবই এ সময়ে তাঁর চিত্তে সর্বাপেক্ষা বেশী। কবির ব্যক্তিগত দাম্পত্যজীবনের সুখ ও আনন্দ গৌণভাবে তাঁর একালের কবিতাগুলিতে প্রসন্নতার সুর জাগ্রত করেছে।

মোহিতলালের প্রকাশিত সর্বপ্রথম[২] কবিতাদ্বয় মৃত্যু ও জীবনবিষয়ক। কবিতারচনার একেবারে ঊষালগ্নেই জীবন ও মৃত্যুর কথা কবির কাব্যের

উপাদান হয়েছে। পরবর্তীকালে দেখা যাবে এই দু'টি বিষয়ের ভাবনা ও ধ্যান—এই দুয়ের সুগম্ভীর রস ও রূপ নানাভাবে তাঁর কাব্যে উচ্ছ্রিত হয়েছে। কবিতা দু'টিকে ঠিক খাঁটি সনেট বলা চলে না। আদি পেত্রার্কীয় সনেটের প্রথম আট পঙ্‌ক্তিতে ভাবের যে উপস্থাপনা এবং পরবর্তী ষটকে যে তার বিস্তৃতি—এখানে তার একান্তই অভাব। মিলবিন্যাসেও তাঁর অপটু হস্তের দৌর্বল্যলক্ষণ সূচিত। চতুর্দশ অক্ষরে প্রবহমান রবীন্দ্রীয় সমিল পয়ারের সঙ্গেই এদের সাদৃশ্য বেশী। 'জীবন' কবিতায় কবি জীবনের মহান্ আবির্ভাবকে 'ঘনপত্রাবলী'-আচ্ছাদিত অন্ধকার কুটীরদ্বারে অমৃতসিঞ্চিত প্রভাত-আলোর উদয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ক্ষণিক জীবনের সুর ও ছন্দকে অনন্ত-জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন—"জগতের অন্তঃপুরে কোথায় মরণ?"

'মৃত্যু' কবিতায় মৃত্যুকে রবীন্দ্রীয়সুরে 'প্রিয়' 'সখা' প্রভৃতি নামে তিনি সম্বোধন করেছেন। সখারূপী মৃত্যু কবিকে জীবনান্তে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে তাঁর মন সংশয়াচ্ছন্ন—

"সে কি অন্ধকার রজনী-বন্ধন?
অথবা আলোক মাঝে চির-জাগরণ"? (মৃত্যু)

চৈতালিতে ১৩০৩ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'মৃত্যুমাধুরী' সনেটটির সঙ্গে মোহিতলালের এই 'মৃত্যু' কবিতাটির এবং রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত সঙ্গীতে'র অন্তর্গত 'অনন্তজীবন' কবিতাটির সঙ্গে 'জীবন' কবিতাটির কিছুটা ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা করা কঠিন নয়। আর কবিতাদ্বয়ের কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে যে উপমা-অলংকার প্রযুক্ত, তাতে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর অনুরূপ অলংকারের অক্ষম অনুকরণের কথা কথা মনে আসে।

"হেমন্তের মৌনস্নিগ্ধ সায়াহ্ন-ছায়ায়
হিম-অবসাদ যথা নেমে আসে ধীরে—
তেমনি তুমিও প্রিয় আসিবে কি হায়,
জীবনের বেলাশেষে?" (মৃত্যু)

অতঃপর 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের কবিতাবলীর আলোচনা। প্রথমেই 'সুন্দর' শীর্ষক কবিতাটিতে লক্ষ্য করা যায় যে প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে রবীন্দ্রীয় পন্থায়[৩] কবির চিত্তে সুন্দরতৃষ্ণার জাগরণ ঘটছে। বিশাল প্রকৃতির বুকে কোন্ এক অজানা-সুন্দরের আভাস ক্ষণে ক্ষণে কবিচিত্তকে বিহ্বল করছে। প্রভাতকুসুমে তাঁর হাসি, মৃদুমন্দ সমীরণে তাঁর কেশসুরভি, 'দিবাশেষে গগন-কিনারে' তাঁর কেশদাম, 'নিদাঘ-সায়াহ্নে নবমেঘ-জলভারে'

তাঁর অশ্রুসিক্তনয়নের অস্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে। প্রকৃতির বর্ণে-গন্ধে এই সৌন্দর্যাভাসের অন্তরালে কবি "মোহন-কান্তি শিব-সুন্দর'কেই প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু ঐ আভাসের মধ্যে দিয়ে যে তৃষ্ণা কবির কণ্ঠকে তৃষাতুর ও ওষ্ঠকে বিশুষ্ক ক'রে তুলছে, তাতে তাঁর তৃপ্তি কোথায়? বিশ্বরূপের নির্বিশেষ সৌন্দর্যকে বিশেষের আধারে নয়নের সম্মুখে কবি প্রত্যক্ষ করতে চান।

"তোমায় ও বিশ্বরূপ বিশ্বের সকল মাঝে নির্বিশেষ নাথ,
আমার নয়ন 'পরে জাগিবেনা কোনদিন—সে পুণ্য প্রভাত?" (সুন্দর)

লক্ষ্য করা উচিত 'মৃত্যু' ও 'সুন্দর' এই দুই কবিতায় যে দুটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা কবিচিত্তের কোনোরূপ ভাবনাসঞ্জাত নয়। তরুণ কবির নিরতিশয় প্রসন্নতা ও বিস্ময়জনিত কৌতূহল মাত্র।

'নির্মাল্য' কবিতা তাঁর দেবভক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দেবতার চরণতলে পুষ্পরূপে তিনি নিজেকে নিবেদন করতে চান। কবির কামনা—ধূপের ধোঁয়া আর শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে দেবতার রাঙা চরণতলে তাঁর মর্ম-গোলাপটি উৎসর্গিত হোক।

'তন্দ্রাতুর' কবিতায় দেবতার মন্দিরসোপানে তন্দ্রাচ্ছন্ন কবি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা অভিনব। চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে সারারাত্রি দেবমন্দির-সোপানে জাগরণের পর ভোরের দিকে 'আধজাগরণে আধেক স্বপনে'র মধ্যে কবির মনে হল যে তিনি কোনো এক রসাতল-গৃহের সন্নিকটবর্তী হচ্ছেন। দেবতার পরিবর্তে মন্দির মধ্যে তিনি বিকটাকৃতি প্রেতের দল ও তার উপরে বৃহৎ কৃষ্ণসর্পকে প্রলম্বিত দেখলেন।

স্বপ্নঘোরে মন্দিরবাহিরের দিকে চেয়ে তাঁর নতুন এক উপলব্ধি হল—

"মনে হয় যেন মন্দির নয়, এ কোন্ প্রমোদশালা;
বসন-ভূষণ উলসিছে হেথা উজল দীপের মালা।
ধরণী ঘুরিছে মাথাটি টলিছে লালসার কলরোল,
বিবশ পরাণ ডুবিয়া গিয়াছে, মদিরা দিতেছে দোল।" (তন্দ্রাতুর)

বস্তুত 'নির্মাল্য' কবিতায় যে একনিষ্ঠ ভক্তের পরিচয় ফুটে উঠেছিল, এ কবিতায় সেই ভক্তচিত্ত মন্দিরবাহিরে যৌবনবিলাস ও লালসার কলরোলে ক্ষুব্ধ হয়েছে। আর তারই ফলস্বরূপ স্বপ্নে বিভীষিকাদর্শন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর দেবমন্দিরের বাইরে লালসা ও কামনাপঙ্কিল চিত্রের সঙ্গে ভিতরের পবিত্র দেবতার অবস্থান যে তাদের দেহ-আত্মার রূপক, উপনিষদকথিত দুই পাখি-তত্ত্বের প্রকাশ—এ বোধ তরুণ কবির এখনও হয় নি বলে তিনি অস্বস্তিবোধ

ক'রেছেন। কিন্তু সে যাই হোক, কবির স্বপ্ন দেখার এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

'সূর্যাস্ত' কবিতায় তপনবধূ দিবার প্রতিদ্বন্দ্বিনী সন্ধ্যাকে আলুলায়িত-কুন্তলা শ্লথতনু অভিসারিকার বেশে সজ্জিত ক'রে মোহিতলাল মানিনী দিবা-বধূর একটি সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানবজগতে বধূবরের অতিপরিচিত মানভঞ্জনের বিষয়টিকে প্রাকৃতিক জগতে আরোপিত ক'রে তিন চমৎকার কাব্যরস সৃষ্টি করেছেন। পূর্বোক্ত 'সুন্দর' কবিতায় কবির সুন্দরপিপাসা এ-কবিতায় আরেকভাবে মিটেছে। কবির প্রথম কবিতায় জীবনমৃত্যুর যে-প্রসঙ্গ একদা উত্থিত হয়েছিল, তিন বৎসর পরে 'ধূমকেতু' কবিতায় পুনরায় তা আরও কিঞ্চিৎ গভীরতার সঙ্গে দেখা দিয়েছে। সমিল প্রবহমান পয়ারে ধূমকেতুর আত্মকাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন। জীবনের সুখ সম্পদ ও আনন্দের উৎসববাঁশরী নিত্য বেজে চলেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'নাহি শান্তি, নাহি প্রেম নাহি অবসর মিলনের।' দুরতিক্রম্য নিয়তির মতো জীবনের এই অভিশাপ থেকে মানুষের মুক্তি কোথায়? মানবজীবনের এই দুর্গ্রহ নিয়তিরই প্রতীক হল কবির ধূমকেতু।

'কবিকাহিনী'তে কবির প্রকৃতি-আশ্রয়ী সৌন্দর্যানুভূতির একটি অস্পষ্ট চিত্র আছে। 'নিশিশেষে ধূলিপথে' চলতে চলতে একদা বসন্ত প্রাতে অচেনা আলোকে কোন্ এক অপরিচিতার 'দুটি চোখ' মাধবীবিতানে কবি দেখেছিলেন। অশোক-পুষ্পের হাসি আর ঝরাবকুলের কান্নায় কবির প্রাণে হাসি আর দীর্ঘশ্বাস জেগে উঠল। 'চূত-মঞ্জরীর মদে' সিক্তকণ্ঠ কোকিলের গান ও কামিনীকুসুমের চুম্বন, স্পৃষ্ট বায়ুর তান তাঁকে বিহ্বল করল—বাসন্তীবাসনার রঙে সমস্ত ভুবন রঞ্জিত হল—কবি বুঝলেন তাঁর দুরন্ত যৌবন জাগ্রত হয়েছে। পুলকশিহরিত কবি অপরিচিতার দুই কর্ণমূলে দুটি চাঁপাফুল গেঁথে দিয়ে অকারণে গান গেয়ে উঠলেন। বাসন্তী প্রকৃতি কবিকল্পনায় যে আগুন জেলে দিয়েছিল গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তা স্তিমিত হয় নি—শারদ-প্রকৃতি তাঁকে বসন্তের গান ভুলিয়ে দিয়ে আবার নতুনভাবে উজ্জীবিত করল। শারদসাগরের নীলালোকে তিনি শায়িত বিষ্ণুমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন। কিন্তু এরপরেই হেমন্ত ও শীতঋতুর কুহেলিকা-জালের কথা স্মরণ ক'রে তিনি কিছুটা বিষণ্ণ হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই দুই ঋতুতে তাঁর কাল্পনিক 'সমাধি-শয়ন'কালে কি কোনো পাখি এসে গান ধরবে? তখনো কি গোলাপফুল ফুটবে?

একদিকে বসন্তপ্রকৃতি কবির চিত্তে জাগিয়েছে অনির্দেশ্য-প্রেম আর

অন্তদিকে শরৎ প্রকৃতি সেই অনির্দেশ্য প্রেমকে ক্ষীরোদসাগরশায়ী বিষ্ণু-লক্ষ্মীর নির্দেশ্য প্রেমের ধ্যানে কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু মূলত এই প্রেম প্রকৃতি-আশ্রিত।

'আলোজ্বালা' কবিতায় একটি জ্বলন্ত মাটির প্রদীপকে লক্ষ্য ক'রে কবি দুই বিপরীত দিক থেকে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটুখানি মাটির প্রদীপকে সারারাত্রি ক্ষীণভাবে জ্বালিয়ে রাখার কোনো অর্থই তিনি খুঁজে পান নি প্রথম স্তবকে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকে তিনি সেই প্রদীপকে নিভে যাওয়ার আগে জ্বলার জ্বালা উপভোগের জন্তে 'বারেক' জ্বলতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এ আর কিছুই নয়—একই বস্তুকে উপজীব্য ক'রে দুই দিক থেকে বক্তব্যকে কাব্যরূপ দান করা যায় কিনা তারই এক অপটু হস্তের পরীক্ষা।

এই পর্যন্ত আলোচিত কবিতাগুলি ভাব ও ভাষায় রবীন্দ্রকাব্যের পার্শ্বে যে নিতান্তই ম্লান ও মৌলিকতায় অনুজ্জ্বল—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তৎসত্ত্বেও এগুলির মধ্য দিয়ে উদীয়মান কবির কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে কবির চিত্তে সুন্দর-তৃষ্ণার জাগরণ, দ্বিতীয়ত বিশ্বসৌন্দর্য যে-সৌন্দর্যস্রষ্টার প্রতিবিম্ব তাঁর প্রতি কবির সুগভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তৃতীয়ত পরিচিত মানবসংসারের রূপকে কবির নিসর্গসৌন্দর্যোপভোগ-প্রবণতা। চতুর্থত মানবজীবন, মানবভাগ্য ও মৃত্যু সম্পর্কে কবির সচেতনতা। আর পঞ্চমত কবির স্বপ্নদেখার প্রবণতা। প্রকৃতি-আশ্রয়ে সৌন্দর্যচেতনার উদ্বোধন কিংবা দেবতাকে 'প্রভু' 'নাথ' 'সখা' প্রভৃতি সম্বোধন ও আত্মনিবেদনের সুরটি কবি রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা' ও নৈবেদ্য'এর কবিতাগুলিকে অবশ্যই স্মরণে আনে। কিন্তু মোহিতলালের পরবর্তী কাব্যপ্রবাহ অনুসরণ করলে আমরা দেখব যে উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বিতীয়টি ছাড়া বাকিগুলি সর্বত্র লক্ষ্যগোচর ও ক্রমশ উদ্বর্তিত। দ্বিতীয়টিকে লুপ্তের পরিবর্তে বলা চলে অন্তর্লীন। এইজন্য এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে আমরা তাঁর কাব্যের কয়েকটি মূল ভাবগ্রন্থিরূপেই মনে করেছি। আর আলোচিত কবিতাগুলি এই কারণেই 'উন্মেষপর্বে'র লক্ষণাক্রান্ত।

অতঃপর ১৩১৯ সালে প্রকাশিত মোহিতলালের 'দেবেন্দ্র-মঙ্গল'[৪] পুস্তিকা। চতুর্দশপদী মোট ১৬টি কবিতা এতে সন্নিবিষ্ট। বিভিন্ন কবিতায় কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের উদ্দেশে কবির প্রশস্তি। দেবেন্দ্রনাথ কবির নিকট আত্মীয়। কিন্তু এই আত্মীয়তার সূত্রেই শুধু তিনি তাঁর প্রশস্তি রচনা করেছেন, একথা

ততখানি সত্য নয়, যতখানি সত্য দেবেন্দ্রনাথের রূপতান্ত্রিকতার প্রতি কবির আন্তরিক আকর্ষণ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"সার্থক সাধনা তব, হে কবি প্রবীণ,
রূপপূজা-পুরোহিত তুমি মহাব্রতী!
চপল করিল মোরে তব স্বর্ণবীণ
তাই দেব, করিলাম তোমার আরতি!" (১৫ নং)

দেবেন্দ্রনাথের রূপরসস্নিগ্ধ কবিতাপাঠে বিশেষত তাঁর সনেট রচনায় নৈপুণ্যে মুগ্ধ তরুণ কবি মোহিতলাল 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের সকল সনেটেই আদি পেত্রার্কীয় সনেটলক্ষণ না থাকলেও আঙ্গিকের দিক থেকে অষ্টক ও ষটক বিভাগগুলি তাঁর ত্রুটিহীন এবং বৈচিত্র্যযুক্ত সনেটরূপে বাঙলাসাহিত্যে সেগুলির বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু মোহিতলালের এই চতুর্দশপদীগুলিতে সনেটের অধিকাংশ লক্ষণই অনুপস্থিত। সনেটের কঠিন বন্ধন বা নিয়মকানুন সম্পর্কে এখনও তিনি ঠিক মনোযোগী হতে পারেন নি। তথাপি চতুর্দশ অক্ষরে একটিমাত্র ভাবকে সংহতিদানের যে-প্রয়াস কবিতাগুলিতে আছে, তা প্রশংসনীয়। 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'এর ৫ ও ১৫নং চতুর্দশপদী দুটি অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত। পরে এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা তাঁর সনেটের আঙ্গিকবিশ্লেষণ বিস্তৃতভাবেই করেছি। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে অতিপরিচিত বহু-বিচিত্র বিষয় ও পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট সুখদুঃখের কথা নানাভাবে স্থানলাভ করেছে। এদের মধ্যে যে রূপ, যে রস ও যে সৌন্দর্য উদ্বেলিত, দেবেন্দ্রনাথ তা ভালভাবেই আস্বাদন করেছেন। রূপ-পূজারী কবির এই প্রীতিসৌন্দর্যের দিকটি কবি মোহিতলালকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

কোথাও অশোকতরুতলে দীপহস্তা কোনো এক বিবাহিতা শ্যামাঙ্গিনী বাঙালী বালিকার রূপসৌন্দর্য, (৫নং) কোথাও বিবাহরজনীতে নবোঢ়ার লাজরক্তবদনের ও নিমীল নয়নের মাধুর্য (৬নং) কোথাও যুবতী জননী ও ছোট্টশিশুর সম্মিলিত চিত্রের গরিমা (৯ নং) কোথাও বঙ্গের বিধবা-অঙ্গনাদের বুকের ব্যথা (৭নং) কোথাও সন্তানের বিদেশযাত্রায় মায়ের অশ্রুসিক্ত নয়নের কারুণ্য, (৮নং)—দেবেন্দ্র-কাব্যে কিরূপ ছায়া ফেলেছে তা মোহিতলাল লক্ষ্য করেছেন। আবার বাঙলাদেশের বিচিত্রবর্ণের পাখি—বুলবুলি, মদনা, চন্দনা, টিয়া, নুরী শ্যামা, বনসারিকা, কোকিল, দোয়েল, কোয়েল (৩নং) বিভিন্নবর্ণের ফুল—সেঁউতি, 'মালতী, মল্লিকা, বকুল,

কৃষ্ণচূড়া, চাঁপা, ডালিয়া, শিরীষ, শিউলী, কনকগাঁদা, দোপাটি, কাঞ্চন, লাভেণ্ডার (১২নং) হরেকরকম ফল—পনস, আম, আঙুর, আনারস, লিচু (১০নং)—দেবেন্দ্রকাব্যকে কি অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছে, তাও মোহিতলাল স্মরণ করেছেন। শুধু কি তাই? ভয়ত্রস্ত শশকের চকিত পলায়ন, আখের ক্ষেতে ক্রৌঞ্চীর বিলাপ, উদাসসুরে কাঠ্‌ঠোকরার ডাক, পিপীলিকার ব্যূহ রচনা ক'রে যাত্রা, ঘরের চালে শান্ত গিরগিটির অবস্থান, মাছরাঙা ও পানকৌড়ির জলক্রীড়া, দীর্ঘপুচ্ছ কাঠবেড়ালীর লম্ফ (১১ নং)—এ সমস্তে তন্ময় রূপতান্ত্রিক কবি দেবেন্দ্রনাথকে স্মরণ ক'রে তিনি প্রাণের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। আবার এই রূপরসমুগ্ধ বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন কবি দেবেন্দ্রনাথ 'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনায়' 'কবিতা কালিন্দীতীরে' 'গোপী-প্রেমপ্রীতি কল্পনায়' যে নব বৃন্দাবন রচনা করেছেন (১৩ ও ১৪ নং) সে চিত্রের রসাস্বাদনে কবি মোহিতলাল কৃতার্থ। পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতে কবির যে রূপ ও সৌন্দর্যপিপাসা জাগ্রত হয়েছিল, এখানেও সেই পিপাসা দেবেন্দ্র-কাব্যমাধুরী আস্বাদনে আরেকভাবে পরিতৃপ্ত হয়েছে। 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'এ মূলত দেবেন্দ্র-প্রভাবই লক্ষণীয়। অবশ্য ভাষায় কোথাও কোথাও মধুসূদনের মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রভাব[৫]ও দুর্লক্ষ্য নয়। প্রথমটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই দ্বিতীয় প্রভাবের বিষয়টি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হচ্ছে।

। দেবেন্দ্রমঙ্গল ।	। মেঘনাদবধকাব্য ।
(ক) "মুকুতারতনে দ্যুতিময় কণ্ঠহার ; কটিতটে বাজে মুখর কনক-কাঞ্চী, চারু চন্দ্রাননে অলোক-সম্ভবা বিভা ;" (১নং)	(ক) "ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়নে। সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী ঢুলায়, মৃণাল-ভুজ আনন্দে আন্দোলি চন্দ্রাননা।" (১ম সর্গ, ৪৬-৫০)
(খ) "বিষ্ণু ধ্যানে মগ্ন সেথা স্বরীশ্বরী, কেশব- ভামিনী" (২নং)	(খ) "অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে ," (৫ম সর্গ ৬)
(গ) "হরি-বিরহিণী ভাসে নয়ন- আসারে।" (১৪ নং)	(গ) "ভাসে শিলা নিবে অগ্নি আসার বরষে !" (৫ম-৫০০)
(ঘ) "সেঁউতি, মালতী, যত মল্লিকার আলি,"—(১২)	(ঘ) "মালতী সেঁউতি জাতি পারিজাত আদি মন্দ-সমীরণ প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে।" (২য় সর্গ, ৪৪-৪৫)

(ঙ) "সীমন্তে সিন্দুর তার জল্ জল্ জলে।" (৫ নং)	(ঙ) "সীমন্তে; সিন্দুর বিন্দু শোভিল ললাটে; (৪র্থ সর্গ ৮৪)
(চ) কুঞ্জে তব, বর্হ তুলি', নাচিছে শিখিনী সখী। (৩নং)	(চ) শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী নাচিত দুয়ারে মোর! (৪র্থ সর্গ ১৩৮-৪৯)
(১) বঙ্গ-কবি সভামাঝে, হে দেবেন্দ্র তুমি দেবেন্দ্র বাসব! (১ নং)	(ছ) "দেবেন্দ্র বাসরে স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।" (২য় সর্গ ২৪৮-৫০)

মোহিতলালের উন্মেষকালের কবিপ্রতিভার পরিচয় এই পর্যন্ত। ঠিক এই কালেই 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিতলালের 'তুমি'[৬] শীর্ষক সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধটিতেও তাঁর সুন্দর তৃষ্ণাই ব্যঞ্জিত। কল্প-জগতের চিরকালের সেই অধরাকে আশ্রয় ক'রে কবিচিত্তের আত্যন্তিক দীর্ঘশ্বাসই এতে ঘনীভূত। এতেও রবীন্দ্রনাথের নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যার্তির প্রভাব স্পষ্ট। আবার 'বিজয়িনী'[৭] নামক প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার সমালোচনাচ্ছলে ভক্ত মোহিতলালের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মোহিত-প্রতিভার উন্মেষকালে তাঁর ওপর রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। তৎসত্ত্বেও কবির পরবর্তী কাব্যজীবনের কয়েকটি মূল ভাবগ্রন্থির সাক্ষাৎ এইকালেই পাওয়া যাচ্ছে। আর এই কারণে এই পর্যন্ত তাঁর কাব্যধারাকে আমরা উন্মেষ-পর্বের অন্তর্গত করেছি। এই পর্বে কবির উপর প্রভাবের প্রসঙ্গটি কিছু আশ্চর্যের নয়। স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা স্বকীয় পথের নিশানা না পেয়ে যুগরীতি বা যুগশ্রেষ্ঠ কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রেই থাকে। ইংলণ্ডের মধ্যযুগের কবি চসার, সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অপরিণত প্রাথমিক যুগের রচনায় প্রচলিত কাব্যরীতির অনুসরণ করেছিলেন।

বিকাশপর্ব : 'স্বপনপসারী'

'স্বপনপসারী' কবি মোহিতলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' গ্রন্থের মর্যাদা না পেলেও পুস্তিকারূপে এটি বাগ্দেবীর চরণে কবির প্রথম অর্ঘ্য। 'স্বপনপসারী' ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শ্রীপঞ্চমীর দিনে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'তোমাকে' খুব সম্ভবত কবি-জায়াকে উৎসর্গিত। এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি নিজেই লিখেছেন, "প্রথম বয়সের রচনা ইহাতে একটিও নাই, গত দশ বৎসরে যাহা লিখিয়াছি তাহারই কতক বাদ দিয়া বাকি

কবিতাগুলি একত্র করিয়া দিলাম।" এই কাব্যের কবিতাসমূহ কবির তেইশ থেকে তেত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে লিখিত। এ গুলির অধিকাংশই 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'স্বপনপসারী' গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে কবি তিনবৎসর সরকারী চাকরি করেন। ১৩২১ সালে কানুনগোর পদ লাভ ক'রে তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই চাকরিজীবন তাঁর অভিজ্ঞতা ভাণ্ডারে এক মূল্যবান সম্পদ।[৮] মোহিতলাল নিজে এই কালের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার কিয়দংশ উদ্ধারযোগ্য।

"জীবনের সহিত রূঢ় ও কঠিন সংঘর্ষ, বাস্তবের অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির ভীষণ মধুর মূর্তির সহিত সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমি এই কয় বৎসরেই লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতার নাগরিক সভ্যজীবন হইতে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়া যেন জন্মান্তরের মতই বোধ হইয়াছিল। বনে জঙ্গলে মাঠে ও নদীর চরে অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। তাঁবুতেই বাস করিতাম, কোনও দিন বা বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ হইতে পাবনা বাজিতপুর পর্যন্ত যে বিশাল চর, একবার সেখানেই সারা বৎসর কাটাইয়া ছিলাম। জলপাইগুড়িতে অবস্থান কালে একবার তিস্তার গর্ভে যেমন প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, তেমনই এই বৃক্ষচ্ছায়াহীন বালুপ্রান্তরে অগ্নিবর্ষী আকাশের নীচে দিনের পর দিন কাটাইয়াছি এবং দুইবার ভীষণ ঝড়ে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। এক কথায় বিধিবদ্ধ সমাজজীবনের বাহিরে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যে ভাবে পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃতির যে-মূর্তি দেখিয়াছিলাম তাহাতে আমার প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির সঞ্চার হইয়াছিল—তেমন শিক্ষা আমার আর কিছুতেই হয় নাই।"[৯]

এই অভিজ্ঞতা কবির কাব্যজীবনে স্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে—বিশেষত 'স্বপনপসারী'রও কিছু সংখ্যক কবিতায় এ-প্রভাব প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই চাকরি-জীবন কলকাতা থেকে বহুদূরে হওয়ায় কবির সাহিত্যিকজীবন নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছিল। আর এই জন্য কবি ১৩২৪ সালে চাকরিজীবন ত্যাগ ক'রে পুনরায় কলকাতায় তালতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করলেন। ১৩২৫ সালে মোহিতলাল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 'ভারতী'র আসরে যোগদান করেন। 'ভারতী'তে যুক্ত থাকাকালীন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। বালুচরজীবনে বাসকালীনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হয়েছিল। এই

পরিচয়ের ফলে 'স্বপনপসারী'র বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'স্বপনপসারী' কাব্যে কবি মোহিতলালের এই কয়েকটি মূল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

(ক) রোমান্টিক রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা

(খ) বলিষ্ঠ-দুরন্ত জীবনপিপাসা ও মর্ত্যপ্রীতি

(গ) ভোগকামনা

(ঘ) নিসর্গচেতনা

(ঙ) ব্যক্তিপ্রশস্তি

(চ) আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস

(ছ) মৃত্যুভাবনা

'উন্মেষপর্বে' কবির রূপ ও সৌন্দর্যপিপাসা জীবন ও মৃত্যুচেতনা, প্রকৃতি-প্রীতি এবং আস্তিক্যবোধের পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই কাব্যে সেই প্রবণতাগুলির সঙ্গে আরও কয়েকটি নূতন প্রবণতা যুক্ত হয়েছে। জগৎ ও জীবনের বহু বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তিনি এই কাব্যে সচেতন হয়েছেন। পৃথকভাবে এই সমস্ত প্রবণতা বিশ্লেষণ ক'রে কবির কবিমানসের স্বরূপ-উদ্ঘাটন আবশ্যক।

রোমান্টিক রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা

'স্বপনপসারী'র কবি মোহিতলালের এই প্রবণতাটি ভালভাবে উপলব্ধির পূর্বে ২৪ বৎসর বয়সে লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধের কতকাংশ প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করছি।

তিনি লিখছেন—"আমি যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি।……আমার অঙ্গে অঙ্গে আলোক পুলক জাগিয়া উঠিতেছে। কি চম্পক-স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ।… আমার ললাটে কে রাজটীকা পরাইয়াছে, এই নবাবিষ্কৃত রাজ্যের আমিই ভূপতি। জগৎ মধুময়, জীবন অনন্ত, তৃণস্তরে আনন্দের স্বর্ণজ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছে। আমি ফুল তুলিব, উহারা বড় সুন্দর, মালা গাঁথিয়া গলায় পরিব, মস্তকের কেশগুচ্ছে চূড়া বাঁধিব।…রাখাল গোচারণে চলিয়াছে—কি গান গাহিতেছে? আমি শুনিব, আমি উহাকে ভালবাসিব। গাভীগুলির নেত্রপল্লব কি দীর্ঘ, কি সুন্দর গমনভঙ্গী,… আমি মাঠে যাইব, হরিৎ-শ্যামল শস্যশীর্ষ দুই বাহু ভরিয়া আলিঙ্গন করিব। নীলরঙের ঐ পাখীটি বুক ফুলাইয়া উড়িয়া

গেল, আমি উহাকে ধরিব।...সকলেই সুন্দর। আকাশ নীল, পৃথিবী শ্যামল, আলোক হিরণ্ময়।[১০]

জগৎ ও জীবনকে রোমান্সের রঙে অনুরঞ্জিত ক'রে স্বপ্নের রঙে রঙীন ক'রে দেখার কবিস্বভাবটি ঐ উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট। মধুময় জগৎ ও অনন্ত জীবনের বিস্ময়রসে আবিষ্ট কবির চোখের সামনে অফুরন্ত সৌন্দর্যের প্রস্রবণ। বিচিত্র খেয়াল ও উদ্ভট-রঙীন কল্পনায় তাঁর মন এখন স্বপ্ন-সঞ্চরণশীল।

আর ঠিক এই কারণেই কবি মোহিতলাল এই কাব্যে মুখ্যত স্বপনব্যাপারী। 'ভারতী'র কবি সত্যেন্দ্রনাথ ও বিশেষত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের স্বপ্নরস[১১] তাঁকে স্বপনপসারী হওয়ার পথে নিশ্চয়ই প্রেরণা দিয়ে থাকবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত এই কবির স্বপ্নের প্রতি একটি চিত্তগত আকর্ষণও ছিল। 'উন্মেষপর্বে'র কাব্যের কবির প্রকৃতিপ্রীতিসঞ্জাত সুন্দর তৃষ্ণারই এ শুধু ফলমাত্র নয়—সেই কালের 'তন্দ্রাতুর' কবিতায় তিনি স্বপ্নানুভূতিকেই ব্যক্ত করেছিলেন।

'স্বপনপসারী'[১২] শীর্ষক নাম-কবিতায় কবি কয়েকটি স্বপ্নচিত্র, খানিকটা স্বপ্নাঞ্জন, দর্পণ, অঙ্গুরীয়ক ও একখানি বাঁশি নিয়ে দ্বারে দ্বারে স্বপ্ন ফিরি করছেন। কবির স্বপ্নচিত্রগুলিতে আলো-ছায়ার অপরূপ সমাবেশ ও অস্পষ্ট ধূসর গোধূলির মায়াময় ইন্দ্রজাল। স্বপ্নপুরীর সবকথা স্পষ্ট হয় না—অস্ফুট আভাস ও সৌন্দর্যের ইন্দ্রধনুজালবয়নেই তার সার্থকতা। স্বপ্নচিত্রে যে-নারীটির কেশ-তপোবনে আঁধার, ললাটতলে নিদারুণ মনোবেদনা, অধরে স্বর্গীয় ভোগপিপাসার শিখা ও আবৃত কবরীতে জ্যোৎস্না-চিকনের গুণ্ঠন তিনি লক্ষ্য করেছেন, সে নারী তো স্বপ্নলোকবিহারিণী চির-অধরা মানসসঙ্গিনী। স্বপ্নের অঞ্জন নয়নে নিলে ঐ মনোবাসিনীকে তখন আর মিথ্যা মনে হয় না। বাস্তব সংসারে এই স্বপ্নসঙ্গিনী চির অপ্রাপনীয়া, তথাপি মনোগহনে এর নিত্য আনাগোনা। হৃদয়ের পাতে সে যে চিহ্ন রেখে যায়, তা তো মিথ্যা নয়।

> "যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে—
> মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
> তবু আঁকা আছে হৃদয়ের পাতে
> জলরেখা-রঙ্গিলা—...
> সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
> —অপরূপ সেই লীলা!' (স্বপন-পসারী)

কবির এই স্বপ্নাঞ্জন চোখে নিলে এবং মোহিনী শিলাখচিত অঙ্গুরী ধারণ করলে জোনাকির-দীপ-জ্বালা বিতানে ফুলদলের মধ্যে বিচরণশীলা পরীবালা কিংবা পাহাড়ের ধারে তারার ক্ষীণ আলোকে যেখানে রূপার নূপুর বাজিয়ে নটিনীর মতো তটিনী চলেছে সেখানে আকাশপানে-চেয়ে-থাকা কোনো এক অপরিচিতার ছবিও ফুটে উঠবে। আবার তুষারপুরীতে 'রূপেরি বাসরে চির ঘুম ঘোরে' 'যৌবন-অচেতন' গিরিবালার চিত্র, কিংবা 'ধূ ধূ ধূ সুদূর প্রান্তর পথে' অশ্বারোহী যুবার অপ্সরী-প্রিয়ার উদ্দেশ্যে অভিসার-চিত্রও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কবি স্বপনেরই পসারী—বাঁশীর পসারী নন—সেইজন্যে বাঁশীখানি তিনি কাউকে দিতে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র যিনি সংসারের বেসুরাকে বশে আনতে সক্ষম, যিনি মৃত্যু সম্পর্কে অভয়-বাণী বাঁশীতে ধ্বনিত করতে পারবেন—কবি তাঁকেই বাঁশীখানি দিয়ে স্বপ্ন ফিরির কাজ থেকে ছুটি নেবেন। বস্তুত এ বাঁশী কাউকে দেবার নয়—এ যে কবির বাঁশী। তাই তিনি অত্যন্ত দুরূহ একটি শর্তের বিনিময়ে বাঁশীদানের কথা বলেছেন। এ কবিতায় কবির স্বপ্নসঙ্গিনী-কল্পনা তাঁর অতি প্রবল সৌন্দর্যতৃষ্ণারই ফলশ্রুতি। তাঁর এই চেতনার মূলে আমরা বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা', অক্ষয়কুমার বড়ালের অবাস্তব-মনোহর অধরা, রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী', 'বিজয়িনী' বা 'লীলাসঙ্গিনী', ইংরেজ কবি শেলির 'Hymn to Intellectual Beaty'র 'সৌন্দর্যসত্তা প্রভৃতির প্রেরণা অনুমান করতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরের প্রভাব অপেক্ষা রোমান্টিক কবিদের অতিশয় স্বাভাবিক প্রবণতারূপেই একে দেখা উচিত। রোমান্টিক কবিরা অতিমাত্রায় আদর্শবাদী। বাস্তবজগতে স্বীয় আদর্শের প্রতিরূপ তাঁরা খুঁজে পান না বলে কুহেলিমণ্ডিত দূর অতীত, মায়াময় স্বপ্নজগৎ, আলো-অন্ধকারময় গোধূলিবেলা, ম্লান জ্যোৎস্নালোক, পলায়নপর ক্ষণিক অনুভূতি—প্রভৃতিকে তাঁরা আশ্রয় করেন। কবি মোহিতলালের পূর্বেজাগ্রত সৌন্দর্য ব্যাকুলতা এবং স্বপ্নাতুরতাই তাকে আলোচ্য কবিতায় স্বপন-ব্যাপারী করেছে। চিত্রে এই 'স্বপ্নসঙ্গিনী'কে 'দরশে হইবে পরশ উদয়' বললেও এখনও কবির মধ্যে এঁকে বাস্তবে পাওয়ার কামনা প্রবল হয়ে ওঠে নি।

'মুক্তি ও 'ভ্রান্তিবিলাস' কবিতা দুটিও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। মনোবাসিনীর রূপ ও সৌন্দর্য ধীরে ধীরে কবির চিত্তকে কেমন আবিষ্ট করছে, তার প্রমাণ এই দুটি কবিতায় আছে। 'মুক্তি' কবিতায় তাঁর মনে হল, যুগ যুগ ধরে ঐ মনোময়ীকে পাওয়ার জন্যে কতো অশ্রু, কতো তাপ, কতো ব্যথা এবং কতো আশা-নিরাশার দোলা। অথচ কতো সহজেই না ঐ জীবনসাথীকে

চিরতরে একাত্ম ক'রে নেওয়া সম্ভব। অশ্রুবেদনার হাত থেকে তাহলে কোন্ সহজ পথে মুক্তি ?—কবি বলেন,—

"আমি যবে তুমি হ'ব—সাধনার শেষ—
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বুদ্ধ-অবতার,
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ,
ঘুচিবে বিরহ-মোহ বৃথা অহঙ্কার।
লভিব নির্বাণ-মুক্তি ভাঙি' দীপাধার—
র'বে আলো, নাহি র'বে অনলের লেশ।" (মুক্তি)

'ভ্রান্তিবিলাস' কবিতায় তিনি বলেছেন যে বৃন্দা-কুঞ্জবনে নারীরাধাকে পৃথক ক'রে রেখে নরকৃষ্ণ নিজেও যেমন, নারীরাধাকেও তেমনই অশেষ যাতনায় মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। যুগযুগান্তর থেকে তাই নরনারীর মিলনোৎকণ্ঠা-জনিত দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার। পৃথিবীর বুকে তাই 'এত কালি, এত ধূলা এত পাপ তাপ'। কবির তাই কামনা,—

"একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে এক ভালো
—তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে।
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো—
রাধার মরণ হোক তোমার জীবনে!" (ভ্রান্তিবিলাস)

কিন্তু তাঁর এই কাল্পনিক কামনা কি বাস্তবে সম্ভব ?

এই মধুর বেদনা ও মধুর জ্বালাই তো রোমাণ্টিক কবিদের কণ্ঠে গান হয়ে বেজে উঠছে। এমন ক'রে মানসলক্ষীর সন্ধান-প্রয়াসের অবসান ঘটে না। মোহিতলালেরও তাই অন্যপথে সে-সন্ধান চলতে থাকল। অতঃপর তাই আমরা তাঁকে নিসর্গজগতের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু দেখি।

আর্দ্রশীতল শ্রাবণসন্ধ্যায় রবিবিরহিণী কেতকীপুষ্পের বিফলীকৃত যৌবনের কথা ভেবে কবি 'কেতকী' কবিতায় আক্ষপ করেছেন। কিন্তু কবিতার পঞ্চম স্তবকে দেখা গেল বাদল-তিমিরে সেই ফুলের গন্ধ তাঁর সমস্ত চেতনাকে হরণ করেছে। জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী কবি যে মানসলক্ষীকে খুঁজে ফিরছেন, তারই অভিজ্ঞান বহন করে আনল ঐ সবুজ বাকলে আবৃত কেতকী ফুল। সবুজ মলাটে-মোড়া কতকগুলি শ্লোকের মধ্য দিয়ে যেন মনোময়ী আজ কেতকী-কুসুমরূপেই তাঁর কাছে ধরা দিল—

'কেশরে-পরাগে পড়িনু সে বাণী—চুম্বনে আঘ্রাণে,
প্রাণের রাগিণী বাজিতে লাগিল বাদল রাতের গানে।' (কেতকী)

'বিদায়বাদল' 'চূতমঞ্জরী' এবং 'বসন্ত-আগমনী' প্রকৃতিপ্রীতির কবিতা হিসেবে বিচার্য হলেও এগুলির মধ্য দিয়ে কবির মানসলক্ষ্মী-সম্ভোগের বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। তাই 'বিদায়বাদল'এ মেঘকজ্জল বাদলদিনের প্রকৃতি-পরিবেশে কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীর প্রতিচ্ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। 'চূতমঞ্জরী' কবিতায় মুকুলিত মঞ্জরী দলের সঙ্গে বাসররাত্রি যাপনের জন্যে সুন্দরী পরীদলের আগমন-কল্পনা ও প্রেমিক-প্রেমিকার বাস্তব রভসলীলার চিত্রাঙ্কনের মধ্যে তাঁর মানসপ্রিয়া-সম্ভোগের উল্লাসই রূপকাশ্রিত হয়ে প্রকাশিত। সম্ভোগকামনার অধীরতায় মোহিতলাল 'বসন্ত-আগমনী'তে বসন্তের একটি মনোরম চিত্র অঙ্কন ক'রে বলেছেন,—

'মনে হ'ল, আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব-—
রঙীন এ রাতি—বাসনার বাতি যত আছে জ্বালো সব!'

(বসন্ত-আগমনী)

স্পষ্ট বোঝা যায় কবির চিত্তে রূপের তৃষ্ণা প্রবল হয়েছে। আর এই তৃষ্ণারই পরিণাম মানসলক্ষ্মীর পরিকল্পনা ও বিচিত্র পথে তাকে সম্ভোগের প্রয়াস। এই পিপাসা কিসে নিবৃত্ত হবে তা তিনি এখনও ভালভাবে জানেন না। এক একবার মনে হচ্ছে পিপাসার পানপাত্রটি যদি পূর্ণ হয়, তাহলে হয়তো তাঁর দুর্বার তৃষ্ণা মিটবে।

'ফুলের হিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা, বঁধু!
রেশমী-রঙীন পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে।'

(রূপতন্ত্র)

কিন্তু রোমান্টিক কবিদের এই তৃষ্ণা যে অগস্ত্যের। এর পূর্ণ নিবৃত্তি কোথায়? মোহিতলাল ও তাই নিসর্গরাজ্যের সৌন্দর্যমহলে তাঁর চিন্ময়ীকে না খুঁজে প্রতিদিনকার পরিচিত বাস্তব সংসারের দিকে চাইলেন। আর অনুসন্ধান নয়,—কিশোরী-বধূর সঙ্গে নিজসম্পর্কের বহুবিধ চিত্রাঙ্কন ক'রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের পন্থায় তিনি রূপ ও প্রেমপিপাসাকে মেটাতে চাইলেন। 'চোখের দেখা' 'ভাদরের বেলা' 'কিশোরী' 'শ্রাবণ-রজনী' 'চুড়ির আওয়াজ' 'পরমক্ষণ' প্রভৃতি কবিতায় আমাদের এ-কথার প্রমাণ আছে।

নিসর্গ-সংসার তো সুন্দর। কিন্তু সেখানে তাঁর ক্ষুধা মিটল কই? একস্থলে মোহিতলাল নিজে এইকালেই লিখেছেন—

"ফুলের বর্ণ সৌরভ ও পেলবতা যে আনন্দ দেয় তাহাতে চিন্তা ও কল্পনার প্রসার হয়। সে সৌন্দর্য জড়, জীবনহীন। তাই জীবনের উপর তাহার প্রভাব নাই।......কিন্তু কালো চোখের তীব্র আলোক অথবা প্রবাল-অধরের মুক্তাময় স্মিতহাস্য আসক্তিহীন উপভোগের বস্তু নহে।......যেদিন পথিপার্শ্বে, অতি তীব্র অতি মধুর হাসির শব্দে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—মূর্তিমতী বসন্ত-লক্ষ্মীর তরুণী যুগল অর্দ্ধ-সমাপ্ত বকুলের মালা হাতে লইয়া পরস্পরের সহিত হাস্য-পরিহাস করিতেছে, সেদিন বুকের মধ্যে কি বিপ্লব বাধিয়াছিল বুঝিতে পারি নাই"।[১৩] বলাবাহুল্য এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় মোহিতলালের নারী-আশ্রিত সৌন্দর্যানুরাগ এবং কিশোরী-বধূর প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টি। 'কিশোরী' কবিতায় কিশোরী রাধারাণীর একটি অতি বাস্তব মূর্তি অঙ্কন ক'রে কবি তার 'আধ-মকুলিত' রূপসৌন্দর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। 'শ্রাবণ-রজনী'তে কবির কিশোরী-বধূই তাঁর সমস্ত চিত্তকে হরণ করেছে। বাইরে দুর্যোগময়ী বর্ষারজনী আর গৃহাভ্যন্তরে কিশোরী-বধূর পার্শ্বে শায়িত কবির যে উল্লাসময় চিত্তস্পন্দন তা ভাবের দিক থেকে এমন কিছু অভিনব নয়, কিন্তু বাঙালীর গৃহকোণে বধূবরের এই সম্পর্কের মধ্যে যে একটি স্নিগ্ধ-কমনীয় মাধুর্য আছে, তারই রস খাঁটি দেবেন্দ্রীয় পন্থায় তিনি এখানে উপভোগ করতে চেয়েছেন। 'চুড়ির আওয়াজ' কবিতায় প্রিয়তমার তুচ্ছ ক্রিয়াকলাপ, চুড়ির একটুখানি রুনিঝুনি কবিকে মুগ্ধ করেছে। 'ভাদরের বেলা'য় প্রিয়তমার নীলশাড়ি, কাঁকনের রুনিঝুনি কিংবা অলস-দুপুরে বকুলের মালাগাঁথার চিত্র তাঁকে তন্ময় করেছে। 'পরমক্ষণ' এ প্রিয়তমার সঙ্গে নিবিড় আশ্লেষ-বন্ধনের উল্লাস প্রকাশিত হয়েছে। 'গৌরী-হর' মূর্তির ন্যায় পরমমিলনের মুহূর্তে কবির কাছে দেহ-আত্মার ভেদ যখন সাময়িকভাবে লুপ্ত, তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁর মনে হয়,—

> 'স্বর্গ আসে ধরায় নামি'—
> একটি বোঁটায় ফুল সে ফোটায়
> তোমার তুমি, আমার আমি!' (পরমক্ষণ)

'জন্মান্তরে' কবিতায় বধূ-বরের রূপকে একজন্মের দাম্পত্য-প্রেমকে বহু বহু বিগত জন্মের স্মৃতি-সুরভিত প্রণয়রূপে উপলব্ধি করার চেষ্টা। পরস্পর দুই চরণে অন্ত্যমিল বর্জন ক'রে দূরান্তরিত মিলযোজনার সাহায্যে প্রবহমান পয়ার ছন্দের আধারে রবীন্দ্রীয় ভাবনার অনুগত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের মহিমা কবি এখানে খ্যাপন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস,—

"প্রেম যে আত্মার আয়ু! ক্ষয় নাহি তার,
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূবর!'

(জন্মান্তরে)

'স্বপনপসারী'র অন্তর্গত রোমান্টিক রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা-সম্বলিত কবিতাগুলির আলোচনা এই পর্যন্ত। এই আলোচনায় কয়েকটি বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। মোহিতলালের কবিজীবনের 'উন্মেষ-পর্বে'ই তাঁর মধ্যে প্রকৃতি-প্রীতি থেকে রূপ ও সৌন্দর্যপিপাসার জাগরণ। এই কাব্যে সেই পিপাসা ঘনীভূত হয়ে যুগপৎ প্রকৃতি ও নারী-আশ্রিত। এই তৃষ্ণারই পরিণামী প্রতিক্রিয়ায় কবিচিত্তে মনোলোকবাসিনীর আবির্ভাব ও পরে এই অধরাকে প্রাপ্তির সন্ধানে তাঁর আকুলতা। এই অপ্রাপনীয়াকে অ-প্রাপ্তির বেদনায় কবিচিত্তে ক্ষীণ দ্বন্দ্বের আবর্ত উঠেছে। কিন্তু তরুণ কবির রোমান্সরস-লোলুপ চিত্ত কতকগুলি কাল্পনিক প্রয়াসের মাধ্যমে ঐ দ্বন্দ্বকে অনেকখানি এড়িয়ে গেছে।

মোহিতলালের কবিচিত্তে রোমান্টিক মনোধর্মের প্রবণতাসূত্রে মানসপ্রিয়ার এই অভ্যুদয় তাঁর কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরবর্তী কাব্যপ্রবাহে তাঁর কবিকল্পনা একে কেন্দ্র ক'রে নানাভাবে উৎসারিত।

বলিষ্ঠ-দুরন্ত জীবনপিপাসা ও মর্ত্যপ্রীতি

'বেদূঈন' 'নাদিরশাহের জাগরণ' 'নাদিরশাহের শেষ' 'ইরাণী' 'অঘোর-পন্থী' এই কয়েকটি কবিতা বলিষ্ঠ ও দুরন্ত জীবনপিপাসার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ-যোগ্য। আর এইজন্যে এইগুলি একই সঙ্গে আলোচ্য। 'বেদূঈন'[১৪] শীর্ষক অতিদীর্ঘ কবিতাটি মোহিতলালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। রূঢ় রুক্ষ বালুচরবাসী বেদূঈনদের মৃত্যুভয়হীন উত্তেজনা-উদ্বেল স্বাধীন যাযাবরীজীবনরস এখানে তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাদের রক্তে আগুনের প্রচণ্ড দাহ, হাতে শাণিত বর্শা ও কোমরে ধারাল তলোয়ার। হিন্দার বেটা অমৃক রাজার লোকজনের সঙ্গে আসন্নযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে এক বেদূঈনবীর তাদের এক রোমাঞ্চকর জীবনানুভূতি তুলে ধরেছে।

"'নূর' কাজ নেই! 'নার' চাই মোরা—জীবনের সার উত্তেজনা,
ফুঁসে-ওঠা শুধু জ্বল্-জ্বল্-চোখ—একদম-খাড়া সাপের ফণা!
একটি নিমেষে শেষ ক'রে দেওয়া, বোমার মতন কলিজা ফাটা!
এক চীৎকারে দম ছুটে' যাক! একলাফে শেষ রাস্তা-হাঁটা"? (বেদূঈন)

এই বেদুঈনদের বেগবান প্রতিহিংসাপরায়ণ নিঃশঙ্ক-জীবন, বালুচরবুকে সামান্যতম প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে অস্থায়িভাবে তাঁবু খাটিয়ে বাস, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, কথায় কথায় তলোয়ার-বর্শা-ছুরি-রক্তের উল্লেখ, সাকী ও শরাবের প্রসঙ্গ, এক অলৌকিক মহাশক্তি জিন্ সর্দারের প্রতি আস্থা—প্রভৃতি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও অতিশয় বাস্তব। এই অপরিচয়-জনিত বিস্ময় আদ্যন্ত কবিতাটিকে রোমান্সের গাঢ়বর্ণে রঞ্জিত করেছে। আবার এই দুঃসাহসী নির্ভীক বেদুঈনদের জীবনে সেই অগ্নিতপ্ত বালুচরেও অতিশয় সন্তর্পণে প্রেমের আবির্ভাব ঘটে। অনিন্দ্যসুন্দরী এক যুবতীকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারার বেদনা বেদুঈনবীরের স্বগতোক্তির মধ্যে করুণসুরে বেজে ওঠে—

"অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি—আওরাত নিয়ে দিলের খেলা,
বর্শার চেয়ে ভর্সা-হারানো চোট পেয়েছিনু তাহারি বেলা।
তারি মুখখানি মনে করে' আমি গান বেঁধেছিনু দিওয়ানা হ'য়ে—
তেমন ব্যথা যে পাইনি কোথাও,—ছুরি-ছোরা? সে ত' গেছেই স'য়ে!
বড় ঘুম পায়, সেই গান গেয়ে ঘুমাই খানিক ঠাণ্ডা ঘাসে—
'দারাত-জুলে'র নামে গাঁথা সেই সুরটি পরাণ ছাইয়া আসে।" (বেদুঈন)

তৎকালীন বেদুঈন জীবনাঙ্কনের যুগগত রেওয়াজ, কবির বালুচরজীবনের অভিজ্ঞতা, M. W. Jones-এর কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরেজি অনুবাদ, Desert of Arab' গ্রন্থের বহু উপাদান, ব্রাউনিংএর Dramatic Monologueএর অনুসৃতি, কবি যতীন্দ্রনাথ-সেনগুপ্তের 'বেদেনী' কবিতার অনুরূপ বাস্তবতার মধ্যেও নবরোমান্টিকতার রস-সঞ্চার-প্রয়াস—ইত্যাদি মোহিতলালের এই 'বেদুঈন' কবিতার মূলদেশে আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের বিশেষভাবে উত্তেজনাময় বলিষ্ঠ স্বাধীন পৌরুষধর্মী যাযাবরী জীবনের প্রতি কবির গভীর আকর্ষণের কথাই বুঝতে হয়। কবি স্বয়ং অন্যত্র বলেছেন,—"যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, যত দুর্দমনীয়—সেই মানুষই তত জীবন্ত, তত স্বাস্থ্যবান, যাহার আকাঙ্ক্ষা যত ক্ষুদ্র, সেই তত অসুস্থ।[১৫]

এই পৌরুষ ও শক্তির প্রশস্তিতে কবিচিত্তের আগ্রহাতিশয্যের পরিচয় 'নাদিরশাহের জাগরণ'[১৬] ও 'নাদিরশাহের শেষ' কবিতা দুটিতে লক্ষণীয়। পদ্মার বালুচরজীবনের ছাপ এই দুইটি কবিতাতেও বর্তমান। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অত্যাচারী ও নররক্তলোলুপ নাদিরশাহ একটি অতিশয়-নিন্দিত চরিত্র। তাঁর হৃদয়হীন নরমেধযজ্ঞ, কায়কোবাদের ধর্মসিংহাসননাশ, নিষ্ঠুর শিশুহত্যা—প্রভৃতি তাঁর দানবমূর্তিকেই ইতিহাসে প্রকট করেছে। নাদিরের ভারত

আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠনের ভয়াবহতা ইতিহাসখ্যাত ঘটনা। ইতিহাসে তিনি অত্যাচারের প্রতিমূর্তি হ'লেও একজন অসাধারণ রণনীতিবিশারদরূপে প্রসিদ্ধ। সেকালে পারস্য বিদেশীয় জাতি ও রাজগণের দ্বারা অধিকৃত হয়ে তার পূর্বগৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, সেই সময়ে এক অজ্ঞাত কুলে এই বীরের জন্ম। কথিত আছে যে প্রথমজীবনে নাদির ছিলেন একজন সামান্য মেষপালক। পরে তিনি নিজ শক্তিতে সমগ্র পারস্যের অধিপতি হয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছিলেন। অত্যাচারের নেশায় যেদিন তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, সেদিন তাঁর কাছে 'সাকী ও পেয়ালা' ও 'দুই চারিটি শ্লোক'এর কোনো মূল্য ছিল না। মমতাকে দুর্বলতা ভেবে 'বজ্র-বাজনা মরু-মরীচিকা'কেই সেদিন তিনি বরণীয় মনে করেছিলেন। শ্লথ-মন্থর জীবনের প্রতি সেদিন তাঁর কি ধিক্কার। সেদিন স্বদেশ গৌরবের পুনরুদ্ধার এবং বীরত্বের খ্যাতিলাভ করার আকাঙ্ক্ষা কিভাবে তাঁর চিত্তে জাগ্রত হয়েছিল তারই একটি কাল্পনিক চিত্র এ কবিতায় আছে।

"দূর করে' দাও গোলাপের মালা! পেয়ালা ভাঙিয়া দাও।
'নাদির! নাদির'! শুধু ওই-সুরে পার ত' আবার গাও।
কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই,
অধীর হয়েছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই।"

(নাদিরশাহের জাগরণ)

নিজের সংকল্প ও তা সাধনের জন্যে প্রাণের মধ্যে যে একটি অদম্য উন্মাদনা —তাই নাদিরের জাগরণ।

তারপর এই নাদিরই যখন দুরাণীর কাছে পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে, তার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কবি তাঁর মনোরাজ্যের যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইতিহাসের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব না থাকলেও এ চরিত্রের মানবিক দিকটি তাতে অপূর্বতালাভ করেছে। স্বপ্নের ঘোরে নাদিরের মনে হচ্ছে যে একটি অদৃশ্য শক্তি এতকাল তাঁর উপরে ভর করেছিল বলে তিনি ঐরূপ নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছিলেন। আজ সেই শক্তির তিরোধানে নাদিরের মনে একটি অজানা আশঙ্কা ও অনুতাপ দেখা দিয়েছে। ইরাণের সাকী ও পেয়ালার কথাই এখন তাঁর মনে পড়ছে। তাঁর চিত্ত আল্লার কাছে 'মাফ চাই' 'মাফ চাই' বলে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। কবিকল্পিত নাদিরের এই-স্বপ্নচিন্তা এ-চরিত্রকে জীবন্ত বাস্তবিকতা ও মানবিকতাদানে সাহায্য করেছে। মৃত্যুর মুহূর্তে নাদিরের পৌরুষদীপ্ত হুংকার নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার ন্যায় শেষবারের মতো জলে উঠেছে।

"আহাহা আল্লা! বহুৎ মেরেছি, মরিতেও জানি তবে!—
বিচারের কালে একথা ধরিয়া গুণা কিছু মাফ হবে?
শেষ হয়ে গেল—হাপ!—
ইরাণের ধ্বজা—ইরাণের গ্লানি—বিধাতার অভিশাপ!

(নাদিরশাহের শেষ)

নাদিরের মতো ইতিহাস-কুখ্যাত চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে কবি মানুষের ভীরুতা ও অবসাদকে কটাক্ষ করেছেন এবং দুর্জয় কামনাবলিষ্ঠ শক্তি ও পৌরুষের জয়গান গেয়েছেন।[১৭] বেদুঈনের মতো এই কবিতা দুটিতেও Dramatic monologue-এর সার্থক ব্যবহার এবং ইতিহাসের বিলীয়মান অন্ধকার কক্ষে স্থানে স্থানে কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি রোমান্টিকতার আমেজ আনয়নের সফল প্রয়াস করেছেন।

আমরা দেখলাম অতিপ্রবল জীবনরসকামনার ফলস্বরূপ কবির দূর মরু-প্রান্তরের দুর্ধর্ষ বেদুঈন-জীবন ও পারস্যসন্তান দুর্দান্ত বীর নাদিরকে কাব্যের আলম্বনবিভাবরূপে গ্রহণ। আবার এরই আনুষঙ্গিক ফল হল রোমান্সরস-পিপাসার দুর্বারতা। আর এই পিপাসায় কাতর কবি 'ইরাণী' কবিতায় অপরূপ সুন্দরী এক ইরাণীবালার ইঙ্গিত একখানি চিত্রাঙ্কন ক'রে আবেগোচ্ছ্বসিত মুহূর্তে মানস-চুম্বন করেছেন।

ভীষণে-মধুরে কঠিনে-কোমলে যে উত্তপ্ত জীবন—তারই রস এবং বাঙালী-কবির কাছে অজ্ঞাত এই জীবনধারার যে রোমান্স-রস, তা নানাভাবে এগুলিতে তিনি আস্বাদন করেছেন। পৌরুষ-বীর্যময় এই সমস্ত যাযাবরী বলিষ্ঠজীবন ও যৌবনের প্রতি মোহিতলালের আকর্ষণের মূলে 'অদৃষ্টের বন্ধনেতে' বাঁধা পড়ে 'অম্লপায়ী তক্রপায়ী বঙ্গবাসী' না হয়ে থাকার যুগগত প্রেরণা, তৎকালীন জাতীয় ও স্বদেশী আন্দোলনের বীর শহিদদের মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের শাক্ত-আদর্শ নিশ্চয়ই ছিল এবং কবির শিলাইদহের চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর এই বিষয়ক প্রবণতাটিকে পুষ্টও করেছিল। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি কথাও মনে রাখা দরকার। মানুষের আত্মশক্তি বা চরিত্রশক্তিকে সীমাহীনরূপে ধারণার মূলে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থের 'সোঽহং-তত্ত্ব' ব্যাখ্যার প্রভাবও তাঁর মনের গভীরে সক্রিয় ছিল। আত্মার বিরাটত্ব ও শক্তির মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই গ্রন্থ কবিকে সর্বদা সচেতন রেখেছে।[১৮]

'অঘোরপন্থী' কবিতায়ও কবির এই বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সর্ববিষয়ে নির্ঘৃণ শৈব-উপাসকের নরকপালে সুরাসেবনের মতো

তিনি এ কবিতায় সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা ও সুন্দর-কুৎসিতে-ভরা জীবনের সুরা ধরণীর পেয়ালায় পান ক'রে বেহুঁশ হতে চেয়েছেন। অঘোরপন্থী তান্ত্রিকের ভূমিকায় শাক্ততান্ত্রিক কবি এখানে জীবন-রসে মাতাল।

এই 'অঘোরপন্থী' এবং 'দিলদার' 'গজলগান' ও 'হাফিজের অনুসরণে' কবিতাগুলি ভোগবাদমূলক কবিতা হিসেবেই আলোচ্য। তথাপি ওমরখৈয়ামী সুরে কামনার রসে ও জীবনাসবে মত্ত হওয়ার মধ্যে কবির বলিষ্ঠ জীবনতৃষ্ণাও উপেক্ষণীয় নয়। শেষের তিনটি কবিতায় ছন্দ ও ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব স্পষ্ট।[১৯]

জীবনপ্রীতির গভীরতার সঙ্গে মর্ত্যপ্রীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। 'স্বপন-পসারী'র জীবনপ্রেমমূলক কবিতাগুলি পরোক্ষভাবে যে কবির মর্ত্যপ্রীতির স্মারক—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিছক এই শ্রেণীর কবিতা হিসেবে এইগুলি বিচার্য নয়। 'স্বপনপসারী' কাব্যের 'কামনা' 'পুরূরবা' ও 'প্রেম ও সতীধর্ম' এই তিনটি কবিতায় কবির মর্ত্যানুরাগ অতিশয় স্বচ্ছ। 'কামনা' কবিতাটি একটি উৎকৃষ্ট লিরিক। দুটি স্তবকে কবি তাঁর বক্তব্যকে স্বল্পায়তনে সুন্দর রূপ দিয়েছেন। মাটির পৃথিবীকে বিদীর্ণ ক'রে তার যাবতীয় রস তিনি শতমুখে 'স্নায়ুতে শোণিতে' শোষণ ক'রে নিতে সমুৎসুক। প্রত্যক্ষ জগৎকে পরিত্যাগ ক'রে কোনোরূপ দূর-দুর্লভ অমৃতের তৃষ্ণায় তিনি বিভোর হতে চান না। জীবনতৃষ্ণার প্রবলতা এবং মর্ত্যপ্রেমের গভীরতা—দুইই অতিশয় তীব্রতায় সঙ্গে আলোচ্য কবিতায় রূপলাভ করেছে।

"আকাশের তারা যেমন জ্বলিছে—জ্বলুক অসীমরাতি,
ওর পানে চেয়ে ভয়ে মরে যাই, চাহি না অমৃত-ভাতি!
ধরার কুসুম বারবার হাসে বারবার কেঁদে যায়—
আঁধারে-আলোকে শিশিরে-কিরণে আমি হব তার সাথী।"

(কামনা)

মোহিতলালের এই নিঃসীম মর্ত্যপ্রেমের পরিচয় স্বর্গীয় বা পৌরাণিক দেবোপম চরিত্রগুলিকে মর্ত্য-নরনারীর স্বভাবধর্মের আলোকে দেখার মধ্যেও লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের পুরূরবা এবং মহাভারতের দ্রৌপদী—এই দুই চরিত্রকে মর্ত্যের সম্পর্কে রেখে কবি একদিকে যেমন তাঁদের জীবন্ত ও স্বাভাবিক করেছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে তাঁর মর্ত্যমমতাও উজ্জ্বল হয়েছে। উর্বশী-পুরূরবার সেই 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র প্রাচীন কাহিনীই তাঁর কাব্যে ভাষায় ছন্দে ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বে এবং পরিবেশ-সৃষ্টির নৈপুণ্যে

অপরূপতা-লাভ করেছে। মহাকবি কালিদাস ঐ কাহিনীকে ঈষৎ রূপান্তরিত করেছেন তার 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে। আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'উর্বশী' কবিতায় এই চরিত্রকে আশ্রয় ক'রে প্রয়োজনাতীত বিশুদ্ধ ও আদর্শ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মূলত উর্বশীর দিকে সেখানে পুরূরবা অনুপস্থিত। মোহিতলালের দৃষ্টি মূলত পুরূরবার দিকে। স্বর্গবাসিনী উর্বশীকে মর্ত্যের সীমায় এনে তিনি মর্ত্যচারী পুরূরবার তীব্রতম হৃদয়ার্তিকে রূপ দিয়েছেন। মর্ত্যবাসীর আকর্ষণে স্বর্গীয় উর্বশী ধরা না দিয়ে পারেন নি—

"স্বর্গ হ'তে
রূপ আসে নামি', ধরার অনর্ঘ দান
মানবের প্রেম।" (পুরূরবা)

কিন্তু এমন মানবীয় প্রেমেও শেষপর্যন্ত উর্বশীর মন ভ'রল না। পুরূরবার প্রতি-শ্রুতিভঙ্গের ছল ক'রে স্বর্গের অপ্সরা বিদায় নিলেন—পুরূরবার কান্না চরমে উঠল।

"যেয়ো না যেয়ো না প্রিয়ে!
মাগি' লও স্বর্গ হতে চির-নির্বাসন,
চেয়োনা অমৃত, এস মরি দু'জনায়।" (পুরূরবা)

পুরূরবার এই মানবিক আর্তি ও সকরুণ আবেদন মোহমুক্তা উর্বশীর অন্তরকে স্পর্শ করল।

'কোথায় উর্বশী!
রেখে গেছে হাসিখানি প্রভাতের মুখে
করুণ-কোমল,— বিদায়ের মতো নয়।
আবার কোথায় যেন হইবে মিলন।" (পুরূরবা)

'ধরার অনর্ঘদান মানবের প্রেম'কে পুরূরবা-চরিত্রের ভিত্তিমূলে স্থাপন ক'রে কবি মোহিতলাল মর্ত্যচারী প্রেমিকের পার্শ্বে নন্দনবাসিনী উর্বশীকে ম্লান করেছেন এ কবিতায়। সুচয়িত ধ্বনিগম্ভীর তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে এবং ভাষার ক্লাসিক্যাল সংযমে কবিতাটি অপূর্বতা-লাভ করেছে। 'প্রেম ও সতীধর্ম' কবিতায় তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর প্রতি সমদৃষ্টি ও সমপ্রেমের সতীত্বে খুশী হতে পারেন নি। সে যেন নারীর ধর্ম নয়— দেবীর বা বীরের সহধর্মিণীর সে যেন কর্তব্যপালন মাত্র। কিন্তু যেখানে ব্যাসদেব অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর বিশেষ পক্ষপাতের কথা উল্লেখ ক'রে প্রচলিত দৃষ্টিতে তাঁর চরিত্রে সামান্য কলঙ্ক লেপন করেছেন, সেখানেই তাঁর মতে দ্রৌপদী

দেবী থেকে মর্ত্যের কামনাবাসনাময়ী মানবীতে উন্নীত হয়েছেন। কবির এই মর্ত্যচারিণী মানবীপ্রীতির ভিতর তাঁর মর্ত্যপ্রেমও চমৎকার ফুটে উঠেছে।

ভোগকামনা

মোহিতলালের কাব্যে এই ভোগকামনার প্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেইজন্যে একটি পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবল এইটুকুমাত্র বলা চলে যে 'স্বপনপসারী'তে সর্ব-ইন্দ্রিয়দ্বারে কবিচিত্ত ভোগ-কামনায় চঞ্চল ও উল্লসিত। কিন্তু কবিচিত্ত সম্পূর্ণরূপে দ্বন্দ্বমুক্ত।

নিসর্গচেতনা

মোহিতলালের উন্মেষপর্বের কবিতাগুলি আলোচনার সময় তাঁর প্রকৃতি-প্রেমের কথা বলেছি। সেখানে প্রকৃতিই প্রথম তাঁর সৌন্দর্যপিপাসাকে জাগ্রত করেছে—প্রকৃতির মধ্যেই কবি বিশ্বস্রষ্টা সুন্দর-দেবতার আভাস পেয়েছেন এবং প্রকৃতির সংসারে মানবসংসারের অভিনয় দেখে দুই জগৎকে নিকটবর্তী করেছেন। 'বিকাশপর্বের' 'স্বপন-পসারী' কাব্যে কবির প্রকৃতিচেতনা আরও স্পষ্টতা, ব্যাপকতা ও গভীরতালাভ করেছে। 'স্বপনপসারী'তে তাঁর প্রকৃতি-প্রীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা আছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবি কোথাও একান্ত নির্লিপ্তভাবে যথাস্থিতরূপে প্রকৃতির স্বভাবচিত্র অঙ্কন করেন নি। প্রতিটি কবিতায় প্রকৃতি কবির কোনো না কোনো মানস-অনুভূতি-উদ্রেকে সহায়তা করেছে।

প্রাচীন পাশ্চাত্যকাব্যে বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্যে নিসর্গের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কিংবা মানবজীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র কাহিনীকে বিশদ করার জন্যে পটভূমিকায় প্রকৃতির অনুরূপ চিত্র সংস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু নিসর্গ ও জীবনের নিবিড় যোগসূত্রের প্রসঙ্গ প্রাচীন কাব্যে তাদৃশ লক্ষ্যগোচর নয়। ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের পর থেকে কবিরা স্বকীয় মানসরঙে রঞ্জিত ক'রে প্রকৃতিকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তখন থেকেই প্রকৃতি জড় ও অনুভূতিহীন পদার্থের পরিবর্তে চেতনশীলা এক প্রাণময়ী সত্তারূপে কল্পিত হচ্ছে। নিসর্গান্তঃপুরের গোপন মর্মস্পন্দন, তার রঙ ও রেখার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য, তার রহস্যময়তা, মানুষের আশা-নিরাশার সঙ্গে তার আত্মিকযোগ, অথবা তার বিশাল ও অন্তহীন রূপের প্রেক্ষাপটে মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখানুভবের অকিঞ্চিৎকরত্ব কিংবা মনুষ্যজগৎ সম্পর্কে সুদূর

নির্লিপ্ততা—এই সমস্তই বিভিন্ন কবির কাব্যে নানাভাবে ধরা পড়েছে। আবার ভিক্টোরীয় যুগে বিজ্ঞানের ক্রমাগ্রগতির ফলে প্রকৃতিপর্যবেক্ষণে কবিদের অনুভূতি যে বিজ্ঞানচিন্তার দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—টেনিসন, ব্রাউনিং ও ম্যাথু আর্নল্ডের কাব্যে তা লক্ষ্য করা যায়। কবির ব্যক্তিগত মানসপ্রবণতা অনুযায়ী তাঁর প্রকৃতিসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিও যে বিকশিত হয়, আত্মনিষ্ঠ (Subjective) কবিতাসৃষ্টির যুগে সে কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমালোচক একস্থলে বলেছেন,—"Speaking broadly, we may say that the interpretation of nature is fundamentally a matter of temperament and mood, and that the investigation of it thus forms part of the personal study of Literature."[২০]

মোহিতলালের নিসর্গচেতনা-সংবলিত কবিতাগুলির বিচার-পূর্বে উপরের কথাগুলি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। 'সাগর ও শশী' 'বিদায়-বাদল' 'কলসভরা' 'বসন্ত-আগমনী' 'শ্রাবণ-রজনী' 'চূতমঞ্জরী' 'কেতকী' 'পূর্ণিমা স্বপ্ন', 'অমৃতের পুত্র' প্রভৃতি 'স্বপনপসারী'র কবিতাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাগুক্ত 'সূর্য্যাস্ত' কবিতার মতো 'সাগর ও শশী' কবিতায় প্রত্যক্ষ মানব সংসারের নায়ক-নায়িকার বাসররজনীর ছবি সাগর ও শশীর পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন। ঊর্ধ্বে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশবক্ষে দীপ্যমান পূর্ণচন্দ্র আর নিম্নে নিথরনির্জন বেলাভূমের নিকটবর্তী কূলহীন সাগরের অধীরতা তাঁর মনে ঐ চিত্রের উদ্রেক করেছে।

'বিদায়-বাদল'এ বর্ষাপ্রকৃতিকে একটি জীবন্ত নারীরূপ দান ক'রে তিনি সেই নারীকে নিজ প্রিয়তমা কল্পনা করেছেন এবং বিদায়বেলায় প্রিয়তমার আচরণে যে বেদনরাগিণী বেজে ওঠে সেই ব্যথার রেশকে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'চূতমঞ্জরী'তে মঞ্জরীদল ও পরীদলের বাসররাত্রিযাপনের মধ্যে মানবমানবীর প্রতিচ্ছবিদর্শনও একহিসাবে 'সাগর ও শশী'রই অনুরূপ। দেখা যাচ্ছে, মোহিতলালের এটি একটি অতিপ্রিয় প্রবণতা। বসন্তের আবির্ভাবে নিসর্গজগতে যে আনন্দ ও রূপের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তার একটি যথাযথ স্বভাবচিত্রাঙ্কন ক'রেই তিনি 'বসন্ত আগমনী' কবিতায় ক্ষান্ত হন নি। ঐ প্রকৃতি তাঁর নিজ যৌবনবনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তারও পরিচয় দিয়ে তিনি মানব ও প্রকৃতি এই দুইকে নিকটবর্তী করেছেন। ফাগুনের বেলাশেষে গৃহপাশে বন্দিনী গ্রাম-নারীর পুকুরঘাটে কলসভরার আকুলতার মধ্যে

প্রকৃতির গোপন আহ্বানবাণী যেন গুঞ্জিত হয়েছে 'কলস ভরা' কবিতায়।[২১] 'স্বপনপসারী' কবিতায় স্বপ্নলক্ষ্মীর যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তার উপাদান এসেছে সমস্তই নিসর্গজগৎ থেকে। 'শেষশয্যায় নূরজাহান' কিংবা 'পুরূরবা' কবিতায় নূরজাহান ও পুরূরবার মনোবেদনা, হাহাকার ও আর্তির সঙ্গে প্রকৃতির সুন্দর মিতালি লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি এখানে নিতান্ত অনাত্মীয়ের মতো দূরে অবস্থান না ক'রে পরমাত্মীয়ের মতো চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করেছে। 'বেদূঈন' ও 'ইরাণী' কবিতায় রুক্ষ-রূঢ় ও রোমান্সরঙীন প্রকৃতি বেদূঈন ও ইরাণী জীবনের সঙ্গে আশ্চর্য সঙ্গতিস্থাপন করেছে। 'কেতকী কবিতায় মোহিতলাল রবিবিরহিণীর যৌবনবৈফল্যের দিকটি 'গোরোচনা গোরী'র উপমায় অদ্ভুত মানবিতার সঙ্গেই শুধু অঙ্কন করেন নি—কেতকীর সবুজ বাকলে ও সৌরভে নিজের মানসসঙ্গিনীর প্রতিবিম্বও তিনি লক্ষ্য করেছেন।

'শ্রাবণ-রজনী' কবিতায় কবির প্রকৃতি প্রেমের একটু অভিনবত্ব আছে। তিনি নিজ দেশের প্রকৃতিগৌরব-কীর্তনে উৎসাহী হয়েছেন এখানে। তাঁর দৃষ্টিতে অতিরঞ্জন প্রশ্রয় পেয়েছে বলে মনে করি না। ঘনঘোর মেঘে জ্যোৎস্না ডুবে যাওয়ায় বর্ষার অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে। শুরু হয়েছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। প্রিয়তমার পার্শ্বে শায়িত কবি বর্ষাপ্রকৃতির এই পটভূমিকায় অন্তর ও বাইরে অদ্ভুত এক উন্মাদনা অনুভব করেছেন। হঠাৎ এই সময় মেঘের আড়ালে জ্যোৎস্না ফুটে নায়কের মতো নায়িকা ধরণীকে যেই চুম্বন করেছে, অমনি তাঁর মনে এক অভিনব অনুভূতির উদয় হল—

"আমারি দেশের আষাঢ় গগনে নবীন নীরদ ছায়া
স্থলে-জলে রচে বরষে-বরষে বৃন্দাবনের মায়া।
গোঠে যায় ধেনু, মাঠে বাজে বেণু আমারি শ্যামল দেশে—
'চাঁদিনী উঠিলে ফুলটি ফুটিলে কদমতলায় কে সে'।"

(শ্রাবণরজনী)

দেখা যাচ্ছে, বৈষ্ণব সাহিত্যে অঙ্কিত বর্ষাপ্রকৃতির একটি গান্ধর্বচিত্র কবি নিজ বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করে গর্ববোধ করেছেন। বর্ষাঋতুটি তেমন প্রিয় না হলেও বর্ষা রাত্রির প্রতি তাঁর একটি দুর্বলতা ছিল।[২২]

এই পর্যন্ত আলোচিত কবিতাগুলির মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে মোহিতলালের নিজস্ব অনুভূতিলব্ধ কোনো বিশিষ্ট দর্শন (Philosophy) এর সাক্ষাৎলাভ

করি না। ১৩১৬ সালে 'সুন্দর' কবিতায় তিনি নিসর্গের হাটে সুন্দরদেবতার আভাস পেয়েছিলেন। এর দশবৎসর পরে লেখা স্বপনপসারীর 'পূর্ণিমা-স্বপ্ন' কবিতাটিতে আরও একবার তাঁর অনুরূপ অনুভূতি হল। পূর্ণিমারজনীর অফুরন্ত সৌন্দর্যরস আস্বাদন করতে করতে জাগ্রত ভুবন থেকে তিনি স্বপ্ন-জগতে পৌঁছে গেছেন। স্বপনপসারীর কবি এখানেও আরেকবার স্বপ্নরসে মজেছেন। পূর্ণিমা-রাত্রির 'দিব্য আলোক বিভার মাঝখানে' কবি স্বপ্নে রূপসীর দিকে চেয়ে 'নিখিল-মর্মের নীরব আভাস' এবং অসীম সুন্দরের জ্যোতি লক্ষ্য করেছিলেন। এই কবিতাটির দু'বৎসর পরে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,—

"জোৎস্নাময়ী নিদাঘ-শর্ব্বরী আমার মনোহরণ করিত। ছায়ার মতো আলোক, তাহাতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা অপেক্ষা অপ্রকাশ থাকে অধিক—মহা-সৌন্দর্যের একটি প্রান্তমাত্র যেন পৃথিবীতে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার সমস্তটাই আকাশের ওপারে। সে যেন একটি স্বপ্ন, ঘুমন্ত পৃথিবীর আঁখি-পল্লবে সৌন্দর্য-দেবতার চুম্বনের মতো ব্যাপিয়া রহিয়াছে।......আমার চক্ষু স্বপ্নাবেশে মুদ্রিত হইয়া আসিত। তখন মনে হইত, আমি যেন এই দেহ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির পরীরাজ্যে বিচরণ করিতেছি।"[২৩]

পৃথিবীর সৌন্দর্য খণ্ড, আকাশের ওপারেই আছে অখণ্ড বা মহাসৌন্দর্য। স্বপ্নরাজ্যে বিচরণের মধ্য দিয়েই সেই অখণ্ড সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পূর্ণিমা-স্বপ্ন' কবিতায় কবির সেই উদ্দেশ্যেই স্বপ্নবিহার। মর্ত্যের নিসর্গজগতের খণ্ড সৌন্দর্যকে অখণ্ড সৌন্দর্যদেবতার অংশরূপে অনুভবশক্তির মধ্যে তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি অবশ্যই প্রকাশমান। আবার তাঁর এই বিশ্বাসের মধ্যে রবীন্দ্রীয় প্রকৃতিভাবনারও প্রভাব কল্পনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম ধীরে ধীরে তাঁকে বিশ্বাত্মবোধের ভিতর দিয়ে মানবপ্রেম, মর্ত্যপ্রেম এবং সর্বেশ্বর অরূপ-উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে। সেখানে মানুষ প্রকৃতি ও অরূপ একাকার—একই রুদ্রসুন্দরদেবতা প্রকৃতিলোক ও নরলোককে একই সূত্রে গেঁথে চলেছেন। প্রকৃতি সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের এই গভীরতম ও ব্যাপকতম উপলব্ধি মোহিতলালের কাব্যে ক্রমপরিণতির সূত্র ধরে মোটেই প্রাগ্রসর নয়। তাই প্রকৃতিচেতনায় রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও একটি সুস্থির ও আত্মবোধলব্ধ বিশিষ্ট দর্শন ছিল না বটে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃত কবিদের মতো তাঁর একটা উপলব্ধিগত বিশ্বাস ছিল এবং তা বাসনারূপে তাঁর চিত্তে বিদ্যমান থাকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানবের একাত্মতার চিত্রাঙ্কনে তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ।

মোহিতলালের 'উন্মেষপর্বে'র কবিতাগুলিতে প্রকৃতিচেতনায় নিশ্চয়ই রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল, কিন্তু বিকাশপর্বেও যখন তাঁর মধ্যে সেই পূর্বতন বৈশিষ্ট্য-গুলির উজ্জীবন দেখছি, তখন আর প্রভাবের দিকটিতে গুরুত্ব না দিয়ে কবিচিত্তে সমুদিত ভারতীয় প্রকৃতিবোধরূপেই তাঁর নিসর্গচেতনাকে দেখাই সমীচীন। 'বিকাশপর্বে'র এই শ্রেণীর কবিতাগুলি বিশ্লেষণশেষে আমরা নিঃসন্দেহে এই কথাটি বলতে পারি যে কবিচিত্তে প্রকৃতি আদ্যন্ত একটি নির্দ্বন্দ্ব প্রসন্নতার সুরকেই জাগ্রত করেছে।

ব্যক্তিপ্রশস্তি

'বেদুঈন', 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' কবিতায় শক্তিগর্ভ ও পৌরুষধর্মীচরিত্রের প্রতি মোহিতলালের আকর্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। তারই রকমফেরে আমরা তাঁর ব্যক্তিপ্রশস্তির প্রবণতাটি লক্ষ্য করতে পারি। ত্যাগপূতই হোক আর শক্তিদৃপ্তই হোক, যে প্রাণবান পুরুষ গতানুগতিক সাধারণ জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে কোনো নূতন আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন, তাঁর প্রতি মোহিতলাল শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারেন নি। প্রেমের মন্ত্রেই হোক, আর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই হোক, যে প্রাণোচ্ছল পুরুষ অসাধ্যসাধন করতে পারেন, তাঁর মধ্যেও নিহিত আছে লোকোত্তরশক্তি। জড়তা, ভীরুতা আর দুর্বলতাই মানুষের সকল দুর্গতির নিদান। যে আকারেই হোক, যে মানুষের মধ্যে মোহিতলাল এই শক্তিকে প্রচ্ছন্ন দেখেছেন, শাক্ততান্ত্রিক কবি তাঁর উদ্দেশে প্রাণের আরতি নিবেদন করেছেন।

স্বপনপসারীর 'আবির্ভাব' ও 'মহামানব' শীর্ষক কবিতা দুটিতে তিনি তৎকালীন ভারতের 'জনগণমন অধিনায়ক' মহাত্মা গান্ধীর প্রশস্তি রচনা করেছেন।[২৪] ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যথার্থ দেশ নায়কের অভাবে অনেকখানি স্তিমিত, তখন মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। এই আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথও একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ ও প্রেরণা মোহিতলালের এই দুই কবিতায় লক্ষ্য করা কিছু অন্যায় নয়। কিন্তু ব্যক্তিপ্রশস্তির এই প্রবণতাটি ধীরে ধীরে তাঁর একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য রূপে যে দাঁড়িয়ে যায়, তাঁর পরবর্তী কাব্যই তার সাক্ষ্য। সুতরাং কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণে সাময়িক হাততালি লাভের উদ্দেশ্যে মোহিতলালের এই প্রশস্তি—এমন মনে করা ঠিক নয়। 'আবির্ভাব' কবিতায় দেখা যায় মহাত্মাজীর 'অনলদগ্ধ শুদ্ধ-চরিত'

অধরের 'মৌনমহিমা' ললাটের 'অমৃতভাতি' ও নয়নের 'গভীর প্রসাদ-দীপ্তি' কবিকে মুগ্ধ করেছে। এই কবিতায় তিনি অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ ক'রে বর্তমান দুর্গত-অবস্থার চিত্রকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তারপর ভারতের সেই দুর্দিনে মহাত্মাজীর মহান আবির্ভাব কিভাবে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করল—তার এক রমণীয় চিত্রাঙ্কন ক'রে শেষে তিনি বলেছেন—

'জন-সমুদ্রে কল্লোল ওঠে—'অবতার! অবতার!'
রুদ্ধ-নিশাসে হেরিছে ভারত নব লীলা বিধাতার।' (আবির্ভাব)

'মহামানব' কবিতায় মোহিতলালের গান্ধীভক্তি ঘনীভূত হয়েছে। ভারতের বুকে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত অবতারদের সঙ্গে তিনি গান্ধীজীকে এক ক'রে দেখেছেন। তৎকালীন দেশবাসীর প্রাণশক্তির দৈন্য, জাড্য, দুর্গতি ও অসহায়তা দূরীকরণের জন্যে আগত মহাদেব নয়, মহামানব গান্ধীজীর উদ্দেশে তিনি প্রণতিজ্ঞাপন করেছেন। গান্ধীজীকে তিনি দেবতারূপে নয়, মানবরূপেই—মহামানবরূপেই দেখতে চান। পরবর্তীকালে অবশ্য গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর এই শ্রদ্ধা বিচলিত হয়েছিল।[২৫]

কবির ব্যক্তিপূজার এই বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা তৎকালীন কবিদের একটি সাধারণ প্রবণতা রূপেই মনে করি। সাহিত্যে মানুষের কথা, মানুষের শৌর্য-বীর্যের কথা, মহৎ মানুষের ত্যাগ ও কীর্তিগৌরবের কথা—কবিদের গভীর মানবতাবোধেরই ফল। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, নজরুল প্রমুখ সেকালের সকল কবিই এ-শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন। সেকালের এই বিশেষ রীতিটি ঐতিহ্য সূত্রেই মোহিতলাল নিশ্চয়ই লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর শক্তি ও পৌরুষধর্মের প্রতি আকর্ষণের রকমফেরে আমরা এখনও পর্যন্ত কবিতা দুটিকে লক্ষ্য করছি বলে এদের মূলে কবির মানবপ্রীতির বিষয়কে তেমন গুরুত্ব দিতে চাই না। পরবর্তী কাব্যে দেখা যাবে গভীর মানবপ্রেমই মোহিতলালের এই শ্রেণীর কবিতার পশ্চাতে সক্রিয়। কিন্তু সে কথা পরে।

আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস

ক্ষেমঙ্কর ঈশ্বরের চেতনসত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারতীয় বিশ্বাসটি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মোটামুটি বাঙলা সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ ছিল। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য এই গভীর আস্তিক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনের সমস্ত তাৎপর্য-কে পরম সচ্চিদানন্দের মধ্যে উপলব্ধি করার নৈষ্ঠিক সাধনা—রবীন্দ্রকাব্যের

একটি বড় কথা। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রভাবে ইংরেজিসাহিত্যে ব্রাউনিং ও কিছু পরবর্তী ম্যাথু আর্নল্ডের কাব্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বিশ্বের ন্যায়নীতি ও জীবন সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন একটি মনোভাব অনেক স্থলে প্রথম লক্ষণীয় হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কাব্যের প্রথম পর্বেও এই সংশয়দৃষ্টি অনেকের মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের ধারণা, রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রাথমিক যুগের প্রধান তিনজন কবির অবচেতন মনে ঈশ্বর বা ভগবৎ-বিশ্বাস ছিল। তাঁদের কাব্যজীবনের মধ্যপর্বে সচেতন ও অবচেতন মনের ঐ বিশ্বাস-জনিত দ্বন্দ্বের ফলে, তাঁদের কাব্য ঈশ্বর চেতনার ওপর সেই পর্বে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কিন্তু সকলেই পরিণতজীবনে ঐ সংশয় কাটিয়ে উঠেছেন। 'মরীচিকা' 'মরুশিখা' 'মরুমায়া'র কবি যতীন্দ্রনাথের ঈশ্বরসম্পর্কিত সংশয়াচ্ছন্ন মন 'সায়ম্‌' 'নিশান্তিকা'য় ঈশ্বরভক্তিতে আত্মহারা হয়েছে। নজরুলের যোগ সাধনার আত্মপরিচয় সম্পর্কে যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরা জানেন তিনি কতো বড় আস্তিক।[২৬]

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যে ঈশ্বর-সম্পর্কে অনুরূপ ধারণারই পরিচয় আছে। 'উন্মেষ-পর্বের' কবিতাগুলি আলোচনার সময় তাঁর গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি। ১৩১৯ সালে লেখা "চতুঃসন্ধ্যা"[২৭] নামক স্বরচিত একটি প্রবন্ধে তিনি 'শ্মশান-শয়ন চন্দ্রচূড়ের অঙ্গারবর্ণ জটাজাল আকাশে উৎক্ষিপ্ত' দেখেছেন।

'স্বপনপসারী' কাব্যে কবির ভগবৎবিষয়ক কবিতার সংখ্যা খুবই কম। তথাপি 'অমৃতের পুত্র' ও 'পূর্ণিমা-স্বপ্ন' কবিতা দুটিতে তাঁর যে দিব্যানুভূতি হয়েছে, তাতে ভারতীয় হিন্দুর ঈশ্বর-সম্পর্কিত বিশ্বাসই উঁকি দিয়েছে। পূর্ণিমারজনীর সৌন্দর্যে বিভোর-কবি 'জাগর-জীবন' থেকে 'স্বপনের পুরে' প্রবেশ করে ক্ষণ ও খণ্ড সৌন্দর্যের মাঝখানে যে অখণ্ড 'দিব্য আলোকবিভা'র আভাস পেলেন, তাতো পরম সুন্দর বিশ্বস্রষ্টারই প্রতিচ্ছবি। আবার 'কর্মক্লান্ত দিবসের রৌদ্র-তাপ শেষে' জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে পথিকের গ্রাম-পথে প্রাণমুক্ত গান গেয়ে যাত্রার দৃশ্যে তিনি যখন মন্তব্য করেন,—

> "'অমৃতের পুত্র তোরা' !—ঋষিমন্ত্র স্মরি'
> আনন্দে-বিষাদে মোর আঁখি এল ভরি।" (অমৃতের পুত্র)

—তখন তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস নিঃসংশয়িত রূপে ধরা পড়ে। এই পর্যন্ত তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব।

কিন্তু 'পরাজয়' কবিতাটির প্রথম অংশে সর্বপ্রথম মোহিতলালের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং শক্তি সম্পর্কে সংশয় দেখা দেয়। এই সন্দেহ কিন্তু যুগধর্মে তাঁর সচেতন মনের। অবচেতন মনের দীর্ঘকালীন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে এই সংশয়ের আবর্তে-আন্দোলিত কবিমন কবিতাটির শেষের দিকে দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছে। অবচেতন মনের বিশ্বাস জয়ী হওয়ায় সচেতন কবিমন কবিতাটিকে 'পরাজয়' আখ্যা দিয়েছে। কবিতাটিতে কবি বলেছেন যে তাঁর জীবনে অশেষ দুঃখবেদনার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠলেও তিনি কোনো দিন চোখের জলে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করেন নি। আর এর জন্যে লোকে যে তাঁকে 'নাস্তিক' আখ্যা দেয়,—এ অপবাদ তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো মোহিতলালও প্রশ্ন করেছেন—

"হারায়েছি যাহা সে কি ফিরে'-দেওয়া তুমিও পারিতে কভু?"

(পরাজয়)

সচেতন মনের এই অবিশ্বাস শেষের দিকে অবচেতনমনের বিশ্বাসের কাছে পরাভূত হওয়ায় তিনি বলেছেন—

"তাই ভাবি, এ কি! আজ এ কি হ'ল
নিমেষে করিল জয়।
একটু হরষ-পরশ মাত্রে রোমাঞ্চ সমুদয়।" (পরাজয়)

মোহিতলালের 'জন্মান্তরবিশ্বাস'টি স্বপনপসারী পর্যন্ত যে টলে নি, তার প্রমাণ আছে 'কর্মফল ও জন্মান্তরে' কবিতা দুটিতে। এ বিষয়ে তাঁর মন এখনও দ্বন্দ্বমুক্ত। 'কর্মফল' কবিতায় দেখি তিনি কর্মফলে গভীর বিশ্বাসী। কর্মফল অনুযায়ী প্রিয়তমার উচ্চতর কুলে পরবর্তী জন্মের কথা কবি ভেবেছেন এবং পরজন্মে নিজেকে 'ক্লান্ত পান্থ এক' পথিক রূপে কল্পনা ক'রে ঐ প্রিয়তমার ভবনে উপস্থিতির একটি মনোরম চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। 'জন্মান্তরে' কবিতায় পরজন্মে কিভাবে তিনি তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হবেন—তারই এক অপরূপ চিত্র আছে। কবি মোহিতলালের জন্মান্তর সম্পর্কে এই বিশ্বাসটি রোমান্টিক কবিচিত্তের একটি উচ্ছ্বাসময় বোধও তো হতে পারে। পরবর্তী কাব্যে তাঁর এই ধারণার আর কোনো পরিচয় না পেলে হয়তো আমরা সেই সিদ্ধান্তই করতাম। তাছাড়া বাঙালী হিন্দুর এই বিশ শতকে পরজন্ম সম্পর্কে যতই সন্দেহ থাক না কেন, তার অবচেতন মনে এ বিষয়ে একটি সংস্কার-জনিত বিশ্বাস থাকা বিচিত্র নয়। অবশ্য এই বিশ্বাসের মূল মোহিতলালের

অবচেতন মনের ওপর কতখানি দৃঢ়প্রোথিত, তা বোঝবার জন্যে পরবর্তী কাব্য-প্রবাহ অনুসরণ করতে হবে। 'মৃত্যু' কবিতায় "আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক" 'মৃত্যুর পরে চাহিব না কোন সুন্দর পরলোক' প্রভৃতি মৃত্যুবিভীষিকায় বিভ্রান্ত কবির উক্তিমাত্র। পরলোকের আশ্বাসবাণী ও মৃত্যুর মহিমাখ্যাপনের বিষয় যেমন সদ্য মৃত্যুশোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট সাময়িকভাবে অর্থহীন, আলোচ্য কবিতায় মৃত্যুভয়ভীত কবির বক্তব্যও সেইরূপ। বস্তুত জন্মান্তর অবিশ্বাসের পরিচয়বহ কবিতা একে বলা যায় না।

মৃত্যুচেতনা

মর্ত্য-মাটির বুকে মানুষের যে জীবনচর্যা—স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-দয়া-মায়ার অধীন যে সুমধুর জীবনপ্রবাহ—তার ওপর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আঘাত হানে মৃত্যু। এমন মধুময় জীবনের অবসান ঘটে যে মৃত্যুতে তার ভাবনা জীবন-প্রেমিক মানুষকে চঞ্চল না ক'রে পারে না। দেহধৃত যে জীবন, মৃত্যুর পর তার পরিণতি কি হয়, জগৎ ও জীবনের প্রতি জীবিতের যে ভালবাসার ডোর, মৃত্যুর মহা-বিচ্ছেদ-লগ্নেও তা অটুট থাকে কি না, মৃত্যুর পরে দেহবিযুক্ত হয়েও আত্মা কিরূপ সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে, জীবনের সঙ্গে সে আত্মার সম্পর্ক কি ইত্যাদি নানা সংশয়জড়িত প্রশ্ন চিন্তাশীল ও জীবনপ্রিয় মানুষের মনে উদিত হতে পারে। মৃত্যুবিষয়ক ধারণার বিশিষ্টতার ওপর কবিদের জীবন-সম্পর্কিত চেতনাও যে বহুলাংশে নির্ভরশীল একথা অস্বীকার করা চলে না।

ভারতীয় কবিদের মৃত্যুবিষয়ক ধারণা মূলত ভারতীয় দর্শনচিন্তারই অনুবর্তী। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে মৃত্যু ইহলৌকিক জীবনপ্রবাহের চিরন্তন সমাপ্তি চিহ্ন নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে, ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কথা আছে। "মৃত্যু কিছু একটা সত্য মারক বস্তু নহে; তাহা আমিকে বজায় রাখিয়া আমার অবস্থা পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যু যে সত্য নহে—এই বোধটিই মৃত্যুঞ্জয়, মোক্ষদ্বার।"[২৮] মৃত্যু সম্বন্ধে ভারতীয় এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন।[২৯] তাঁরও বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুতে জীবনপ্রবাহের শেষ নয়। রূপরূপান্তর ও জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে। মৃত্যুতে একটা জীবনের পূর্ণতা এবং এইভাবে নানা রূপের মধ্য দিয়ে পরিণামমুখী জীবনপথে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে।

'উন্মেষপর্বে'র 'মৃত্যু' কবিতায় মোহিতলাল রবীন্দ্রসুরেই মৃত্যুর কথা বলে-ছিলেন। কিন্তু 'স্বপনপসারী'র 'মৃত্যু' কবিতায় তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ নূতন

এবং পূর্বোক্ত ভারতীয় দর্শন চিন্তার বিরোধী। বিশ শতকের যুক্তিবাদী মন নিয়ে এই কবিতায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমূলক দৃষ্টিতে তিনি মৃত্যুর দিকে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য মোহিতলালের কাব্যে মৃত্যুভাবনার একটি বিশেষ স্থান আছে বলে আমরা বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করছি। ১৩২৭ সালের 'ভারতী'র আষাঢ় সংখ্যায় কবিতাটি 'মৃত্যু-বিভীষিকা' নামে বের হয়, পরে তিনি এর নাম পরিবর্তন করেন। কবির ভাবনায় 'ভয়ঙ্করদর্শন' 'রক্তনয়ন বিকট-বদন' মৃত্যুর হাসিতে 'রক্তধারা' এবং তার বিষনিঃশ্বাসে মানুষ বাক্যহারা। তার কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত ও দশনমালা ভীষণ। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার নির্মম অনাবেশ। জীবনের খেলা যার সবেমাত্র শুরু, তার কাছেও মৃত্যুর আহ্বান আসতে পারে। জীবনের উৎসবমুখর প্রমোদরজনীতেও তার অবাঞ্ছিত আগমন ঘটতে পারে। মানুষ তার কাছে বড় অসহায়, মৃত্যুর হাত থেকে

"আছে কি তাহার কোন প্রতিকার—
আছে মানবের হাতে?" (মৃত্যু)

মৃত্যুর কল্পিত মোহনরূপের প্রশংসায়, ধর্মের সান্ত্বনা বাক্যে বা মন্ত্রতন্ত্রের আশ্বাসে—কবি আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। মৃত্যুকে 'বঁধু' বলে সম্বোধনও তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় (যদিও তিনি তা করেছেন)। জীবনপ্রেমিক কবি স্বল্পবৃত্ত জীবনকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে চান। 'জীবনের শোক, জীবনের দুখ, জীবনের আশা জীবনের সুখ' 'উচ্ছল ফেনা মদিরার মতো' তিনি পাত্র ভরে পান করবেন। তারপর ভোগশেষে অতি স্বাভাবিক নিয়মে বার্ধক্যে তাঁর 'জীবন ক্লান্ত' ও 'বাহুযুগ' যখন ক্ষীণ হবে, তখন সেই স্বাভাবিক মৃত্যুকে তিনি সাদরে বরণ করতে কুণ্ঠিত হবেন না—

"ঝিরি-ঝিরি নিশা বায়
ফুল যথা মুরছায়,
তেমনি মুদিব আঁখি
ধরণীতে মাথা রাখি'—
আমার 'আমি'টা একেবারে শেষ হোক্,
করিব না কোন শোক,
মৃত্যুর পরে চাহিব না কোন সুন্দর পরলোক।"
(মৃত্যু)

কিন্তু কবির এই অভিপ্রেত মৃত্যু কি সব সময়ে সম্ভব? জীবনপথ-পরিক্রমায় তার আকস্মিক আগমন কে রোধ করবে? এ প্রশ্ন তাঁকে এখনও বিব্রত করে

নি। জীবনের রস আকণ্ঠ পান করতে গেলে জীবনকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে গেলে মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন জয় করতেই হবে। অতি প্রবল জীবনাসক্তি এবং অতিশয় নিবিড় প্রেমের সাহায্যে অনেক সময় মৃত্যুভাবনা জয় করা যায়। একে ঠিক জয় না বলে বলা উচিত মৃত্যুভাবনার বিস্মরণ। 'স্বপনপসারী'তে মোহিতলালের সে প্রয়াস আছে। মধুমান জীবনরসে মাতাল কবি নিষ্ঠুর মরণকে পদদলিত ক'রে 'অঘোরপন্থী' কবিতায় যখন বলেন,—

> "জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়
> যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।"
>
> (অঘোরপন্থী)

কিংবা প্রিয়তমার সঙ্গে তাঁর প্রেমকে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যসূত্রে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রীয় সুরে যখন তিনি বলেন,—

> 'প্রেম যে আত্মার আয়ু!—ক্ষয় নাহি তার
> জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর।' (জন্মান্তরে)

তখন মৃত্যুভাবনাকে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন একথা সহজেই অনুমান করা চলে। আবার 'পুরূরবা' কবিতায় কবি বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যখন বলেন,—

> 'এসো মরি দু'জনায়!
> অজর-অমর হ'য়ে নিত্যের নন্দনে
> থেকোনা অরূপ রূপে—অনিত্য-সদনে,
> অন্তহীন মৃত্যুস্রোতে এস গো নামিয়া। (পুরূরবা)

তখন তাঁর মৃত্যুপ্রীতির কথা মনে আসতে পারে। কিন্তু এগুলির কোনোটিতেই মোহিতলালের মৃত্যুভয়-জয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও স্থির ধারণার পরিচয় নেই। মৃত্যু ও জীবনের যে দ্বন্দ্বের ওপর রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকটি প্রতিষ্ঠিত এবং যাতে মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে জীবনের বিজয়-পতাকা উড্ডীন—বার্ধক্যকে নির্জিত ক'রে যৌবনের সংস্থাপন—তার কতকটা ছায়া মোহিতলালের ঐ 'অঘোরপন্থী' কবিতাটির উদ্ধৃতাংশে এবং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের 'অনন্ত প্রেম' কবিতার ছাপ 'জন্মান্তরে' কবিতাংশে লক্ষণীয়। আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে মৃত্যু সম্পর্কিত যে রোমান্টিক কল্পনা মিশ্রিত উচ্ছ্বাসময় ধারণা লক্ষ্য করা যায়, তার প্রভাব শেষের উদ্ধৃতাংশে লক্ষ্যযোগ্য। 'স্বপনপসারী'র 'অ-মানুষ'[৩০] শীর্ষক কবিতায় দেখি বেদান্ত পন্থায় কবি মরণের পরবর্তী অবস্থার চিত্র অঙ্কন করেছেন। মৃত্যুর পর অশরীরী রূপে নিজেকে অনুভব ক'রে ছায়াময়

মিথ্যা সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা তিনি ভেবেছেন। কিন্তু অশরীরী কবি নিরাকার ব্রহ্মের নৈকট্যলাভ ক'রেও আশ্বস্ত হতে পারেন নি।

"জনম-জনম এমনি কাটে, ঘুচ্‌ল না ত' ছায়ার মায়া!"

(অ-মানুষ)

মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে তাঁর অতি মাত্রায় সচেতনতার পরিচয় আমরা পাচ্ছি—কিন্তু মৃত্যুভাবনা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তাঁর যে বিভিন্ন প্রয়াস, তাতে বোঝা যায় যে বয়োধর্মের তারুণ্যে তিনি এই বিষয়ক ভাবনা-দ্বন্দ্বটিকে আমল দিচ্ছেন না। নইলে এ কালে মৃত্যুর বিভীষিকা কবিকে কিরূপ চঞ্চল করেছিল তার প্রমাণ তাঁর সমকালীন অন্য রচনাতেও আছে। "মরণ অনিবার্য, মরণের পর যে অবস্থা—তাহা ভাবিতেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।·· যে সত্যই স্নেহশীল, পরার্থপর প্রেমিক, সে মরণের কথা চিন্তাও করে না; আমি তাহা নই, তাই মৃত্যু-বিভীষিকা আমাকে এমন ব্যাকুল করিয়াছে।"[৩১]

অথবা

"মৃত্যু কি সত্যই সর্ব বিপদের অবসান, সকল বাসনার পরিসমাপ্তি, জীবনের মহানির্বাণ? না ওই অন্ধকার তরুশিরে মসীলিপ্ত প্রান্তরের উপর বিজন প্রেতভূমে—কখনও নীরব কখনও অস্ফুট কখনও অতি তীব্র আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে নিশীথ বায়ুর সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইতে হইবে · কে বলিবে?"[৩২]

'বিকাশপর্বে'র কবি মোহিতলালের মৃত্যু ভাবনা এই পর্যন্ত।

পর্বশেষে

বিকাশপর্বের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী'তে মোহিতলালের মূল প্রবণতাগুলির পরিচয় আমরা শেষ করলাম। প্রত্যেকটি প্রবণতায় তাঁর ভাব বা অনুভূতি-ভাবনা যতদূর অগ্রসর হয়েছে, আমরা তার অনুসরণ করেছি।

ভাষা ও ভাবের দিক থেকে পূর্ববর্তী উন্মেষ-কালের কবিতাগুলি অপেক্ষা এগুলি যে অনেক পরিণত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। দুরন্ত ও বলিষ্ঠ জীবন-পিপাসা ও ভোগকামনা বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ মৌলিক অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। মৃত্যু ও ভগবৎবিষয়ক ধারণায় মোহিতলালের মন গতানুগতিক ধারায় বিচরণ করে নি। বিশ শতকীয় মন নিয়েই তিনি এই দুই বিষয়কে দেখেছেন। সমকালীন দেশ ও কালের ঘটনা এবং রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে বহমান যে কাব্যপ্রবাহ তার মূলপ্রবৃত্তি তাঁর চিত্তেও প্রহত হয়েছে। অন্যান্য প্রবণতাগুলিতে ভারতীয় চিন্তাভাবনা, রবীন্দ্রীয় কিংবা দেবেন্দ্রীয় ভাব, অথবা

সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব গৌণভাবে ক্রিয়াশীল থাকলেও তাঁর বলবার ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া এই কাব্যে ইংরেজকবি ব্রাউনিং-এর মতো তিনি যে Dramatic monologueএর সার্থকতম ব্যবহার করেছেন, বাঙলাসাহিত্যে তাও অভিনব। রূপসৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা, মৃত্যুভাবনা এবং ভগবৎবিষয়ক চিন্তায় ক্ষীণ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবর্তে কবি পতিত হলেও প্রাণধর্ম ও যৌবনরসসিক্ত দৃষ্টির সাহায্যে তিনি সেই সংশয়ের জালকে এড়িয়ে গেছেন। মোটের ওপর 'উন্মেষপর্ব' এবং 'বিকাশ পর্বে'র কবির মন একরূপ দ্বন্দ্বমুক্ত। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর একটি সদাপ্রসন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় সকল কবিতার মূলদেশেই লক্ষণীয়। এই সমস্ত কারণে আমরা 'স্বপনপসারী'কে 'বিকাশপর্বে'র কাব্য বলে আখ্যাত করেছি।

আর একটি কথা। এই কাব্যে মোহিতলালের বস্তু-আশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও তাঁর ওপর কল্পনা ও স্বপ্নমায়ার কিঞ্চিৎ আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। যৌবনকালের মনের রঙ, হৃদয়ের উত্তাপ, চোখের তন্দ্রালু নেশা ও প্রাণের স্বপ্ন-রস এই কাব্যে মোহিতলালের কবিচেতনাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন করেছে। রোমান্সের এই আলো, এই মায়া 'স্বপনপসারী'র কক্ষে কক্ষে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছে। কবিচিত্তে স্বপ্নমায়ার এই আধিপত্যের দিকটি মনে রাখলে এর নামকরণের উপযুক্ততা উপলব্ধ হয়। ১৩৪৮ সালে কাব্যটির দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি সেই স্মৃতিকেই স্মরণ ক'রে লিখেছিলেন,—

"আজ সে পূর্ণিমা নাই, নাই সেই ফাগুনের ফাগে-রাঙা অসীম ভুবন,
বিভোর যাহার রূপে ভরেছিনু একদিন পসরায় রঙীন স্বপন।"

(উৎসর্গ কবিতা)

ইংরেজ কবি T. L. Beddoesএর 'Dream Pedlary' কবিতার নামকরণের প্রভাব যে এ কাব্যের নামকরণে আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সমৃদ্ধিপর্ব : বিস্মরণী

'স্বপনপসারী'র পাঁচ বৎসর পরে ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মোহিতলালের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিস্মরণী' প্রবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গিত। 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা 'ভারতী', 'প্রবাসী' ও 'কল্লোল'এ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের কালক্রম-অনুযায়ী কবিতাগুলিকে সজ্জিত না

ক'রে কবি স্বেচ্ছামতো অনেকখানি ভাবগত ঐক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলিকে কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সর্বসাকুল্যে মোট পঁচিশটি কবিতা 'বিস্মরণী'তে স্থান পেয়েছে। কবির তেত্রিশ থেকে আটত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কবিতাগুলি রচিত।

মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী'র প্রকাশকাল পর্যন্ত সমকালীন দেশকাল, রাজনৈতিক ঘটনা ও কবির ব্যক্তিজীবনের কথা পূর্ববর্তী প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা গেছে। সেই বহুবিস্তৃত ও তীব্রতম আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর এ-কাব্যে তাদৃশ লক্ষ্যগোচর নয়। তবে শাক্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শে কবির শ্রদ্ধায় ও আত্মাহুতি-জনিত ত্যাগের মহিমা-উপলব্ধির ব্যাপারে সমকালীন সন্ত্রাসবাদীদের জীবনাচরণ ও বীর যুবকদের মৃত্যুবরণ-দৃষ্টান্তের বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সমকালীন অর্থনৈতিক দুর্গত অবস্থার ফলস্বরূপ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মনের নৈরাশ্য ও হতাশার প্রভাব তাঁর 'বিস্মরণী'র দুঃখবাদকে তীব্রতর করেছিল। অবশ্য এই হতাশা ও বেদনার একটি সদর্থ তিনি স্বকীয় গভীর ও মৌলিক দৃষ্টির সাহায্যেই নির্ধারণ ক'রে নিয়েছিলেন।

'বিস্মরণী'র কালে মোহিতলালের রবীন্দ্রভক্তিও অটুট ছিল। ১৩৩৬এর 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে[৩৩] তাঁর গভীর রবীন্দ্র-ভক্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রবন্ধেই কবি সেকালের তরুণ সাহিত্যিক-দের বাস্তবের নামে কুৎসিত রচনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। 'বিস্মরণী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাহিত্যিকের দল রবীন্দ্রযুগের অবসান ঘোষণা ক'রে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে আক্রমণ করা সত্ত্বেও মোহিতলালের রবীন্দ্রভক্তি এতটুকু হ্রাস পায় নি। তবে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, বেকারের সংখ্যা প্রাধান্যলাভ করায় এবং জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঙ্গে অনেকখানি মুখোমুখি পরিচয়ের সুযোগ আসায় যে জীবনজিজ্ঞাসা সেকালের তরুণদের চঞ্চল ও হতাশ করেছিল তার হাওয়া তাঁর চিত্তকেও স্পর্শ করেছিল।[৩৪] আবার রবীন্দ্র-অনুকারী কবির দল কাব্যে যে অবাস্তব ভাববিলাস, ইন্দ্রিয়াতীত আকৃতি ও কায়াহীন অবস্তুর মরীচিকামায়ায় ধাবিত হচ্ছিলেন, তার প্রতি মোহিত-চিত্ত ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কবিদের কাব্যসাধনায় বস্তুভিত্তি কোথাও শিথিল হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এঁদের থেকে কতকটা দূরে আত্মগত

ভাবসাধনায় যে রূপলোক সৃজন ক'রে নিয়েছিলেন, তা তাঁর মতো কবির পক্ষে শোভনসুন্দর ছিল। কিন্তু অনুকারীদের কাব্যে জীবনের অবমাননা বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল। 'বিস্মরণী' কাব্যে সেইজন্যে বস্তুভিত্তিক উপাদানের সাহায্যে জীবননিষ্ঠ কাব্যরচনার প্রবণতাটি অধিকমাত্রায় প্রশ্রয় পেয়েছে। এইখানেই মোহিতলালের বস্তুবাদী ও জীবনবাদী কবিরূপে স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে 'স্বপনপসারী' বা তারও পূর্বে 'উন্মেষপর্বে'র কবিচিত্তের গহনে যে সুন্দরতৃষ্ণার রোমান্টিক মনোবৃত্তিটি বড় আসন জুড়ে বসেছিল, তার স্বাধীনতাও তিনি এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নি। বাস্তবজগতের যে মানস-প্রতিবিম্ব তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছিল সেখানে কায়া কখনই তিরস্কৃত হয় নি।

আমরা পূর্বেই বলেছি 'বিস্মরণী'র বহু কবিতা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেইজন্যে 'স্বপনপসারী'র কবির পূর্বের প্রবণতাগুলি এই কাব্যে সমস্তই দেখা গিয়েছে। তবে সেগুলি এখানে ভাব ও ভাষায় পূর্বাপেক্ষা গাঢ়তর হয়েছে। বিশেষত কবির জীবননিষ্ঠ ভোগবাদভাবনা এখানে অতিশয় স্বাতন্ত্র্য ও দীপ্তিলাভ করেছে। তাছাড়া পূর্ববর্তী 'বিকাশপর্বে'র কাব্যে যে যে প্রবণতাগুলি কবিচিত্তে একটি প্রসন্নতার ভাবকে সদাজাগ্রত রেখেছিল, এখানে সেগুলির অধিকাংশই কবিকে গভীরতর ভাবনাবর্তে নিক্ষিপ্ত ক'রে তাঁর চিত্তে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। 'বিস্মরণী' কাব্যে তাঁর এই কয়েকটি মূল প্রবণতা লক্ষণীয়—

(ক) রোমান্টিক রূপসৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা
(খ) বলিষ্ঠ জীবনপিপাসা-সঞ্জাত দুঃখবাদ ও মর্ত্যপ্রীতি
(গ) ভোগকামনা বা বিশিষ্ট জীবনবাদ
(ঘ) নিসর্গচেতনা
(ঙ) ব্যক্তিপ্রশস্তি তথা মানবভাবাদ
(চ) আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস
(ছ) মৃত্যুভাবনা।

রোমান্টিক রূপসৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা।

'বিকাশপর্বে'র কবির রূপসৌন্দর্যরসের তৃষ্ণায় স্বাপ্নিকতা ও মানসলক্ষ্মী সন্ধানের প্রয়াস এ কাব্যে আরও প্রবলতর রূপে দেখা দিয়েছে। 'মানসলক্ষ্মী'[৩৫] কবিতায় কবি তাঁর মনের গহনবনে যে নারীঅপ্সরীকে দেখলেন, তার কালো কেশপাশে বিরহের বেদনা, অধরের কূলে মিলনের রাঙা উৎসব ও নয়নতারায়

সুগভীর ঔদাসীন্য। কতো কতো বিগতজন্মের সঙ্গিনী এই মানসলক্ষ্মী। এই সুন্দরী কি একদা জীবনসাথীরূপে তাঁর বাহুপাশে ধরা দিয়েছিলেন? পূর্বজন্মে ইনিই কি তাঁর কক্ষে অন্ধকারে বাসর বাতি জ্বেলেছিলেন? ইনিই কি তাঁর চিতামূলে চরণতলে একদা বসেছিলেন? নিজের সঙ্গে নিজের এই তর্ক ও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে কবি এখন বেশ বুঝছেন যে সত্যিই এই মনোবাসিনী চির-অধরা। ক্ষণে ক্ষণে কবিচিত্তে শিহরণ জাগানোই তাঁর কাজ। অথচ তাঁকে আলোকের মাঝখানে স্পষ্টভাবে না দেখতে পেলে তাঁর চিত্ত হাহাকার ক'রে ওঠে। কিন্তু উপায় কি?

"গানেরি আড়ালে সাড়া দেয় শুধু
সে অপ্সরা,
বাহির-ভুবনে এই বাহুপাশে
দিবেনা ধরা।" (মানসলক্ষ্মী)

চিরকালের অপ্রাপনীয়া এই মানসলক্ষ্মী ইংরেজকবি শেলি, কীট্‌সকেও যেমন বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথকেও তেমন বহুবার প্রলুব্ধ করেছে। ভাবের দিক থেকে তাই বিষয়টি যে অভিনব নয়, একথা 'বিকাশপর্বেই' বলা হয়েছে। কিন্তু মানসলক্ষ্মীর যে বস্তু-অপেক্ষিত ললিত চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশে যে প্রবল আকূতি তার আন্তরিকতা বড়ই মর্মস্পর্শী। রোমান্টিক কবিদের এই 'আইডিয়াল'এর সঙ্গে 'রিয়্যাল'এর বা আদর্শবাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি কি সহজে হয়? এই দ্বন্দ্বই তাঁদের চিত্তে মধুর হাহাকার ও ততোধিক মধুর দীর্ঘশ্বাসকে জাগিয়ে তোলে।

'মাধবী'[৩৬] কবিতায় একটি মাধবীফুলকে ঘিরে কবির মনে মানসলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটেছে। তারপর মানবীপ্রিয়ার সঙ্গে তার মিল খুঁজতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন আদর্শবাস্তবের মিল হয় না। সর্বশেষে তিনি এও বুঝেছেন যে শরতের অস্তগামীসূর্যের রক্তিম আলোকস্নাত হওয়ায় শুভ্র বকুল ফুলটি তাঁর মনে বসন্তের মাধবী পুষ্পের বিভ্রম জাগিয়েছে। আর এই মাধবীকুসুমই শেষ পর্যন্ত সেই অপরূপার প্রতিমূর্তি হয়ে তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করেছে। আলোচ্য কবিতায় কবির বক্তব্য যথেষ্ট মননধর্মী। বাস্তবজগতের বকুলফুল তাঁর মনোজগতে মাধবী ফুলের মায়াসঞ্চার করেছে—অথচ দুয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য। তেমনি বাস্তবজগতের মানবী, কবিচিত্তে মানসলক্ষ্মীর মায়াসঞ্চার করে—অথচ দুয়ের মধ্যে আছে দুস্তর ব্যবধান। আবার পার্থক্য যতই থাক, একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাতে যাওয়া যায় না। বকুল ও

মাধবীর রূপকে এখানে কবি তাঁর মানবী-প্রিয়া ও মানসলক্ষ্মীর স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

Real-এর ভিতর দিয়ে Ideal-এর রাজ্যে উপনীত হওয়ার এই কথাটিই একটু ভিন্নভাবে 'বিস্মরণী,[৩৭] কবিতার মধ্যেও তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন। এ কবিতায় তাঁর মানসলক্ষ্মী ও কাব্যলক্ষ্মী এক হয়ে গেছে। এই কবিতায় তিনি বাস্তবসংসারে পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের মাঝখানে থেকেও দূর কাব্যলক্ষ্মীর তথা মানসলক্ষ্মীর হাতছানি পেয়ে তাঁরই ধ্যানে ও গানে কিরূপ নিবিষ্টচিত্ত হয়ে পড়েছেন—তার পরিচয় দিতে গিয়ে স্বীয় কাব্যসাধনার পথ ও মতের স্বাতন্ত্র্য দাবি করেছেন। তাঁর বিশ্বাস খরতর বাস্তবতার আলোকে গভীরতর সত্য নেই। কিন্তু বাস্তবতার অন্তরালেই কোথাও সেই সত্য নিহিত আছে। সেইজন্যে বাস্তবের 'আতপ-উৎসকূলেই' তাঁর 'নয়নে নিদালি' ভরে নেওয়ার আগ্রহ। তাঁর ধারণা দিবসের সমস্ত আনন্দ তন্ময়তার মূলে আছে নিশীথ-গগনের অভিনয়। কবির এই যুক্তিতে অন্ধকার আকাশ, সূর্যকরোজ্জ্বল দিবস অপেক্ষা বেশী সত্য। আবার যেহেতু নিশীথগগন অভিনয় ক'রে চলেছে, সেইজন্যে তার মধ্যেও যথার্থ সত্য নেই। নিশীথের 'তারার আঁখরে'ই আছে পরিপূর্ণ সত্য। কবি তাই আলোকিত বাস্তবের রাজ্যে বাস করেও অন্ধকারের মধ্যেই তথা কুহেলি-ঘেরা কল্পলোকের মধ্যেই জীবনের পরিপূর্ণ সত্যসন্ধানের পক্ষপাতী।

"আমি তিমিরের তীর্থ পথিক
তারকার গাহি জয়।" (বিস্মরণী)

বাস্তবে যে-জীবন প্রত্যক্ষ করা হয়, তা খণ্ডিত, তা অর্ধাংশমাত্র—কল্পলোকের অন্ধকার গুহায় আছে বাকি অর্ধজীবন। সে জীবন স্বপ্নের মতো মায়াময়। এই মায়াময় জীবনসত্যের রাজ্যে উপনীত হতে গেলে বাস্তবের সোপান অতিক্রম ক'রেই কবিকে যাত্রা করতে হয়। এই কল্পলোকেই আছে কবির চির আরাধ্যা মানসলক্ষ্মী তথা কাব্যলক্ষ্মী। বাস্তবের কায়া-সৌন্দর্যরসকে আকণ্ঠ পান ক'রে কল্পলোকের সেই অন্ধকার রাজ্যে পৌঁছলে দেখা যাবে—

'সুপ্তি-সাগরে ফেন-তরঙ্গ
স্ফুরিছে জ্যোতির্ময়।' (বিস্মরণী)

কিংবা

'যে সুখ স্বপন তাহারি রভসে
জগৎ জ্যোতির্ময়।' (ঐ)

এইভাবে কাব্যলক্ষ্মীর কটাক্ষ-ঈক্ষণে চঞ্চল হয়ে স্বপ্নরথে বিহার, কামনার ফুলে মাল্যরচনা ও 'বাণী বিনাইয়া' ছন্দ গাঁথার মধ্যে কবি অপূর্ব সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। কাব্যলক্ষ্মীর অধরসুধাপানের মানসিক সম্ভোগে ও তাঁর রূপারতিতে তিনি কিরূপ তন্ময় হয়ে পড়েছেন, তার পরিচয় নিজেই সুন্দরভাবে দিয়েছেন—

'বাণী বিনাইয়া বাঁধি যে ছন্দ
তারি মধুমদে পরাণ অন্ধ
হয়তো মনের এ মকরন্দ
সত্যের সুধা নয়—
তবু ভুলে আছি তাহারি পুলকে
জীবনের ক্ষতি ক্ষয়।' (বিস্মরণী)

বলাবাহুল্য কবির রোমাণ্টিক কবিচিত্ত এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্রয় পেয়েছে এবং Ideal ও Real-এর দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্তও এখানে পীড়িত নয়। Real-এর ভিতর দিয়ে কিভাবে Ideal-এর জগতে উপনীত হওয়া যায়, সে কথাটিই এখানে মুখ্য। 'মানসলক্ষ্মী' ও 'মাধবী' কবিতায় আদর্শবাস্তবের যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, এ কবিতায় সেই দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়াস আছে। কাব্যরাজ্যের কাব্যলক্ষ্মী ও মনোরাজ্যের মানসলক্ষ্মী একীভূত হওয়ায় যে দ্বন্দ্ব থেকে কবি পরিত্রাণ পেলেন বলে মনে হল তা যে ভ্রমমাত্র, পরবর্তী কাব্যগুলিতে তার সাক্ষ্য আছে।

এই সূত্রে তাঁর স্বপ্ন দেখার প্রবণতাটি 'বাদলরাতের গান' ও 'ঘুঘুর ডাক' কবিতায় লক্ষণীয়। প্রথম কবিতাটিতে বৃষ্টি পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাদলরাতে কবির প্রাণের তলেও বাঁশী বেজে উঠেছে। তাঁর কোনো এক পূর্ব-প্রণয়িনী 'কলসী কাঁখে' জল আনতে এসে একদা যে ছায়ায়-ঢাকা পথে পথ হারিয়েছিল, আজ স্বপ্নরাজ্যে তারই তনুলতিকার লাবণ্য স্মরণে তিনি বিহ্বল। স্বপ্নের মধ্যে তাকে চুম্বন করতে গিয়ে তিনি দমকা বাতাসে শাসনের গর্জন শুনলেন। কবিতাটি প্রকৃতিপ্রেমের কবিতারূপেই আলোচ্য। তথাপি বৃষ্টি ঝরা রাত্রিতে কবিচিত্ত যে স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করেছে—তা 'স্বপনপসারী'র কবির একটি অতিস্বাভাবিক প্রবণতা। আবার বিবাহিতা নারীকে স্বপ্নে চুম্বন করতে গিয়ে তিনি যে নিবৃত্ত হয়েছেন তার মূলেও তাঁর নৈতিক চেতনা ক্রিয়াশীল। দাম্পত্যপ্রেমরস-রসিক দেবেন্দ্রভক্ত কবির এই নৈতিক বোধও যথার্থ।

'ঘুঘুর ডাক' কবিতাটিও 'স্বপনপসারী'র অনুবর্তী। দ্বিপ্রহরে ঘুঘুর ডাকের

সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তে যে স্বপ্নমিছিল শুরু হয়েছে—তারই অনবদ্য কয়েকটি মায়াময় চিত্র এর প্রাণ। স্বপ্নপুরীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য আস্বাদনে কবিপ্রাণের উল্লাস 'ঘুঘুর ডাক'কে উপলক্ষ্য ক'রে এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু কবি স্বপ্নপ্রিয় হলেও কায়াকান্তিরও পূজারী। 'দীপশিখা' কবিতাটিতে দীপশিখাকে তপনের প্রণয়িনীরূপে কল্পনা ক'রে তারই মুখে যে ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন তা একান্তভাবেই তার আত্মকাহিনী। কিন্তু আগাগোড়া সমাসোক্তি অলংকারের সাহায্যে একটি তন্বী-কুমারীর ব্যবহার যে-ভাবে তিনি দীপশিখার উপর আরোপ করেছেন তাতে তাঁর রূপপর্যবেক্ষণী শক্তি, চিত্রাঙ্কন-দক্ষতা এবং রোমান্টিকতা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। এখানেও পথিকবধূর বেশে দীপশিখার 'তপনের স্বপ্ন' দেখার কথা আছে।

নারীর প্রেয়সী ও শ্রেয়সী দুই রূপের মাধুর্যরস আস্বাদন আছে 'বাঁধন'[৩৮] কবিতায়। স্পষ্টত এ কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ দুই কবিরই প্রভাব আছে। শয্যাপার্শ্বে একদিকে শিশুর কলভাষ ও অন্যদিকে বধূর আলিঙ্গন পাশ—বধূ ও জননীর—রাধা ও ম্যাডোনার সমন্বয়মূর্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। পত্নী ও শিশুর সাহচর্যে গৃহকোণে যে অফুরন্ত আনন্দের প্রস্রবণ—কবির প্রেমপিপাসা তাতেই নিবৃত্ত হয়েছে।[৩৯] দাম্পত্য প্রেমের দুর্জয়-শক্তিতে মোহিতলালের বিশ্বাসের পরিচয় 'মৃতপ্রিয়া' কবিতাতেও লক্ষণীয়। তিনি এখানে মৃতা প্রিয়তমাকে অভিসারিকার বেশে কষ্ট ক'রে কাছে আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজপ্রাণের মধ্যে স্মরণ-প্রদীপ জেলে দীর্ঘকাল-মৃতা প্রিয়তমার মধুরস্মৃতি লালন করবেন। যে প্রিয়তমা সিঁথির সীমায় কবির দেওয়া সিঁদুর নিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য যোগ। এ কবিতায় মোহিতলালের বলবার ভঙ্গী ও ভাষা তাঁর নিজস্ব। কিন্তু দাম্পত্যপ্রণয়ের এই প্রশস্তির মূলে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব কল্পনা করা যেতে পারে। আর জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যসূত্রে প্রিয়তমা সম্পর্কিত ধারণার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তমাকল্পনার প্রভাব যে কিছুই নেই তা বলা চলে না।

এ পর্যন্ত আলোচিত এই বিষয়ক কবিতাগুলিতে আদর্শবাস্তবের দ্বন্দ্ব ও সেই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করার প্রয়াস, কবির রোমান্টিক মনের স্বপ্নাভিসার, দাম্পত্যপ্রণয়ের মাধুর্যরসসম্ভোগ ও তার শক্তিবিঘোষণ—নানাভাবে লক্ষ্য করা গেছে। 'বিকাশপর্বে'র স্বপ্নানন্দবিলাস এ কাব্যে কবিকে যে অধিকতর চিন্তাশীল করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বলিষ্ঠ জীবনপিপাসা-সঞ্জাত দুঃখবাদ ও মর্ত্যপ্রীতি

ভোগকামনা বা বিশিষ্ট জীবনবাদ

এই দুটি বিষয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কেবল এইটুকু মাত্র বলা চলে যে কবির দুঃখবাদ, ভোগবাদ বা জীবন-বাদের সঙ্গে অন্বিত হয়ে তাঁকে গভীরভাবে দ্বন্দ্বক্লিষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ভোগাতীত রাজ্যের দিকে তাঁকে ঠেলেছে। আবার এই অধ্যায়েই যে মৃত্যু-ভাবনার আলোচনা করা গেছে (যা এক হিসেবে দুঃখবাদেরই সামিল) তাও তাঁকে একই পরিণামের দিকে নিয়ে গেছে।

সুগভীর জীবনপ্রীতির ফল স্বরূপ এই দুঃখবাদ যে কবির গভীর মর্ত্যমমতার সঙ্গে যুক্ত, একথা অস্বীকার করা যায় না। 'ব্যথার আরতি' 'মোহ-মুদ্গর' 'পান্থ' প্রভৃতি কবিতায় পৃথিবীপ্রীতির নিবিড়তা তাঁর দুঃখবাদ ও ভোগবাদের অন্তরালে অনায়াসেই অনুভব করা যায়। 'বিস্মরণী' কাব্যে একই কবিচিত্ত থেকে উৎসারিত মোহিতলালের দেহবাদ, দুঃখবাদ জীবনপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি ভাবৈকসূত্রে চমৎকার গ্রথিত হয়েছে।

নিসর্গচেতনা বা প্রকৃতিচেতনা

'বিস্মরণী'র 'কন্যা-শরৎ' 'শিউলির বিয়ে' 'ঘুঘুর ডাক' 'বাদলরাতের গান' এবং 'মাধবী' কবিতায় মোহিতলালের প্রকৃতিচেতনা স্পষ্ট। যে সমাসোক্তি অলংকারের নিপুণ প্রয়োগে মানবসংসারের বিচিত্র অভিনয়কে নিসর্গসংসারে আরোপিত ক'রে দুই সংসারকে নৈকট্যদান ও একাত্ম করার প্রয়াস 'উন্মেষপর্ব' ও 'বিকাশপর্বে' দেখা গেছে—এ কাব্যেও সেই বৈশিষ্ট্য পুনরায় লক্ষ্য করা যায়।

'কন্যা-শরৎ' কবিতায় শরৎকন্যার সজ্জার কথা কবির ভাষায় না বললে এর চিত্রসৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ থাকে না—

> "দোপাটি ফুল—চুটকি পায়ের,
> সন্ধ্যামণির নাকছাবি,
> গোট্ পরেছে অপ্‌রাজিতার,
> কুন্দকলির সাতনরী-হার,
> আঁচল-খুঁটে রিং‌টি-ভরা
> কৃষ্ণকলির লাখচাবি" ! (কন্যা শরৎ)।

শরতের দুপুর, সন্ধ্যা, আকাশ, আলো, শিউলি ফুল, লক্ষ্মীপূজা—সমস্ত কিছুই শরৎকন্যার বিচিত্র মর্জি বা খেলার অঙ্গরূপে কল্পিত হয়েছে এবং মানবকন্যাদের

সুন্দরী কন্যার খেলা, বেশভূষা ও আচরণের আরোপ হয়েছে শরৎকন্যার ওপর। এই দিক থেকে 'শিউলির বিয়ে' কবিতাটি অপরূপ। কুলীন বাপের মেয়ে শিউলির 'গায়ে হলুদ' হয়ে গেলেও বিবাহ এখনও হয় নি। ঘটক প্রজাপতি 'রূপে গুণে খাসা' এক বরের সন্ধান দিলেও শিউলি তাতে সম্মত না হয়ে স্বয়ংবরা হতে চায়। এতে ফুলবাবুরা সভা করে শিউলিফুলদের একঘরে করে। কিন্তু শিউলি এতে ভীতা নয়। দখিন হাওয়া, শিউলিকে পরীর দেশে আহ্বান করে। কিন্তু শিউলি আকাশ-কুসুম হয় কি ক'রে? তারপর দূর আকাশের জ্যোৎস্না 'জরীর চাদর' ধূলায় লুটোতে লুটোতে আসে শিউলিকে বিয়ে করতে। কিন্তু তার অনুনয়ে শিউলির মন প্রসন্ন হয় না। সবশেষে 'ধুলো মাটির পানে' যে 'নব দূর্বাদল শ্যাম'—তারই রূপ তাকে উতলা করে এবং অন্য সকলের মিনতি উপেক্ষা ক'রে শিউলি তাকেই বরণ করে। আমাদের পল্লী জীবনে কুলীন বাপের বাড়িতে বিবাহযোগ্যা নারীর চিত্তে স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনের যে হাওয়া বইছিল তারই আলোকে কবি এখানে প্রকৃতিসংসারে একটি অনুরূপ অভিনয় লক্ষ্য করেছেন। শিউলি শেষ পর্যন্ত যাকে পতিত্বে বরণ করেছে, সে হল মাটির বুকের 'দূর্বাদলশ্যাম'। মাটির বুকের শিউলি আকাশ-বুকের জ্যোৎস্নাকে গ্রহণ করে নি। কবিতাটির মূলদেশে একদিকে যেমন কবির কাল-সচেতনতা অন্যদিকে তেমনই মৃত্তিকাপ্রীতি লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের 'ফুলের বিবাহ' প্রবন্ধের প্রভাব এ-কবিতার উপর আছে বলে আমরা মনে করি। মোহিতলালের সমকালীন কবি যতীন্দ্র-মোহন বাগচী 'সরোবরে সন্ধ্যা' 'পদ্মাতীরে' 'চন্দনদীঘি'—প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতিপর্যবেক্ষণে অনুরূপ প্রবণতা দেখিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবসংসারের একটি ছবিকে আদ্যন্ত নিসর্গজগতে প্রতিফলিত ক'রে সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রাখার দক্ষতা যতীন্দ্রমোহনে দেখা যায় না।

'ঘুঘুর ডাক' কবিতায় ঘুঘু-ডাকা এক অলস দুপুরে কবিমন মায়াঘেরা এক স্বপ্নরাজ্যে প্রয়াণ করেছে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিসর্গজগতের যে কয়েকটি খণ্ডচিত্র এতে ফুটে উঠেছে, তাতে তাঁর ঐ পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

'বিকাশপর্বে'র মতো 'বিস্মরণী'তেও প্রকৃতি কবিমনের কোনো বিশিষ্ট অনুভূতি-উদ্রেকে সাহায্য করেছে। বাদলরাতের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপট কবিচিত্তে প্রেমের গান জাগিয়েছে। এখানে প্রকৃতি উদ্দীপনবিভাবরূপে অবস্থান করছে। আবার 'মাধবী' কবিতায় প্রকৃতি আলম্বনবিভাবরূপে মানসসুন্দরী ও মাধবীর মধ্যে একাত্মতা এনেছে।

'বিকাশপর্বে'র 'পূর্ণিমা-স্বপ্ন'এর মতো অধ্যাত্ম-অনুভূতিসম্বলিত 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় প্রকৃতির মধ্য দিয়েই মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা আছে। এ কবিতায় নিসর্গরাজ্যের 'প্রথম প্রাবৃটের নব মেঘোদয়' কিংবা সন্ধ্যার রক্তরাগের মধ্য দিয়েই মৃত্যুর মোহনসুন্দর রূপটিকে ধরবার প্রয়াস। নচিকেতা প্রাকৃতিক জগতের মধ্যেই দিব্যচক্ষুলাভ ক'রে 'আত্মার অমৃতপন্থা মৃত্যু-পরিণাম' দর্শন করেছেন। কবিচিত্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রতিচ্ছায়া প্রকৃতিজগতে এখানে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

নিসর্গভাবনায় রবীন্দ্রনাথের মতো কিংবা ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো মোহিতলালের একটি বিশিষ্ট দর্শন না থাকলেও তিনি প্রকৃতিকে জড় বা অচেতন পদার্থমাত্র মনে করতে পারেন নি। প্রাণহীন জড়ের সঙ্গে এমন নিবিড়-নৈকট্য তো সম্ভব হয় না। আসলে প্রকৃতিভাবনায় তিনি এই 'সমৃদ্ধিপর্বে' ভারতীয় বিশ্বাসের দ্বারাই যে অনেকখানি অনুপ্রাণিত—এমন অনুমান করা চলে। ভারতীয় বিশ্বাসে সমস্ত জড়প্রকৃতিই 'অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ'—এদের প্রত্যেকের মধ্যে সংজ্ঞা বা চেতনা বিদ্যমান। এই ধারণার মধ্যেই রয়েছে একটি গভীর ও ব্যাপক বিশ্বাস—সমগ্র সৃষ্টি সেই এক থেকেই সমুদ্ভূত এবং একের মধ্যেই বিধৃত।[৪০] বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির সাহিত্য এই বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতীয় এই বিশ্বাসটি মোহিতলালের প্রকৃতিভাবনার মূলেও যে ছিল 'বিস্মরণী'তে তা আর অস্বীকার করা চলে না।

ষড়ঋতুর মধ্যে 'স্বপনপসারী'তে বসন্ত ও বর্ষাপ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেছে। 'বিস্মরণী'তে বসন্ত, 'বর্ষারাত্রি' এবং শরৎঋতুর প্রতি কবির আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

ফুলের প্রতি তাঁর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সম্ভবত কবি দেবেন্দ্রনাথের পুষ্পপ্রীতি এ বিষয়ে তাঁকে প্রভাবান্বিত ক'রে থাকবে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—

"মোহিতলালের Pastime—সাহিত্যবিষয়ক সংলাপ ও ফুলবাগান রচনা। ...পুষ্পোদ্যান রচনায় আজকাল তাঁর সমস্ত প্রাতঃকাল ব্যয়িত হয়। ঢাকায় তাঁহার বাসস্থানকে ঘিরিয়া যে ফুলবাগানটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা একটি দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। গোলাপের ফসল লইয়া তাঁহার স্বকীয় গবেষণার মৌলিক দান আছে। প্রায় একশত প্রকার গোলাপ লইয়া তাঁহার কারবার।"[৪১]

কথাগুলি ঢাকায় অধ্যাপনাকালীন মোহিতলাল সম্পর্কে উক্ত হলেও এই পুষ্পপ্রীতির স্পষ্ট সূচনা 'বিস্মরণী'র কালেই। 'মাধবী' 'শিউলির বিয়ে' 'কন্যা-শরৎ' এর কথা বাদ দিলেও এইকালে গ্রন্থবহির্ভূত একটি কবিতা 'রোগশয্যার চিঠি'[৪২]-তে তিনি তাঁর বাদুড়বাগানের মেসের একটি বন্ধুকে কবিতায় যে পত্রখানি লেখেন, তাতে নিরানন্দ রুগ্ন কবি শারদপ্রকৃতির হাতে অপরাজিতা, গাঁদা, রক্তজবা, পুষ্পমণি, কৃষ্ণকলি ও শিউলিকে দেখে অনেকখানি আনন্দলাভ করেছেন। রোগশয্যায় তাঁর অভিজ্ঞতা হল—

"মোর মনে হয়, যার ভগ্ন দেহ মন
রোগশীর্ণ, অবসন্ন নয়ন শ্রবণ—
ফুল তার ভাল লাগে। প্রকৃতি মাতার
স্বহস্তে রচিত সে যে স্নেহ উপহার।"

(রোগশয্যার চিঠি, ১৩৩০)

ব্যক্তিপ্রশস্তি তথা মানবতাবাদ

'বিস্মরণী' কাব্যের সূচনাতেই দেখি মোহিতলাল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। নানাকারণে এইকালে তাঁর মানসিক শান্তি ছিল না। এসব কথা তাঁর জীবনকথায় বিবৃত হয়েছে। এই সময়ে কবির চিরপ্রিয় কাব্যসাধনায় প্রতিও একটা নিস্পৃহতা দেখা দিচ্ছিল। তথাপি ভগ্নহৃদয়ে 'সুন্দরের তীর্থ অভিলাষে' তিনি বাণীসাধনা করে চলেছিলেন। এমন সময়ে করুণানিধানের একনিষ্ঠ বাণীচর্চা, সস্নেহ আলাপ-চারিতা, অনুপম চরিত্রমাধুর্য এবং তাঁর কাব্যগত স্বপ্নরস ও আঙ্গিক পারিপাট্য তাঁর নৈরাশ্যকে দূরীভূত করল। 'বিকাশপর্বে'ই এই অগ্রজতুল্য কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল এবং তিনি তাঁর 'শান্তিজল' কাব্যটি পাঠ করে একটি প্রশস্তিমূলক কবিতাও লিখেছিলেন। এখানে করুণানিধানের প্রীতিরসসিক্ত হৃদয় এবং নৈষ্ঠিক কাব্যানুশীলন কবিকে প্রাণের স্বস্তি দিয়েছে। তিনি বলেছেন—

—"সে মাধুরী মর্ত্যের অধিক
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান।"

এই হিসেবে 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতাটিও স্মরণীয়। বীর যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের আত্মোৎসর্গের মহিমা-খ্যাপন করা হয়েছে এ কবিতায়। প্রসঙ্গত মনুষ্যত্বের অবমাননা, স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠা, ধর্মাচরণে পুরোহিত-নির্ভরতা

এবং 'পুঁথি' ও 'পৈতে' পুজাকে কবি কটাক্ষ করেছেন। 'অবহেলে আত্মবলিদান'-এর যে মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শ ঐ বীর যুবকদ্বয় রেখে গেলেন, তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এ কবিতায় ব্যক্তিপ্রশস্তির মধ্য দিয়ে মহৎ জীবনাদর্শের প্রতিই কবির প্রাণের পুষ্পার্ঘ্য।

'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে' এবং 'চৌঠা আষাঢ়'[৪৩] কবিতা দুটিও উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় শ্বাসাঘাত ছন্দে বাঙলাকাব্যে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিপূজার প্রবণতাটি স্মরণ করে মোহিতলাল লিখেছেন—

"যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগসারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধূপ-আরতি!" (সত্যেন্দ্র-বিয়োগে)

কবির নিজ চিত্রশালাতেও ঐরূপ 'ধূপ-আরতি'র কিছু অভাব নেই। 'চৌঠা আষাঢ়' কবিতাটি একই রীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। এতে ঐ দেশপ্রেমিক দানব্রতী মহাবীরের প্রয়াণে কবিচিত্তের হাহাকার বড়ই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিতর্পণের প্রবণতাটি একটুখানি ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে 'অগ্নিবৈশ্বানর' 'দীপশিখা' ও 'কালাপাহাড়' কবিতায়। কবির সুগভীর মানবপ্রীতির সঙ্গে ঐ প্রবণতা অন্বিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে এসব ক্ষেত্রে।

'অগ্নিবৈশ্বানর'[৪৪]এ সত্যেন্দ্রনাথের সুরেও ছন্দে অগ্নিদেবতার বিচিত্র ও বিভিন্ন প্রলয়ংকরী শক্তি-বিভূতির পরিচয় বৈদিক ভাবানুষঙ্গে চিত্রিত। আর 'তপনের পথিক বধূ'রূপে দীপশিখার আত্মপরিচয়ে কবিকল্পনার স্বাধীন ও রোমান্টিক স্বেচ্ছাবিহারের কথা স্বীকার ক'রেও বলা যায় এ কবিতায় অগ্নিদেবতার শিখার প্রতি আসক্তি, 'দেহময় দাহনের জয়'চিহ্নযুক্ত জ্বলন্ত শিখার প্রতি আকর্ষণ ব্যক্তিপূজারই একটি রকমফেরমাত্র। শাক্ততান্ত্রিক মোহিতলাল মানুষের মধ্যে যে পৌরুষ, যে শক্তির উদ্বোধন কামনা করেন —প্রাকৃতিক জগতে তার প্রতিরূপ না দেখেও তিনি আশ্বস্ত হন না। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পূর্বে যেমন দেবী কালিকার অর্চনা, মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনাযুক্ত পুরুষকারকে জাগ্রত করার জন্যে তেমনই তাঁর শিখা ও বহ্নিস্তুতি।

কবির এই প্রবণতারই আলোকে 'কালাপাহাড়'[৪৫] কবিতাটি স্মর্তব্য। রহস্যময় এক ঐতিহাসিক চরিত্র এই কালাপাহাড়। শোনা যায় প্রথমে তিনি হিন্দুই ছিলেন—পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ ক'রে ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হন।

হিন্দুর দেব-দেউল ধ্বংসের অভিযানকালে তাঁর দামামা ও কাড়ানাকাড়ার তুমুল বাদ্যধ্বনি শোনা যেত। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে কবি এ চরিত্রকে দেখেছেন এ কবিতায়। যুক্তি ও বুদ্ধিসচেতন, নবজাগ্রত মানবাত্মার মহাশক্তির প্রতীক রূপে দেখা দিয়েছে এই কালাপাহাড়। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে যুগযুগনন্দিত দৈবনির্ভরতা ও ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন ক'রে কালাপাহাড় নবযুগের সূচনা করেছে। ঐতিহাসিক কালাপাহাড়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি ও হিন্দুর দেউল বিধ্বংসী অভিযান কবির কাছে দৈব-বিশ্বাসভঙ্গজনিত বীর্যবান মনুষ্যত্ব-উদ্বোধক শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর মানুষের দেহমন্দিরে যে-দেবতার অধিষ্ঠান—এতকাল তাঁরই অবমাননা হয়েছে বলে তাঁর চিত্ত ক্ষুব্ধ।

উন্নত পুরুষকার, বীরোচিত শক্তি, ইস্পাতকঠিন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রসারণশীল মানুষের দুর্গম গিরিজয়-স্বপ্নকে মোহিতলাল বার বার অভিনন্দন জানিয়েছেন। মানুষের আত্মশক্তির উপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। মানুষের সুমহান্ ত্যাগও যে ঐ শক্তিরই একটি রূপমাত্র এই বিশ্বাসও তাঁর প্রবল ছিল। ব্যক্তিচরিত্রের ক্ষাত্রসুলভ কিংবা ত্যাগব্রত দিকটির বন্দনা ধীরে ধীরে তাঁকে বীর্যবান মনুষ্যত্ব পূজায় প্রণোদিত করেছে। 'বিকাশপর্বে' দ্রৌপদীর মানবিক দুর্বলতা ও পুরূরবার মানবিক প্রেম তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। 'সমৃদ্ধিপর্বে' 'মৃত্যুশোক' কবিতায় জীবকে তিনি 'শিবেরও অধিক' বলেছেন এবং 'অগ্নিবৈশ্বানর'এ তিনি সকল জীবের জন্যে অগ্নিদেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করেছেন। কাজেই স্পষ্টভাবে না হলেও কবিচিত্তে মানবপ্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

এক হিসেবে কবির ব্যক্তিপূজাও মানবপ্রেমেরই একটি দিক। কিন্তু তিনি কোথা থেকে এই মানবপ্রেমের মন্ত্রটি লাভ করলেন? তাঁর এই মানবপ্রেমের মূলে ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের[৪৫] প্রেরণা, বাঙলা-সাহিত্যে উনিশ শতকীয় নবমানবতার (Neo Humanism) উজ্জীবনকামনা, রবীন্দ্রনাথের সুগভীর মানবপ্রীতি-অর্হণা—প্রভৃতির প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বহির্গত প্রেরণা সম্মিলিতভাবে বাঙালী কবির রক্তগত তান্ত্রিক চেতনায় প্রচ্ছন্ন নরপূজাকে[৪৬] উদ্রিক্ত করেছিল বলে আমরা মনে করি। মোহিতলালের এই ব্যক্তি-প্রশস্তির সূত্রে মানবপ্রীতি বা জীবনের কোনো একটি মহৎ-আদর্শ বরণের অভীপ্সায় যে মানবতাবাদ তা তাঁর কাব্যে বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যেই স্বতোৎসারিত প্রেমরূপে তেমন ধরা

পড়ে নি। 'স্বপনপসারী'র 'মহামানব' কবিতায় গান্ধীজীর প্রশস্তিতে তিনি 'মহাদেব নয় –মহামানবের চরণ'বন্দনার কথা বলেছিলেন। 'কালাপাহাড়' কবিতায় নরের মধ্যেই তিনি নারায়ণের অধিষ্ঠান লক্ষ্য করেছেন এবং 'মৃত্যু-শোক' কবিতায় তিনি শিব অপেক্ষা জীবের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছেন। তৎসত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সর্বব্যাপী মানবপ্রেমের কবিতা তাঁর অল্প। কবি তাঁর 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে এইকালে বা তার কিছু পূর্বে কোন্ মানুষ কোন্ চরিত্র ও কোন্ আদর্শ তাঁর বরণীয় তার কিছু পরিচয় দিয়েছেন। 'বিস্মরণী' প্রকাশের কিছু পূর্বে ১৩৩০ সালের একটি প্রবন্ধ 'দুঃখের স্বরূপ'এ, ১৩৩৯ সালের আর একটি প্রবন্ধ 'মৃত্যুদর্শন'এ এবং আরও পরে 'অভয়ের কথা' সমালোচনায় মোহিতলাল সকল শ্রেণীর মানুষের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুবেদনার জন্যে গভীরভাবে ব্যথায় বিবশ হয়েছেন। কিন্তু এই সমস্ত গদ্যরচনার কথা বাদ দিলে কাব্যে এইকালে আপামর জনগণের জন্যে সমবেদনা ও মমত্ব প্রকাশে কোথায় যেন কবিচিত্তে একটি দ্বিধা। বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত ভাবনার ফলই এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব। এই ভাবনার পরিচয়দানের জন্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি—

(ক) "অধিকাংশ মানুষের কথাবার্ত্তা তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা এত ক্ষুদ্র যে, তাহাদিগকে একপ্রকার পশু বলিয়াই মনে হয়, ইহাদের মধ্যে বেশীদিন বাস করিলে বুদ্ধি ক্রমেই জড়তা প্রাপ্ত হয়।· ইহাদের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুধা, সেই ভিখারীসুলভ উল্লাস ও হতাশা দেখিলে সহজবুদ্ধিতে মনে হয়, ইহারা মানুষ ও পশুর মধ্যবর্ত্তী।"[৪৭]

(খ) "যে সব মানুষ সত্যই বড় সদাশয়, সত্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা, তাহাদিগকে দেখিলে আমি লজ্জিত ও সংকুচিত হই, নিজেকে দুর্ব্বল মনে হয়। কিন্তু যে সব মানুষ অতিশয় নীচ, ভণ্ড ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে দেখিলে আমার যেন সর্ব্বশক্তি জাগিয়া উঠে।"[৪৮]

(গ) "মানুষের উপকার করবার স্পর্দ্ধা কেবল তারই সাজে, যে নিজে মানুষ হতে পেরেছে ; সর্ব্বাগ্রে হৃদয়বান হওয়া চাই।"[৪৯]

আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস

'বিস্মরণী' কাব্যে কবি মোহিতলালের ঈশ্বরোপলব্ধিবিষয়ক কবিতার সংখ্যা বিরল। তবে 'মৃত্যু ও নচিকেতা' নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে নাট্যরূপের অনেকখানি নির্লিপ্ততার মধ্যেও তাঁর অধ্যাত্মচেতনা স্পষ্ট। কবি নিজেও কবিতাটিকে তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পরিচয়বাহী বলে স্বীকার করেছেন।[৫০]

নচিকেতা চরিত্রের ঔপনিষদিক পরিচয়কে মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি এখানে স্বকীয় উপলব্ধি ও ধ্যানকে মাঝে মাঝে প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুদেবতার অস্তিত্বে কবির বিশ্বাস এখানে গোপন থাকে নি। এই কবিতাটি ব্যতীত 'বিস্মরণী'তে মোহিতলালের আস্তিক্যবোধ-সম্বলিত আর কোন কবিতা নেই। সমকালীন বাঙলাকাব্যে রবীন্দ্রকাব্যের আস্তিক্যবোধের প্রভাবে, কাব্যে ভূমা বা অতীন্দ্রিয়বাদ বড়ই প্রাধান্য লাভ করায় বাস্তব দেহজীবনের কথা গৌণ হয়ে পড়েছিল। এইজন্যে ইচ্ছে ক'রেই তিনি এ-বিষয়ে কবিতা লেখায় উৎসাহী হন নি। কিন্তু তাঁর অবচেতন মনের গভীরে মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি বিশ্বাসবোধ ছিল। বাইরে থেকে কবিকে যাঁরা দেখতেন, তাঁরা তাঁর মনোগহনের ঐ বিশ্বাসের পরিচয় অনেক সময় পেতেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মুখে তাঁকে ব্যক্তিজীবনে আস্তিকরূপেই জানা গেছে। নিকট সম্পর্কে এসে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"তিনি (মোহিতলাল) জগৎ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেও একটি নীতিকে আবিষ্কার করেছিলেন। তাকে তিনি জানতেন। মনে মনে মানতেনও। কিন্তু মনে মানা এক কথা এবং নিঃসংশয় বিশ্বাসে তার অনুশীলন আর এক কথা।...বিশেষ ইষ্ট এবং সেই ইষ্টের সপ্রেম ধ্যান তিনি করেন নি। সেই কারণেই তাঁর জীবনে কঠোরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৫১]

মোহিতলালের জীবনের 'উত্তরোত্তর কঠোরতা বৃদ্ধি'র জন্যে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর যাকে দায়ী করেছেন তা অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যে নীতিকে তিনি 'মনে মনে মানা'র কথা বলেছেন তা বিশ্বের ন্যায়নীতি এবং তার স্রষ্টা ভগবান। এইটিই তো তাঁর অবচেতন মনের বিশ্বাস। পরবর্তী কাব্যগুলিতে কবির এই বিশ্বাস প্রবলতর হওয়ার প্রমাণ মিলবে। 'কালাপাহাড়' কবিতায় 'নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই' বা 'ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে!'—প্রভৃতি উক্তি আত্যন্তিক দেবভক্তির অন্ধত্বে ও মনুষ্যত্বের নিদারুণ অবমাননায় ক্ষুব্ধ কবির সচেতন মনের উচ্ছ্বাসমাত্র।

কবির জন্মান্তর সম্পর্কিত পূর্বোক্ত বিশ্বাসটি 'বিস্মরণী' কাব্যে সংশয়াচ্ছন্ন। জীবনপ্রেমের গভীরতার ফলেই এই সংশয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। অর্থাৎ কবির অবচেতন মনে ছিল জন্মান্তরীণ বিশ্বাসের সুদৃঢ় আসন আর সচেতন যুক্তিবাদী মনে যুগধর্মে জাগ্রত হয়েছিল অবিশ্বাসের অঙ্কুর। এই

বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় আন্দোলিত দ্বন্দ্বকাতর কবিচিত্তের পরিচয় এ কাব্যে মাঝে মাঝে লক্ষণীয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

জন্মান্তর বিশ্বাস—

"ওগো, তোমায় পথ খুঁজে আর আস্‌তে হবে নাক'
যেথায় থাকো, ঘুমিয়ে তুমি থাকো!
স্মরণ-শিখায় প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে,
বছর পরে বছর ঠেলে-ঠেলে
পৌছব যে তোমার ঘরে আমি—
সেদিনের সেই চার-চোখেতে প্রথম-চাওয়ার স্বামী।"

(মৃতপ্রিয়া)

অবিশ্বাস—

"তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ!—
দেহ-লীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে।" (মৃত্যুশোক)

বিশ্বাস—

"এ ধরার মর্ম্মে বিঁধে রেখে যাব স্নেহ-ব্যথা, সন্তান-পিপাসা,
তাই র'বে ফিরিবার আশা।"

(মোহমুদ্গর)

অবিশ্বাস—

"আর যদি না-ই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ?" (পান্থ)

কিন্তু মনে রাখা দরকার অবচেতন মনের বিশ্বাসটিই যথার্থ। সচেতন মনের ওপর তার আধিপত্য নষ্ট হলেই জাগে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব যে জেগেছে তা স্পষ্ট। কিন্তু অবচেতন মনের বিশ্বাসের প্রমাণ কি? হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে সংস্কারবশতই হোক বা রবীন্দ্রকাব্যের প্রভাবেই হোক—জন্মান্তরবিশ্বাস কবির মনের গভীরে ধীরে ধীরে আসন পেতেছে। কিছু পূর্বের কবির একটি উক্তি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করছি—

"অতৃপ্ত-প্রেমের মূলে আছে পূর্ব্বজন্মের association বা অনুষঙ্গ-প্রভাব। এ জন্মে সেই জন্মান্তর-সুহৃদকে চেনে না, খুঁজিয়া পায় না, কিন্তু স্মৃতিজড়িত সেই প্রেম আছে, সেই সঙ্গ-পিপাসা আছে, অথচ 'সে' নাই; যাহাকে

অন্ধ-আবেগে জড়াইয়া ধরে সে আরেক জন—কাহার প্রেম দিয়া সে কাহাকে ভালবাসিতেছে! তাই প্রেমে এত অতৃপ্তি, তাই প্রেমের রহস্য এত গভীর। ঐ জন্মান্তরীণ associationই অনেক ট্র্যাজিডির কারণ হইতে পারে।"[৫২]

মৃত্যুভাবনা

বিকাশপর্বের মতো এই সমৃদ্ধিপর্বেও মোহিতলালের বিভিন্ন কবিতা মৃত্যু-চিন্তার পরিচয়বহ।

'মৃতপ্রিয়া' 'পথিক' 'নবতীর্থঙ্কর' ও 'পান্থ' কবিতায় তাঁর মৃত্যুভাবনার আংশিক পরিচয় এবং 'মৃত্যুশোক' ও 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় পূর্ণ পরিচয় রয়েছে। 'মৃতপ্রিয়া'য় তিনি তাঁর মৃত প্রিয়তমাকে স্বপ্নে জীবন্তরূপে চাক্ষুষ করেছেন। স্বপ্নে তাঁকে মনে হল যে তিনি অন্য এক সাগরতীরের রহস্য-মন্দিরবাসিনী 'পরদেশিনী'। গৃহিণী বা ঘরনীর মিথ্যা পরিচয়ের উর্ধ্বে মরণের পরেই প্রিয়তমা আসল স্বরূপ লাভ করেন—তাঁর মনে এই তত্ত্ব দেখা দিয়েছে। প্রিয়তমার স্মৃতি ধ্যান করতে করতে ধীরে ধীরে তাঁর রাজ্যেই তিনি উপনীত হবেন। দাম্পত্য প্রণয়ের একনিষ্ঠতায় এখানে কবি যে মরণকে তুচ্ছ করেছেন, তাতে তাঁর নিজ বিশ্বাস কতখানি এবং রবীন্দ্রীয় জন্মান্তরীণ সৌহৃদ-সূত্রে প্রিয়তমাকে উপলব্ধির ভাবচিন্তা অথবা বিহারীলালের 'প্রেমের আনন্দ ধামে মরণের ভয় নাই'[৫৩] প্রভৃতি উক্তির প্রভাব কতখানি বলা কঠিন।

'পথিক' কবিতায় রবীন্দ্রীয় সুরে জীবনপথ-পরিক্রমাকে পথিকবৃত্তিরূপে অনুভব ক'রেও মর্ত্যধৃত জীবনাবসানের ভাবনায় তিনি ভীত না হয়ে পারেন নি। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভয়ের কথা' গ্রন্থের বেদান্তীয় মৃত্যুচিন্তা বা রবীন্দ্রীয় মৃত্যুভাবনার আলোকে যিনি কবিতাটির প্রথমেই বলেছিলেন—

> 'জানি শুধু—যাব বহুদূর,
> আসিয়াছি বহুদূর হ'তে' (পথিক)

তিনিই শেষে বলেছেন—

> 'জানিতে চাহিনা কবে
> দেহ-যাত্রা শেষ হবে—
> মুছে যাবে লোক-লোকান্তরে
> অন্তহীন অন্ধকার-স্রোতে।' (ঐ)

বেদান্ত বা রবীন্দ্রীয় চিন্তার আলোকে জীবনকে প্রথম দিকে কবি দেখেছেন, তবে তাঁর ঐ দেখা প্রাণগত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। আর সেইজন্যেই এ কবিতায় তিনি মৃত্যুচিন্তাকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

দেহবন্দনার চূড়ান্ত পরিচয় আছে 'মৃত্যুশোক' কবিতায়। দেহান্তে কিছুই যে থাকে না, দেহচেতনাই যে জগৎ ও জীবনকে রমণীয় করে রাখে, নশ্বরদেহী জীব যে অনশ্বর ভুবনেশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এ কথা এ কবিতায় উচ্চকণ্ঠেই বলা হয়েছে। দেহগত জীবনের প্রতি নিঃসীম মমতায় নিবিড় এবং মহার্ঘ দেহের এমন অপরূপ প্রশস্তি-স্পন্দিত কবিতা সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেই দুর্লভ। তথাপি কবিতাটি ধীরভাবে পাঠ করে আমরা মনে করেছি যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাই একদিকে যেমন কবির দেহজীবনপ্রীতিকে গভীর করেছে, অন্যদিকে ঐ বেদনাই কবিতাটিতে কারুণ্যের সৃষ্টি করেছে।

"উৎসব-শোভা ম্লান হ'য়ে যায়
আলোকের অবসানে,
মরণের ফুল বড় হয়ে ফোটে
জীবনের উদ্যানে।"

(মৃত্যুশোক)

মোহিতলালের বিখ্যাত 'পান্থ' কবিতাটিতে তাঁর অতি প্রবল জীবনপ্রেম ও প্রকৃতিপারবশ্যজনিত উল্লাস অপূর্ব বাণীবন্ধে রূপায়িত হয়েছে এবং মৃত্যুর ওপরে জীবনের জয়ঘোষণা নানাস্থলেই পরিস্ফুট। তথাপি আমাদের মনে হয়, এ কবিতায় জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত জয়গানে কবিকণ্ঠে একটুখানি বেদনার রেশও মিশে আছে। জীবনপ্রেমিক কবির কণ্ঠের সুরও তাই জীবনের বলিষ্ঠ স্তব-মন্ত্র-উচ্চারণে রয়ে রয়ে কেঁপে উঠেছে। উদাহরণ দিচ্ছি—

"মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা!" (পান্থ)

অথবা

"ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্‌চক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদ্‌ভ্রান্ত-হারা!
আমারে হারাই যদি! যদি মরি সুচির-মরণে!
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা!—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা।" (পান্থ)

এখানে প্রথম 'উদ্ধৃতি'তে মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবন-কবির নিকট যে মিনতি জানাচ্ছে, তা সকরুণ কেন? এই 'কেন'র উত্তর আছে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে। বোঝা যাচ্ছে, জীবনরসে বুঁদ হতে গিয়েও কবি নশ্বরতার বেদনা ভুলতে পারছেন না।

জীবনকে ভালবাসে বলেই মানুষের মৃত্যুভাবনা। মৃত্যুভাবনা জীবন-চিন্তারই পরিণাম। মোহিতলালের 'মৃত্যুশোক' 'পান্থ' ও 'পথিক' কবিতায় তাই জীবন ও মৃত্যুভাবনা একই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাঁর বিশিষ্ট জীবনবাদ-বিষয়ক ভাবনার মূলে মৃত্যুভাবনাও যুক্ত থাকায় তলে তলে কবিমনে একটি পরিবর্তনও কাজ করছে। এর প্রমাণ পাওয়া গেল 'মৃত্যু ও নচিকেতা'[৫৪] কবিতায়। ভোগানন্দের মধ্যেও যখন ক্ষণিকতার বেদন-রাগিণী বেজে উঠছে, তখন ভোগটাই হয়তো জীবনের সর্বস্ব নয়। ম্যাথু আর্নল্ড-ভক্ত মোহিতলালের চিত্তেও ঐ ইংরেজ কবির 'Philomela' কবিতার সেই "Eternal passion'এর Eternal pain"ও অনুভূত হয়েছে। এই চিরন্তন বেদনা যেমন ভোগে অতৃপ্তির, তেমনি মৃত্যুভীতিরও। এই বেদনার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির জন্যে বিশ শতকের কবি মোহিতলাল প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ঋষিকণ্ঠ উচ্চারিত মৃত্যুতত্ত্বের রহস্য জানবার জন্যে উতলা হয়েছেন। উপনিষদের মূল বক্তব্য যা সংক্ষিপ্ত গূঢ়াক্ষরে সূত্রাকারে ছিল, তিনি তাকেই অপূর্ব সৃজনশক্তিবলে ও স্বচ্ছ কল্পনাশক্তির সাহায্যে বিশদ করেছেন। নেপথ্যে পিতৃগণের গান, মৃত্যুর স্বরূপ বোঝাতে নচিকেতার কাহিনীচ্ছলে প্রাকৃতিক জগতের বাস্তব উপমা-প্রয়োগ, উপনিষদে যমদেবতার মুখে আত্মার রহস্য ব্যাখ্যার স্থলে মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং পার্থিব বিত্ত ও ভোগ্য বস্তু কেন তর্পণীয় নয়, তা বোঝাতে নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা—প্রভৃতি এ-কবিতায় তাঁর মৌলিক দৃষ্টি ভঙ্গিরই পরিচায়ক। কিন্তু এ মৌলিকতা উপনিষদযুগের একটি জীবন্ত প্রেক্ষাপটসৃজনে অদ্ভুত সাফল্যলাভ করেছে। বালক নচিকেতা ভোগের সহস্র উপকরণ যমদেবতার কাছে পেয়েও খুশী হতে পারেন নি—

> "ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
> আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা? এই মোর দেহ
> জরিবেনা গুপ্তচর জরা সে তোমার?
> ... ...
> কহ তবে
> কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ?
> সহস্র-শরৎ আয়ু? তার বেশী নয়?"
>
> (মৃত্যু ও নচিকেতা)

অতএব 'জীবনের শ্রেষ্ঠবর' 'বিত্ত আর পরমায়ু'র অঙ্গীকারে বালক নচিকেতা তথা কবির চিত্ত শান্ত হল না। অবশেষে মৃত্যুদেবতার মুখে নাচিকেতা

জানলেন 'বিশ্বপ্রাণে নিজ প্রাণধন' বিলিয়ে দিয়ে যে লাভ 'সে আনন্দ সেই মৃত্যু অমৃত সমান।" এর সঙ্গে উপনিষদের বক্তব্যেরও কোনো পার্থক্য নেই। সেখানে দেখি,—"True knowledge which consists in recognising the identity of the individual soul with the world soul, raises its possessor beyond the reach of death."[৫৫] বিশ্বপ্রাণের মধ্যে আত্মবিলোপী সুমহান্ ত্যাগের মধ্যেই আছে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার নিগূঢ় আশ্বাস। উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী মোহিতলালের-ভোগবাদ বিষয়ক ধারণার একেবারে মূল ধরেই টান দিল। 'বিকাশপর্বে'র সেই 'ত্যাগ-নহে ভোগ'—উচ্চারণকারী কবি এখন ত্যাগেরই মহিমায় বিস্মিত ও আশ্বস্ত। আর ঠিক এই কারণেই 'সমৃদ্ধিপর্বে' বীর যুবক যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেবের মৃত্যুবরণ অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে তাঁকে মুগ্ধ করেছে। 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতায় তাই তিনি বলেছেন—

> হে সুপর্ণ। হে গরুড়! কোথা হ'তে সুধা সঞ্জীবনী
> হরিয়া করিলে পান মৃত্যুবিষ-মন্থন পাথারে?
> ... ...
> কোন্ শাস্ত্র শিখাইল অবহেলে আত্ম বলিদান?"
>
> (নবতীর্থঙ্কর)

দেখা গেল, 'সমৃদ্ধিপর্বে'ই মৃত্যুভাবনার দুঃসহ দ্বন্দ্ব থেকে কবির পরিত্রাণ ঘটেছে বিশ্বপ্রাণে আত্মপ্রাণের উৎসর্জনে কিংবা আত্মলোপী প্রেমের অনুশীলনে।

সমৃদ্ধিপর্ব : রূপকথা

'বিস্মরণী'র পরবর্তী কাব্য 'রূপকথা'। 'সুবীর শিশু গ্রন্থমালা'রূপে ১৩৫২ সালে জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্সের পক্ষ থেকে কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুনে 'রূপকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটি কবির দুই মৃতা কন্যা—অমিয়া ও অরুণাকে উৎসর্গিত। এতে কবিতার সংখ্যা মোট পনের। এর অধিকাংশ কবিতা ১৩৩৮ সাল থেকে ১৩৪২ সালের মধ্যেই লিখিত। 'রূপকথা' 'ঘুমপাড়ানি'[৫৬] ও 'শিউলির বিয়ে' কবিতা তিনটি 'হেমন্তগোধূলি' ও 'বিস্মরণী' কাব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাকি কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি। কবিতাগুলি রচনার পশ্চাৎ ইতিবৃত্ত কতকটা কবি নিজেই এইভাবে দিয়েছেন—

"এককালে ছেলেদের জন্য কয়েকটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, যাঁহাদের তাগিদে

লিখিয়াছিলাম, তাঁহাদের পত্রিকাতেই সেগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।···এই কবিতাগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নহে; ইহাদের কাব্যরস কিশোর বা বালক-মনের উপযোগী। ভাব ও ভাবনার প্রসার ইহাতে যেটুকু আছে তাহা অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ, এবং ভাষা কুত্রাপি কঠিন নহে,—এইজন্য কাব্যরস-পিপাসু কিশোর-কিশোরীদের হাতে আমি এই ক্ষুদ্র কবিতাগুচ্ছ তুলিয়া দিলাম।"[৫৭]

মোহিতলাল কবিধর্মে যেরূপ গম্ভীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তাতে 'স্মরগরল'এর কবিতাগুলি রচনাকালে 'রূপকথা'র কবিতাগুলি কেন লিখলেন, তা ভাববার বিষয়। ফরমাইসী কবিতা লিখতে তো তিনি বরাবর অনিচ্ছুক ছিলেন। "পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া যায় এমন কতকগুলি কবিতা লিখতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম"—কবি কালিদাস রায়ের এই অনুরোধের জবাবে মোহিতলাল লেখেন,—"বরাতী লেখা আমি লিখতে পারব না।"[৫৮] অথচ এই কবি 'রূপকথা'র গ্রন্থ-পরিচয়ে বলেছেন যে বাইরের তাগিদেই এর কবিতাগুলি লিখিত। তাঁর এমন পরস্পর বিরোধী উক্তির অর্থ কি?

আমাদের ধারণা তিনি অসত্য কিছু বলেন নি। 'রূপকথা'র কবিতাগুলি নিছক বাইরের তাগিদেই লিখিত হয় নি। 'রূপকথা'র ভূমিকায় তাঁর বক্তব্য আংশিক সত্য। কবি নরেন্দ্রনাথ দেব এবং গিরিজাকুমার বসু—এঁরা তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এঁদের তাগিদের সঙ্গে কবির অন্তরের তাগিদ যুক্ত না হলে তিনি কখনই এ শ্রেণীর কবিতা লিখতেন না। কবি মোহিতলালের মনোরাজ্যের সেই গোপন সংবাদ জানলে আমরা বুঝতে পারব 'স্মরগরল'এর গুরুপাক কবিতাগুলি লেখার সময়ে কেন তাঁর 'রূপকথা'র কবিতাগুলির লেখার উৎসাহ।

'শিউলির বিয়ে'[৫৯] ও আরও তিনটি কবিতা বাদ দিলে বাকী কবিতাগুলির অধিকাংশই ১৩৩৮-৪২ সালে লিখিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কবির ব্যক্তি জীবনের যে কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে তা স্মরণ করলেই তার মনোরাজ্যের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে দু'একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করছি। এইকালে অতিশয় স্নেহভাজন অনুজ-প্রতিম কবি নজরুলের সঙ্গে বিরোধে তাঁর মানসিক অবস্থা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ ছিল। এই অশান্তি ১৩৩৮ সালে তাঁর দুই কন্যার মৃত্যুতে চরমে উঠল। তাছাড়া এই বছরেই এক শিশু পুত্রের মৃত্যুও তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করল। দুই শিশুকন্যার ও পুত্রের বিয়োগ বেদনায় কাতর কবি তাঁদেরই রাজ্যে স্মৃতির

অর্গল উন্মুক্ত ক'রে মানস-প্রয়াণ করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ দেব ও গিরিজাকুমার বসু তাঁদের পত্রিকায় লেখবার জন্যে কবিকে অনুরোধ জানালেন। বাইরের প্রেরণার সঙ্গে অন্তরের তাগিদ যুক্ত হলো—আর এই কারণেই 'রূপকথা'র কবিতাগুলির জন্ম।

প্রকাশিত 'রূপকথা' কাব্যে তিনশ্রেণীর কবিতা—তিনটি অনুবাদ, দুটি পূর্ববর্তী কাব্য থেকে সংগৃহীত এবং দশটি সন্তান-বিয়োগে মানসিক শান্তির প্রয়োজনে রচিত। এই তথ্যটির সঙ্গে আমরা আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'কাব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের 'শিশু'কাব্যের পরিচয় দান করতে গিয়ে লিখেছেন, "শিশু কাব্যের কবিতাগুলি তিনভাবে সাজানো চলে। প্রথমত, গোটা কয়েক অনুবাদ দ্বিতীয়ত, কতকগুলি পূর্বতন কাব্য হইতে বাছিয়া লওয়া, ইহাদের অধিকাংশই কবির অল্পবয়সের রচনা। তৃতীয়ত, প্রথম বত্রিশটি কবিতা। এই শেষোক্ত অংশটিকেই প্রকৃত শিশুকাব্য নাম দেওয়া যায়।"[৬০]

অতঃপর ঐ সমালোচক এই তৃতীয় অংশ রচনার মূল প্রেরণার ইতিহাস উদ্ধৃত করেছেন—"স্ত্রী বিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন, তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন; তাহার নাম 'শিশু'। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে মাতা ও পিতা উভয়ের স্নেহলাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহরস হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবণ বালক-হৃদয়ের সুখ দুঃখ জাগিয়া এই কাব্য শিশু-জীবনের আনন্দলোককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।"[৬১]

আশা করি, ঐ উদ্ধৃতি থেকেই মোহিতলাল ও রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতা-রচনায় সাদৃশ্যটুকু উপলব্ধ হবে। হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যের আদর্শে পরবর্তীকালে মোহিতলাল তাঁর 'রূপকথা'র কবিতাগুলিকে অনুরূপ পন্থায় সজ্জিত করেছেন। কিন্তু উভয় কবির মনে এ শ্রেণীর কবিতা-রচনার পশ্চাতে যে শোকাবহ ব্যাপারটি আছে, সেখানে অনুকরণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য এই শ্রেণীর কবিতায় শিশু মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে বিশ্বসৌন্দর্যের সঙ্গে শিশুর সৌন্দর্যকে মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে অত্যুচ্চলোকে তাঁর কাব্যকে নিয়ে গেছেন, তার সঙ্গে মোহিতলালের কোনো সাদৃশ্য নেই। আমরা সেকথা বলি নি।

এখন প্রশ্ন, মানসিক দুঃসহ যন্ত্রণা বা তীব্রতম শোকব্যথাকে হাল্কা করার জন্তে কবিদের কেন এই শিশু-রাজ্যে মানস-প্রয়াণ? এ জগৎ কিভাবে তাঁদের কাছে সান্ত্বনার হেতু হয়? আসলে শিশুর জগৎ কল্পনা ও রূপকথার জগৎ। সম্ভব-অসম্ভবের পরিলেখ এখানে নেই। বাস্তব সংসারের বিধি-বিধান, সত্যাসত্য নির্ণয়ের হিসেবী মাপকাঠি, যুক্তিতর্ক ও কলরব এ রাজ্যে অনুপস্থিত। এ রাজ্যের নায়ক শিশুই। প্রত্যেক মানুষকেই একদা তার এই অতিপ্রিয় রূপকথার জগতে বাস করতে হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঐ রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত হয়। ভাবদুর্গের অধিবাসী কবি বা সাহিত্যিকদের জীবনে কিন্তু এই কল্পনাপ্রবণ রহস্যময় বাল্যের আকর্ষণ সর্বাধিক। এ জগতে আসতে পারলে বিড়ম্বিত বাস্তব-জীবনের সমস্ত জ্বালা, সমস্ত দুশ্চিন্তা, সমস্ত নৈরাশ্য-বেদনার হাত থেকে ক্ষণিকের জন্তেও মুক্তি পাওয়া যায়। সেই মুক্তিদশায় স্মৃতির আলোকে যা লাভ করা যায়, তার মূল্য অপরিসীম।[৬২]

মোহিতলাল তাঁর 'রূপকথা' গ্রন্থটিকে "ঠিক শিশুপাঠ্য" বলতে চান নি, —বলেছেন, 'ইহাদের কাব্যরস কিশোর বা বালক মনের উপযোগী।' শিশু ও কিশোরের জগতে তফাত কিসে? কল্পনা, রহস্যময়তা ও অজ্ঞতার মাত্রাভেদে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনা-উদ্বেল অপরূপ দেশটিতে বাস্তব জগতের আলো, হিসেবী বুদ্ধি, তর্ক ও চিন্তার আনাগোনা শুরু হয়। শৈশবের পরবর্তী স্তরই কৈশোর। কিশোর শব্দের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক—১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত যার বয়স। বলাবাহুল্য এই বয়সেও কিশোরের মনে পূর্বের স্বপ্ন, বিস্ময় ও কল্পনার যথেষ্ট আধিপত্য থাকে। তবে শিশুর মতো সে অতখানি অবুঝ বা বাস্তবজ্ঞানহীন নয়। কৌতূহল এবং বিস্ময় কিশোরেরও কম নয়। কিন্তু শিশু যাতে কৌতূহলী ও পুলকিত, কিশোর তাতে উচ্ছ্বসিত নয়। আবার কিশোরের যাতে উল্লাস, শিশু তার মর্ম অনুধাবন নাও করতে পারে। শিশুর খেলনা ও বায়না কিশোর আর চায় না। শিশুর জগতের চেয়ে তার জগৎটি অনেকখানি সীমিত। শিশু ও কিশোরের মনোজগতের এই পার্থক্য থেকে বুঝতে পারা যায়, এদের জন্তে রচিত সাহিত্যেও কোথায় ভেদ থাকা প্রয়োজন। এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেই মোহিতলাল তাঁর কাব্যকে নিছক শিশুকাব্য বলতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। 'রূপকথা'র অনুবাদ কবিতাগুলি বাদ দিয়ে বাকীগুলির বিচার করলে আমরা দেখব, এগুলিও সব কিশোর বা বালক মনের উপযোগী নয়। অল্পসংখ্যক কবিতা শিশুদের জন্তেও রচিত বলে মনে করা যায়। এই কারণেই বোধ হয় কবির সংশয়পূর্ণ ভাষা—

'ঠিক শিশুপাঠ্য নহে'। কবিহৃদয়ের এই সংশয়ের হেতু পরে বিশ্লেষণ করা হবে। সে যাই হোক, 'পুজোর পোষাক' 'শান্ত খোকা' 'চালাক জগাই' এবং 'আড়ি ও ভাব' এই চারটিকে শিশুকবিতা, 'স্মরণে', 'রূপকথা' এবং 'পুষ্পজীবন'কে কবির ব্যক্তিগত স্মৃতি-রোমন্থনের কবিতা আর 'মায়ের প্রতিমা' 'বীরগাথা' 'রাজবেশ' এবং 'শ্রাবণের গান' এই কয়েকটিতে কিশোর কবিতা বলা যেতে পারে। তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিরোমন্থনের তিনটি কবিতা এবং 'রাজবেশ' ও 'শ্রাবণের গান'এর রস বয়স্কদেরও উপযোগী।

অতঃপর কবিতাগুলির আলোচনা। দুই মৃতাকন্যাকে কাব্যটি উৎসর্গকালে 'স্মরণে' শীর্ষক কবিতায় মোহিতলালের পিতৃসত্তা হাহাকার করে উঠেছে। কন্যা দুটির মৃত্যুর এক বছর পরে কবি ১৩৩৯ সালের 'শনিবারের চিঠি'র শ্রাবণ সংখ্যায় বিখ্যাত 'মৃত্যুদর্শন' লিখেছিলেন। আর ১৩ বৎসর পরে 'স্মরণে' কবিতায় তিনি যা বলেছেন, তাতে বোঝা যায় ঐ সন্তানদ্বয়ের চিরবিদায়[৬৩] কি নিঃসীম শূন্যতায় কবিচিত্তকে নিক্ষিপ্ত করেছে—

"চোখ বুজে আজ খুঁজছি তোদের, বুকের তলার অন্ধকারে,
কোথায় আছিস্ আছিস্ কি নেই—সেকথা কেউ বলতে নারে।
... ...
আছিস্ তোরা—আছিস্ বেঁচে আমার নিশাস চোখের জলে,
থাকবিনে আর, ডুবব যখন আমিও সেই আঁধার জলে।
... ...
ধর্ মা তোরা তোদের বাপের বুক-ভাঙা এই ব্যথার দান,
তোদের কথাই রূপকথা যে এমনি আমি ভাগ্যবান।"

(স্মরণে)

অমিয়া আর অরুণার কথাই আজ পিতা মোহিতলালের কাছে 'রূপকথা'। রূপকথার জগতে বিচরণ করেই তিনি তাঁর ব্যথাদিগ্ধ অন্তরকে আশ্বস্ত করবেন। আত্মসান্ত্বনার ছলেই তাই তিনি রূপকথার রাজ্যে কি যেন সন্ধান করছেন।

"কোন্ জনমের কোন্ মার মুখ,
কোন্ অতীতের কোন্ সুখ-দুঃখ
নূতন করিয়া ভরি' তোলে বুক—
সকলি হয়েছে পর।
তাই ভাবি, আর দেখি—মুখখানি সবচেয়ে সুন্দর!"

হারা-মুখ স্মরণে পিতার চোখেও জল নামছে—

"কারো পানে চেয়ে মনে হয় যেন, যে জন গিয়েছে চলে'
সে-দিনের খেলা সাঙ্গ না করি', কাহারে কিছু না বলে'—
সেই যেন হোথা উঁকি দিয়ে চায়,
... ...
কাঁদে যেন দেখা হ'লে!
অত দূরে থেকে সুখ হয় কারো? কেন গেলি ভাই চলে'?"

(রূপকথা)

নিরুদ্দেশের রাজ্যে হারা কবির কোনো এক পুত্রের স্মৃতিরোমন্থন রয়েছে 'ভোলানাথ' কবিতায়। পথ ভুলে ভোলানাথের মতো কবির গৃহে সে এসেছিল, 'আকাশের নীলে' সে আবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। এই পুরাতন স্মৃতি-স্মরণ ক'রে তিনি সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করছেন—

"দুধের বাটিতে দুধ যে রহিল পড়ে'।
চোখের কাজল—আধেক রহিল টানা,
চুমাটি খাইতে মু'খানি গেল যে নড়ে'—
তাও শেষ করে' যেতে কি আছিল মানা?"

(ভোলানাথ)

শোককাতর পিতার এই আত্মসান্ত্বনার চেষ্টা 'পুষ্পজীবন' কবিতাতেও লক্ষণীয়। পুষ্পের অমরজীবন কল্পনার সাহায্যে তিনি সন্তানদের অস্তিত্বে আস্থা আনবার চেষ্টা করছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হল—ফুল ঝরে, কিন্তু মরে না। বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে আবার তারা দেখা দেয়। ফাল্গুনের অশোক-শাখে কোকিলের ডাক, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, আকাশের নীলমেঘ ও অঘ্রানের তৃণের বুকে শিশিরবিন্দু—চিরকালই তো আছে। সীমিত দৃষ্টিতে বিশেষ কোকিল, বিশেষ মেঘ ও বিশেষ শিশিরবিন্দু নিশ্চয়ই আর দেখা যায় না—কিন্তু দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেই সমষ্টিগতভাবে তাদের অব্যাহত ধারায় অমর-জীবনের পরিচয় মেলে। কবির সন্ততিরাও ফুলেদের মতো ঝরে গিয়েও তাই মরে নি। এখানে যে চারটি কবিতার কথা আলোচিত হল, প্রত্যেকটিতেই স্মৃতিচারণ। এগুলি যে শিশুকাব্য নয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার এগুলি কিশোর মনের উপযোগী কিনাও সন্দেহ। তবে ব্যক্তিগত স্মৃতি-রোমন্থনের কবিতা হিসেবে এগুলি মূল্যবান।

'পূজোর পোষাক' কবিতায় তিনি স্বীয় শিশু কন্যার অদ্ভুত একটি খেয়ালকে কাব্যরূপ দিয়ে কন্যাস্মৃতি-লালনের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন।

আবার শিশুকন্যার আকাশ-কুসুম খেয়ালটি সকল শিশুরই একটি চিরন্তন অভিলাষ হওয়ায় কবিতাটি শিশু-কবিতারূপেও অনবদ্য। কবির তিন বছরের শিশু-কন্যার 'বাবা' সাজার সখ হয়েছে। রুমাল, চাদর, মনিব্যাগ, জুতো, পাঞ্জাবি যা কিছু পিতার ব্যবহার্য সমস্তই কন্যার মাপসই মতো ক্রয় করা হল। পুজোর এই পোষাক পরিধান করে মেয়ে কাছে এসে তাঁকে বলল—

'কেমন আমি বাবা হলেম, দেখো দিকিন চেয়ে।' (পুজোর পোষাক)

কিন্তু 'বাবা' সেজেও আদরের দুলালী সন্তুষ্ট হল না। ক্রোধের সঙ্গে সে বলে উঠল—

"বাবা তুমি আমার জন্যে আনলে না যে গোঁপ।" (পুজোর পোষাক)

'চালাক জগাই'এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দাদার প্রশংসা করায় ভাইএর ক্রোধ এবং নিজ চালাকির হাস্যকর কাহিনী বিবৃত ক'রে দাদাকে ঠকানোর প্রসঙ্গ—একদিকে যেমন উপভোগ্য, অন্যদিকে তেমনই শিশুমনেরও উপযোগী।

'শান্ত খোকা' কবিতায় কবি ব্যক্তিগত সন্তান হারানোর বেদনা লাঘব করতে চেয়েছেন বটে, তবে এখানে রুগ্ন-শিশুর আচরণ যে কোনো শিশুর আচরণ বলে গৃহীত হতে পারে। সেইজন্যে শিশু কবিতা হিসেবে এটি মূল্যবান। 'শান্ত খোকা'র চিত্রটি করুণ ও মনোরম। রুগ্ন সন্তান আর তার শয্যাপার্শ্বে অশ্রুসিক্তা মাতা। সন্তানকে বার বার ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টায় অবোধ খোকা ভাবছে যে তার দুষ্টুমির জন্যেই বোধ হয় শাস্তি-স্বরূপ এই ওষুধের আয়োজন। সে আর দুষ্টুমি করবে না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাকে ওষুধ দিতে নিষেধ করছে। বদ্ধ ঘরে রুগ্ন শিশুর মন বাইরের ডাকে ছুটে যেতে চায়। 'পাখনা মেলে' 'নীল আকাশের কোলে' তার উধাও হয়ে যাওয়ার কথা মা শুনেছেন। খোকার ধারণা, সেই জন্যেই বোধ হয় মায়ের চোখে জল। মায়ের চোখের জলের অর্থ অবুঝ শিশু এর বেশী আর কি জানে?

মোহিতলালের 'আড়ি ও ভাব' কবিতাটি শিশুবিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিশু-মনস্তত্ত্বের এক অপরূপ বাস্তব আলেখ্য এখানে অঙ্কিত হয়েছে। ছোট শিশুদের মধ্যে 'আড়ি ও ভাব' খেলার একটি নিত্য অঙ্গ। এক মুহূর্তে নিতান্তই তুচ্ছ কারণে যার সঙ্গে একজনের আড়ি হয়, পরমুহূর্তেই আবার তারা ভাব পাতাবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন ভাব করতে উৎসুক ও অন্যজন যদি অকারণ গম্ভীর হয়ে ওঠে, তাহলে ভাব-করতে আসা শিশুর অবস্থা কিরূপ হয়, তারই একটি সুন্দর চিত্র এখানে আছে। আলোচ্য কবিতায় একজন শিশু আরেকজনের নামে দোষারোপ ক'রে পণ্ডিতমশাইকে বলায়

দুজনের মধ্যে আড়ি হয়ে গেছে। যে আড়ি করেছে, তার কাছে অন্য শিশুটি মজার কলম, গল্পের বই, পেন্সিল, জলছবি প্রভৃতির কতো গল্প ভাব পাতাবার আশায় বলে গেল। জ্যাঠাইমার নেবুর আচার, বাগানের জামরুল, পেয়ারা, কাগজ মোড়া আমচুর—কোনো কথাই বাদ দিল না সে। তখন কি আর অন্যজন কথা না বলে থাকতে পারে? শিশুদের আড়ি শরতের লঘুমেঘ। একজনের একটুখানি আগ্রহের অনুকূল বাতাসে তা কোথায় উবে যায়—তাই এক মুহূর্তে একটি কথায় তাহাদের ভাব হয়ে গেল—

"আর হবে না ভাব কিন্তু
আয় খেলিগে ডাংগুলি।" (আড়ি ও ভাব)

'মায়ের প্রতিমা' 'রাজবেশ' ও 'বীরগাথা' তিনটি কবিতার বক্তব্য কিশোর-চিত্তের উপযোগী। দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার গঠনারম্ভ থেকে পুজো পর্যন্ত কালটিতে যে ব্যবধান, তা বালকের পক্ষে ধৈর্যচ্যুতির কারণ। দেবী-পূজার পুরোহিতের চেয়ে শিল্পী 'পালকাকা'ই বালকদের বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তারপর এমন সুন্দর প্রতিমার দ্রুত-বিসর্জনও তাদের চিত্তে নিদারুণ বেদনারই হেতু। এই সমস্ত কথাই বালকমনের সামঞ্জস্যসূত্রে স্বাভাবিকভাবেই 'মায়ের প্রতিমা' কবিতায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু 'রাজবেশ' কবিতার বক্তব্য তেমন স্পষ্ট নয়। রাজা নিঃস্ব হয়ে বনে গিয়েও রাজবেশের প্রলোভনকে জয় করতে পারেন নি—এই অনুভূতিটি কবিতায় তেমন চিত্তস্পর্শী হয় নি। 'বীরগাথা' এবং 'শ্রাবণের গান'—দুটি কবিতাই অপরূপ। 'শ্রাবণের গান' কবিতা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর। বয়স্কেরাও এর রস আস্বাদনে আনন্দিত হতে পারবেন। পল্লীগ্রামে শ্রাবণের বাস্তবরূপ আর কবিদের কাব্যে অঙ্কিত শ্রাবণ-রূপের পার্থক্য এবং উভয়রূপকে সমান মর্যাদার সঙ্গে যুক্তিভিত্তিক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এ কবিতায়। কবিতাটির শেষের দিকে শ্রাবণদিনে ঘরে বসে 'সারাদিন শুধু অঙ্ক কষিতে থাকো'—কিশোরদের প্রতি এই উপদেশ কবিতাটিকে বয়স্কদের রাজ্য থেকে কিশোরদের রাজ্যে ঠেলে দিয়েছে।

'বীরগাথা' কবিতাটিও কিশোর-কবিতা হিসেবে ত্রুটিহীন। কবি প্রথমেই জানিয়েছেন—

ওগো সুন্দর যুবা বীরবর। ধরা দাও মোর গানে,
তোমার কাহিনী ধ্বনিয়া তুলিব চির-কিশোরের কানে।
(বীরগাথা)

এই বীরের রূপকথার জগতেই বাস। তার 'মুকুতার খাপে বাঁকা তলোয়ার'

'জড়োয়ার জরীর ফাঁসে উষ্ণীষে হীরার দোলক', 'দুই কানে বীরবৌলি', গলায় 'আধেক চাঁদের মালা' ললাটে 'রক্ততিলক' আর 'আঁখিতে প্রতিভা'র দীপ্তি। নীলসাগরের কূলে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর যেখানে ইন্দ্রনীলের ফুলে সোনার ভ্রমর আর নিত্য জাফরান রাঙা জ্যোৎস্নার আলো—সেই অজানা দেশে অশ্বারোহী বীর ছুটে চলেছে এক স্বপনপাখির সন্ধানে। অথবা সে চলেছে পৃথিবীর অপর একটি হিমময় মেরুদেশের প্রান্তে—যেখানে একটি গাছে দুর্লভ সোনার আপেল ফল ফলেছে, কিংবা বীরযুবা চলেছে কোনো এক নির্জন গিরিচূড়ের দানবপুরীতে—যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা সোনার খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে চোখের জল ফেলছে—তার উদ্ধারকামনায়। এই বীরের কাহিনী শুনতে শুনতে কিশোরের মনও দুঃসাহসিক অভিযানে 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

"আমরাও তাই ছুটে বাহিরাই—দেহ থাকে পিছে পড়ি'—
প্রাণ তোমা সাথে করে অভিযান দুর্গম পথ ধরি'।"

(বীরগাথা)

আর যারা বয়স্ক তাদের অন্তস্তলে নিদ্রিত চিরকিশোরের ঘুম ভেঙে যায়।

মোহিতলালের 'রূপকথা' কাব্যালোচনার এইখানেই শেষ। এই কাব্যের 'শ্রাবণের গান' 'রাজবেশ' 'রূপকথা' 'পুষ্পজীবন' এই কয়েকটি কবিতা ঠিক শিশু বা কিশোর মনের উপযোগী নয়—বরং এগুলি বয়স্কদের জন্যেই যেন লিখিত। কিন্তু মোহিতলাল এ কাব্যের সমস্ত কবিতাকে বালক বা কিশোর মনের উপযোগী বলে অভিহিত করেছেন। আবার এ-কাব্যে শিশুদের জন্যেও কয়েকটি কবিতা আছে। এমন মিশ্রণের কারণ কি? আমরা মনে করি কবিচিত্তের সেই অন্তর্নিহিত দ্বিধা বা দ্বন্দ্বই এর মূলে। এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় সার্থকতা অর্জন করতে গেলে কবিকে সকল অভিমান বিসর্জন দিয়ে শিশু বা কিশোরের মন নিয়েই অগ্রসর হতে হয়। মোহিতলালের মতো গম্ভীর ও চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে সে কাজ সহজ নয়। অথচ এই একটিবার মাত্রই তিনি অন্তর ও বাইরের তাগিদে ভাব ও ভাবনার উচ্চমার্গ থেকে নেমে এই শ্রেণীর কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এ কিছু তাঁর স্বধর্মচ্যুতিও নয়। কিন্তু তাঁর চিত্ত-প্রকৃতিতে এই 'সন্ধিপর্বে'ই দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। তাঁর জীবনবাদে, মৃত্যুভাবনায়, সৌন্দর্য ভাবনায়, ব্যক্তিপ্রশস্তিতে, জন্মান্তরবাদে—সর্বত্রই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সুতরাং এখানেও কবির অজ্ঞাতে যদি সেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে আশ্চর্যের কি আছে? এই কারণেই এ কাব্যে বিভিন্নপ্রকার

কবিতার মিশ্রণ। তথাপি এ দ্বন্দ্ব কবির 'রূপকথা'র কাব্যগত ভাবকে ভাবনায় রূপান্তরিত করে নি। বরং এই একটি ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর মনের দ্বন্দ্বকাতর অবস্থা থেকে অনেকখানি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। তাই ভাবনার দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট-শ্রান্ত-ক্লান্ত কবির এ কাব্যে যেন ক্ষণ-বিশ্রামের আয়োজন। দ্বন্দ্বের গুরুভারকে সহনীয় ক'রে তোলবার জন্যে এ মানস-প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল বৈ কি।

পর্বশেষে

'সমৃদ্ধি পর্বে'র 'বিস্মরণী' কাব্যে কবির বিভিন্ন প্রবণতাগুলির ক্রমবিকাশ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এই পর্বে 'বিকাশপর্বে'র ভাবানুভূতিগুলি বহুস্থলেই ভাবনায় রূপান্তরিত। পূর্বের স্বপ্নরস বা কবির রোমান্টিক মনোভাব এ পর্বে অনেকখানি সংযত। কল্পনাপ্রবণতা এখানে যে নেই তা নয়, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবজীবনের দুঃখযন্ত্রণা, ভোগ-কামনা ও তজ্জনিত দ্বন্দ্ব, মৃত্যুভাবনা, মানবমহিমা বা উচ্চাদর্শ-প্রীতি—প্রভৃতি কবিচিত্তকে অধিকার করেছে। মোহিতলালের কাব্যের ভোগবাদ বা জীবনবাদ যে অতর্কিতভাবে কবিচিত্তে সমুদিত কোনো বস্তু নয়, তৃতীয় অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা গেছে। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি, মননসমৃদ্ধ সৃষ্টি এবং বক্তব্যে নাটকীয় গুণ নিয়ে তিনি যখন তাঁর স্বকীয় স্টাইল-লক্ষণাক্রান্ত এই পর্বের 'বিস্মরণী' কাব্যটিকে বঙ্গের বাণীমন্দিরে উপস্থাপিত করলেন, তখন তরুণের দল উল্লসিত চিত্তে ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্যের অতিরঞ্জনটুকু বাদ দিলেও সত্যটুকু উপলব্ধিতে অসুবিধে হয় না। তাঁরা লিখেছিলেন—

" 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হবার পর এ কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।…রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় Romanticismএর ভগীরথ—এক রোমান্টিসিজমের চরম বিকাশ হয়তো তাঁর কবিতায় হয়েছে। কিন্তু Romanticism ছাড়াও যে উঁচুদরের কবিতা হয়, সে কথা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন। আজ যদি বাংলা কবিতায় অনেকখানি dramatic ও intellectual element প্রবেশ করে থাকে, তবে তার জন্যে আমরা যুগধর্মকে অভিশাপ না দিয়ে অভিনন্দনই করি।…রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন বাংলা সাহিত্যকে শাসন করতে আরম্ভ করলে, তখন একটা হলো তার reaction অতএব revolution এবং আর একটা হলো তার evolution. এই revolution রূপ পেয়েছে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-

নাথ সেনগুপ্তের 'মরীচিকা'য় এবং evolution পরিণতি লাভ করেছে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদারের 'বিস্মরণী'তে।"[৬৪]

উদ্ধৃতিতে মাত্রাতিরিক্ত রবীন্দ্র-কটাক্ষ অবশ্যই আছে এবং মোহিতলালের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রযুগের অবসানও ঘটে নি। তবে মোহিতলালের কাব্যের বস্তুবাদ বা জীবনবাদ, বুদ্ধিবাদ ও নাট্যগুণ যে যুগধর্মেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং তিনি যে একজন যথার্থ শক্তিমান কবি—এ সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি এতে আছে। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে তৎকালীন নবীন সাহিত্যিকদের ঐ উক্তি কবির বিশেষ একশ্রেণীর কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। জীবনবাদ ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়েই 'বিস্মরণী'র কবি যে রবীন্দ্র-তীর্থগামী পথিক—এ কথাটা তাঁরা উৎসাহের আতিশয্যে হয় অস্বীকার করেছেন, না হয় বিস্মৃত হয়েছিলেন।

এই পর্বে স্বপ্নসঞ্চরণ, রোমান্টিক আকুলতা, আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্ব, আস্তিক্যবোধ, জন্মান্তরবিশ্বাস, প্রকৃতিভাবনা—প্রভৃতি বিষয়ে মোহিতলালের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শের বিরোধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বরং এসব ক্ষেত্রে বহুস্থলে তাঁর ওপর রবীন্দ্রপ্রভাবই লক্ষণীয়। অবশ্য এসব স্থলে রূপায়ণ-পদ্ধতিতে এবং ভাষার স্টাইল ও চিত্রকল্পনায় তাঁর স্বকীয়তা লক্ষ্যগোচর। মৃত্যুভাবনা ও জীবনবাদ-ভাবনায় কবি অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুচেতনা এ কাব্যেও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন এবং তিনি শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বহীন। জীবন-বাদবিষয়ক কবিতাগুলিতে এ পর্বে তাঁর দ্বন্দ্বজাত চিত্ত-বিক্ষোভ আভাসিত। ব্যক্তিপ্রশস্তি বা মানবতাবাদ-চিন্তা, জন্মান্তরভাবনা ও আস্তিক্যবোধেও দ্বন্দ্বের ছায়াপাত ঘটেছে। রোমান্টিক রূপ-সৌন্দর্য বিষয়েও কবিচিত্তে দ্বন্দ্ব এবং সে দ্বন্দ্ব-মুক্তির প্রয়াসও এ পর্বে লক্ষ্য করা গেছে। বলা বাহুল্য এই দ্বন্দ্বই প্রমাণ করছে বিষয়গুলি সম্পর্কে কবির গভীর চিন্তা। মোটকথা 'বিকাশপর্বে'র কবি মোহিতলাল তাঁর নিজস্ব সুর-বৈশিষ্ট্য এবং কাব্যের রসরূপের মৌলিকতায় যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এইজন্যই আমরা 'বিস্মরণী' কাব্যটিকে 'সমৃদ্ধিপর্বে'র অন্তর্গত করেছি। 'বিস্মরণী' গ্রন্থটি প্রকাশের কিছু পরে একজন কবি-সমালোচক যা বলেছিলেন, তাতেও এ কাব্যের সমৃদ্ধিলক্ষণই সংকেতিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—"যে কবি রূপের সহিত রসের, সম্ভোগের সহিত সংযমের, প্রজ্ঞার সহিত কল্পনার, গভীরতার সহিত নিবিড়তার, ছন্দের সহিত গন্ধের, হার্টের সহিত আর্টের এমন মিলন ঘটাইতে পারে তাহাকে ভোলা কি এতই সহজ?"[৬৫]

এই পর্বের 'রূপকথা'-কাব্যে লঘুচালে কবির রূপকথার দেশে মানস-পরিক্রমার কথা আছে। কিন্তু এইকালে কন্যাদ্বয় ও পুত্রের মৃত্যু, নজরুলের সঙ্গে বিরোধজনিত ঘোরতর মানসিক অশান্তি, সমকালীন অর্থ নৈতিক বিপর্যয়-জনিত তরুণমনের হতাশা, ক্লান্তি ও দুঃখবাদ—প্রভৃতি কবিচিত্তে যে বিক্ষোভ জাগিয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণের জন্যে ভেতরে ভেতরে তিনি উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণে কবির এই মানস-চক্রমণও অক্ষম অপরিণতচিত্ত কবির একটি দুর্বল বিলাসমাত্র নয়। শক্তিমান কবিরই এ যেন ক্ষণিকের জন্যে শঙ্খ-ফুৎকারের পরিবর্তে বংশীবাদন। অতএব এ কাব্যও আমাদের মতে 'সমৃদ্ধিপর্বে'রই অন্তর্গত।

পরিশেষে 'সমৃদ্ধিপর্বে'র 'বিস্মরণী' কাব্যটির নামকরণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যে দণ্ডীর 'দশকুমারচরিত'এ ক্ষুৎপিপাসা নিবারক এক মহার্ঘ মণির উল্লেখ আছে। এই মণিটি রাজবাহন নামক রাজপুত্র এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রাপ্ত হন। এই মণিটি তিনি মস্তকের মধ্যে সংগুপ্ত রেখেছিলেন। এই মণিকেও 'বিস্মরণী' মণি বলা চলে। খুব সম্ভবত মোহিত-লাল এই মণির কথা মনে রেখেই তাঁর কাবের নামকরণ করেছেন 'বিস্মরণী'।

মোহিতলালের কাছে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীই তো সেই বিস্মরণী মণি। কিন্তু এর নাম বিস্মরণী কেন? কাব্যলক্ষ্মীরূপ মণিকে লাভ করলে বাস্তবজীবনের যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল জ্বালা-যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করতে পারা যায়। এইজন্যেই তাঁর এই মণি-সন্ধানের প্রবল আগ্রহ—

"ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি
মণি সে বিস্মরণী।" (বিস্মরণী)

'বিস্মরণী' কবিতায় নিজ কাব্যসাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ঐ মণি অর্থাৎ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর অধর-সুধার মানস-সম্ভোগের কথা বলেছেন। যাঁকে লাভ করলে আত্মবিস্মৃতির আনন্দে সংসারের ধন-যশ-মান, প্রতিপত্তি ও দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা করতে পারা যায়—তিনিই তো বিস্মরণী। 'বিস্মরণী' প্রকাশের চার বছর পরে নিজের কাব্যসাধনার কথা বলতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন, তা আমাদের বক্তব্যেরই পরিপোষক।

কবি বলছেন—

"আমি কবিতা লিখতাম আমার আনন্দে—সেই কবিতাই আমার রতি-সম্ভোগ; আমার কাব্যলক্ষ্মীর অধরসুধা—তার চেয়ে বেশী কিছু আমি চাই নি। যদি চেয়ে থাকি, তবে আমার সেই প্রিয়তমাকে অপমান করেছি।…

কবিতার আসল definition এই :—কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের দিব্যভাববিধুর গদ্‌গদ ভাষ।"৬৬ এই কাব্য লক্ষ্মীর কথাই তো 'বিস্মরণী' কবিতায় বলা হয়েছে।

আর শিশু-কিশোরদের রাজ্য রূপকথার জগৎ ছাড়া আর কি? সেইজন্যে ন্যায়সঙ্গতভাবেই তিনি সে কাব্যের নামকরণ করেছেন 'রূপকথা'।

পরিণতিপর্ব : স্মরগরল

'বিস্মরণীর' দশ বৎসর পরে ১৩৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতা রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে 'স্মরগরল' কাব্যটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি কবির অকৃত্রিম বন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে মশাইকে উৎসর্গীকৃত। ১৩৩৪ সাল পর্যন্ত এই কাব্যের কবিতাগুলি যেরূপ নিয়মিতভাবে 'কালিকলম' 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' ও 'কল্লোল'এ বের হয়েছিল, ১৩৩৫ সাল বা তার পরে তেমন হয় নি! ঐ পত্রিকাগুলি ছাড়াও অনিয়মিতভাবে 'উত্তরা', 'বঙ্গশ্রী' 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকায় 'স্মরগরল' এর কিছু সংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হয়। কবির স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা-রচনার ধারা যে মন্দীভূত হয়ে এসেছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এইকালে লিখিত কিছু অনুবাদ-কবিতা এবং কতকগুলি মৌলিক কবিতা পরে কবি কর্তৃক 'হেমন্ত-গোধূলি'তে অনুবদ্ধ হয়েছে। মোহিতলালের আটত্রিশ থেকে আটচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে 'স্মরগরল'এর কবিতাগুলি লিখিত।

এই কালের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী এবং কবির জীবনকথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। আপাতত 'স্মরগরল'এর কবিতাগুলি উপলব্ধির জন্যে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করছি। সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ ও নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে এইকালে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায় তাঁর গভীর মনঃসংযোগ লক্ষ্য করা গেল। ১৩৩৫ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদ লাভ করায় তাঁর সমালোচনার অনুশীলন বৃদ্ধি পেল। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি রহস্যময় প্রাণধর্মের পূজারী হয়ে উঠলেন। উনবিংশ শতকের সাহিত্যে বিশেষত মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে তিনি সেই প্রাণধর্মের সঙ্গে আশা, বিশ্বাস, শক্তি ও বলিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে সমকালীন সাহিত্য-জগৎ থেকে একরূপ বিদায় নিলেন। চিরন্তন বা সনাতনের সঙ্গে যুগের সমন্বয় ঐ দুই সাহিত্যিকের রচনায় প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি ক্ষণিকতার হট্টগোল থেকে

সরে গেলেন। দেহ ও আত্মা, কাম ও প্রেম, বাস্তব ও আদর্শ, সৌন্দর্য ও প্রেম, প্রকৃতি ও পুরুষ, ভোগ ও ত্যাগ—প্রভৃতি চিরকালীন জীবনসমস্যার অনুশীলনকেই তিনি কবির পবিত্র কর্ম বলে স্থির করলেন। এ বিশ্বাস তাঁর মনে পূর্বেও ছিল এবং এ বিশ্বাসের অধীন হয়েও পূর্বে তাঁর কবিকল্পনা অগ্রসর হয়েছে। এখন সমকালীন সাহিত্যে সেই আদর্শচ্যুতি ও উৎকেন্দ্রিকতার পরিচয়ে তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তর স্বীয় আদর্শকে আরও দৃঢ়ভাবে বরণ ক'রে নিতে প্রয়াসী হল। তাঁর আদ্যন্ত কাব্যসাধনা যে সাময়িকতার উত্তেজনায় বা পাশ্চাত্যের ভাবানুকরণের ব্যর্থ-প্রচেষ্টায় অগ্রসর হয় নি, পরন্তু তা চিরযুগের জীবনভাবনা বা আদিসমস্যার প্ররোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত হচ্ছে—এই আত্মাভিমানও কবিকে এখন থেকে সদাসতর্ক ক'রে রাখল।

সে যাই হোক, সাহিত্যসমালোচনায় অধিকতর মনোনিবেশের ফলে তাঁর কাব্যরচনার প্রবাহ মন্থর হয়ে এল। সমালোচকের মনন, যুক্তি, তত্ত্ব ও তর্ক তাঁর কাব্যের মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে এ-কালে অনুভব করা গেল। আবার এইকালেই স্বদেশ ও স্বজাতির অবক্ষয়ভাবনা বিশেষভাবে দেখা দেওয়ায় 'স্মরগরল'এর অনেকগুলি কবিতায় তার প্রতিফলন লক্ষিত হল। দিকে দিকে তিনি অনাচার, গ্লানি আর অসত্যের জঞ্জালকে স্তূপীকৃত দেখলেন। সমকালীন সাহিত্যিক আন্দোলন এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যে সত্যসুন্দরের দাস মোহিতলাল সত্য ও সুন্দরের শুধু অবমাননাই লক্ষ্য করলেন।

এই সমস্ত কারণে 'স্মরগরল'এর বহু কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়াবেগ অপেক্ষা মননের আতিশয্য, সমালোচকসুলভ তর্কবিতর্ক, তত্ত্বরসরসিকতা, জাতির অধঃপতনভাবনা—প্রভৃতি নানা স্থলে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ভাষা ও স্টাইলের দিক থেকে কবি স্বপ্রতিষ্ঠ হলেও 'স্মরগরল' যে সর্বত্র সুখপাঠ্য নয়—একথা স্বীকার করতেই হবে। তাঁর চিন্তা ও ভাবনা নিশ্চয়ই এখানে পরিণত এবং বক্তব্য মননঋদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত বা তত্ত্ব-ভিত্তিক। কিন্তু 'স্বপনপসারী' বা 'বিস্মরণী'র মতো কাব্যটি অতখানি মর্মস্পর্শী নয়। এই সঙ্গে এও স্বীকার করি যে কবির তত্ত্বও এখানে বহু কবিতায় রসতাপ্রাপ্ত, সেদিক থেকে তাঁর কাব্য অসার্থক নয়। আমাদের দেখতে হবে, এ কাব্যে তিনি স্বীয় স্বভাবের অনুবর্তনে ভাব ও ভাবনায় পরিণতির পথে কিভাবে অগ্রসর এবং পূর্ববর্তী ধারণাগুলি একালে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতায় কোন্ রূপ পরিগ্রহের জন্য প্রতীক্ষা করছে। 'স্মরগরল' কাব্যে সনেটসহ মোট একচল্লিশটি কবিতা স্থান

পেয়েছে। এগুলির মধ্যে কাব্যপরিচায়ক সনেটটি ধরলে মোট উনিশটি সনেট। গ্রন্থের সূচনায় নামহীন সনেটটিতে কবি নিজেই "স্মরগরল" কাব্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে যৌবনের যে দ্রাক্ষারসকে একযোগে মধুযামিনীতে তিনি মানসপ্রিয়ার সঙ্গে পান করেছিলেন—'আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস'। এই 'দ্রাক্ষারস' বা কামনার রসই তো তাঁর 'স্মরগরল'। প্রৌঢ় কবির 'দেহ-দীপাধারে' স্মরগরলের সেই সুতীব্র জ্বালা ও উন্মাদনা নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। এর জন্যে যৌবনরস-প্রিয় কবির বেদনা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আবার পাত্রশেষ দ্রাক্ষারস-পানের আনন্দজনিত শেষ গানটুকু গাইবার আগ্রহও তাঁর কম নয়। আশা নিরাশার এই দ্বন্দ্ব সনেটটিতে আছে। তবে নিরাশার মধ্যেও আশার রাগিণী শুনেছেন বলে মনে হয়, তিনি দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবেন। বলা বাহুল্য, মোহিতলালের 'স্মরগরল' কাব্যও এই আশা-নিরাশাজনিত দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির গান।

এই কাব্যের মূল প্রবণতাগুলি এইভাবে নির্দেশ করা চলে—

(ক) সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা

(খ) নিসর্গচেতনা

(গ) ব্যক্তিপ্রশস্তি

(ঘ) জাতির অবক্ষয়বেদনা

(ঙ) আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস

সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা

মোহিতলালের দেহাত্মনির্ভর ভোগ বা জীবনবাদের মূলেও সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনা একই সঙ্গে সক্রিয়। কিন্তু এই দুই পিপাসা, বাস্তব-আদর্শের দ্বন্দ্বে তাঁর মনের যে রোমান্টিক আকৃতিকে প্রকাশ করেছে, প্রেমের জন্যেই সৌন্দর্যতৃষ্ণা তাঁর চিত্তকে কিরূপ ভারাতুর করেছে—আপাতত আমাদের সে-প্রসঙ্গই আলোচ্য। 'মিলনোৎকণ্ঠা', 'শেষ আরতি' ও 'রতি ও আরতি'—এই তিনটি কবিতায় বাস্তব-কল্পনার সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'বিদায়বাসনা' 'বসন্তবিদায়' 'শেষশিক্ষা' 'নিশি-ভোর' ও 'নির্বাণ' কবিতায় কবির যৌবনাবসানের বেদনা ও হাহাকার ধীরে ধীরে চরমে উঠেছে এবং তাঁকে ঘোরতর নৈরাশ্যবাদী করেছে। আবার 'দিনশেষে' 'একআশা' ও 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় সেই হতাশার দ্বন্দ্বকে জয় করার চেষ্টা আছে।

'মিলনোৎকণ্ঠা'য় স্বপ্নরঙীন এতকালের মানসপ্রিয়াকে বাস্তবে লাভ করার উৎকণ্ঠা অপূর্ব বাণীভঙ্গিমায়—কোমলললিত শব্দঝঙ্কারে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘকাল এঁরই জন্যে কবি কতো কতো বিরহের 'স্বপ্নরজনী' অতিবাহিত করেছেন। এতকাল তাঁকে না দেখলেও তার অপরূপ রূপ, চোখের চমৎকার চাহনি ও অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির কথা শুনে তিনি মুগ্ধবিহ্বল ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁর মনে হচ্ছে যে, এতদিনের অনুসন্ধানের বুঝি আজ শেষ। মানসপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহের শুভলগ্ন আজ সমুপস্থিত। লাল চেলী, মণিহার, চোখের কাজল, হাতের কাজললতা, করমূলে লাল সুতো—প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রিয়ার সেই বধূবেশে সাজ কবি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে সেই গোধূলি-লগনে মিলনের জন্যে। এ কবিতায় কবি কল্পলোকের মানসবধূর ছবি অঙ্কন করলেও বাস্তব জগতের বিবাহলগ্নের একটি রক্তমাংসের নারীর অপরূপ মূর্তির সংস্কার যে ভুলতে পারেন নি-‍ ‍সেকথা বলাই বাহুল্য।

'শেষ আরতি'তে কবি তাঁর মানসসঙ্গিনীর স্বরূপ ব্যাখ্যায় কতকটা সমালোচকের মন নিয়েই অগ্রসর হয়েছেন। কবির বক্তব্য হল যে তাঁর মনোবাসিনী ভুবনেশ্বরীর রূপ-রস-সুধা-পানের জন্যে ত্রিভুবন উন্মত্ত। ত্রিভুবন-ব্যাপী সৌন্দর্যস্রোতের মাঝখান থেকেই তিনি তাঁকে নিজ অন্তরের পদ্মাসনে গ্রহণ করেছেন। চৈত্রের চাঁদিনী রাতে প্রথম তাঁকে দর্শন থেকে এ পর্যন্ত কবির চিত্তে তাঁর আনাগোনার বিরাম নেই। কামনার দীপকে জ্বালিয়ে দিয়ে মানসপ্রিয়া কতোভাবে তাঁকে চঞ্চল করেছেন। কিন্তু কবি আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখছেন যে ঐ প্রিয়া তো এতকাল তাঁর জগতে 'বাণী-রাগ-রঙ্গিণী' ছিলেন। তাঁর রূপের অমৃত পান করলেও এতদিন তো তিনি তাঁকে নিয়ে রতির পরিবর্তে আরতিই ক'রে এসেছেন। সুকঠিন অসিধারব্রতে দীক্ষা নিয়ে এতকাল তো তিনি তাঁর সঙ্গে সকল প্রকার দৈহিক সম্পর্ককে এড়িয়ে এসেছেন। এই চির-অধরাকে শেষ-আরতি জানাতে এসে তাঁর চিত্ত কিন্তু আজ বেদনায় রক্তিম। বেশভূষা, চোখে কুহকের কাজল, অলংকার ও রূপের ছলনা তো অনেক হল। এখন তিনি মানসলক্ষ্মীকে সন্ধ্যার স্নেহদীপ-হাতে বাস্তব প্রেয়সীরূপে কিংবা শিথানের নর্মসহচরীরূপে পেতে চান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাত্রি ও প্রভাতে' কবিতায় নারীর যে প্রেয়সী ও শ্রেয়সী মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন—বাস্তব নারীর সেই দুই মূর্তির মধ্যেই মোহিতলালও তাঁর মানসপ্রিয়াকে অনুভব করতে উৎসুক। 'মিলনোৎকণ্ঠায়' অধীরতা এখানে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে চিত্তে এনেছে দ্বন্দ্ব।

কল্পলোক ও বাস্তবলোকের এই দ্বন্দ্বসমাধানের চেষ্টা ঠিক ঐ সমালোচকের মন নিয়েই তিনি করেছেন 'রতি ও আরতি' কবিতায়। কল্পজগতের রূপসীর সঙ্গে বাস্তবজগতের প্রেয়সীর চিরকালের ব্যবধান। মানসরূপসীকে কোনোদিনই শরীরী মূর্তিতে বাস্তবে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই—

'মনের নিশীথে সে যে চিত্তাকাশে অপরূপ জ্যোতি!
সে তো নহে ভোগ-প্রয়োজন।'

তাই এ রূপসী রতি নয় আরতিরই যোগ্যা। মর্ত্যমাটির প্রেয়সীই হলেন রতির আধার। এই পার্থক্যের বিষয়ে সচেতন থেকে মোহিতলাল সমালোচকের যুক্তিতে দুইকে মেলাবার চেষ্টায় বলেছেন—

"যেই আমি আমা হতে মুক্তি চাই কল্পনার নিশীথস্বপনে,
সেই আমি বাঁধি পুনঃ আপনারে চেতনার জাগ্রৎ ভুবনে।"

(রতি ও আরতি)

কবি যখন কল্পরাজ্যে মনোবাসিনীকে ঈপ্সিত মূর্তিতে নিজেই সৃজন করেছেন, তখন তাঁর পক্ষে পরিচিত সংসারের প্রেয়সীকে কাম্য মূর্তিতে সন্দর্শন কঠিন হবে কেন? এই যুক্তির বলে তিনি কল্পনা ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে লিখেছেন যে প্রেয়সীর মধ্যে রূপসীর সেই

"অধরে বাসন্তী ঊষা, সিন্দুরে বালার্ক-ভাতি,
নেত্রে তার নীলাকাশ দেখিবারে পাই!"

(রতি ও আরতি)

'বিদায়বাসনা' 'বসন্তবিদায়' ও 'শেষশিক্ষা' এই তিনটি কবিতাতেই যৌবন-হারানোর ব্যথায় কবিচিত্তের আক্ষেপ আছে। ভালবাসার কবি মোহিতলাল, জীবনরস-রূপের কবি মোহিতলাল যৌবনাপগমের বেদনায় যে হাহাকার করবেন—এতো খুবই স্বাভাবিক। অধরাসুন্দরীকে নিয়ে তিনি জীবনের পথে যৌবন-তীর্থাভিমুখে এতকাল যাত্রার আনন্দে মেতে ছিলেন। তীর্থে উপনীত হয়ে যৌবন-কোজাগরী পূর্ণিমার আলোক-বন্যায় আনন্দস্নান-শেষে তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে তাঁর যৌবন বিদায় নিয়েছে। হতাশায় পীড়িত কবি তখন অধরা সখীর নিকট থেকে বিদায় নিতে চাইলেন—সখীর বেশভূষা ও প্রসাধনের আর কোনো প্রয়োজনই তিনি খুঁজে পেলেন না—

'একটি সে তিথি, তারপর সখি, সব শেষ,
একে একে খুলে ফেলিতে হইবে রাজ-বেশ।'

(বিদায়-বাসনা)

এই আক্ষেপের সুরে 'বসন্ত বিদায়' কবিতাটিও মর্মস্পর্শী। প্রকৃতির বুকে বসন্তঋতুর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রবৈশাখের আবির্ভাব হওয়ায়—'কাঁদে কামবধূ বিদায়-বিধুর নূপুর খুলিয়া রাখে।' কবির নিজ জীবনেও বসন্তের সকল কামনাবৃন্তগুলি ফুল হয়ে ফোটবার আগে বৈশাখের বজ্রানলশিখা জ্বলে উঠেছে। জীবনের শ্যামল সরসতার স্থানে এসেছে বৈশাখী শুষ্কতা। 'জীবনের পীতবাসে মরণকে আচ্ছাদিত ক'রে হৃদয়রাধাকে নিয়ে বিচিত্রলীলার যে সাধ তাঁর জেগেছিল, তা আর পূরণ হল না। কবি বলেছেন—

"সে কামনা মোর জ্বলে' নিবে গেল শিমুলের শাখে শাখে।"

'শেষশিক্ষা'র তাঁর এই শিক্ষা হল যে, 'ভাল যে বাসেনি কারে, তার চেয়ে দুঃখী কেহ নয়।' 'ধরণী যে প্রেম, প্রীতি, স্নেহের নিলয়'। যৌবনাস্তিক কবির মনে হচ্ছে যে ধরণীর পূর্ণিমা-উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েও তিনি যোগদান করতে পারেন নি। একান্ত নিঃসঙ্গ কবিজীবনকে বরণ করে তিনি বাণীর বসনই বয়ন করেছেন। স্বপনের সখাসখীদের সঙ্গেই তিনি বৃথা কাল হরণ করেছেন। কামনার আত্মহারা গান তাঁর ব্যক্তিগত দেহবীণায় বাজল কই? সেইজন্যে আজ মনে মনে তিনি অপরাধভঞ্জনের শ্লোক পাঠ করছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁর এই উক্তি যৌবন-হারানোর ক্ষোভ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর দেহবীণায় যদি কামনার গান না জাগতো, তাহলে পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতে প্রেম ও যৌবনবিষয়ক কবিতার এত প্রাধান্য কেন? কিংবা তাঁর "যে-কবি নারী-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই, সে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন গান গাহিতে পারিবেনা, এই কামনাকে যে যত অতৃপ্তির মাত্রায় উঠাইতে পারিয়াছে, সে ততই সৌন্দর্যকে মহান, দুঃখকে বিরাট এবং সঙ্গীতকে মধুর করিতে পারিয়াছে"...[৬৭] এই উক্তির সত্যতা কোথায় থাকে?

'নিশি-ভোর'[৬৮] প্রকৃতিপ্রীতির কবিতা হিসেবে অপরূপ। কৃষ্ণপক্ষের অর্ধচন্দ্রের ছায়ায়-আলোয় রাত্রির অনবদ্য রূপসৌন্দর্য এখানে উদ্ভাসিত। এতকাল রাত্রি-রানী অভিসারিকা নারীর মূর্তিতে কবির জীবনকুঞ্জে কত রভসলীলায় তাঁকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। কবির 'মধুমালতীর কুঞ্জে' 'মুকুলে মুকুলে' ছিল কতো 'ফুলের স্বপন'। কৃষ্ণাতিথির আধখানি চাঁদ ঝাউবীথির মাথায় দাঁড়িয়ে ছায়ার মায়ায় মুগ্ধ ছিল। অভিসারিকা রাত্রির 'নয়নে ছিল' 'নীলিম ক্ষুধা' আর 'মৃদুবিহসিত' অধরে 'রঙীন সুধা'। তার শিথিল হাতে রজনীগন্ধার শাখার সুবাসও তিনি তন্দ্রাভরে লাভ করেছিলেন। তার 'নখে মাটি খুঁটে' নূপুর-বাজানোর শব্দও তিনি শুনেছিলেন। ছায়াময়ী রাত্রির সেই

রূপের মায়ায় কবি সারারাত কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হায় তখন যে তাঁর যৌবন ছিল। আর আজ যৌবনান্তিক কবি 'নিশি-ভোর' হওয়ার দুঃসংবাদ পেয়েছেন। আজ আর সেই ছায়া, সেই রূপ, সেই অজানার মোহ, সেই অভিসারিকার আকর্ষণ—কিছুই নেই। তাই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই তিনি বলে উঠেছেন—

'তুমি গেলে, যবে উষার আবীরে
ভোরের তারা
চক্ষু আবরি' শিশিরে শিশিরে
কাঁদিয়া সারা।" (নিশি-ভোর)

এই দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারের পরিচয় 'চৈত্ররাতে' ও 'বিদায়' নামক সনেট দুটিতেও স্পষ্টভাবে বিধৃত।

যৌবন-অপগমের এই বেদনা, এই হাহাকার চরমে উঠেছে 'নির্ব্বাণ' কবিতায়। যৌবন-শেষ-জীবন কবির কাছে নিদাঘ-শ্মশান মাত্র। তাঁর প্রাণগ্রন্থি শিথিল হয়ে আসছে। জেগে থাকলেই যৌবন-হারানোর বেদনা সহ্য করতে হবে। চেতনাশূন্য জড়ে পরিণত হতে পারলে কিংবা নিদ্রায় হতচেতন হলে এই ব্যথার অবসান হতে পারে। যৌবনশেষে কামনা ও প্রীতি যখন নেই, তখন ব্যথা ও স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার কি প্রয়োজন? হতাশার গভীরতম অন্ধকারে, বেদনার দুর্বিষহ জ্বালায় তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-কামনা করছেন।

'বাদলের ধারা জলে তিতি'
নিবে যাক্ প্রাণ-বহ্নিকণা।' (নির্ব্বাণ)

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যৌবনহারা কবির জীবনে গুরুতর সংকট। তবে কি যৌবন-শেষ বাকী জীবনের কোনো মূল্যই নেই? এই ধরণী, এই প্রকৃতি, এই মানব, এই সংসার—সমস্ত কিছুই কি প্রৌঢ়ের চক্ষে নিরর্থক? একই-কালে এই চিন্তাও মোহিতলালের চিত্তে উদিত হতে থাকল। প্রেম ও যৌবনের বিচিত্র রসকথায় যে কবি এতকাল মুখর ছিলেন, সহসা সেই অতিপ্রিয় যৌবনের চিরবিদায়ের ব্যথা তাঁকে মুহ্যমান করবে বৈ কি? কিন্তু ঐ বিপরীত-মুখী চিন্তার আবির্ভাবে তিনি আবার হতাশার নীরন্ধ্র অন্ধকারে একটুখানি আলোকের রেখা দেখতে পেলেন। ক্রমে ক্রমে বেদনার্ত কবি আশ্বস্ত হচ্ছেন—'দিনশেষে' 'এক আশা' এবং 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় তার প্রমাণ আছে।

কবিজীবনের ঐ গুরুতর সংকট থেকে পরিত্রাণের ইঙ্গিত 'দিনশেষে' কবিতায় লক্ষিতব্য। এ কবিতায় তিনি বলেছেন যে তাঁর জীবনে যৌবনের সেই ফাগেরাঙা

দিনগুলোর অবসান হল। ধরণীর রূপরস ও সৌন্দর্য সীমাহীন। অথচ যৌবনের কালটি কত সংক্ষিপ্ত। ধরণীর খেলাঘরে যৌবনের খেলাশেষে কতো কতো মানুষ বিদায় নিচ্ছে। আবার তাদের অনেকেই ঐ ক্ষণজীবী যৌবনের সদ্‌ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনে হয় যৌবনের অসীম ক্ষুধার নিবৃত্তিস্বরূপ একটুকু সুধা যে পুলকে পান করেছে, তার জীবন যৌবন-শেষেও বিফল নয়। সারা জীবনব্যাপী তাঁর মধুসন্ধানের নেশা কাটে না। চোখে বিগত-যৌবনের নেশা ধরিয়ে দেবার জন্যে লীলাসঙ্গিনীকে শেষবারের মতো সকাতর অনুরোধ জানালেও কবির অন্তর যে অনেকখানি আশ্বস্ত, তা বুঝতে পারি, যখন তিনি সখীকে বলেন—

"বক্ষে আমার রাখ হাতখানি,
গুঞ্জর' কানে পরমা সে বাণী—
'পাই বা না পাই, নাহি তায় হানি
তবু নহে নিষ্ফল—
যাবার বেলায় ফেলিয়াছি মোরা এক ফোঁটা আঁখি-জল'।"

(দিনশেষে)

'এক আশা'৬৯ কবিতাটিতে মোহিতলাল নিজ জীবনে সন্ধ্যার আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ ক'রে প্রথমত কিছুটা নিরাশ হয়েছেন। ধরিত্রীমাতার এক 'ক্ষীণপ্রাণ শীর্ণশিশু'রূপে নিজেকে অনুভব ক'রে তাই কবিতাটির প্রথমাংশে তাঁর আক্ষেপ। দুরন্ত সন্তানের দল ধরিত্রীমাতার স্তনস্রাবী সুধা তাঁরই চোখের সামনে এখন উল্লাসে পান ক'রে চলেছে। বিগতযৌবন কবির আজ তো তাদের সঙ্গে যোগ দেবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু তবুও তিনি হতাশ হন না। তাঁর স্থির বিশ্বাস, বঞ্চিত এই সন্তানের জন্যে ধরিত্রীজননী গোপনে 'একটু প্রসাদকণা' নিশ্চয়ই সঞ্চিত রেখেছেন। কবি জীবনের সর্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরটিকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে চান। তাঁর শেষ-শয়নশিয়রে পূর্ণিমারজনীতে নিখিলের রূপলক্ষ্মী এসে যখন অবগুণ্ঠন খুলবেন, তখন তিনি এককালে নয়ন-গণ্ডূষে তাঁর লাবণ্যসিন্ধু পান ক'রে নেবেন। এ জগতে "সত্য শুধু প্রেম আর জীবন পিপাসা"—একথা তিনি ভালভাবেই জানেন। সেই প্রেম আর পিপাসাকে কবি তাঁর জীবনের শেষ পূর্ণিমালগ্নে পূরণ করবেন প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যকে আশ্রয় ক'রে। কিন্তু জীবনের সে লগ্ন তো অনেক দূরে। অতএব যৌবনাস্তিক কবির প্রৌঢ় জীবন সেই আশ্বাসে একেবারে মূল্যহীন নয়।

হৃতযৌবন কবির সংকটমুক্তির প্রয়াস আরও স্পষ্টভাবে আছে 'প্রেম ও

জীবন'[10] কবিতায়। বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দ দাসের একখানি পদের স্মরণীয় একটি পঙ্‌ক্তি 'চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'—মোহিতলালকে এই বিখ্যাত কবিতাটি রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ফাল্গুনের এক দোল পূর্ণিমা রাত্রিতে প্রৌঢ় কবির কল্পনা রাধাকৃষ্ণের কথা অনুধ্যান করতে করতে দূর অতীতের বৈষ্ণব কবিদের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। কবিতাটির প্রথম অংশে দোলপূর্ণিমারাত্রির একটি রমণীয় চিত্র আছে। নয়টি স্তবকে রচিত এই কবিতাটি অত্যন্ত দুরূহ এবং মননঋদ্ধ। প্রথম স্তবকে রজনীসুন্দরীর 'জ্যোৎস্না-বারাণসী'-শাড়ী, তারার কুঁড়ি-খচিত ওড়না এবং তার শাড়ীর কালোপাড়ে 'বনান্ত'-স্পর্শের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এমন পরিবেশে কবির নয়নে সঞ্চারিত হয়েছে বৃন্দাবনী মায়াঘোর। তাঁর জীবনবসন্ত শেষ হলেও পূর্ণিমানিশির তো শেষ নেই। দ্বিতীয় স্তবকে অধীর যৌবনমদে যুবজনের মত্ততার আনন্দধ্বনি সুন্দরভাবেই ফুটেছে। তৃতীয় স্তবকে কবি সেই রাত্রির দিকে চেয়ে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছেন—দেখেছেন শ্যামরূপ হ্রদে রাই ডুবে গেছেন—তাই 'নীল জলে জলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী'। চতুর্থ স্তবকে তাঁর স্বপ্ন আরও গাঢ় হয়েছে। তিনি আকাশের বুকে শ্যাম ও রাইএর হোরিখেলার ছবি দেখতে দূর অতীতে প্রয়াণ করেছেন। পঞ্চম স্তবকে তিনি বৈষ্ণব কবিদের চিরবিরহের ও চির অতৃপ্তির সুর শুনেছেন এবং বেশী ক'রে মনে পড়েছে—'প্রেম সে চপল, থির জীবন দুরন্ত অসহ'। ষষ্ঠ স্তবকে অবাস্তবমনোহর মায়ামরীচিকার মতো এক রূপের পিপাসায় বৈষ্ণব কবিদের হাহাকারের কথা বলা হয়েছে। সপ্তম স্তবকে কবি ঐ সমস্ত বৈষ্ণব কবিদের প্রশ্ন করেছেন। ভাববৃন্দাবনের পরম পুরুষের অবাস্তবসুন্দর-পিপাসায় বৈষ্ণব কবিরা প্রেমকে জীবনাধিক মনে করেন। কবির প্রশ্ন, যে রূপের পিপাসায় প্রেমকে জীবনের অপেক্ষাও তাঁরা মহার্ঘ ভাবেন, সে পিপাসা কি তাঁদের বাস্তবজগতের প্রেয়সীকে অবলম্বন ক'রে কিছুমাত্র মেটে নি? কবিতার কল্পলোকে তাঁরা তো চিরযৌবনের কবিরূপে খ্যাত। কিন্তু বাস্তবজগতে তাঁদের জীবনে চাঁদ-ডোবা ম্লান রাত্রি কি একদিন আসে নি? অষ্টম স্তবকের বক্তব্য হল যে বৈষ্ণব কবিদের কাছে প্রেম চপল বলেই মূল্যবান। কিন্তু তাঁর কাছে জীবন আরও চপল বলে তিনি জীবনকেও নিরর্থক ভাবতে পারেন না। যৌবনবসন্ত শেষে ফাল্গুনের সেই পুরাতন ফুল তুলতে গিয়ে 'রঙছুট' লক্ষ্য করলেও কবি প্রৌঢ়জীবন বা যৌবনাস্তিক জীবনকেও মূল্যবান মনে করেন।

> "তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী
> মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে।

শেষে রচি ঝরা ফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ!
—বৃন্দাবন চিরপরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে,
কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ!"
(প্রেম ও জীবন)

নবম স্তবকে কবির আবার স্বপ্নভঙ্গ এবং 'সুখহীন একান্ত উদাস' সুরে কবিতাটির অবসান। বলা বাহুল্য এ কবিতায় একদিকে হতাশা ও অন্যদিকে আশা এই দুয়ের দ্বন্দ্ব কবিচিত্তকে পীড়িত করেছে।

'স্মরগরল'এর 'নিশান্তে'[৭১] 'নিশুতি'[৭২] ও 'পৌর্ণমাসী' নামক সনেটগুলিতেও দ্বন্দ্ব বা সংকটমুক্ত কবির পরিবর্তিত মনোভাবের স্বাক্ষর আছে। নিশাবসানে প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণ যেন কবির কাছে 'সৃষ্টির আহ্লাদ', 'জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ।' প্রভাতের এই 'স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা প্রভা' কবিচিত্তে যে অখণ্ড শান্তি ও আনন্দ এনে দিয়েছে, তা প্রৌঢ় কবির বেদনাজয়ী মনেরই পরিচায়ক। নিশান্তে প্রকৃতির রূপরস-সৌন্দর্যকে তিনি এখানে আর এক চক্ষে দেখেছেন। যৌবন-নিশার শেষে যে আলো দেখে কবিপ্রাণ এমন প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে, তা তাঁরই ভাষায়—'যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তুভ আভাস', 'জগতের নিগূঢ় চেতনা' ও 'নিরঞ্জনা প্রভা'। পরিচিত জগতের আলোককে বোঝাবার জন্যে এখানে অপরিচিত অধ্যাত্মজগতের আভাসই লক্ষিতব্য।

কবির মন যে অধ্যাত্মলোকের দিকে যাচ্ছে এবং তজ্জন্য পরিচিত রূপ-সৌন্দর্য-লোক যে তাঁকে আর তেমন আকৃষ্ট করতে পারছে না—তার কিছু আভাস 'নিশুতি' কবিতায় জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির রূপপ্লাবনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফুটে উঠেছে। বিগতযৌবন কবি যখন এ কবিতায় 'যৌবন দেহের ব্যাধি-রূপ যেন তাহারি বিকার' বললেন, তখন যৌবন ও দৈহিক রূপের প্রতি তাঁর বিরূপতাই লক্ষ্য করা যায়।

'পৌর্ণমাসী' কবিতায় প্রহরে প্রহরে রাত্রি ও চন্দ্রের রভসলীলা তিনি দর্শন করেছেন। রাত্রিকে 'জ্যোৎস্না-সীধু' পান করানোর পর যখন চন্দ্র বিদায় নিল, তখন রাত্রির হাসিও ম্লান। ভোগশেষে ক্লান্ত অথবা যৌবনশেষে প্রৌঢ়া রজনীর সেই ম্লান হাসি কিন্তু আরও মধুর বলে তাঁর মনে হল। অতএব বিগতযৌবন কবির আর আক্ষেপের কোনো কারণ নেই। তিনি প্রৌঢ় জীবনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে নূতন আশা ও উদ্দীপনার আলো একটু একটু ক'রে দেখা দিচ্ছে। 'নূতন আলো'

কবিতায় সেই আলোর কথাই কবি স্পষ্টভাবে বলে অধ্যাত্ম জগতে উপনীত হয়েছেন।

'স্মরগরল' কাব্যের কয়েকটি কবিতায় মোহিতলালের রোমান্টিক সৌন্দর্য-পিপাসা যে ভাবে অভিব্যক্ত তার পরিচয় আমরা নিয়েছি। তাঁর ঐ সৌন্দর্য ও প্রেমপিপাসা যৌবনশেষে কিরূপ হাহাকার ক'রে উঠেছিল এবং তাঁর চিত্তে কিরূপ দ্বন্দ্বের সূচনা করেছিল তাও দেখা গেল। তারপর এই পিপাসাই কিভাবে প্রকৃতিপিপাসায় রূপান্তরিত হয়ে কবিকে আশ্বস্ত করেছে সেকথাও বলা হয়েছে। আর সবশেষে ঐ পিপাসা কিভাবে অধ্যাত্মরসামৃতের সন্ধান পেয়ে স্বস্তিলাভ করেছে তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার সৌন্দর্য-তৃষ্ণায় কবিচিত্তের দ্বন্দ্ব-উৎক্রান্তির কথাও বলেছি।

নিসর্গচেতনা

'বিস্মরণী'র চেয়ে 'স্মরগরল'এ মোহিতলালের প্রকৃতিভাবুকতা অনেক বেশী গাঢ়। অবশ্য প্রকৃতি ভাবনার পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি এ কাব্যেও বর্তমান। তবে কবির ভাব-গভীরতা এবং ভাষা ও স্টাইলের অতিশয় সমৃদ্ধি এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে এখানে বিশেষ মহার্ঘতাদান করেছে। কবির ভাব ও মর্জির রূপান্তর-অনুযায়ী এ কাব্যে প্রকৃতিরও বেশ-বদল হয়েছে। মানবজীবন বা মানবসংসারের অতিপরিচিত চিত্রের আরোপ 'স্মরগরল'এর 'বনভোজন' 'পৌর্ণমাসী' 'নিশুতি' 'চাঁদের বাসর' কবিতায় পুনরায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'বনভোজন' সনেটটিতে তপনপ্রেয়সী দিবাবধূ বাকলের শাড়ি ও কণ্ঠিহার পরিধান ক'রে এলোচুলে বৃদ্ধ বনস্পতিদের খাদ্য পরিবেশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে— সুবৃহৎ থালিকায় পায়সান্ন' নিয়ে। কুলবধূর মঙ্গল মূর্তির চিত্রই দেখতে পেয়েছেন কবি দিবাবধূর আচরণে। 'পৌর্ণমাসী'তে 'মেঘমুক্ত গাঢ়নীলাম্বরে' পূর্ণশশী ও নিদাঘ শর্বরীর সম্ভোগলীলার চিত্র সুন্দরভাবেই আঁকা হয়েছে। এখানে পূর্ণসুখ-উপভোগ-শেষে শর্বরীর মুখে উদাস-মাধুরী এবং তার ম্লান হাসিতে অধিকতর মাধুর্যই কবি লক্ষ্য করেছেন। শেষে চন্দ্রের অস্তগমনে বনে বনে দীর্ঘশ্বাস এবং পূর্বদিগন্তে উষার রক্তিমাভায় বিধবা শর্বরীর 'কৌটার সিঁদুর' বিক্ষেপ তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। আকাশের চন্দ্র ও চিত্রা নক্ষত্রকে বরবধূ কল্পনা ক'রে বিবাহবাসরের একটি মনোজ্ঞ চিত্র দেবার প্রয়াস আছে 'চাঁদের বাসর' কবিতায়। এ কবিতার শেষের দিকে দেখা যায় যে প্রকৃতির ঐ চিত্র কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনুরূপ এক স্মৃতিচিত্র জাগ্রত করেছে।

'স্মরগরল'এর কবির মানসপ্রকৃতির চমৎকার প্রতিবিম্বন লক্ষ্য করা যায় 'শ্রাবণশর্ব্বরী', 'বসন্ত বিদায়', 'নিশি-ভোর', 'চৈত্ররাতে', ও 'বিদায়'[৭৩] নামক কবিতায়। কবিচিত্তে বিরহের বেদনামধুর অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়োজনে এসেছে বর্ষণমুখর, দামিনীঝলকিত গর্জনগভীর শ্রাবণরাত্রির প্রেক্ষাপট 'শ্রাবণ-শর্ব্বরী'তে। কবি স্বীয় জীবনে যৌবনবিদায়ের হাহাকারকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে নিসর্গজগতের বসন্তবিদায়ের পটভূমিকে আশ্রয় করেছেন। রাত্রি-রানীর আবির্ভাব ও বিদায়ের দুটি বিপরীতধর্মী চিত্রাঙ্কন ক'রে তিনি স্বীয় যৌবন-অভ্যাগমের আনন্দ ও যৌবন-হারানোর বেদনাকে প্রকাশ করেছেন 'নিশি-ভোর' কবিতায়। 'নিশান্তে' ও 'নিশুতি' কবিতায় কবিমনের ভাবান্তরের ইঙ্গিত পূর্বেই করা হয়েছে।

'বিভাবরী 'কবিতাটি অবশ্য স্বতন্ত্র মূল্যের দাবি রাখে। দশটি স্তবকে রচিত এই কবিতাটিতে রাত্রির রূপবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে একটি তত্ত্ব দেবার প্রয়াস আছে। জ্যোৎস্না-ত্রয়োদশীতে কবি রাত্রির যে রূপ দেখলেন, তাতে মনে হয়েছে যে রাত্রি যেন যৌবনবতী মৌন এক রাজবালা—'আলোকের পালঙ্ক-শায়িনী'। পরনে তার নীল জ্যোৎস্নার 'চুমকি-দেওয়া' বারাণসী, 'তারার মল্লিকামালা' ও থরে থরে জুঁইফুল তার শয্যায়। আর উপরে সোনার প্রদীপ-চাঁদের আলো। এই রাজবালা রাত্রি কার প্রেয়সী? তাঁর প্রাণের পুলক কার জন্যে? এ প্রশ্ন কবির মনে দেখা দেয়। মানসযৌবনের যে বিপুল বেদনা নিখিলের সকল শোভার মূল, সেই বেদনার কালো গূঢ়তর ছায়া 'বেড়িয়াছে রজনীর নীল-পাণ্ডু কায়া'। আর এই কারণেই তার এমন রূপ। কবির বিশ্বাস, চেতনার পরপারে যে আরেক ভুবন আছে—সেই চেতনাতীত লোকের লোকেশ্বর—আদি বিধাতারই মানসনন্দিনী এই রজনী। আর তাঁরই জন্যে উদাসিনী রজনীর এমন ক'রে বাসর জাগা। মনে হচ্ছে, সেই আদি-বিধাতার ধ্যানে স্বপ্নলীনা রাত্রির এবার বুঝি দয়িতকে বরণ ক'রে নেবার লগ্নটি সমাসন্ন। এরপরেই রূপসী যোড়শী রাত্রি কবির চক্ষে অন্যভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মনে হয়েছে সে যেন মহাকালেরই জায়া। পৃথিবীর শবাসনে বসে ত্রিলোকের মৃত্যুসুধারস সে আপনার সংজ্ঞা অপহরণ ক'রে পান ক'রে চলেছে। আর রজনীর রূপের আবেশে তন্ময় কবির মনে মনে 'বিভাবরী' নামটির শুধু গুঞ্জন চলছে।

'কবিধাত্রী' কবিতায় মোহিতলাল স্বীয় জন্মভূমি অর্থাৎ পল্লী-বাঙলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছেন। তাঁর

সুনিবিড় প্রকৃতিপ্রীতির কবিতা হিসাবে 'কবিধাত্রী' স্মরণীয়। বাঙলাদেশের কোমলশ্যামল প্রকৃতির স্তব 'স্বপন-পসারীর' 'শ্রাবণ-রজনী' কবিতায় একবার লক্ষ্য করা গেছে। জন্মভূমি পল্লীকে জননীর শ্রদ্ধা অর্পণ ও তদ্গতচিত্তে স্তব এ কবিতায় উদাত্ত-স্বরে অনুরণিত। 'ঊর্দ্ধে শূন্য মহানীলাম্বর', 'নিম্নে হরিতের মেলা', 'সারাবেলা বিহঙ্গের গান', 'কাননের উদাস মর্মর', সূর্যের 'নীরব উদয়-অস্ত', 'অশ্বত্থ তিন্তিড়ী তাল', 'বেণুশীর্ষ আম্র আর পনসের ঘনপত্র ভার', 'নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার'—এমন পরিবেশেই কবির পুরাতন বাস্তুভিটার অবস্থান। 'এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর'ই হল 'কবিধাত্রী'—'জনহীন—সবুজ শ্মশান।' সন্ধ্যায় ও প্রভাতে জন্মভূমির এই স্তব্ধগম্ভীররূপ দেখতে দেখতে কবির অন্তরে জাগে 'সুগম্ভীর ধ্বনি'। 'বৃহৎকালের সাক্ষী' পিতৃ-পিতামহের জলন্ত স্মৃতি তাঁকে অভিভূত করে। জন্ম-মৃত্যুর দুর্ভাবনা ও সংসারের সকল দুঃখ ক্ষণিকের জন্যে তিনি বিস্মৃত হন। তাঁর রোমান্টিক মনকে এই বনভবন অতীতচারী করে। একদিকে এ কবিতায় যেমন পল্লীভবনের একটি সুগম্ভীররূপ ফুটে উঠেছে, অন্যদিকে কবির ব্যক্তিগত মানসপ্রবণতাও এতে দুর্লক্ষ্য নয়। যুগের হৈ-হট্টগোল থেকে বিদায় নিয়ে আশা, বিশ্বাস ও প্রাণরসপুষ্ট গৌরবময় অতীতে আশ্রয় গ্রহণের আগ্রহও এখানে স্পষ্ট।

'ত্রিস্রোতা' কবিতাটি পুণ্যতোয়া জাহ্নবীরই স্তব। এক বিষ্ণুপদী ধারা তিন লোকে—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতালে মন্দাকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতী নামে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু পাতালের ভোগবতীর কলস্বর কিংবা স্বর্গের মন্দাকিনী-তরঙ্গে ভাসমান 'সুবর্ণ-নলিনী'র কথা সত্য কিনা কবি জানেন না। তিনি শুধু 'পুণ্যতোয়া প্রাণপ্রবাহিণী' মর্ত্যে ত্রিধারায় বহমানা জাহ্নবীকেই জানেন। চন্দ্রচূড় মহাকালের শিরে নৃত্যশীলা উন্মাদিনী এই ভাগীরথী নদীর প্রতি মোহিতলালের একটি বিশেষ দুর্বলতা ছিল।[৭৪]

এ কাব্যে বসন্তঋতুর প্রতিই তাঁর পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। 'বসন্তবিদায়' কবিতায় বসন্ত-অপগমের চিত্র তিনি ব্যথাহত চিত্তে অঙ্কন করেছেন। 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় বসন্তের দোলপূর্ণিমার একটি উজ্জ্বল আবেশমধুর ছবি আছে। আবার 'চৈত্ররাতে' সনেটটিতে জ্যোৎস্নাভরা চৈত্ররাতের স্মৃতি বিগতযৌবন কবি স্মরণ ক'রে বিষন্ন। আর বৃষ্টিপতনমুখর, বিদ্যুৎ-বিলসিত শ্রাবণরাত্রির সুন্দর ছবি আছে 'শ্রাবণ-শর্বরী'তে। এছাড়া রাত্রি, জ্যোৎস্না-গোধূলি, দিনশেষে, নিশান্তে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্না, নিশুতি—প্রভৃতির প্রতি কবির আকর্ষণও এ কাব্যে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

ব্যক্তিপ্রশস্তি

'স্মরগরল' কাব্যের 'শরৎচন্দ্র'[৭৫], 'রুপার্ট ব্রুক', 'বিবেকানন্দ', 'জন্মাষ্টমী', 'কবিবরণ', 'সত্যেন্দ্রনাথ' কবিতায় ব্যক্তির মহৎ কীর্তি, উন্নত পৌরুষ ও গৌরবময় জীবনাদর্শের প্রতি কবির গভীর শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পূর্ববর্তী কাব্যের মতোই জাগ্রত আছে। পূর্ববর্তী কাব্যে দেখা গেছে যে ব্যক্তির মহিমান্বিত জীবনের কোনো একটি দিক বা তাঁর দুর্জয় শক্তিরই তিনি মূলত পূজারী। তাঁর এই মহৎ-আদর্শপ্রীতির মূলে যে নবমানবতার প্রেরণা সক্রিয় ছিল তাও আমরা পূর্বে বলেছি। এখন 'স্মরগরল'এর এই শ্রেণীর কবিতায় কবির বিশেষ মনোভঙ্গীটি বুঝে নিতে হবে।

'শরৎচন্দ্র'[৭৬] শীর্ষক কবিতায় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' ও 'শ্রীকান্ত—প্রথমপর্ব্ব' উপন্যাস পাঠে চিত্তপ্রতিক্রিয়ার সূত্রে মোহিতলালের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছে। কিন্তু এই শ্রদ্ধাঞ্জলির বহু পূর্বেই কবি তাঁর যৌবনকালেই ঐ বই দুখানি পাঠ করেছিলেন। যৌবনকালের সেই প্রতি-ক্রিয়াকে অনেকদিন পর স্মরণ ক'রেও তিনি আজ কত না আনন্দিত। তাঁর যৌবনকালে যখন 'বিকশিত চিত্তশতদলে সুপবিত্র প্রীতিরাগ', তখন রুদ্ধ কুতূহলে বিরাজের হৃদয়রুচির কথা পড়ে তাঁর চিত্ত চমৎকৃত হয়েছিল। সামান্য রমণী বিরাজের অসামান্য প্রেমের করুণ কাহিনী ও নীলাম্বরের প্রেমের পুরুষমূর্তি সেদিন কবিকে বিস্মিত করেছিল। আবার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথমপর্বও তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রে সেদিন তিনি বীরাচারী তান্ত্রিকরূপই দেখেছিলেন। বীরাচারী তান্ত্রিকের মতো জীবনের 'শ্মশানে-মশানে' পরিভ্রমণ ক'রে শরৎচন্দ্র শববক্ষের ধ্বনি শুনেছিলেন। 'যা কিছু কুৎসিত হেয়' তাকেই তিনি তাঁর চিত্তপ্রবাহিণীর স্নানে সুন্দর ও উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর সাহিত্যরূপ তন্ত্রসাধনায় সেইজন্যে অন্ধকারের রূপ ফুটে উঠেছে। অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতের মূল্য যে কতো অপরিসীম তা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র আমাদের পরিচিত পৃথিবীর মাটির সন্তান। তাঁর লেখনীতে

লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ—অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ!
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণপরিচয়—
মানুষের সর্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস।" (শরৎচন্দ্র)

'বিস্মরণী'র কবিতাগুলি লেখবার সময় কবি মোহিতলালের তন্ত্রতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল, একালে তা আরও সংসক্তি লাভ করেছে। তাই

একালের মানসিকতার প্রভাববশতই তিনি শরৎচন্দ্রের বীরাচারী তান্ত্রিক মূর্তিকেই দেখতে পেয়েছেন।

'রুপার্ট ব্রুক'এ ঠিক অনুরূপ পন্থায় ইংরেজকবি রুপার্ট ব্রুকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাঁর '1914 and other poems' নামক কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ ক'রে তিনি এখানে জানিয়েছেন যে এই ইংরেজকবির সঙ্গে তাঁরও কবিধর্মের কোথায় যেন একটি নিকট সামীপ্য আছে। ব্রুকের নিঃসীম মর্ত্যপ্রীতি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় তাঁর অর্থবান ব্যথাবিধুর শব্দে-শ্লোকে ফুটে উঠেছে। সমগ্র ইউরোপের বুকে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের মরণঝড় দানবীয় মূর্তিতে প্রকট, যখন শতাব্দীর সঞ্চিত আবর্জনায় বিষবাষ্পে আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন, যখন ঘৃণা অবিশ্বাস আর মিথ্যা মোহজালের অট্টহাসি, তখন মৃত্যুপথযাত্রী এই কবির মুখে 'সুন্দর বন্দনা'র শুভ সংগীত উচ্চারিত হয়েছিল। আপনার হৃৎপিণ্ডকে রক্তজবার মতো মৃত্যু-মহারাজের কাছে উপহার দিয়ে তিনি মরণজয়ী হয়েছিলেন। আসন্ন মৃত্যুর পূর্বে রচিত তাঁর সেই সব কবিতায় জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আশাবাদের উচ্চসুর ধ্বনিত হয়েছে। বীর্যবান এই কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধাতর্পণ করতে গিয়ে মোহিতলাল লিখেছেন—

> "প্রাণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি!
> হে গাণ্ডীবী, বিস্ফারি বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
> ধনুকে অমোঘ শর ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
> বহাইলে ভোগবতী—পূত হল সারা প্রেতভূমি।
> মমতার মোম দিয়ে বধূ-মুখ করিলে মার্জনা
> প্রকৃতির,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান!" (রুপার্ট ব্রুক)

এই শ্রেণীর অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে এইকালের কবির বিশিষ্ট ভাবনাটি সুব্যক্ত হয়েছে। আগেই বলেছি, জাতির শোচনীয় অধঃপতন ও সর্বাত্মক অধোগতির একটি চিত্র এইকালে তাঁর মানসপটে মুদ্রিত হয়েছিল। জাতির এই অধঃপতন-ভাবনায় তিনি অত্যন্ত বেদনাবোধ করতেন। বাঙলাদেশের চতুর্দিকে অসত্য, অনাচার, দুর্নীতি ও অসুন্দরের প্রেতনৃত্য লক্ষ্য ক'রে তিনি অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন এবং দেশ ও জাতির অতীত কৃষ্টি ও গৌরবময় ঐতিহ্যকে আশ্রয় ক'রে তিনি নানাভাবে জাতিকে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন।

'বিবেকানন্দ' 'জন্মাষ্টমী' ও 'কবিবরণ'—এই তিনটি কবিতাতেই ব্যক্তি-পূজার অন্তরালে কবির ঐ মনোভাবই স্পষ্ট। 'মুমূর্ষু এ জাতি'র সম্মুখে কবি

সেই 'জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবীর, বীর-বীর্য প্রেমিক উদার'—বিবেকানন্দের সদাজাগ্রত পৌরুষমূর্তিরই ধ্যান করেছেন 'বিবেকানন্দ' কবিতায়। 'জন্মাষ্টমী'তে হিংসা-দ্বেষ ও হানাহানিতে মত্ত জাতির দুর্দিনে কবি কোনো স্বর্গীয় দেবতা নয়, নররূপী নারায়ণেরই আবির্ভাব কামনা করেছেন। আবার 'কবিবরণ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে বরণ করতে গিয়ে তিনি বিশ্বকবিরূপে তাঁকে অভ্যর্থনার পরিবর্তে বলেছেন—

"করি আমি তোমারে বরণ
হে বরেণ্য বঙ্গ-কবি, জাতি-দেশ ভাষার দিশারী!" (কবিবরণ)

এই সমস্ত কবিতায় জাতিপ্রীতির গভীরতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে জাতির কল্যাণচিন্তায় শুধু মনীষী-বন্দনা অনেক সময় কবির দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। এই শ্রেণীর পূর্ববর্তী কবিতাগুলিতে যে মহৎ ও উচ্চ জীবনাদর্শের প্রতি কবির অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এখন সেই অনুরাগকে জাতিপ্রেম অনেকখানি আচ্ছন্ন করছে। কবিকীর্তির বিচিত্রতায় যে-রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে আখ্যাত, তাঁকে শুধুমাত্র বাঙালীর কবি বলেই বন্দনা—একথা মনে করলে মোহিতলালের দৃষ্টি সীমিত হয়ে পড়ে নাকি?

জাতির অবক্ষয়বেদনা

মোহিতলালের ব্যক্তিপূজার মূলে যে জাতীয় সংকটভাবনাকে অন্বিত হতে দেখা গেছে, এ কাব্যে তা তাঁর একটি নতুন সুর। এইকালে তাঁর মনে ঐ ভাবনাটি কথঞ্চিৎ প্রবল হওয়ায় অন্য কয়েকটি কবিতায় সে ভাবনা আলম্বন-বিভাবরূপে দেখা দিয়েছে। 'স্মরগরল'এর 'রুদ্রবোধন' কবিতাটি এই শ্রেণীর হলেও ভিন্নতর একটি কারণে এর মূল্য অসাধারণ। অসত্য ও অন্যায়, জড়তা ও ভীরুতা চিত্তদৈন্য ও আবিল দৃষ্টিভঙ্গী চতুর্দিকে এত বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিল যে কবি এ কবিতায় সমগ্র সৃষ্টিকে শবপরিপূর্ণ এক ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমিরূপে কল্পনা করছেন। সমকালীন সাহিত্যে সুন্দরের নামে অসুন্দরের উপাসনা, প্রেমের নামে আত্মরতি এবং সত্যের নামে মিথ্যার বেসাতি—তাঁকে মর্মে মর্মে পীড়িত করেছিল। আর এর সঙ্গে বাঙালীর ভীরুতা, দুর্বলতা, আত্মদৈন্য ও অভাব-অনটনের বেদনা তো ছিলই। মূলত এই দুই প্রেরণার দ্বারা প্রাণিত হলেও মোহিতলাল এ কবিতায় বাঙলাদেশ ও বাঙালীজাতিকে প্রত্যক্ষভাবে কটাক্ষ না ক'রে একটি বিশ্বজনীন নৈরাশ্যব্যঞ্জক পটভূমিকায় রুদ্রের

আবাহনী-গীত গেয়েছেন অপরূপ ভাষা ও ছন্দে। জাতিপ্রেমিক কবির দৃষ্টি-সঙ্কীর্ণতা কবিতাটিকে স্পর্শ করে নি বলে এটি এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। কবির এই উদ্বোধন-সংগীতের সুর-উদাত্ততা কবিতাটির যে-কোনো স্তবকেই লক্ষণীয়।

"জাগো মহাকাল! রুদ্রদেবতা! বর্ণবিহীন বিভূতিময়!
দাও খুলে তব গ্রন্থিল জটা, ব্যোমকেশ! কর সৃষ্টি লয়।
ফেটে যাক্ নীল নভো-বুদ্বুদ—রঙের হাট।
মেদিনীর এই বেদী ভেঙে যাক্—রূপের ঠাট!
সুন্দরে হানো সত্যের শূল, টুটাও স্বপন হে নির্দয়।
নিত্য-মরণ হরিয়া দাও গো নিত্য জীবন শুভ্রময়।

(রুদ্রবোধন)

সত্য-সুন্দরের পূজারী কবি এ কবিতায় রূপ ও রঙের ঠাট ভেঙে দিয়ে সুন্দরকে সত্যের শূলে বিদ্ধ করার জন্যে রুদ্রদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। রূপের সঙ্গে এখন আর প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই, রূপ এখন কামনা-নটীরই নৃত্যকলা—রূপ এখন হৃদয়ের দানও নয়। তাই এই কৃত্রিম রূপলাবণ্যের প্রতি তাঁর চিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে। তাই নবসৃষ্টির পত্তনের জন্যে কবি রুদ্রদেবতার দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছেন।

'কবিধাত্রী' কবিতাটি মূলত প্রকৃতিপ্রীতিবিষয়ক। কিন্তু এ কবিতাতেও কবির অতীতচারী মন বর্তমানের কোলাহলময় পরিবেশ থেকে দূরে পলায়ন করেছে এবং অতীতের সেই অস্তমিত গৌরবসূর্যের শেষ রশ্মিটুকু বর্তমান-কালের বুকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছে জাতীয় গৌরব-পুনরুজ্জীবনের আশায়।

"যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবেনা কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

(কবিধাত্রী)

'আহ্বান'[৭৭] সনেটটিতে নৈরাশ্যের ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত হলেও পুরুষের পৌরুষকে বরণ ক'রে কবি তার অন্তহীন জয়যাত্রাকে অভিনন্দিত করেছেন।

আমরা জানি, জাতির উত্তরোত্তর অবক্ষয়ভাবনার চরম পরিণাম ঘোরতর হতাশা। এই হতাশার সুরই ধরা পড়েছে 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায়। এখানে তিনি সর্বরিক্ত বাঙালীর দুঃখদুর্দশা ও অভাব-অনটনের মধ্যে বঙ্গলক্ষ্মীকে দেখতে পান নি। অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বঙ্গলক্ষ্মীর রূপের কথা পাঠ ক'রে কবি

স্বপ্ন-সুষমায় তাঁর একটি মূর্তি রচনা করেন বটে—কিন্তু বাস্তবে সে মূর্তি দেখা যায় না। এখন তিনি দেখেন—

"উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীতরৌদ্রে দীর্ঘ জ্বরজ্বালা।
কে গাঁথিবে তরু মূলে শেফালির মালা—
অচিরে কমল তুলি কমলাসনায়?" (বঙ্গলক্ষ্মী)

আস্তিক্যবোধ ও জন্মান্তরবিশ্বাস

'স্বরগরল'এ 'নিশান্তে' 'নূতন আলো' ও 'রুদ্র বোধন' কবিতায় মোহিতলালের আস্তিক্যবোধের পরিচয় আছে। লক্ষ্য করা উচিত, এ কাব্যের আস্তিক্যবোধ অবচেতন বা চেতন মনের কোনো রূপ দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট নয়। নিসর্গ জগতের উন্মুক্ত প্রেক্ষাপটে তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি ঘটেছে 'নিশান্তে' ও 'নূতন আলো' কবিতায়। নিশাশেষে 'দিবামুখে প্রভাতের কিরণ' দেখে তাঁর চিত্ত অপূর্ব প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

তাঁর মনে হয়েছে এ আলো যেন বিষ্ণুর বুকের কৌস্তুভ-মণির আভা, এ যেন 'সৃষ্টির আহ্লাদ', 'জগতের নিগূঢ়চেতনা', 'জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ'। বাস্তবজগতের সূর্যোদয়ের একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনাই যদি ঐ আলো হত, তাহলে তার 'স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা প্রভা' কবিকে এমন ক'রে তন্ময় করতে পারত না। এ সেই 'তমেব ভাতি অনুভাতি সর্ব্বম্'—এরই উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়।

শীতের জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রিতে রুদ্ধঘরে শায়িত ও জাগ্রত কবির চিত্তে নানা ভাবনা ভিড় ক'রে এসেছে 'নতুন আলো' কবিতায়। শ্রান্তদেহ, ক্লান্ত-আয়ু, শুষ্কনয়ন কবির মনে জেগেছে দুর্ভাবনা। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন পূর্বদিগন্তে ভোরের আলো ফুটছে। এই আলোর রূপে মুগ্ধ হয়ে কতো কবি গান গেয়ে উঠেছেন। তাঁরও শীর্ণ পরাণ-পুটে আজ সেই রূপের ছোঁয়া লেগেছে। পূর্বাকাশের সেই 'জ্যোতিঃ সিনান করে' তাঁর নয়ন 'শ্রবণ' হয়েছে। বচনে যিনি ধরা দেন না অথচ লোচনের সামনে যিনি নিজেই এসে স্বয়ংবরা হন—সেই 'ভারতী'র ঝরে পড়া আশীর্বাদ তিনি দু' চোখ ভরে আজ লাভ করেছেন। 'চরাচরের শেষ সীমানায় আলোছায়ার পারে' ঐ জ্যোতির আভাস পেয়ে তিনি পরমানন্দে বলেছেন—

'পেয়েছি সেই জ্যোতির আভাস—আর কিছু না চাই,
—ঘুমাই এখন, ভাই!" (নতুন আলো)

বলা বাহুল্য 'নিশান্তে' এবং 'নতুন আলো' এই দুই কবিতাতেই বাস্তব-জগতের পরিচিত নিসর্গরাজ্যের মধ্যেই কবির অধ্যাত্ম অনুভব ঘটেছে। বাস্তবজগৎকে বাদ দিয়ে নিভৃতনির্জন সাধনার মধ্য দিয়ে মোহিতলালের অধ্যাত্মচেতনা আসে নি। পরিচিত জগতের সোপানপথে চলতে চলতে তিনি সোপানশেষে সেই আলোর আভাস পেয়েছেন।

'রুদ্র-বোধন' কবিতাটিকে আমরা রূপকধর্মী মনে করতে পারি না। পাপ তাপ ও কলুষদুষ্ট পৃথিবীর নবরূপায়ণে কবি পুরাতনের ধ্বংস ও নবসৃষ্টির আয়োজনের জন্যে হিন্দুর চির আরাধ্য রুদ্রদেবতাকে আহ্বান করেছেন। এই দেবতার প্রতি এবং তাঁর একাধারে ভয়ঙ্কর ও ক্ষেমঙ্কর রূপের প্রতি যদি তাঁর অন্তরের বিশ্বাস না থাকত, তাহলে কখনোই তিনি তাঁকে আহ্বান করতেন না।

জন্মান্তরবিশ্বাস সম্পর্কে মোহিতলালের কবিমন 'স্মরগরলে' কোনোরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট নয় বলে এ-ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব—এমন কথা মনে করা যেতে পারে।

কাব্যশেষে

'স্মরগরল' কাব্যে কবির বিভিন্ন প্রবণতাগুলির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা গেল। 'বিস্মরণী' কাব্যের মূল প্রবণতাগুলির মধ্যে মৃত্যুভাবনা এবং জন্মান্তর-বিশ্বাস এ কাব্যে আর তাঁকে বিশেষ পীড়িত করে নি। 'বুদ্ধ' কবিতায় ক্ষণিকের জন্য একবারমাত্র মানবজীবনের দুঃখ ও মৃত্যুবেদনা তাঁর চিত্তে অবশ্য জাগ্রত হয়েছে। কিন্তু কবি 'প্রেম' নামক এক রহস্যময় 'Secret of Life' দ্বারা সে দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়েছেন। পূর্ববর্তী কাব্যে জীবনযজ্ঞকে পরহিতার্থে উৎসৃষ্ট ক'রে আত্মত্যাগের সাহায্যে তিনি মৃত্যুভাবনা জয়ের কথা বলেছিলেন। 'স্মরগরল'এর কালে তিনি দুঃখ ও মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে তাঁর ঐ দ্বন্দ্বসমাধান-প্রয়াস ঐ ত্যাগেরই ভিন্নরূপ মাত্র। অতএব মনে করা যেতে পারে যে দুঃখ ও মৃত্যুভাবনার যে ক্ষীণতম দ্বন্দ্ব কবিমনে সুপ্ত ছিল, এ-কাব্যে তাও লুপ্ত হয়েছে। জন্মান্তর-বিশ্বাসের ভাবনাটি এ কাব্যে কোথাও লক্ষ্যগোচর নয় বলে মনে করা চলে যে তিনি এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর আস্তিক্যবোধ এ-কাব্যে নিঃসংশয়িত গভীরতা লাভ করেছে।

কবির বহুঘোষিত দেহাত্মনির্ভর ভোগবাদ বা জীবনবাদ, যা 'বিস্মরণী'তে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছিল এবং যা কবির মনে দ্বন্দ্বের সূচনা ক'রে একটি চির-অতৃপ্তির বোধকে জাগ্রত করেছিল—তার পূর্ণ পরিণতি এই কাব্যেই স্পষ্ট

হয়েছে। 'বিস্মরণী'তে ঐ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির প্রয়াস আভাসিত হলেও দেহই যে সব নয়—এই বোধ 'স্মরগরল'এর মতো সেখানে সর্বসংশয়মুক্ত নয়।

সৌন্দর্য ও প্রেমের রোমান্টিক পিপাসাজনিত আদর্শবাস্তবের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব-মুক্তির প্রসঙ্গটি পূর্ববর্তী কাব্যের মতো এখানেও দেখা দিয়েছে এবং এ-কাব্যে কবি কতকটা সমালোচকের ভূমিকায় তার সমাধান যে ভাবে করেছেন, তা 'বিস্মরণী'র প্রয়াস অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণতার লক্ষণাক্রান্ত। কোনো কবিই এই চিরন্তন-সৌন্দর্যতৃষ্ণার বিরোধ থেকে মুক্তি পান না। এই পিপাসাকে প্রেমপিপাসায় রূপান্তরিত ক'রে বাস্তব নারীর মধ্য দিয়েই তার সমাধান খুঁজতে হয়। মোহিতলালও সে-প্রয়াস করেছেন এবং এ কাব্যে তাঁর প্রচেষ্টা পরিণত চিন্তারই স্মারক।

কবির ব্যক্তিপূজার প্রবণতাটি এ-কাব্যে জাতির অবক্ষয়ভাবনার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নূতনত্ব লাভ করেছে এবং চিরাচরিত ঐতিহ্যসূত্রে ঐ প্রশস্তি সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁর সমকালীন মানসিকতার রঙে অনুরঞ্জিত হয়েছে। কবির চিন্তা-পরিণামের সঙ্গে সামঞ্জস্যক্রমেই এ প্রবণতার নতুনত্ব।

পূর্ববর্তী কাব্যের প্রকৃতিভাবুকতা 'স্মরগরল'এ ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করেছে। প্রকৃতিকে দেখা ও দেখানোর ভঙ্গীটি পূর্ববর্তী কাব্যের অনুরূপ হলেও এ কাব্যে প্রকৃতি কবির চিত্তে একটি বড় আসন জুড়ে বসেছে। যৌবনশেষ কবিমনের হতাশা ও বেদনার নবতন দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তির জন্যে প্রকৃতি এ কাব্যে বড় আশ্বাসের কারণ হয়েছে। আবার এ কাব্যে প্রকৃতির উদার আলোক-জ্যোতি তাঁকে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকেও ঠেলেছে। এ-সব থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই প্রবণতাটি পরিণতির পথে উদ্বর্তিত।

এ কাব্যে যৌবন-হারানোর ব্যথা ও জাতির অধঃপতনের দুর্ভাবনা—এই দুই নূতন দ্বন্দ্ব তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছে। প্রথমটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তিনি যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং জীবনের একটি গভীরতর সদর্থ আবিষ্কার ক'রে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছেন, তা আমরা দেখেছি। দ্বিতীয় ভাবনাটি প্রবল না হলেও কবিমনকে নৈরাশ্যপীড়িত করেছে।

পরিণতিপর্ব : হেমন্তগোধূলি

'স্মরগরল' কাব্যের পাঁচ বৎসর পর ১৩৪৮ সালের শ্রাবণমাসে 'হেমন্ত-গোধূলি' প্রকাশিত হয়। বাগ্দেবীর চরণে এই কাব্যখানিই মোহিতলালের শেষ অর্ঘ্য। গ্রন্থমধ্যে দু'টি পৃথক পর্যায়ে কবিতাগুলি কবিকর্তৃক সন্নিবিষ্ট।

তাই এতে মৌলিক ও অনুবাদ উভয় শ্রেণীর কবিতা লক্ষ্য করা যায়। অনুবাদ-কবিতাগুলি 'স্বপনপসারী'র কাল থেকে বিভিন্ন সময়ে রচিত। মৌলিক কবিতার কিয়দংশ 'স্মরগরল'এর কালে লিখিত। তিনি লিখেছেন, "যে সকল কবিতা পূর্ব্বে লিখিত হইলেও প্রকাশিত অথবা সুপ্রচারিত হয় নাই এবং আরও যেগুলি প্রায় সর্ব্বশেষের রচনা, সেগুলিকে এ পুস্তকে সঙ্কয় করিলাম।" বলা বাহুল্য তাঁর এই সর্বশেষ রচনাগুলির মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য। চতুর্থ অধ্যায়ে পৃথকভাবে কবির বিদেশী কবিতাগুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্য প্রকাশের পূর্বেই মোহিতলাল বাঙলাদেশে সমালোচকরূপে একটি অতিশয় মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন। তাঁর সমালোচনার প্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থ এর মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'স্মরগরল'এর কালেই তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এখন তা আরও ক্ষীণতর হয়ে রুদ্ধ হবার উপক্রম হল 'স্মরগরল'এর কালে জাতির যে অবক্ষয়বেদনা কবিকে পীড়িত করেছিল, একালে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। কাব্যচর্চা অপেক্ষা জাতির জীবন-মরণের ভাবনাই কবিকে সমধিক চঞ্চল ক'রে তুলল। এই ভাবনাই ঘনীভূত হয়ে 'হেমন্ত-গোধূলি'র পরবর্তী কবিকে কাব্যরাজ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করেছে। পরবর্তীকালের সেই উৎকট বাঙালী-প্রেমিক মোহিতলালের পরিচয় আপাতত আমাদের অনাবশ্যক। 'হেমন্ত-গোধূলি'র অনেকগুলি কবিতায় কবির এই জাতিগত দুর্ভাবনার পরিচয় থাকলেও তিনি এখনও সম্পূর্ণরূপে কাব্যচর্চা ত্যাগ করেন নি। আর এই কারণেই 'হেমন্ত গোধূলি'র কাব্য আলোচনায় আমাদের আগ্রহ।

'স্মরগরল' কাব্যে জাতির অবক্ষয়বেদনারূপ নূতন ভাবনাটি ছাড়া আর সকল ভাবনারই দ্বন্দ্ব বা সংশয় থেকে কবিকে মুক্ত হতে দেখেছি। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে সেই দ্বন্দ্বমুক্ত প্রশান্ত মানসিক অবস্থাই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ় কবির জীবনে এখানে যথার্থই গোধূলি-লগ্ন সমাসন্ন। বৈরাগ্যের একটি গৈরিক রঙে কবির চিত্ত অনুরঞ্জিত। অপগত জীবনের মধুর স্মৃতিকে স্মরণ ও লালনে আজ তাঁর কতো আনন্দ। জীবনবিধাতার নির্দেশে এতদিন তিনি যে কবিব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আজ তার অবসান। আজ তাঁর মনে কোনো ক্ষোভই আর রাখতে চান না। এই স্থৈর্য, এই বৈরাগ্য, এই শান্তির স্মৃতি-রঙীন ধূসর-রাজ্যে মোহিতলাল আসন পেতেছেন 'হেমন্ত-গোধূলি'তে। এই

কাব্যের কবিতাগুলিকেও আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নোক্তরূপ শ্রেণীবিন্যস্ত করা চলে।

(ক) দ্বন্দ্বহীন প্রশান্তির কবিতা

(খ) নিসর্গপ্রীতির কবিতা

(গ) ব্যক্তিপ্রশস্তিমূলক ও জাতির অবক্ষয়বেদনা সংবলিত কবিতা।

দ্বন্দ্বহীন প্রশান্তি

প্রথমেই দ্বন্দ্বহীন প্রশান্তির কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যটি কবি তাঁর যৌবনকালের প্রিয় সুহৃৎ 'ভারতী' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন। কবির 'স্বপনপসারী' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা এই বন্ধুর আগ্রহে এবং অনুপ্রেরণায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। বিচিত্র ঘটনাবর্তের মধ্যে পতিত হয়ে তিনি সেই বন্ধুর কথা একরূপ বিস্মৃত হয়েছিলেন। 'স্বপনপসারী' 'বিস্মরণী' 'স্মরগরল' কাব্য একের পর এক বের হয়ে গেল জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনার ব্যস্ততায় কবি পিছনের দিকে তাকাবার অবকাশই পান নি। ইতিমধ্যে বন্ধুও মর্ত্যজীবন ত্যাগ ক'রে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যখানির প্রকাশকালে কবি অতীতের সেই মধুময় স্মৃতির জগতের আকর্ষণ অনুভব করলেন। 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের শেষ গানগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে কবি অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় রাজ্যের বন্ধু মণিলালকে স্মরণ ক'রে পরম আনন্দ লাভ করলেন। কবিচিত্তের এই প্রসন্নতার সুরেই উৎসর্গ কবিতাটি রচিত। নিরালায় ফেলে-আসা বিগত জীবনের স্মৃতি-রোমন্থন কম আনন্দদায়ক নয়। 'স্মরগরল'এর 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় কবি এই স্মৃতির রাজ্যের মহিমার আভাস দিয়েছিলেন। 'উৎসর্গ' কবিতায় সেই আনন্দরসই ঘনীভূত। এই কালেই রচিত আর একটি সনেটে তিনি স্মরণের আনন্দকে আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> "সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,
> বেদনা-সুরভি। দিনশেষে সন্ধ্যা যথা,
> ভোগশেষে উপভোগ,—হৃদি ভরপুর
> রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা।" (স্মরণ)

দেখা যাচ্ছে, 'হেমন্ত-গোধূলি'র কবি জীবন ও যৌবনের সর্বপ্রকার কোলাহল থেকে দূরে একটি অখণ্ড প্রশান্তির রাজ্যে উপনীত হয়েছেন। হেমন্ত বিভাবরীর সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁর মানসসুন্দরীকে আহ্বান করলেন, তখন তাঁর চিত্ত

সুশীতল। বাসনা ও কামনার উত্তাপ নেই বলে তাঁর কোনো আক্ষেপ নেই। কবির জীবনের 'অস্ত-কিনারে' নূতন আলোর দীপালি জ্বলে উঠেছে। 'নীরব নিথর রঙের পাথার' এখন তাঁর নয়নের সামনে অস্তরাগের এক অপরূপ মায়া সঞ্চার করেছে। পরম পরিতৃপ্ত কবির নিকট আজ প্রৌঢ় জীবনও বড় মূল্যবান।

"নিবে আসে যবে আকাশে দিনের আলো
অস্ত-কিনারে কে দেবী, দীপালি জ্বালো?
স্বপনের ভারে ভেরে আসে আঁখি-পাতা—
তিমিরের পটে এত রং কেবা ঢালো!"

(হেমন্ত-গোধূলি)

'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে' কবিতাতেও কবি এই আলোর কথাই বলেছেন—

"এতদিন আলোর পিপাসা জানি নি কাহারে বলে,
আমার আকাশ আমার ধরণী ছিল যে আলোয়-আলো!
নিম্ন-ভুবনে সে আলো এখন নামিছে অস্তাচলে—
ঊর্দ্ধগগনে তাই কি, বন্ধু, তারার প্রদীপ জ্বালো?"

(পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে)

এই 'দীপালি' ও 'তারার প্রদীপের আলো' অধ্যাত্ম জগতেরই রশ্মি। এর আভাস পেয়েছেন বলেই তিনি আজ 'বালুকা বাসর'এর জন্যে উদ্‌গ্রীব। ভাঙনের তীরে বালুচরের বুকে 'বালুকা-বাসর' কবিতায় কবির যে বাসরশয্যা তা মানস-সুন্দরীর পছন্দ হয় নি বলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাঁকে রেখে তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু মায়ার টানে আবার তাঁকে ফিরে আসতে হল। কবির সঙ্গে পুনরায় তিনি প্রেম-লীলায় মেতে উঠতে চাইলে, কবি উত্তর দিলেন—

"ভালবাসা?—হাসির কথা! উড়িয়ে দিছি অনেকদিন,
বালুর উপর ঝাউএর ছায়া তার চেয়ে যে ঢের রঙীন্।"

(বালুকা-বাসর)

আসলে এখন মোহিতলালের চিত্তেই এসেছে গভীর পরিবর্তন। মানস-লক্ষ্মীকে নিয়ে হোলি-খেলার উৎসবে মত্ত হবার তাঁর আর সাধ নেই। মানস-লক্ষ্মীর এই বিদায়ের কথা 'নির্ব্বেদ' কবিতাতেও আছে। যৌবনের মতো বসন্ত-প্রকৃতিতে তাঁর চিত্তে বিরহ আর জাগে না—'কুসুম-কুন্তলা পুনর্নবা বনবীথি' তাঁকে আর সেদিনের মতো উতলা করে না—তাঁর চিত্তে সেই আকণ্ঠ দুরন্ত পিপাসাও আর নেই। 'প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি

সাথে।' কিন্তু তথাপি কবি নিরাশ হলেন না—তিনি যৌবনকে তো একদা সর্বান্তঃকরণে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। 'যৌবন-যজ্ঞে'র সেই 'মধুস্রবা—অমৃত-ওষধি'—'সোম'কে শোধন ক'রে নিয়েই তো তিনি 'বিধির বিধি' একদা ভোগ করেছেন। আজ তার জন্যে আক্ষেপ করবেন কেন? চঞ্চল চপল প্রিয়া বিদায় নিল তো কি হবে? 'তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন।'

প্রৌঢ় জীবনে যথার্থ যৌবন-বসন্ত আজ আর আসবে না। প্রাকৃতিক জগতে বসন্তের আবির্ভাব ও তদ্ধেতু আনন্দের প্লাবন প্রত্যক্ষ ক'রেও আজ কবির কোনো ক্ষোভ নেই। আজ এই বসন্ত উৎসবে তিনি যখন স্মৃতির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে 'বসন্তের ঝরা পাতা' ও 'ঝরা ফুলে'র দিকে চেয়ে পূর্বকথাকে স্মরণ করেন, তখন সে-স্মৃতির আলোকে তিনি নিজ জীবনেও 'তপোবনে আকালিক বসন্ত উদয়ের' মতো যৌবন-বসন্ত ফিরে পান। সেই স্মৃতিবিহারী পরমসুখী কবি বলেন—

> 'শীতের জরার শেষে বসন্তের এ নব-যৌবন
> করুক সবারে সুখী—সম্বরিনু আমিও লেখন।'

(অকাল-বসন্ত)

দেখা যাচ্ছে, জীবনের এই পর্বে দুটি উপায়ে কবি শান্তি ও সান্ত্বনার বারি পান করছেন। বিগত জীবনের আনন্দমুখর স্মৃতির অনুধ্যানে অথবা জীবনের 'অস্ত-কিনারে' প্রতিফলিত দীপালির স্নিগ্ধ আলোক-নীরে অবগাহনেই কবির এই মানসিক প্রশান্তি। প্রথমটির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়টি ক্রমশ কবিপ্রাণকে গভীরতর অধ্যাত্মরসে নিমজ্জিত করেছে। 'প্রকাশ' 'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে' 'গঙ্গাতীরে' 'শ্রীপঞ্চমী' 'কন্যাপ্রশস্তি' ও 'প্রশ্ন' কবিতায় এ উক্তির প্রমাণ মিলবে।

'প্রকাশ' কবিতায় দেবতাত্মা হিমাচলের সন্নিকটে মোহিতলালের চিত্ত 'প্রাণস্পর্শা বিরাটের' মহিমায় বিগলিত হয়েছে। 'জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন' এই ত্রিবিধ চেতনার ভিতর দিয়ে কবি মায়াময়ী রজনীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জাগর অবস্থায় জ্যোৎস্নার মদিরা-পানশেষে তিনি সুষুপ্তির দশায় গভীর অন্ধকারে পতিত হলেন। শেষ-রাত্রিতে সুপ্তিভঙ্গের পর আকাশের বুকে দিব্যবিভাযুক্ত একটি নক্ষত্রকে লক্ষ্য করা গেল। অবশেষে পূর্বদিগন্তকে রক্তিমায় রঞ্জিত ক'রে উষার আবির্ভাব হল—তারও পরে স্তরে স্তরে নির্মল নীলিমাকে ভেদ ক'রে 'দেবতাত্মা তুঙ্গ হিমাচল' যখন কবির চোখের সামনে দেখা দিল, তখন—

"ঘুচিল সংশয়-মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল ;
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা ! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা,
প্রাণস্পর্শী বিরাটের ; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল।"

(প্রকাশ)

অধ্যাত্মজগতের বিভার যিনি আভাস পেয়েছেন, তাঁর পক্ষে হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' বলা এবং তার মধ্যে বিরাটের প্রকাশ লক্ষ্য করা খুবই স্বাভাবিক।

'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে' কবিতায় কবি নিজ জীবনে গোধূলি-বেলার উপস্থিতির কথা বললেও তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ নেই। এই কবিতায় কবি তাঁর জীবনের যে-দেবতাকে ক্ষণিকের জন্যে নয়নের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে অনুরোধ করেছেন এবং যাঁর শ্রীঅঙ্গের ছায়া-আলোকের খেলা স্বীয় নয়নে অনুরাগের রেখায় অঙ্কন ক'রে নিতে চেয়েছেন, তিনি কে ? রূপসুন্দর এই জীবনদেবতার যখনই তিনি পরিচয় দিতে গেলেন, তখন দেখা গেল সে দেবতা পরম লীলাময় শ্যামসুন্দর।

"অধরের বেণু, বনমালা, আর পায়ের নূপুর মণি—
সেই শিখি-চূড়া, পীতধটিখানি হেরিবনা আর যবে,
তখনো বক্ষে নৃত্য-চপল তব চরণের ধ্বনি
থামিবেনা জানি—যতখন মুখে তারকারা চেয়ে রবে।"

(পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে)

অধ্যাত্মচেতন কবির চিত্তে আত্মনিবেদনের ভক্তিবিগলিত সুরই এখানে অনুরণিত।

'কন্যাপ্রশস্তি' কবিতায় কবির এই মনোভাব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বন্ধুকন্যার বিবাহ-উপলক্ষে আশীর্বাণী জানাতে গিয়ে তিনি কন্যার মধ্যে দেবী মহামায়াকে প্রত্যক্ষ ক'রে বদ্ধাঞ্জলি হয়েছেন। এই মানসিকতার ফলে কবিপ্রাণের বিনির্মল প্রসন্নতায় 'গঙ্গাতীরে' কবিতাটি রসশ্রী লাভ করেছে। গঙ্গার কূলে কূলে, উর্ধ্বে, নিম্নে—ম্লান সূর্যালোকে নিসর্গ সৌন্দর্যের মায়াঘেরা প্রেক্ষাপটে কবি তাঁর জীবনদেবতাকে স্মরণ করেছেন। অন্তরের মধ্যে চির জাগরূক, 'অশ্রু-হাসির উদ্বেল গানে' চির সমুৎসুক এই জীবনদেবতার নির্দেশেই এতকাল কবি সত্যসুন্দরের উপাসনা করেছেন—'রুদ্রের সাথে রতির' আরাধনা করেছেন। জীবনের এই হেমন্ত-রজনীতে তাঁর মনে হল যে তিনি তাঁর দীর্ঘকালের দুরূহ কবিব্রতের গুরুদায়িত্ব যথোচিতভাবেই পালন করেছেন। দায়িত্বপালন-শেষে মানসিক স্বস্তির মধ্যে গঙ্গাতটে যখন তিনি আপন হৃদয়ের দিকে একবার ফিরে তাকালেন, তখন মনে হল তাঁর

চিত্ত 'অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতি'র জন্যে লালায়িত। আর এ বিশ্বাসও তাঁর হল যে পরমা শান্তি ও নির্বৃতির সন্ধান এই গঙ্গার কূলেই মিলবে। সেই জন্যেই কবি আজ বলছেন—

> 'মথিতে চাহিনা জলরাশি আর—করিবারে পারাপার,
> তরঙ্গ-মুখে তরণী সঁপিয়া দুরন্ত অভিসার!
> আজ শুয়ে র'ব সিকতার' পরে বাহুতে নয়ন ঢাকি'
> সব-ভুলে-যাওয়া অসীম আরাম পরাণে লইব মাখি।'

(গঙ্গাতীরে)

কিন্তু শুধু ঐ 'আরাম' চেয়ে নেওয়াই নয়, এই গঙ্গাতটে তন্দ্রাচ্ছন্ন কবি যদি জোয়ারের টানে তলিয়ে যান, তাহলে তেমন সুখ-পরিণামের জন্যে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন! হিন্দুর চিরপবিত্র শতস্মৃতিবিজড়িত এই গঙ্গার তটে অধ্যাত্মরসলিপ্সু কবির চিত্তে এই ভাবনাই তো স্বাভাবিক। মোহিতলালকে যাঁরা খাঁটি দেহাত্মবাদী কবিরূপে স্থির ক'রে তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক-ভাবনাকে একটি অবাঞ্ছিত উপদ্রব মনে করেন, তাঁরা গঙ্গাতীরে কবির এই ভাবনায় মর্মাহত হন এবং এতে 'কবিপ্রতিভার পরাজয়'কে[৭৮] প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু আমরা মোহিতলালের কাব্যের উন্মেষপর্বেই আধ্যাত্মিকতাকে লক্ষ্য করেছি। 'বিকাশপর্বে'ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির কবিতা পেয়েছি। 'সমৃদ্ধি' ও 'পরিণতিপর্বে'ও এই চেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। তাই বিষয়টি আমাদের কাছে কবিচিত্তের পরিণামেরই স্বাক্ষরবহ। মোহিতলাল বস্তুজগতের বুকে বসেই অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করেছেন। পূর্ব থেকে সংস্কারবশত এ প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু অতিরঞ্জন করেন নি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরভাবে এ-চেতনা তাঁর চিত্তে সমুদিত হয়েছে।

'শ্রীপঞ্চমী' কবিতাটিও একই সুরে বাঁধা। ভক্তিপ্লুত কণ্ঠে তিনি এ কবিতায় 'বিশ্বরমা কন্যা' ও 'ব্রহ্মার মানসী' দেবী সরস্বতীকে আবাহন করেছেন। আবার যখন 'প্রশ্ন' কবিতায় 'কোনও প্রায়োপবেশন-ব্রতী দেশ-প্রেমিক বীর' যুবককে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেন—

> "আমি বেঁচে আছি যুগ যুগ এই চির-প্রসূতির ঘরে,
> ফিরেও আসিনা মরিনা না যে কভু! এ বিরাট কলেবরে
> জন্ম-মৃত্যু শ্বাস-প্রশ্বাস! আমি নহি একা আমি,—
> মহামানবের অনন্ত আয়ু বহিতেছি দিনযামী।"

— তখন বৈদিক পুরুষ-মন্ত্রোক্ত অধ্যাত্মবিশ্বাসই কবিকণ্ঠ অধিকার করে।

নিসর্গপ্রীতির কবিতা

'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের প্রকৃতি মূলত শান্ত রসাশ্রিত। প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে কবি প্রধানত শান্তির বারিই পান করেছেন। অবশ্য এ কাব্যে কবিমন স্মৃতিচারী হওয়ায় যৌবনের সেই যাযাবর বেদুঈন জীবনের স্মৃতির সূত্রে ভয়ঙ্কর-সুন্দর প্রকৃতির চিত্র 'কাল-বৈশাখী' কবিতায় অঙ্কন করার বাসনা একবার মাত্র দেখা দিয়েছে এবং বিগত দাম্পত্যজীবনের মধুর স্মৃতিকে স্মরণ করে 'বধূ-বাসন্তী'র শৃঙ্গার রসাত্মক চিত্রও এসেছে। 'বালুকা-বাসর', 'গঙ্গাতীরে', 'প্রকাশ', 'বধূ-বাসন্তী', 'বাংলার ফুল' ও 'কাল-বৈশাখী' কবিতায় মোহিতলালের প্রকৃতি-ভাবুকতার পরিচয় আছে। কবির এ-কালের মানসিকতার দ্বারাই যে তাঁর প্রকৃতিচেতনা মূলত অনুরঞ্জিত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

'বালুকা-বাসর', 'গঙ্গাতীরে' ও 'প্রকাশ' এই তিনটি কবিতার মধ্যে প্রথমটিতে নদীর বালুচর জীবনের ঝাউবনের মায়ায় কবি প্রাণে অশেষ শান্তিলাভ করেছেন। পরবর্তী কবিতা দু'টির প্রথমটিতে গঙ্গাতটের মনোরম স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও গঙ্গানদীর প্রাচীন ঐতিহ্য তাঁর মনকে অধ্যাত্মমুখী করেছে। শেষোক্ত কবিতাটিতে বিশাল হিমালয়ের প্রকাশ-মহিমা তাঁকে বিরাটের ধ্যানে নিমগ্ন করেছে। 'বালুকা-বাসরে' যে শান্তরসের সূচনা, তারই ঘনীভবন পরবর্তী দু'টি কবিতায়। তিনটি কবিতায় প্রকৃতি প্রধানত আলম্বন বিভাবরূপে কবি-প্রাণে শান্ত অথবা ভক্তিরস-উদ্রেকে সহায়তা করেছে।

'বধূ-বাসন্তী' ও 'বাংলার ফুল' কবিতায় কবির পূর্ববর্তী প্রকৃতিপ্রেমের অতিপ্রিয় প্রবণতাটি শেষবারের মতো উঁকি দিয়েছে এবং এই সঙ্গে শেষোক্ত কবিতায় তাঁর দেশপ্রীতির প্রবণতাটিও অন্বিত হয়েছে। 'স্বপনপসারী'র যে কবি একদা 'সে' কবিতায় মনোরমা ভার্যার কল্যাণীমূর্তির রূপসৌন্দর্যে বিভোর ছিলেন, 'স্মরগরল'এ চাঁদের বাসরের কথা বলতে গিয়ে যে কবি একদা প্রাণের তারে 'আরেক রজনীর সুরকে' রণিত হতে দেখেছিলেন, সেই কবিকে দাম্পত্য জীবনের মধুময় স্মৃতি 'হেমন্ত-গোধূলি'তেও উন্মনা করেছে। 'বিস্মরণী'তেও বকুলফুল বসন্তের মাধবীপুষ্পের ভ্রম জন্মিয়েছিল এবং বকুলকেই তিনি 'মানস-বনের মাধবী' বলেই ভেবেছিলেন। 'বধূ-বাসন্তী' কবিতায় বসন্তের মাধবী কুসুমকে বধূরূপে চিত্রিত ক'রে কবি বরবেশে তার কৌমার্য হরণ করেছেন। স্মৃতি-সুরভিত আনন্দকে পাত্রান্তরিত ক'রে ভোগ নয়, উপভোগের বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। অনূঢ়া কন্যার বিবাহ-পূর্ব আয়োজন ভূমিকাটি সম্পূর্ণভাবে এখানে প্রকৃতি-জগতে আরোপিত।

বিচিত্রপ্রকার ফুলের প্রতি মোহিতলালের আকর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ঢাকায় নীলক্ষেত রমণায় বাসকালে কবির স্বহস্তরচিত ফুল-বাগান একটি দর্শনীয় স্থান ছিল। মোহিতলালের সেই আশৈশব পুষ্পপ্রীতিই 'বাংলার ফুল' কবিতায় প্রকাশিত। আবার ফুলের সংসারের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি তাঁর অতিপ্রিয় সেই পুরাতন সমাসোক্তি অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন।

> "হেরি যে হোথায় জোড়া-বাঁধা যেন ফুটিয়াছে রঙ্গন,
> উপরে তাহার শাখা মেলিয়াছে নধর কনক-চাঁপা ;
> কোন্ উপাসিকা দোপাটির বনে ছিটায়েছে চন্দন !
> গাঁদা হাসিতেছে আঙিনার কোণে—হাসিখানি তার চাপা।"
>
> (বাংলার ফুল)

'উষা' কবিতায় স্মৃতিচারী মোহিতলালের সমস্ত অন্তর উষার সৌন্দর্যে ভরে উঠেছে। উষার স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি স্মৃতির মায়া স্মরণ না ক'রে পারেন না।

> "পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়—
> মুহূর্ত্তের সেই শোভা মনোহর—তারি নাম উষা ;
> একবার ধরা দিয়ে ভরি' রাখে স্মৃতির মঞ্জুষা—
> সোনার সে দাগটুকু মানসের নিকষ-শিলায় !" (উষা)

'কাল-বৈশাখী' কবিতায় বৈশাখী প্রলয়-ঝটিকার একটি বাস্তব ও অপরূপ-গম্ভীর রূপ শব্দচিত্রে বিধৃত হয়েছে। 'নববর্ষের পুণ্যবাসরে' কাল-বৈশাখীর ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন ক'রেও কবিচিত্ত 'অদ্ভুত উল্লাসে' পুলকিত। কারণ 'নীল-অঞ্জন গিরিনিভকায়া' ও 'নিশীথ-নীরব ঘনঘোর ছায়া'র অন্তরালে কবি নববিধানের 'দুর্দ্ধর্ষ' আশ্বাসও লাভ করেছেন। প্রকৃতির যে ভীষণ-সুন্দর মূর্তি একদা 'স্বপনপসারী'র কবিকে বিহ্বল করেছিল, 'রুদ্রবোধন'এ যে-কবি ভয়ঙ্কর-মনোহর রুদ্রের উদ্বোধনী সংগীত উচ্চারণ করেছেন, সেই কবির পক্ষে স্মৃতি-সুরভিত পুরাতন সুরেই প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ভীষণ-মধুরের স্তব অতিশয় স্বাভাবিক। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষ শেষ' কবিতার প্রেরণা ও ভাবসাদৃশ্য থাকলেও মোহিতলালের ঝটিকা-চিত্রাঙ্কনে আগ্রহই বেশী। কবির প্রকৃতিপ্রীতি আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়েছে ঘনঘন পিনাকপাণির ছায়াসম্পাতে।

নিসর্গপ্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলির আলোচনায় আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে তিনি প্রকৃতিকে আত্মনিরপেক্ষভাবে সম্পূর্ণ তদ্গতভাবে দর্শন

করেন নি। ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নল্ডের কাব্যের প্রকৃতি সম্পর্কে স্যার এডমণ্ড চেম্বার্স লিখেছেন—"He can arrive at no cohorent vision of the scheme of things entire. Nature follws the course of nature, and man fallows the course of man. Between these there may be contacts.[৭৯]

প্রকৃতি ও মানবের ধারা বিভিন্ন। তাদের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপিত হলেও হতে পারে—এই ধরনের সংশয় মোহিতলালের ছিল না। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই অন্তত কাব্যে তাঁর চিন্তাধারার সুস্পষ্ট বিবর্তন নেই।[৮০] বরং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখনই তাঁর মন অতিরিক্ত চিন্তাশীলতায় দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, তখন প্রকৃতির আশ্রয়ে তিনি স্বস্তিলাভ করেছেন। সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে মানবজগতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার মাঝখানে তিনি কখনই প্রকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর আত্মসম্পর্কই বেশী। আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের এটিই একটি স্বাভাবিক প্রবণতা।[৮১] তথাপি তাঁর প্রকৃতিচেতনার মূল আরও গভীরে।

ব্যক্তিপ্রশস্তি ও জাতির অবক্ষয়বেদনা

পূর্ববর্তী কাব্যে ব্যক্তিপ্রশস্তিমূলক কয়েকটি কবিতায় জাতির দুর্গতি-বেদনা যুক্ত হয়ে কবিচিত্তে যে নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল, 'হেমন্ত-গোধূলি'র কতকগুলি কবিতায় সে দ্বন্দ্বকে তীব্রতম হতে দেখা যায়। 'মধু উদ্বোধন', 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'ফেরদৌসী' 'রবির প্রতি' কবিতায়ও যেমন, 'বনস্পতি' 'অস্তিম' প্রভৃতি কবিতায় তেমনি কবিমনের ঐ বিষাদক্লিষ্ট ভাবনাটি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শুধুই ঐ দ্বন্দ্বের তীব্রতা নয়, দ্বন্দ্বমুক্তির আভাসও এগুলোতে আছে।

তৎকালীন রবীন্দ্র-অনুসারী এবং অতি আধুনিক কবি বা সাহিত্যিকদের কাব্য সাধনায় মোহিতলাল সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। উনিশ শতকীয় আশা ও বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সমকালীন সাহিত্যকে দেখে তাঁর মন নৈরাশ্যপীড়িত হয়েছিল। 'মধু উদ্বোধন' কবিতায় তিনি বলেছেন—

> "নাহি সে জীবন-যজ্ঞে বাসনার হবিঃ—
> নিমেষে আপন-হারা আহুতি প্রেমের।
> কবিতা গিয়াছে মরি', বাণীর শ্মশানে
> দগ্ধ অস্থি-কঙ্কালের কুৎসিত কলহ
> করিছে শ্মশান-চর!" (মধু-উদ্বোধন)

মৃত্তিকার পানপাত্রে দেহহীন ভাবের অমৃতরস অথবা 'আর্তস্বরে অর্থহীন

বাণীর বিকার'ই তৎকালীন কাব্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যের এই শোচনীয় অবস্থায় ব্যথাহত কবি তাঁর প্রিয়তম উনিশ শতকের কবি শ্রীমধুস্থদনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর 'কাব্যবেদী হতে' 'এতটুকু প্রাণ অগ্নিকণা' চয়ন করতে চেয়েছেন। সর্বশেষে কবিকে তিনি বলেছেন—

'জীয়াইয়া তোল নব বাণীমন্ত্রে তব,
এ জাতির কুল-মান রাখ এ সঙ্কটে!' (মধু-উদ্বোধন)

'রবির প্রতি' কবিতায় মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন যে তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় অনুকারী কবির দল সাহিত্যক্ষেত্রে কোলাহল শুরু করেছে। তিনি অপসৃত হলেই এরাও নিশ্চিহ্ন হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবশতই তিনি লিখেছিলেন—

"তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠে পিক!—
কে শোনে তাদের গান? মাছিদের কল্লোলে হায়ায়!
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ!—তুমি রবি, তবুও হা ধিক্
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়!"
(রবির প্রতি)

'মধু-উদ্বোধন' এবং 'রবির প্রতি' দুটি কবিতাতেই ব্যক্তিপ্রসঙ্গ। কিন্তু দুটিতেই ব্যক্তিকে উপলক্ষ ক'রে সমকালীন জাতীয় সাহিত্যের অবনতি বেদনায় তিনি বিষাদাচ্ছন্ন।

ঠিক অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় সংবলিত কবিতা 'বঙ্কিমচন্দ্র'। 'প্রাণের সেই সঞ্জিয়া প্রীতি', জীবনযজ্ঞের স্বাহা মন্ত্রস্বরূপ নারীরূপা প্রকৃতির বিচিত্রমূর্তি —প্রভৃতি যা মোহিতলালের ধারণায় বঙ্কিমসাহিত্যকে অনন্যতা দিয়েছে, সমকালীন সাহিত্যে তার প্রতিফলন কোথায়? বিষণ্ণ কবি তাই এ কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ধ্যানে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'ফেরদৌসী' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। শাশ্বত মানুষের পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষের শৌর্য, বীর্য ও পৌরুষের জয়গান গেয়ে 'হিংসা-প্রেম-পাপ-পুণ্য'কে সমভাবে বরণ ক'রে সহস্র বৎসর পূর্বে ইরাণের যে মহাকবি ফেরদৌসী একদা 'জাতির গৌরব গাথা' রচনা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে এ কবিতায়। কবিতাটির শেষের দিকে হতবীর্য বাঙালীর চিন্তা কবিকে হতাশ করেছে।

"ঈরাণের হে কবি প্রধান!
তোমার কবরে আজ বাঙ্গালীও করে দীপ-দান!
এ দুর্ভাগা দেশ।
অশেষ দুর্গতি মাঝে লয় আজি তোমার উদ্দেশ।"
(ফেরদৌসী)

এই ব্যক্তিপ্রসঙ্গমূলক কবিতাগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি কবিতায় এই ভাবনার পরিচয় আছে। 'অন্তিম' কবিতায় বাঙালী জাতির জীবনে তিনি বর্তমানে যে যক্ষকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাতে এ-জাতির আত্মিক মৃত্যুচিহ্নই ফুটে উঠেছে। 'বনস্পতি' কবিতায় রূপকের অন্তরালে জাতির আত্মহনন-মূলক ভ্রমাত্মক জীবনচর্যা-জনিত উল্লাসের মাঝখানে নৈরাশ্যপীড়িত কবি বনস্পতির মতো নির্বাক হয়ে গেছেন। 'দারুণ মানস-নিগ্রহ'কে বুকে বহন ক'রে বনস্পতির মতোই তিনি লক্ষ্য করলেন—

"ধ্বনিতেছে গগনে গগনে
দণ্ডধারী দানবের জয়।" (বনস্পতি)

জাতি ও দেশের জন্যে মোহিতলালের এ-ভাবনা আন্তরিক হলেও এই অতিরিক্ত মমত্বই তাঁর কবিচেতনাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল। জাতির অধোগতির জন্যে তিনি নিরন্তর অশ্রুপাত করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস জাতিকে উদ্বোধিত করার সব আশা এখনও নির্মূল হয় নি। তাই এখনও বাঙলাদেশের প্রকৃতির প্রসঙ্গ উঠলেই কবির লেখনী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

"এই বাংলার তৃণে তৃণে ফুল, কূলে কূলে মধুমতী,
শ্যামলে সবুজে ধূলামাটি ঢাকা—আলোকের আলিপনা!"
(বাংলার ফুল)

তাই এখনও তিনি মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও ফেরদৌসীর জীবনবাণীর উজ্জীবন কামনা করেন। 'স্মরগরল'এর কালে জাতির অবক্ষয়বেদনা কবির মনে যে নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল এ কাব্যে সে দ্বন্দ্ব তীব্রতম হয়ে উঠলেও কবি আশাবাদী—তাঁর বিশ্বাস মুমূর্ষু জাতি আবার নূতন আশা, বিশ্বাস ও প্রাণমন্ত্রে উজ্জীবিত হবে। এই বিশ্বাসের মধ্যেই কবির এই নবতম দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হওয়ার সংকেত আছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'র কাব্যপরিচয় এই পর্যন্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে, এ 'কাব্যের ফুল ও পাখী' 'স্বপ্নসঙ্গিনী' 'মিনতি' 'যাত্রাশেষ' 'অশান্ত' 'বাণীহারা' প্রভৃতি কবিতায় কবি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অপগত যৌবনের জন্যে যে হাহাকার করেছেন, কিংবা নূতন ক'রে যৌবনের মত্ততার

আবর্তে যে পতিত হতে চেয়েছেন—তার কারণ কি? কাব্যটি যদি কবির সকল প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত প্রসন্ন মানসিকতারই পরিচায়ক হয়, তাহলে এ কবিতাগুলি সম্পর্কে কি বলা যায়? এর উত্তরে বলা যায় যে এ কবিতাগুলি 'স্মরগরল' কাব্যের যৌবনাস্তিক কবির দীর্ঘশ্বাসের সুরে বাঁধা। এগুলি 'স্মরগরল'এর ঐ শ্রেণীর কবিতা-রচনার কালেই লিখিত। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি এ কাব্যের অনেকগুলি কবিতা যে পূর্বে রচিত বলেছেন, আমাদের মতে তা খুবই যথার্থ। উর্বশীরূপী স্বপ্নসঙ্গিনী বিদায় নেওয়ায় তাই কবি জীবনকে কখনো মরুময় ভেবেছেন, (স্বপ্নসঙ্গিনী) কখনো নিজেকে বসন্তের ফুল মনে ক'রে 'ফুটে' ঝরে গেছি তাই নীরস নিদাঘ' বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন, (ফুল ও পাখী) আবার কখনো চিরসুন্দরের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হারিয়েছেন বলে কবি দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন (মিনতি)। কিংবা যে কবি কত সন্ধ্যা উষা মধ্যাহ্ন ও দিবালোকের উদয়-বিলয়ে অন্ধকারের ভয়ে কোনোদিন ভীত হন নি, সেই কবির যাত্রা থেমে যাওয়ায় কি গভীর অনুশোচনা (যাত্রাশেষে)! আর সেই জন্যেই দেখা যাচ্ছে কবি যৌবনের অশান্ত বিক্ষোভকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে আবার কতো আগ্রহী (অশান্ত), চির অধরার অধরসুধা পানের জন্যে আবার কি অধীরতা (বাণীহারা)। মোট কথা এসব কবিতার একটিও 'হেমন্ত-গোধূলি'র কবির নয়—'স্মরগরল'এর কবির। কাব্যশেষে

আমাদের মতে তাই 'হেমন্ত-গোধূলি'-কাব্য কবিচিত্তের পূর্ণ পরিণতির ও প্রশান্তির কাব্য। ভাবে ও ভাষায় কাব্যটি অন্য কাব্যগুলি থেকে স্বতন্ত্র। 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল'এ স্টাইলের যে আভিজাত্য এবং মননের যে দীপ্তি, তা এখানে অনুপস্থিত। 'স্বপনপসারী'র সহজ-সাবলীলতা আবার এখানে দেখা দিয়েছে। অবশ্য স্বপনপসারীর উচ্ছলতার পরিবর্তে এসেছে সংযম ও সংহতি। গীতিকাব্যের স্বানুভবাত্মক ভঙ্গীটিও এখানে অধিক পরিস্ফুট। কাব্যলক্ষ্মীর নিকট থেকে শেষবিদায়ের কারুণ্যভরা সুরমাধুর্য ও বৈরাগের নির্লিপ্ততা কাব্যটিকে পরম রমণীয় ক'রে তুলেছে।

'হেমন্ত-গোধূলি'তে মোহিতলাল তাঁর কবিজীবনের সকল দ্বন্দ্বসংকট থেকেই মুক্ত হয়েছেন দেখেছি। জাতিগত ভাবনার দ্বন্দ্বটি একাব্যে তীব্রতম হলেও কবি অন্তরের অতিপ্রবল আশাবাদের দ্বারা তাকে জয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু 'হেমন্ত-গোধূলি'র পরে কবির চিত্তে ঐ আশাবাদ ক্ষীণ হতে থাকে। আর সেই জন্যেই কাব্যে সমন্বয়ের রাজ্যলাভ করলেও ধীরে ধীরে

তিনি রাজ্যটি থেকে নির্বাসিত হতে থাকেন। অতঃপর তিনি কাব্যসাধনা ত্যাগ ক'রে বাঙালীর সর্বাত্মক উন্নতির জন্যে রাজনীতির আবর্তে নেমে এসেছেন। দ্বিখণ্ডিত বাংলার দুর্গতি, কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যনীতি, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের বিষময় ফল, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সর্বনাশা পরিণতি, জাতি ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ঋষি অরবিন্দের সাধনা, নেতাজীর জীবন-মহাকাব্যের মহিমা—প্রভৃতি বিষয় আলোচনার জন্যে তিনি 'বঙ্গদর্শন'[৮২] ও পরে 'বঙ্গ ভারতী'[৮৩] পত্রিকাকে আশ্রয় করেন। এ দুটি পত্রিকার সর্বাঙ্গে জাতিপ্রেমিক বাঙালী মোহিতলালের দুর্গত সর্বহারা জাতির জন্য অরন্তুদ কান্না 'উদ্বেল-অম্বুধি'। উনিশ শতকের অপসৃত স্বপ্নময় আদর্শকে গভীরভাবে আশ্রয় ক'রে তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কীর্তিগানে মুখর। আর সমকালীন বাঙালীর সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে আত্মহননের বীজ লক্ষ্য ক'রে অশ্রুবর্ষণ। বলাবাহুল্য শেষ বয়সে মোহিতলাল 'বাঙালী' 'বাঙালী' ক'রে একরূপ মানসিক অসুস্থতায় পীড়িত হয়েছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের সে কথা অপ্রাসঙ্গিক।

মোহিতলালের কাব্য-আলোচনার এইখানেই শেষ। এই কাব্যধারা সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রেই এ আলোচনার উপসংহার। মোহিতলালের কবিচিত্তে বিভিন্ন ভাব যে-ভাবে সমুদিত হয়ে ভাবনায় পরিণত হয়েছে এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যেভাবে দ্বন্দ্বমুক্ত সমন্বয়ের অবস্থায় পৌঁছেছে, তাতে তাঁর কাব্যধারায় জার্মান দর্শনিক জর্জ ভিল্‌হেল্‌ম ফ্রেডারিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) দ্বন্দ্বসমন্বয়-রীতি প্রশ্রয় পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।[৮৪] হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুসারে মানুষের প্রত্যেকটি ধারণাই একটি অন্তর্নিহিত গতির প্রভাবে এর বিপরীত ধারণায় পরিণত হয় এবং পরে উভয় ধারণাই একটি উচ্চতর ধারণার মধ্যে সমাহিত হয়। মানুষের চিন্তাধারায় এবং জগতের অভিব্যক্তিতে এই দ্বন্দ্ব যে নিহিত—এ সত্য হেগেল লক্ষ্য করেছিলেন। এই দ্বন্দ্বের তিনটি স্তরের কথাও হেগেল স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিষ্ঠা বা স্থাপনা (Thesis), বৈপরীত্য (Antethesis) এবং সমন্বয় (Synthesis)—এই তিনটি স্তরে মানুষের প্রত্যেকটি সূক্ষ্ম-গভীর চিন্তা বিবর্তিত হয়ে চলেছে। হেগেলের মতে আমরা থীসিস বা প্রতিষ্ঠা বলতে কোনো বস্তু বা চিন্তার একদেশীয় জ্ঞান বুঝি। যতক্ষণ পর্যন্ত এই একদেশীয় জ্ঞানের আধিপত্য, ততক্ষণ তাতে সাম্যের অবস্থা—সেই জ্ঞান কোনোক্রমেই মানুষের মনে ভাবনাকে উদ্রিক্ত করবে না। সেই জ্ঞান একটা

মানসিক প্রসন্নতার সৃষ্টি করে। কিন্তু ঐ বস্তু বা চিন্তার ভিন্নদেশীয় জ্ঞানের নাম বৈপরীত্য (antethesis)। অর্থাৎ এই একদেশীয় জ্ঞান নিয়ে অনুক্ষণ চিন্তা করতে থাকলে মনে ভিন্নদেশীয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তখনই দেখা দেয় চিত্তে দ্বন্দ্ব। আর যে-জ্ঞানে এই দুই পরস্পর-বিরোধী জ্ঞানের সামঞ্জস্য ঘটে, তাকে সমন্বয় (Synthesis) বলে। মোহিতলালের কাব্যের 'উন্মেষ' ও 'বিকাশপর্বে' যে-সমস্ত ভাব তাঁর চিত্তে উদ্রিক্ত হয়েছে এবং ভাবজনিত যে-জ্ঞান তাঁর চিত্তে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব বা সংশয়ের সৃষ্টি করছে না, আমাদের মতে তাই স্থাপনা বা থীসিস্। 'সমৃদ্ধিপর্বে'র কাব্য 'বিস্মরণী' থেকেই কবির চিত্তে দ্বন্দ্বের সূচনা এবং মৃত্যু-ভাবনা ছাড়া আর সকল ভাবনাই দ্বন্দ্বের তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত। মৃত্যু-ভাবনা এখানে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েও দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ। এই পর্বে পূর্ববর্তী বিভিন্ন ভাব, ভিন্ন দেশীয় জ্ঞানের উদ্রেকে বিপরীতমুখী চিন্তায় বৈপরীত্যের (antethesis) সৃষ্টি করেছে। 'পরিণতিপর্বে'র 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলিতে ঐ বৈপরীত্যের অবসান কিংবা কোথাও তার নূতন ক'রে উদ্ভব ও অবসান। যথার্থ সমন্বয়ের সূত্রপাত 'স্মরগরল'এ এবং তার পূর্ণতা 'হেমন্ত-গোধূলি'তে।

আমরা মোহিতলালের সমগ্র কাব্যধারা বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে তিনি এই সমন্বয়ের রাজ্যে উপনীত হয়েও একটি সুদৃঢ় ও সুস্থির ভিত্তির ওপর বেশীদিন বাস করতে পারেন নি। জাতির সর্বনাশা পরিণতির দুশ্চিন্তা তাঁকে দুঃস্বপ্নের মতো পেয়ে বসে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে যে-ভাবনার অবসান ঘটল বলে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম, তা ক্ষণিকের আত্মসান্ত্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ চিন্তাই 'হেমন্ত-গোধূলি'র পরবর্তী মোহিতলালের মধ্যে প্রবলতম হয়ে দেখা দিয়েছে এবং কবিকে সমন্বয়ের রাজ্য থেকে টেনে এনে রাজনীতির রূঢ় রুক্ষ প্রান্তরে গদ্যের গদা ঘোরাবার কাজে নিয়োজিত করেছে। যথার্থ মৃত্যুর পূর্বেই মোহিতলালের কবিসত্তা মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর সমালোচকসত্তা ও জাতি-ভাবনার উদগ্রতায় সঞ্জাত বাঙালীসত্তার সহযোগে আরও কিছুকাল তাঁর সাহিত্যসাধনার জের চলেছে বটে, কিন্তু সেখানে কবি মোহিতলাল নেই—আছে শুধু তাঁর বিগত বৈভবের সেই মধু-স্মৃতি। মোহিতলালের কবিজীবনের এইখানেই ট্র্যাজিডি।

উল্লেখপঞ্জী

১ ১৩৩১ সালের 'শনিবারের চিঠি' মাঘ (সাপ্তাহিক) সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস লিখিত 'দুইদিক' গল্পে সেইকালে মোহিতলাল দারিদ্র্যের মধ্যেও কিরূপ অবিচলচিত্তে কাব্যসাধনা করতেন, তার প্রমাণ আছে। গল্পটির কিয়দংশ কবির জীবনকথায় আমরা বিবৃত করেছি। অনেক পরে অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লেখা একটি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেও এ-কথার আরও একবার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'আমার সাংসারিক দৈন্য চিরদিন আছে— তাতে আমি কষ্ট পাই কিন্তু বিচলিত হই না। আমার মত মানুষ দরিদ্র না হয়ে পারে না। কিন্তু যিনি আমার জীবনকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি চিরদিনই আমার প্রাণধারণের ব্যবস্থাও করেছেন— সে ভাবনা আমাকে করতে দেননি, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা বা বৈষয়িক উন্নতি আমার জন্যে তিনি ব্যবস্থা করেন নি—আমি চিরদিনই লক্ষ্মীছাড়া হয়েই রইলাম।" আজহারউদ্দিন খান লিখিত 'বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল'—গ্রন্থে উদ্ধৃত পত্র পৃঃ ১৭৫

২ ১৩১৪ সালের কার্তিক (৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা) 'জাহ্নবী' পত্রিকায় (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী সম্পাদিত)। 'জীবন' ও 'মৃত্যু' শীর্ষক মোহিতলালের দুটি চতুর্দশপদী বের হয়। এর পূর্বেও ইনি কবিতা লিখতেন এবং বলাগড়নিবাসী তাঁর বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ মজুমদারকে পাঠ ক'রে শোনাতেন। বাড়ির মেয়েদেরও তিনি সে সব কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন কিন্তু অপরিণত সে-সব লেখা ছাপা হয় নি। এইজন্য ঐ কবিতা দুটিকে আমরা প্রকাশিত প্রথম কবিতা বলেছি। এই তথ্য মোহিতলালের নিকট আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ মজুমদার (৩ রমেন্দ্রপ্রসাদ মজুমদার লেন, হাওড়া)-এর নিকট পেয়েছি।

৩ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে সুরদাসের জবানীতে নিজ সৌন্দর্যচেতনার যে ইতিবৃত্ত দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় প্রকৃতিপ্রীতি থেকেই তাঁর চিত্তে প্রথম সৌন্দর্যতৃষ্ণার জাগরণ।

৪ ১৩১৯ সালের ১লা কার্তিক 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ষোলটি চতুর্দশপদী আছে। পুস্তিকাটির মূল্য ছিল এক আনা এবং এতে কবির নাম মোহিতমোহন মজুমদার। পুস্তিকাটি দীর্ঘদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত 'মোহিতলাল কাব্য সম্ভার' গ্রন্থে এটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৫ রবি-প্রদক্ষিণ (রবীন্দ্রনাথ) পৃঃ ৯

৬ 'মানসী' পত্রিকার ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ ৪র্থ সংখ্যায় চির-অধরার প্রতি হাহাকার সম্বলিত 'তুমি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

৭ 'মানসী' পত্রিকার ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' কবিতার মোহিতলালকৃত সমালোচনা।

৮ রবি-প্রদক্ষিণ (শিলাইদহে রবীন্দ্র-স্মৃতি) পৃঃ ১৮০

৯ 'শনিবারের চিঠি' ১৩৪৬ সাল মাঘ সম্পাদকীয় অংশে উদ্ধৃত কবির মন্তব্য।

১০ ১৩১৯ সালে রচিত কবির 'চতুঃসন্ধ্যা' প্রবন্ধ। এটি তাঁর "জীবন জিজ্ঞাসা" (১ম সং ১৩৫৮ আষাঢ়) গ্রন্থের অন্তর্গত। পৃঃ ২০৮

১১ কবিশেখর কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা সংকলন গ্রন্থ 'শতনরী'র ভূমিকায় কবির পরিচয় দান প্রসঙ্গে তাঁকে 'স্বপ্নরসের কবি' বলে আখ্যাত করেছেন।

১২ Thomas Lovell Beddoes লিখিত 'Dream Pedlary' কবিতার কিছু প্রভাব এ কবিতার আছে। কবিতাটির আরম্ভ এইরূপ, "If there were dreams to sell what would you buy ?"

১৩ কবির 'জীবন জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'ব্যর্থজীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯২

১৪ "২০. ৩. ৪২ তারিখে ঢাকা থেকে লিখিত একখানি চিঠিতে অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে মোহিতলাল লিখেছিলেন,—'বেদুঈন'-এর জীবন ও মরুভূমির চিত্র আমি নানাস্থান হইতে প্রায় বিন্দু বিন্দু আহরণ করিয়াছি। তবে উহার প্রধান কল্পনা-উৎস ছিল Monier William Jones কৃত কয়েকটি আরবী কবিতার ইংরাজ অনুবাদ।...মরুভূমিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে আমি এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের 'The Terrible Sahara'র চিত্র কাজে লাগাইয়াছি—দুই একটি ইংরেজী কবিতার সাহায্য লইয়াছি।"

মোহিতলাল একবার কবি করুণানিধানের সঙ্গে কবি সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে সাক্ষাতের জন্য যান। সেখানে তিনি তাঁর স্বরচিত কবিতা 'শেষশয্যায় নূরজাহান' আবৃত্তি ক'রে কবি সত্যেন্দ্রনাথকে শোনালে তিনি খুব খুশী হন। তখন তিনি আনন্দের আতিশয্যে তাঁর অতি প্রিয় কবিতা 'বেদুঈন'ও পাঠ করেন। কিন্তু কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের তেমন ভাল লাগে নি। তিনি বলেন, —"নূরজাহানের সঙ্গে তুলনাই হয় না, অনেক নিকৃষ্ট।" 'কালিকলম' ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যায় 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মোহিতলাল নিজেই এই তথ্য বিবৃত করেছেন।

১৫ 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'মনমর্ম্মর' অংশে 'জীবনধর্ম্ম' সম্পর্কে কবির দিনলিপি পৃঃ ২৩৭

১৬ এই কবিতাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় কবি নিজেই তাঁর 'কাব্যমঞ্জুষা' গ্রন্থের কবিতাপাঠ অংশে দিয়েছেন।

১৭ এই কবিতা দুটি সম্বন্ধে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—'স্বপনপসারীর সুপ্রসিদ্ধ নাদিরশাহ সম্বন্ধে কবিতাটির সঙ্গে কবির রুদ্রগোত্রীয়ত্বের যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আসলে এই পন্থা বীর্যের পন্থা, মানুষকে অভ্রংভদী করিয়া তুলিবার প্রয়াস।" (কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়—১ম সং ১৩৬২ কার্তিক, পৃঃ ২৪৪)

১৮ অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'অভয়ের কথা' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পরিচয় দান প্রসঙ্গে মোহিতলাল অনেক পরে জানিয়েছেন—"কেবল ইহাই বলিব যে প্রথম যৌবনে এই গ্রন্থের সহিত যখন আমার পরিচয় হয়, তখন ইহার মধ্যে আমি যে এক নূতন চিন্তা ও ভাবের জগৎ উদ্ঘাটিত হইতে দেখি, আমার ভাবজীবনে চিরদিন তাহা আধিপত্য করিয়াছে।"

(জীবনজিজ্ঞাসা—অভয়ের কথা, পৃঃ ৮৩)

১৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ২৪১-৪২

২০ An Introduction to the study of Literature—William Henry Hudson (Reprinted march 1930) গ্রন্থের 'On the treatment of nature in Poetry' প্রবন্ধ পৃঃ ৩৩০)

২১ বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ লেখক শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালামৌ' ভ্রমণ বৃত্তান্তে বেলাশেষে পল্লীবধূর কলস-কাঁখে জল আনতে যাওয়ার অনুরূপ একটি অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

২২ 'জীবনজিজ্ঞাসা'—(বিচিত্রকথা) পৃঃ ১৭৫তে কবি লিখেছেন—"বর্ষার রাত্রি আমার খুব ভালো লাগে—খুব অন্ধকার গভীর রাত্রি, আর অবিশ্রান্ত সশব্দ বর্ষণ। বাইরে থেকে আসছে

যুঁই বেল হেনার গন্ধ—ঘরে মিটমিট করছে প্রদীপের আলো। জেগে থাকব না, ঘুমের ফাঁকে ফাঁকে বর্ষারাত্রির অভিসার-সঙ্কেত শুনতে পাব।"

২৩ 'জীবনজিজ্ঞাসা' (ব্যর্থজীবন) পৃঃ ১৯১

২৪ 'বঙ্গদর্শন' (ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা পৌষ-মাঘ) ১৩৫৪ পত্রিকায় 'মহাত্মার মুক্তি' নামক প্রবন্ধে মোহিতলাল লিখেছেন—

"আজ এই বৎসরের ঐ দিনে আমরা ১২৯১ সালের সেই গান্ধীমূর্তি স্মরণ করিলাম—স্মরণ নয়, সেই আবির্ভাব আবার মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিলাম। যাঁহারা আমাদের সমবয়সী তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, আমরা কোন্ ঘটনা কোন্ দৃশ্যের কথা বলিতেছি। সেইকালে আমরা পর পর দুইটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেই কবিতা দুইটি আজ একবার পড়িলাম।" পৃঃ৫৯১। 'স্বপনপসারী'র 'আবির্ভাব' ও 'মহামানব' কবিতা দুটি যে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত, উদ্ধৃতিটি তার প্রমাণ।

২৫ মোহিতলাল সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলি ও 'জয়তু নেতাজী' গ্রন্থে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এইকালে কবি, গান্ধীর প্রতি সকল শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন।

২৬ ১৩৭৩ সালের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূজা সংখ্যার একটি প্রবন্ধ কবি নজরুলের যোগসাধনবিষয়ক ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে।

২৭ 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধটি পৃঃ ২০৮-১৩

২৮ 'অভয়ের কথা'—মোহিতলাল মজুমদার সম্পাদিত ১ম সং ১৩৫৪ পৌষ পৃঃ ১৫৪

২৯ প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র-সমালোচক ডঃ ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন,—"মৃত্যু সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন যে ধারণা ব্যক্ত করেছে, রবীন্দ্রনাথও সেই সত্যে উপনীত হয়েছেন। তা এই যে, দৃশ্যত মৃত্যু আছে কার্যত নেই। আমরা রূপ-রূপান্তর এবং জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটা জীবনের পূর্ণতা এবং এইভাবে নানারূপের মধ্য দিয়ে আমরা পরিণামের পথে এগিয়ে চলেছি।" (রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়—১ম সং ১৩৬০ আশ্বিন পৃঃ ২১৯)

৩০ কবিতাটির মূল অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে স্বয়ং কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "অমানুষ কবিতাটিতে আমার কবি-জীবনের চিরন্তন হাহাকার—যাহা শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল তাহাই আছে।" (অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে ঢাকা থেকে ১০.৬.৪২ তারিখে লিখিত পত্র।)

৩১ 'জীবনজিজ্ঞাসা'—(মনমর্ম্মর) পৃঃ ২৩৮-৩৯

৩২ 'জীবনজিজ্ঞাসা'—(চতুঃসন্ধ্যা) পৃঃ ২১২

৩৩ প্রবন্ধটির নাম সাহিত্যে 'সত্যবাদ ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ'। এতে মোহিতলাল লিখেছিলেন—"রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইয়াছে বা হইবে ইহা লইয়া এত আক্রোশ বা আস্ফালনের ঘটা কেন? ঢাক বাজাইয়া রবীন্দ্রনাথকে 'দুয়ো' দিবার এই প্রবৃত্তি কেন? প্রথমত, কোনো যুগ শেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ একটি নূতন যুগের আবির্ভাব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের যুগ শেষ হইলেই কি রবীন্দ্রনাথের আসন ভাঙিয়া পড়িবে? তাঁহার প্রতিভার সেই অভ্রভেদী চূড়া পূর্ব ও পশ্চিম তোয়-নিধি পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের মানদণ্ডস্বরূপ বিরাজ করিবে না?"

৩৪ 'বিকাশপর্বে'ই কবি মোহিতলালের চিত্তে Convention-মুক্ত একটি কাব্যাদর্শ গড়ে তোলার সংকল্প জেগেছিল। ১৩২৬ সালের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'মাসকাবারী'তে সত্যসুন্দর দাসের বেনামীতে তিনি লিখেছিলেন—

"আমাদের কাব্যসাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দী না এসে অষ্টাদশ শতাব্দী এসে হাজির হয়েছে। অর্থাৎ কাব্যরচনায় কি ভাষা কি ছন্দ কি বস্তু কি ছাঁচ সকল বিষয়েই Convention প্রবল হয়ে উঠেছে।"

৩৫ ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনায় 'মানসলক্ষ্মী' কবিতাটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—'কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের মানসী পড়ে'।

৩৬ ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'র পুস্তক পরিচয়ে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'বিস্মরণী'র কতকগুলি কবিতার মূলে বিভিন্ন কবির প্রভাবের ইঙ্গিত ক'রে লিখেছিলেন—কবি (মোহিতলাল) 'শবসঙ্গীতে' 'যতীন্দ্রনাথের', 'দীপশিখা' ও 'কন্যাশরতে' সত্যেন্দ্রনাথের, 'শিউলির বিয়ে' ও 'মাধবী'তে যতীন্দ্রমোহনের, 'সত্যেন্দ্র-বিয়োগে' করুণানিধানের সতীর্থ ও সহযাত্রী।

৩৭ 'প্রবাসী'র চৈত্র সংখ্যা ১৩৩২ সালে মোহিতলালের বিস্মরণী' কবিতা বের হলে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র ১৩৩৩ এর বৈশাখ সংখ্যায় মাসিক সাহিত্য সমালোচনা পর্যায়ে এর একটি বিরূপ সমালোচনা বের হয়। " 'বিস্মরণী'—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। শব্দের মাধুর্য ও ঝঙ্কার এবং ছন্দের স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি ইহাতে বেশ আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা আদৌ নাই।...আমরা তাহাকে বলি 'হয়তো' কেন সত্যই ইহাতে সত্যের সুধা নাই।...এই কবিতায় অনুপ্রাসের ঘটা দেখিয়া আমাদের ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পূর্বতন কবিদের অলংকারপ্রিয়তার কথা মনে পড়িয়া যায়।" ইত্যাদি।

৩৮ ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী'র পুস্তক পরিচয়ে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার কবিতাটি সম্বন্ধে বলেছিলেন—"বাঁধন দেবেন্দ্র-ভক্ত কবির লেখনীর উপযুক্ত।"

৩৯ অনেকদিন পরে বাঙালীর দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মোহিতলাল লিখেছিলেন—'বাঙালীর মেয়েকে দেখিলে সৌন্দর্য্য-শরাহত হইয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হয় না বটে, কিন্তু স্নেহভরে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়; দাম্পত্যসুখে বাঙালীর মত সৌভাগ্যবান কেহ নাই।" (জীবনজিজ্ঞাসা—মনমর্ম্মর, বাঙালীর মেয়ে পৃঃ ২৩২)

৪০ ভারতীয় কবিদের প্রকৃতিচেতনার পরিচয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী'—গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

৪১ ১৩৪৬ সালের মাঘসংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'—সম্পাদকীয়।

৪২ কবিতাটি 'মোহিতলাল কাব্যসম্ভার'—গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত।

৪৩ এই কবিতাটি 'মোহিতলাল কাব্যসম্ভার' গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত।

৪৪ এই কবিতাটি সম্পর্কে ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে লেখা হয়—'অগ্নিবৈশ্বানরে বৈদিক শব্দ গাম্ভীর্য মৃদঙ্গের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনাও সার্থক হইয়াছে।"

৪৫ রোমাণ্টিসিজমের জনক মহামতি রুশো যে দুটি ঋক্-মন্ত্রে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই 'The worth and dignity of man as man and the power of natural scenery to respond to his needs' (The Age of Wordsworth—

Introduction, Page xvi—by C. H. Herford)। পরবর্তীকালে উনিশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে "Rousseau's humanism were carried on with increased richness and subtlety in Romantic poetry." (The age of wordsworth introduction.)

৪৬ ১৩২৯ ভাদ্রসংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তন্ত্র সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা করেন, পরবর্তীকালে মোহিতলাল তাঁর 'বাঙলা ও বাঙালী' (১ম সং ১৩৫৮) গ্রন্থের ৬৭-৭১ পৃষ্ঠায় তা বহুলাংশে উদ্ধৃত করেছেন। মোহিতলালের ঐ উদ্ধৃতি তন্ত্রের নরপূজা সম্পর্কিত। এখানে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত হল— " 'যত জীব তত শিব'—এই মহাবাক্য বাংলাদেশেই উত্থিত হয় এই মহাবাক্য অনুসারে মনুষ্যসমাজে যতটা কাজ হওয়া সম্ভবপর তাহা বাঙলাদেশেই বাঙালী জাতির মধ্যে হইয়াছিল।··· তন্ত্রের এই দেহতত্ত্বই বাঙালীর Anthropomorphism বা নরপূজার—নরদেবতার পূজার বেদী।"

৪৭ জীবন-জিজ্ঞাসা—মনমর্মর—সাধারণ মানুষ পৃঃ ২৪০

৪৮ ঐ ঐ সাহস ও ভীরুতা—পৃঃ ২৪৬

৪৯ ঐ ঐ মানুষের বন্ধু—পৃঃ ২৬১

৫০ 'মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা'—গ্রন্থের (১ম সং ১৯৩৬ জুলাই) মোহিতলালের ছাত্র-অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 'স্মৃতির পাতা' অংশে জানিয়েছেন—"কিন্তু মোহিতলালের সময়-জ্ঞান নেই। আবৃত্তির নেশায় বিভোর হয়ে গেছেন। বললেন, 'আর একটি কবিতা শোন। এ কবিতাটির মধ্যে আমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচয় আছে'—বলেই আরম্ভ করলেন 'মৃত্যু ও নচিকেতা'র আবৃত্তি।

৫১ ১৩৫২ ভাদ্র শনিবারের চিঠিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার জীবন'।

৫২ 'জীবনজিজ্ঞাসা'—মনমর্মর—পৃঃ ২৩৫-২৩৬

৫৩ 'সারদামঙ্গল কাব্য—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী।

৫৪ ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কবিবন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে 'বিস্মরণী' কাব্য আলোচনায় এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন,—"যম ও নচিকেতায় উপনিষদের ইতিহাসের ছায়াটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এতে মৃত্যুযজ্ঞের যে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা আছে সেটি মোটেই দার্শনিক বিচার, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ বা সমস্যার সমাধান নয়। কবি যা বলতে চেয়েছেন, তা নিত্য অনুভূত সামান্য কথামাত্র। কিন্তু বৈদিকযুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা মানসিক Setting-এর ভেতর দিয়ে সেই শাশ্বত কথাটি বিচিত্র হয়ে ফুটে উঠেছে। যার হৃদয় দুর্বল ও মলিন মৃত্যু তার মহাভয়, যূপবদ্ধ পশুর মতো জীবযজ্ঞভূমে সে সহস্রবার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে; কিন্তু যে মহাপ্রাণ আপনার প্রাণধন বিশ্বের প্রাণে বিলিয়ে দেয়, আপনাকে আপনি জগতের যজ্ঞরূপে বলিদান করে, সেই মৃত্যুকে আত্মার আরাম বলে বুঝতে পারে, সেই নিঃশেষে মরে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়।"

৫৫ History of Sanskrit Literature (Second Edition.) by—A. A. Macdonell. P. 227.

৫৬ 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবিতাটির নাম পরিবর্তিত করে 'নিদাঘ' দেওয়া হয়েছে।

৫৭ 'রূপকথা' (২য় সং ফাল্গুন ১৯৫৩)—মোহিতলালের ভূমিকা

৫৮ ১৩৫৯ ভাদ্র 'শনিবারের চিঠি'তে কবি কালিদাস রায়ের প্রবন্ধ 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল'।

৫৯ কবিতাটি ১৩৩২ সালের 'বার্ষিক মুকুল'এ প্রকাশিত হয়।

৬০ 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ'—২য় খণ্ড প্রমথনাথ বিশী পৃঃ ৮

৬১ ঐ ঐ ঐ গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশ।

৬২ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রূপকথা' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—"শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানবমনের সনাতন প্রবৃত্তি, এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া কৌতুক ও উচ্ছ্বাস-চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ় জীবনের উপরও তাহার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।" (সাহিত্যকথা—রূপকথা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬৩ মোহিতলালের কন্যাদ্বয়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীরও ১৩৩০ সালে যথাক্রমে ভাদ্র ও আশ্বিনে পর পর দুটি কন্যা বিয়োগ হয়। সেই শোকের স্মৃতি কবিতা 'যুগ্ম অশ্রু'। কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি—

(১)

অনামিকা

সে আমার সে আমার সে আমার ছিল ছোট মেয়ে?
বিধাতারও চেয়ে সত্য সে আমার ঐটুকু ইলা—
আত্মার আত্মীয়তম। অন্তরের গূঢ় অন্তঃশিলা।"

(২)

কালো

"ধরেছিলাম সোনার হরিণ গলাটি তার
জড়িয়ে মায়ার ফাঁসে,
কোন্ বনে সে পালিয়ে গেল, ডাক এল তার
কোথায় যে আকাশে।"

৬৪ 'প্রগতি' পত্রিকা পৌষ ১৩৩৪॥ মাসিকী॥—সম্পাদক—অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু।

৬৫ 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ পুস্তক পরিচয়—'বিস্মরণী'—কবি সম্পাদক বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৬৬ 'জীবন জিজ্ঞাসা'—বিচিত্রকথা—আমার কাব্যসাধনা পৃঃ ১৭৩

৬৭ বাংলা ও বাঙালী (১ম সং ১৩৫৮) গ্রন্থে বাঙালীর মাতৃপূজা প্রবন্ধ পৃঃ ১৭০

৬৮ 'নিশি-ভোর' কবিতাটি সম্পর্কে সেকালের মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'তে (১৩৩৬ এর অগ্রহায়ণ) বিরূপ মন্তব্য করা হয়।

৬৯ 'এক আশা' কবিতাটি ১৩৩৩ 'বিচিত্রা'র ফাল্গুন সংখ্যায় 'জীবনসন্ধ্যা' নামে প্রকাশিত হয়।

৭০ এই কবিতাটি সম্পর্কে ১৩৩৮ সালে লিখিত 'সাহিত্যের স্বরাজ' প্রবন্ধ (সাহিত্য কথা) পৃঃ ৮৮

৭১ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'নিশান্তে' কবিতাটির নাম ছিল 'ভোরের আলো'।

৭২ ১৩৩৪ 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'নিশুতি' কবিতাটির নাম ছিল 'জ্যোৎস্না নিশুতি'।

৭৩ " " " " 'বিদায়' " " " " " 'শেষবাসর'।

৭৪ এর প্রমাণ আছে বাঙলা ও বাঙালী গ্রন্থের 'বাঙলার গঙ্গা' প্রবন্ধ, পৃঃ ২৩০

৭৫ ১৩৩৪ 'কালিকলম'-এর ভাদ্র সংখ্যায় কবিতাটির নাম ছিল 'শরৎচন্দ্রের প্রতি'।

৭৬ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কবিও এ শ্রদ্ধা পরে বিচলিত হয়েছিল। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র, ও 'শেষপ্রশ্ন' সমালোচনা দ্রঃ।

৭৭ 'আহ্বান' কবিতাটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি' (১ম সং ১৩৬১)-তে নূতন তথ্য দিয়েছেন,—"বিচলিতকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনি (মোহিতলাল) আমার উদ্দেশ্যে যে কবিতাটি এই দুঃসময়ে লিখিয়াছিলেন, পৌষের 'শনিবারের চিঠি'র একেবারে গোড়ায় তাহাই 'শনিবারের চিঠির উদ্দেশে' এই নামে ছাপা হইল।" (পৃঃ ২১৮-১৯)

৭৮ 'মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা' (১ম সং জুলাই ১৯৬২) গ্রন্থের লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের মন্তব্য পৃঃ ১০৯

৭৯ English Critical Essays (Twentieth Century) Selected with an introduction by Phyllis M. Jones, Reprinted 1959 গ্রন্থে Sir E. K. Chambers-এর লিখিত Matthew Arnold প্রবন্ধ পৃঃ 168

৮০ ১৩৫৫ সালের 'বঙ্গদর্শন' বৈশাখ সম্পাদকীয় এবং বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থের 'শারদীয়া' প্রবন্ধ।

৮১ হেন্‌রি হাডসন লিখেছেন—'Infact the ability to see and describe any natural phenomenon without reference to personal feeling is very rare in recent literature." An Introduction to the study of Literature. P. 330

৮২ ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ মাসে মোহিতলালের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি বের হয়। অদ্ভুত সম্পাদন কৃতিত্বের সঙ্গে মোহিতলালের উৎকট বাঙালীপ্রীতি এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য। দু'বৎসর পর পত্রিকাটি আর্থিক কারণে বন্ধ হয়। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আদর্শ-অনুসৃতির প্রতিশ্রুতি আছে।

৮৩ ১৩৫৯ সালের বৈশাখ মাসে মোহিতলালের সম্পাদনায় 'বঙ্গভারতী' পত্রিকা বের হয়। মাত্র তিনমাস সম্পাদনা করার পর ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে মোহিতলালের মৃত্যু ঘটে। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আমাদের কথা' অংশে প্রথম সংখ্যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন,—বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ইহার উদ্দেশ্য তাহার বিপরীত বলিলেও হয়। ...ইহার দৃষ্টি থাকিবে মুখ্যত বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি বিশ্ব বা ভারতের দিকে নয়।"

৮৪ জার্মান দার্শনিক হেগেলের দার্শনিক মতবাদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যার জন্যে Bertrand Russell-এর 'History of Western Philosophy' (5th edition)-এর ৩৪-৩৫ পৃঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্যদর্শন' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ১ম সং ১৯৬৩)-এর একাদশ অধ্যায় এবং নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হেগেলের দার্শনিক মতবাদ ও মার্কসীয় দর্শন' (২য় সং ১৩৫৫)-প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ভোগভাবনা

বলিষ্ঠ ভোগবাদী কবিরূপে বাঙ্‌লা সাহিত্যে মোহিতলালের অসামান্য খ্যাতি। তাঁর সমস্ত কিছু মৌলিকতা বা কবি-স্বাতন্ত্র্যের মূলেই আছে ভোগবাদ। রবীন্দ্রোত্তর যুগে কবিহিসাবে মোহিতলালের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান হেতুও ঐ ভোগ-বাদমূলক কবিতা। 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকবৃন্দের তাঁকে "আধুনিকোত্তম"[১] আখ্যা দিয়ে গুরুরূপে বরণের কারণও ঐ ভোগবাদ। বলাবাহুল্য তাঁর কাব্যে ভোগবাদ-প্রসঙ্গটি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন মনে করেছি।

ভোগ এবং ভোগবাদ শব্দ দুটি সমার্থক নয়। আক্ষরিক অর্থে সুখ-দুঃখাদির অনুভবের নাম ভোগ। ভোগ দ্বিবিধ—মানসিক ও দৈহিক। মানসিক ভোগে অন্তরেন্দ্রিয় বা মনের ক্রিয়ারই প্রাধান্য এবং দৈহিক ভোগে স্পর্শ ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই মুখ্য। মানসিক ভোগে বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অনুপস্থিত, কিন্তু দৈহিক ভোগে ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যক্ষ সংযোগ। এক হিসেবে তাই মানসিক ভোগকে উপভোগ বলাই সমীচীন। বস্তু বা দেহকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ভোগের কথা অচিন্তনীয়। ভোগের সমর্থনবিষয়ক বক্তব্য শৃঙ্খলাবদ্ধ-রূপে ভোগ-পরিণামী হলে তাকে ভোগবাদ বলা চলে।

যাঁরা ভোগবাদী তাঁরা জীবনে ভোগের সমর্থক এবং তাঁরা ভোগকেই পুরুষার্থ বলে ধারণা করেন। কিন্তু একটি গভীরতর সত্যকে লাভের জন্যে যাঁরা ভোগকে উপায়রূপে গ্রহণ করেন, তারা খাঁটি ভোগবাদী নন। আমাদের দেশের তন্ত্রসাধকগণ, সহজিয়াগণ, বাউলসম্প্রদায়- প্রভৃতি তাঁদের সাধনপন্থায় দেহকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে ভোগকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কিন্তু ভোগ তাঁদের সত্যলাভের উপায়, উপেয় নয়। আর এইজন্যই এঁরা খাঁটি ভোগবাদী নন। ভারতীয় চার্বাক বা চার্বাকপন্থীরা[২] এবং পাশ্চাত্যের অ্যারিস্টিপ্‌পাস্, এপিক্যুরস্, লুক্রেসিয়াস্—প্রভৃতি যথার্থ ভোগবাদী। এঁরা সকলেই দার্শনিক। কিন্তু মোহিতলাল দার্শনিক নন, কবি। কাজেই তাঁর কাব্যে ভোগভাবনা দার্শনিকের চিন্তাধারার মতো যুক্তিভিত্তিক ও নিশ্ছিদ্র হতে পারে না। তাই সাধারণভাবে তাঁর ভোগ-সম্পর্কিত বক্তব্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য।

মোহিতলালের কাব্যজীবনে ভোগবাদমূলক ভাবনার উদ্ভব থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত ধারাটি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে তিনিও আত্যন্ত অবিমিশ্র ভোগবাদের কবি নন। 'স্বপনপসারী'র কবি প্রচণ্ডভাবে ভোগবাদের সমর্থক এবং তাঁর পরবর্তী কাব্য 'বিস্মরণী' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি খাঁটি ভোগবাদী। 'বিস্মরণী'তেও তাঁর ভোগবাদ-বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা আছে। কিন্তু ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থেই দেখা গেল যে ভোগের আনন্দ ও উল্লাসকে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর কণ্ঠ মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বপীড়িত। ভোগে অতৃপ্তিজনিত একটি অবসাদ বা ক্লান্তির ভাব কবিচিত্তকে অধিকার করছে। 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে ভোগকে অতিক্রম ক'রে তিনি যে ভোগাতীত লোকের সন্ধান পেয়েছেন, তার বীজ কিন্তু ঐ 'বিস্মরণী'র দ্বন্দ্বের মধ্যে। 'স্মরগরল'এ যৌবনাপগমের বেদনায় কাতরতার মধ্যে কবির সুপ্ত ভোগলিপ্সা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এই কাব্যেই ঐ বেদনার দ্বন্দ্বকে যখন তিনি জয় করেছেন স্মৃতি, প্রকৃতি ও লোকাতীতের অনুধ্যানে তখন সেখানে আর তাঁকে খাঁটি ভোগবাদী বলা সমীচীন হবে না। তাছাড়া মোহিতলাল যখন ভোগবাদের প্রবল সমর্থক, তখনও তাঁর এ চিন্তার মূলে একটি পবিত্র আদর্শের অবস্থান—ফলে সেক্ষেত্রেও তাঁর ভোগভাবনা বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল।

কবির বহুকথিত দেহাত্মবাদের প্রসঙ্গটি এই অধ্যায়ের অন্তর্গত ক'রেই আলোচ্য। দেহবাদ ও বস্তুবাদ শব্দ দু'টি অভিন্ন। প্রত্যেক বস্তুরই একটি দেহ আছে। মোহিতলাল এই কায়াকে উপেক্ষা ক'রে ছায়ার মায়ায় আকৃষ্ট হন নি। তাঁর জীবন, প্রকৃতি ও নারীর রূপরস-সম্ভোগে ঐ কায়ার মূল্য খুব বেশী। তাঁর নারী সম্পর্কিত ভোগবাদ দেহাপেক্ষিত। কিন্তু তা কখনও নিছক দেহবাদ নয়—আত্মাকে বাদ দিয়ে সে দেহ অর্থহীন। তাই এ হল দেহাত্মবাদ। কিন্তু নারী ব্যতীত অন্য ভোগ্যবস্তুর ক্ষেত্রে দেহাত্মবাদ শব্দটি যথোপযুক্ত নয়। সেখানে ভোগবাদ শব্দই বেশী সার্থক। প্রকৃতিকে যখন প্রাণহীন জড় বস্তু বলে কবি মনে করতেন না—তখন সর্বপ্রকার ভোগবাদমূলক কবিতা-গুলিকেই ব্যাপক ভাবে তাঁর বিশিষ্ট জীবনবাদের কবিতাও বলা যেতে পারে।

তাঁর কাব্যে দেহাত্মনির্ভর ভোগবাদের মূলে যুদ্ধোত্তর-ইংরেজি সাহিত্যিক ডি এইচ লরেন্স, এইচ জি ওয়েলস্, অলডুস্ হাক্সলি, বার্নার্ড'শ—প্রভৃতির নরনারীর দৈহিক আকর্ষণ-সম্পর্কিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির প্রভাব থাকা সম্ভব।[২] ফরাসী সাহিত্যের ভিক্টর হুগো, মোপাসাঁ, এমিলি জোলা, বদলেয়ার, ফ্রান্সিস

ভিলোঁ, মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যান ও জর্জ সিল্‌ভিস্টারের কথাও মনে আসবে। এই সমস্ত শিল্পী নরনারীর দেহগত আকর্ষণকে কোনোরূপ আধ্যাত্মিকতার আলোকে না দেখে তাকে স্বাভাবিক জৈব ক্ষুধারূপে অনুভব ক'রে তার বিচিত্ররূপ তাঁদের উপন্যাস নাটক গল্প বা কাব্যে রূপ দিয়েছেন। আমাদের ধারণা, মোহিতলালের এই শ্রেণীর কবিতার মূলে তাঁর নিজস্ব জাতিগত বাঙালী সংস্কারের তান্ত্রিক প্রেরণাই মুখ্য। সমকালীন বাঙ্‌লাদেশের যুগপ্রেরণায়, পারসীক সাহিত্যে পণ্ডিত পিতার সাহিত্যিক ভাবাদর্শে এবং দেশী-বিদেশী গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর স্বকীয় প্রবণতাটি অবশ্যই পুষ্ট হয়েছিল। তাঁর পড়াশোনার পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত ও বহু শাখান্বিত। সেক্সপীয়রের 'অ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার অমর প্রেম, অথবা তাঁর ট্র্যাজিডিগুলিতে জীবনের ভীমকান্ত রূপ, ব্রাউনিঙের প্রেম কবিতাগুলির বিচিত্র-রহস্য, সুইনবার্নের 'Poems and Ballads' কাব্যের উত্তপ্ত প্যাশন, অন্যান্য প্রি-র‍্যাফেলাইট্‌ কবিগোষ্ঠীর দেহ বা বস্তুসচেতনতা, ভিক্টর হুগোর 'দি টয়লার্স অব দি সী'তে প্রেমের সর্ব-বিধ্বংসী মূর্তি, ভিলোঁর দেহবাস্তবতা ও মৃত্যুচিত্র বদলেয়ারের নারী-সম্পর্কিত সত্যভাষণ, এমিলি জোলার প্রকৃতি-পন্থায় নরনারীর চরিত্রচিত্রণ, মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যান ও জর্জ সিল্‌ভিস্টারের দেহাসক্তি—প্রভৃতির সঙ্গে মোহিতলাল যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। আবার অ্যারিস্টিপ্‌পাস, এপিকিয়্যুরস, লুক্রেসিয়াস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের সুখবাদ, এবং তাঁদের প্রভাবপুষ্ট পারস্যের জালালুদ্দিন রুমি, সাদি, হাফিজ, ওমর—প্রভৃতি কবিদের কাব্যের ভোগবাদ এবং আমাদের দেশের চার্বাক বা চার্বাক-অনুবর্তীদের অনুরূপ মতবাদও তাঁর জানা ছিল। এই সঙ্গে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কালিদাস, অমরু, ভর্তৃহরি, শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতা প্রভৃতিও যে তাঁর পড়া ছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। যে কবির পড়াশোনার পরিধি এইরূপ, তাঁর কাব্যে বিশেষ কোনো কবি বা সাহিত্যিকের প্রভাব কল্পনা তাই ঠিক নয়। মোহিতলালের কাব্যের বহুকথিত দেহাত্মবাদের প্রবণতাটি তাই তাঁর রক্তগত তান্ত্রিক চেতনারই ফল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথ চৌধুরীর কাব্যে সংস্কার-মুক্তির প্রয়াস ও পৌরুষ-শক্তির উদ্বোধন, কবি সত্যেন্দ্রনাথের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অক্ষয়কুমার বড়ালের নারীভক্তি, দেবেন্দ্র-নাথ সেনের রূপতান্ত্রিকতা ও গোবিন্দদাসের দেহবাদ তরুণ মোহিতলালের দেহচেতনা বা ভোগবাদকে নিশ্চয়ই উজ্জীবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুবর্তীদের কাব্যে দেহ-বাস্তবতার কতকটা অভাবও তাঁকে নিজস্ব পথে চলার শক্তি দিয়েছিল। আর এরই সঙ্গে বিদেশী কবি, সাহিত্যিক ও

দার্শনিকদের অনুরূপ জীবনাদর্শ তাঁর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ ও ভাবচিন্তাকে স্বাধীন ক'রে থাকবে। মোহিতলাল নিজেও তাঁর এই শ্রেণীর কবিতার মৌলপ্রেরণার কথা উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—"কিন্তু কবিতার প্রেরণাও আমি য়ুরোপীয় কাব্য হইতে লাভ করিয়াছি, একথা সর্ব্বৈব সত্য নহে। বরং, যে কবিতাগুলিতে ভাববস্তুর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব, অর্থাৎ, আমার বাঙালী-সংস্কৃতি বা রক্তগত প্রেরণার ফল।·· যেহেতু গত পাঁচশত বৎসর ধরিয়া বাংলা-কাব্যে ঐ 'বৈষ্ণব' সুরই প্রধান হইয়া আছে, এবং অপর সুরটি (দেহাত্মবাদ বা ভোগবাদের সুরটি) জীবন-রসে রসাম্বিত হইয়া খাঁটি কাব্যের সুর হইয়া উঠে নাই, সেজন্য আমার কবিতা, ইংরাজীওয়ালা নীতিবাগীশের কাছেও যেমন, 'ললিতলবঙ্গলতা'-বিলাসীদের কাছে তেমনই, উপাদেয় হইতে পারে নাই।"[৩]

তাঁর এই বিশ্লেষণ আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান এবং এ-স্বীকৃতি তাঁর ভোগবাদবিষয়ক কবিতার উৎস-নির্ণয়ের প্রবেশিকা। আদিরসের প্রতি আকর্ষণ এবং সেই হেতু দেহকে সাহিত্যে স্বীকৃতি দান বাঙলা সাহিত্যের আদি যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। চর্যাগীতিকার তত্ত্বে, নাথ ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনায়, আউল-বাউলদের সাধনকর্মে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেহ বা কায়াসাধনার পরিচয় স্পষ্ট। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে ও আরও পরে ব্রাহ্মধর্ম ও ইংরেজদের সংস্পর্শে বাঙালী তার সাহিত্যে দেহতত্ত্বকে অনেকখানি এড়িয়ে চলতে থাকে। সে যাই হোক, এই কায়া-সাধনা যে বাঙালীর অস্থি-মজ্জাগত একটি জাতীয় প্রকৃতি এতে কোনো সন্দেহ নেই।[৪]

ভোগের সমস্ত উপাদান মানবজগৎ ও নিসর্গ জগতেই প্রাপ্তব্য। নিসর্গ-জগতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের সৌন্দর্য-মাধুর্য যেমন নিরন্তর মানবচিত্তে সাড়া জাগাচ্ছে, তেমনই মানবজীবনের অসীমবৈচিত্র্য, অনন্তরহস্য ও অশেষ আনন্দ ভোগোপকরণরূপে নিত্যকাল বিদ্যমান। ভোক্তা মানুষের সম্মুখে ভোগের পাত্র নিত্য প্রসারিত। কিন্তু ভোগের সামর্থ্য সকলের নেই। এই বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা। দুর্বল বা শক্তিহীন কখনও প্রাণ ভরে গ্রহণ বা ভোগ করতে পারে না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। আবার জীবন ও জগতের ভোগ্যবস্তুর ঘনীভূত নির্যাস মানবজগতে নারীতে এসে পূর্ণতালাভ করেছে। এক অর্থে বাহ্যজগতের ধন, মান, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি—সমস্ত কিছুই প্রকৃতির অধীন। এ সকলে মত্ত হওয়ার অর্থই হল প্রকৃতির উপাসনা। আর নারীই হল ঐ প্রকৃতির সাকার বিগ্রহ। 'উন্মেষপর্বে'র কবি মোহিতলাল রূপ ও সৌন্দর্যের ভক্ত হলেও ঠিক ভোগবাদী নন, কারণ তখন প্রকৃতির রূপ-রস ও সৌন্দর্যের প্রতি

তাঁর আকর্ষণ দেখা দিলেও নারীর প্রতি আসক্তি স্পষ্ট নয়। 'বিকাশপর্বে' 'স্বপনপসারী'তে কবির ভোগবিষয়ক ধারণা অতিশয় স্বচ্ছ। ভোগই যে জীবনের সর্বস্ব, এ বোধ এইকালের কবিতায় প্রত্যক্ষ। ঠিক সময়েই লিখিত তাঁর ডায়েরী জাতীয় গ্রন্থ 'জীবনজিজ্ঞাসা'র 'মনমর্মর' অংশেও তার প্রমাণ মিলবে। জীবনের অর্থ কি, কিভাবে জীবনের পুরোমূল্য আদায় করা যায়, প্রবৃত্তিমার্গে জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা কেমন—এই সব চিন্তায় তখন তিনি মগ্ন। ভোগের পথেই যে জীবনের পূর্ণতা এই সিদ্ধান্তে তখন তিনি পুরোমাত্রায় বিশ্বাসী। ভোগের সামর্থ্য যার নেই, সে মৃত তার আর নূতন ক'রে মরবার দরকার নেই—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কবি এই ভোগানন্দে উল্লসিত হয়ে এইকালে 'প্রবৃত্তির বেগ'[৫] ও 'লুটিবার শক্তি'র[৬] জয়গানে মত্ত হয়েছিলেন। কাব্যসাধনার এই পর্বে কবি অনুভব করেছিলেন জীবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন আরও ক্ষণজীবী—আরও অস্থির। সেইজন্যে ক্ষণকালীন জীবনসীমায় ধরণীর সুখ-সৌন্দর্যের মদিরা জীবনের আনন্দাসব আকণ্ঠ পান ক'রে নিতে হবে। চতুর্দিকে বংশীধ্বনি, সন্ধ্যাকাশে আবীর কুঙ্কুম পৃথিবী ফুলে ফুলময়—চরাচরব্যাপী এক অখণ্ড সৌন্দর্যের রাগিণী। এমন রূপ-সুন্দর মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। দুর্বার কামনার নেশায় সর্বাঙ্গ শিহরিত। কাজেই স্নায়ুতে শোণিতে জীবনাসব ভ'রে নিতে হবে। নারীর দেহ, তার রূপ, তার লাবণ্য প্রাণ ভরে আস্বাদন করতে হবে। মোহিতলালের দুর্দম ভোগলিপ্সার পরিচয় 'স্বপনপসারী' কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় লক্ষণীয়। 'অঘোর-পন্থী,' 'পাপ' 'কামনা,' 'মৃত্যু' 'দিলদার,' 'গজলগান' 'রূপ-তন্ত্র' 'হাফিজের অনুসরণে' 'ভ্রান্তি-বিলাস' প্রভৃতি কবিতা বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। 'পাপ' কবিতায় বলা হয়েছে যে কাম বা কামনা মানুষের সহজাত একটি দুর্বার প্রবৃত্তি। যৌবনের মধুমাসে মানবচিত্তে তার পূর্ণ বিকাশ ও স্ফূর্তি। এই কামনার সৌরভে অবশ প্রাণের কখনও হাসি আবার কখনও ক্রন্দন। শোকতাপ আধিব্যাধিতেও এই প্রবৃত্তি মধুহীন হয় না। চিররোগী, চিরদুঃখী ও অতি বৃদ্ধ—সকলেই কামরসের জন্য লালায়িত। এই কামনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে বাসনা আর আশা। কামনা বা কাম কি কখনও পাপ হতে পারে? ভারতীয় ঋষিরাও একে পাপ বলতে পারেন নি। সমস্ত পৃথিবী-রূপ পুষ্পের রূপ-রস-সৌন্দর্যে মানুষের যে প্রবৃত্তিটি পুষ্ট ও নন্দিত হচ্ছে তাকে কি পাপ বলা যায়? প্রেম দিয়ে যে কামনার সোমরসকে মানুষ শোধন ক'রে নিয়েছে। এই প্রেমকে ভোগ করার সামর্থ্য নেই বলে তাকে মানুষ পাপ মনে করে। প্রেমশোধিত কামই

মানুষের সবচেয়ে বড় গৌরব। বাসনার বহ্নিমুখে বার বার দগ্ধ হয়েই মানুষ স্বর্গীয় সুখ ও অমরতা লাভ করতে পারে। কামনার সঙ্গে বেদনা ও তথাকথিত এই পাপের সঙ্গে তাপও যুক্ত হয়ে তার গৌরব ও মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে। এই কামানুশীলনে যাদের কুণ্ঠা, তাদের জন্য আক্ষেপ ক'রে কবি লিখেছেন—

"কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানেনা—জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী!
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ!
ওইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় একি অভিশাপ!" (পাপ)

প্রেমশোধিত কামনা নিয়ে বীর্যবানের ভোগাধিকারকে 'পাপ' কবিতায় স্বীকৃতি জানিয়ে মোহিতলাল 'অঘোরপন্থী' কবিতায় জীবনের রসে মাতাল হওয়ার জন্য সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। বাসনার রঙে রাঙা মড়ার মাথার খুলিতে নীরহীন অতিতীব্র জীবনাসব। এই জীবনরসের সুরা পান ক'রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে হবে। অঘোরপন্থীদের বীভৎস সাধনার রূপকে কবি এখানে জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছেন। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে অঘোরপন্থীদের দৃষ্টিতে কিভাবে শব-শিবে একাকার হয় ও কিভাবে তাদের চিত্তে মদিরার প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়—তারই পরিচয়। তৃতীয় স্তবকে জীবন-মদিরা পান করতে গিয়ে বুক জ্বালা করলেও তা বার বার ঢেলে খাওয়ার কথা। চতুর্থ স্তবকে ধরণীর পেয়ালায় মধুর জীবনমদ্য পান ক'রে মরণকে পদদলনের কথা। আর পঞ্চম স্তবকে ঐ সুরার প্রভাবে দেহের সকল রক্তকণিকার উতরোল হওয়ার প্রসঙ্গ। জীবনপ্রেমিকের চোখে জগৎ এখানে সুন্দর। অপরূপ নেশায় রাত্রিও রূপময় এবং রূপও সীমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় মৃত্যুকে টিটকারী দিয়ে জীবনাসবে বুঁদ হতে হবে।

তিনটি স্তবকে রচিত 'কামনা' কবিতাতেও কবির গভীর জীবনপ্রেম ও পৃথিবীপ্রীতি চমৎকার অভিব্যক্ত। প্রথম দুটি স্তবকে তিনি জীবনসাগরের বুকে পদ্মফুল হয়ে ফুটে উঠতে চেয়েছেন। একদিকে সেই পদ্ম মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ ক'রে তার সমস্ত রস স্নায়ুতে শোণিতে শুষে নিতে চায়, অন্যদিকে সে শতদল মেলে তার সমস্ত কামনাকে বিকশিত করতে উদ্গ্রীব। তৃতীয় স্তবকে কবি স্বর্গীয় তারকার অমৃত-দীপ্তি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আঁধারে আলোকে ভরা পৃথিবীর ফুলগুলিকে বরণ করতে চেয়েছেন। জাগতিক রূপ-সৌন্দর্য-রসোপভোগের আকুতিও যেমন, জীবনসায়রের রূপপানের আগ্রহও তেমনিই কবিকে উল্লসিত করেছে।

'রূপ-তন্ত্র' কবিতায় রূপতৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় রূপোপভোগে কবির কাঙালপনা। ভোগের পাত্রটি পরিপূর্ণ না হলে তিনি ভোগ করতে অনিচ্ছুক—

"ফুলের হিয়ার মধু,
চাহিনা চাহিনা, বঁধু!
রেশ্‌মী-রঙীন্ পাপড়ি যদি না
চারিধারে পড়ে লুটে'। (রূপ-তন্ত্র)

'উন্মেষপর্বে' কবি 'সুন্দর' দেবতার পূজায় যেতে উঠেছিলেন। এখন কিন্তু আর পূজা নয়, তাঁকে ভালবাসার জন্তই তিনি কাঙাল। পতঙ্গের মতো সুন্দর রূপানলে দগ্ধ হতেই তিনি অভিলাষী।

'গজল্‌গান' 'দিলদার' ও 'হাফিজের অনুসরণে' কবিতায় ওমর খৈয়ামী সুরে ক্ষণিক জীবনসীমায় 'সাকী ও সুরার' আশ্রয়ে জীবনরসামৃত পান করার কথা আছে। প্রথমটিতে—

"বড় মিঠা মদ! ফের পেয়ালায় ভর্ সাকী!
হর্‌দম্ দাও!—আজ বাদে কাল ভর্‌সা কি?" (গজলগান)

—এই সুরটিই জীবনমদিরামত্ত কবিকে বেহুঁশ করেছে এবং অন্ত দুটিতেও প্রায় একই সুর তাঁকে ভরপুর পেয়ালার দিকে আকৃষ্ট করেছে।

"বড় মিঠা শরবৎ।
—ফের্ ভর পেয়ালি,
কানে বাজে নওবৎ,
চোখে লাগে দেয়ালি!" (দিল্‌দার)

'মৃত্যু' কবিতায় মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্তির চিত্রই প্রধান। তথাপি এ কবিতায় গভীর জীবনপ্রেম থেকেই কবির মৃত্যুভাবনা জাগ্রত। আর সেইজন্তই জীবনপ্রেমিক কবি জীবন ও জগৎকে পূর্ণরূপে ভোগশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুকামনা করেছেন। এই জীবনরসাস্বাদনের অতিতীব্র কামনায় তিনি বলেছেন—

"আমি চাই এই জীবনেরে জুড়ে'
বুকে করি' ল'ব সব,
জীবনের হাসি জীবনের কলরব।
জীবনের শোক, জীবনের দুখ,
জীবনের আশা, জীবনের সুখ—
পরাণ আমার চির-উৎসুক
লইতে পাত্র ভরি'।

উচ্ছল-ফেন মদিরার মত
কানায় কানায় বুদ্‌বুদ শত
অধরে তুলিব ধরি'—
ধরণীর রস জীবনের রস যত।" (মৃত্যু)

এইকালে কবির ভোগকামনার স্বরূপ উপলব্ধির জন্যে পূর্বোক্ত কবিতাগুলির বিশ্লেষণই যথেষ্ট। কবির আবেগ বা 'প্যাশন' তাঁকে কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত করেছে এবং তা নারী-আশ্রিত হওয়ায় কিরূপ হাহাকারে ফেটে পড়েছে, তার পরিচয় এই সময়ের একটি প্রবন্ধেও লক্ষণীয়। "তোমার নেত্র-পল্লবের ঐ পক্ষ্মরাজি, এবং তাহারই অন্তরালে যে কটাক্ষ-বহ্নি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার মোহিনী মায়ায় আমি আত্মহারা হইয়াছি। আমি আমার সকল জীবন, জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি, তত্ত্বজ্ঞানজনিত পরমানন্দ—সকলই ভগবান্ অথবা শয়তানের হাতে ছাড়িয়া দিব, তুমি প্রসন্ন হও! ওই অন্ধকার কেশ-রাশিতে আমাকে আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে অন্ধ করিয়া দাও, আমার দুই চক্ষের জর-জ্বালা নির্ব্বাপিত কর! সারা দেহ হইতে বিদ্যুন্ময়ী জীবনী-শক্তি শোষণ করিয়া আমার হৃৎপিণ্ড শীতল করিয়া দাও।"[৭]

ঠিক এই কালেই বিরহ নয়, মিলনের আনন্দকে চিরস্থায়ী করবার কামনায় তিনি কল্পনা করেছেন—

"একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,
—তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে!
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো—
রাধার মরণ হোক্ তোমার জীবনে!"

(ভ্রান্তি-বিলাস)

'বিস্মরণী' কাব্যের কবিতাগুলি লেখবার কালে মোহিতলাল অনেকগুলি পারসীক কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। 'প্রেমগাগুলি' ও 'ফারসী-ফরাস' নামে সেগুলি ১৩২৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সব কবিতার মাত্র কয়েকটি পরবর্তীকালে 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের অনুবাদ অংশে স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাকী কবিতা-গুলির অনুবাদ প্রবণতা থেকে একালে কবির ভোগপ্রিয় মনটিকে চিনতে অসুবিধে হয় না। এইরূপ গ্রন্থবহির্ভূত কয়েকটি কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

(ক) "সকল ভাবনা দূর করি দাও, বোলাও পেয়ালী

রূপসী সাকী !
জীবনের রোদ পড়ে' এল ওই মহা-নিশা সব
দিবে গো ঢাকি।"

(প্রেমাঞ্জলি)

(খ) "শুধু যৌবন ফিরে দাও দেব।
ফিরে দাও ফিরে দাও
তাই পেলে মোরা চাহিনা কিছুই
আর যাহা আছে নাও!"

(ফার্সী ফরাস্)

(গ) "এস এস বঁধু, শুধু ক্ষণতরে
বসি একাসনে তোমার সনে,
এস প্রাণসমা, এস প্রিয়তমা,
কুসুম তুলিব কালের বনে।"

(ফার্সী ফরাস্)

'স্বপনপসারী'র পর 'বিস্মরণী' কাব্যেও ভোগবাদী মোহিতলালের পরিচয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। ভোগ-কামনার তীব্রতাযুক্ত কিছু সংখ্যক কবিতা 'বিস্মরণী'তে আছে। 'দেহ ভরে' 'কবোষ্ণ প্রাণের মদিরা' পান করার ব্যাকুলতা এবং 'ধরণীর স্তনযুগ'কে 'দশন আঘাতে' 'ববরের' মতো 'জর্জর' করার কথা 'বিস্মরণীতে'ও আছে। 'জীবনের সুখ দুঃখ বার বার ভুঞ্জন' করবার বাসনায় দেহে কামানলের শিখা জালিয়ে 'রমণীর জায়ারূপ'-এর আরতি করতে কবি এখানেও অত্যুৎসাহী। এই শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা হিসেবে 'বিস্মরণী'র 'স্পর্শ-রসিক' 'মোহমুদ্গার' 'পান্থ' 'পথিক' 'মৃত্যুশোক' ও 'ব্যথার আরতি'র নামোল্লেখ করিতে হয়।

'স্পর্শ-রসিক' কবিতায় কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়-তীক্ষ্ণ এক অন্ধের জবানীতে কবি নিজেরই দেহাসক্তি ও স্পর্শ-ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। দেহ-ধূপাধারের গন্ধে ও ধূমে স্পর্শরসিক অন্ধ। নয়ন-ইন্দ্রিয় তার বিনষ্ট বলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত সজাগ। আবার তার স্পর্শেন্দ্রিয়টি সবাপেক্ষা বেশী অনুভব-প্রখর। এই অন্ধ দেহগন্ধে দিশেহারা হয়ে কখনো কখনো ভুলভ্রান্তি ক'রেও বসে— ভুলের কাঁটায় তখন তার করাঙ্গুলি ক্ষত হয়। দৃষ্টিহীন বলে লোকে গঞ্জনা দেয়। কিন্তু তাতে সে ক্ষুব্ধ নয়—বরং অশ্রুনিষেকে তার জীবনমরু সিক্ত হয় ও প্রাণের প্রীতি নিরঞ্জনা হয়। অন্ধ স্পর্শরসিক নারীসঙ্গমের চরম মুহূর্তে

নিজেকে মরণ-অধিপ মনে করে। নিষ্প্রদীপ শয়ন শিয়রে প্রিয়াকে সে দেখতে পায় না, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে তার লক্ষ দীপের রোমাঞ্চ জাগে—অন্ধকারেও তখন তার অন্ধ নয়নে বিদ্যুতের বিভা। স্পর্শরসিক নিস্তরঙ্গ অমৃতসরোবরের প্রত্যাশী নয়, সে মৃত্যুই চায়—আর চায় নবজন্মের আশ্বাস। নারীদেহ-ভুঞ্জনকালের আনন্দে তার সৃষ্টিকেও সুন্দর মনে হয়। স্পর্শকাঙাল স্পর্শরসিক দেবতাকে স্পর্শ ক'রেই প্রণতি জানায়। ধরণীর অন্তরেই সে দেখতে পেয়েছে স্পর্শমণি। আর তারই স্পর্শে জড় ও চেতনে এমন মেশামিশি। পদতলে যে পৃথিবী চারদিকে এমন আলিঙ্গন বিস্তার ক'রে আছে, তারই প্রতিচ্ছায়া তো ঐ নারী। কাজেই নারীসম্ভোগে দ্বিধা বা কুণ্ঠার কোনো কারণ নেই।

মোহিতলালের এইকালের জীবনাদর্শ 'মোহমুদ্গর' কবিতাটিতেও কতকটা তর্ক ও চিন্তা-পরিশীলিত হয়ে রূপ পেয়েছে। মায়াবদ্ধ ও সংসারাসক্ত জীবের মোহভঙ্গের জন্যে শঙ্করাচার্য রচনা করেছিলেন 'মোহমুদ্গর'। আর বিশ শতকের কবি মোহিতলাল জীবনবিমুখ কবি, সাধক ও সন্ন্যাসীদের সাধন-মোহভঙ্গের জন্য রচনা করেছেন অভিনব মোহমুদ্গর। দশটি স্তবকে রচিত কবিতাটির প্রথম দুই স্তবকে 'চিরমৃত্যু মোক্ষ-অভিলাষী' 'নিত্য উপবাসী' 'রুদ্ধ-অশ্রু' শুষ্ক-অক্ষি তাপস এবং 'প্রেয়সী নারীর মুখে' 'বিভীষিকা' দর্শনে সংসারত্যাগী মন্ত্রজপরত বামমার্গী নাস্তিক তান্ত্রিক কাপালিকদের প্রতি সুতীব্র কটাক্ষ। তৃতীয় স্তবকে ধরণীর পূর্ণপয়োধরের দুগ্ধধারায় উদাসীন, রজোহীন 'রজনীর মল্লিকা-মাধবী'র ধ্যানে মগ্ন এবং কল্পনার ইন্দ্রজালবয়নে ঊর্ধ্বমুখ কবিশ্রেষ্ঠকে (সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে) আক্রমণ। চতুর্থ স্তবকে ক্ষণকালীন জীবনবৃন্তকে পূর্ণরূপে সদ্ব্যবহারে মানুষের দ্বিধা ও কার্পণ্যে ক্ষোভ। পঞ্চম স্তবকে এই মিথ্যাসুন্দর পারাবারে এবং মৃত্যু-কারাগারে মানুষের সীমিত জীবনকেই একমাত্র সত্যরূপে ধারণা এবং 'শুক্তিগর্ভে সুদুর্লভ' মুক্তা-সঞ্চারের মতো দেহবৃক্ষে কামমন্দারের উদয়কে অভ্যর্থনা। ষষ্ঠ স্তবকে বিষ্ণুর নাভি-পদ্মশায়ী স্রষ্টা প্রজাপতি ও তাঁর যুবতী বধূর আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তির ফলস্বরূপ এই প্রত্যক্ষ ভুবনকে মাতৃ-অঙ্করূপে ধারণা। সপ্তম স্তবকে 'কোটি জীব-কল্লোলিত' জীবনসমুদ্রের তটদেশে দাঁড়িয়ে কবির নয়ন উদ্গত-অশ্রু। এই চিরসুন্দর রূপজগতে তিনি আবার ফিরে আসতে পারবেন কিনা সেই সংশয়। অষ্টম স্তবকে একবারের জন্য বিধিদত্ত এই দুর্লভ মানবজীবনকে মানুষ ভোগ করতে কেন দ্বিধাগ্রস্ত—তার জন্য পুনরায় ক্ষোভ। নবম ও দশম স্তবকে বীর সাধক ও তাপস সকলকেই কবোষ্ণ প্রাণের মদিরা পানের জন্যে আহ্বান।

ধরণীমাতার মর্মে সন্তান পিপাসা রেখে যেতেই হবে—আর তাহলেই মৃতবৎসা জননীর বেদনার টানে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসা সম্ভব হবে বলে তাঁর ধারণা। কবিতাটিতে জীবনবিমুখ ও ভোগভীরু ব্যক্তিদের প্রতি কবির আক্রমণ অনেকস্থলে উদগ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির বক্তব্য প্রতিষ্ঠার অতি উৎসাহে কবিতাটির প্রথম ষষ্ঠ স্তবকে প্রচার-ধর্মিতার লক্ষণ অনেকখানি প্রকাশমান। অবশ্য শেষের দিকে কবিকণ্ঠ অনেকখানি সংযত হওয়ায় এবং পুনর্জন্মের সংশয়-বেদনায় কতকটা কারুণ্যের সঞ্চার হওয়ায় শেষ রক্ষা হয়েছে।

'পান্থ' কবি মোহিতলালের এক অতিপ্রসিদ্ধ কবিতা। ১৩৩২ সালের 'কল্লোল'এর ভাদ্র সংখ্যায় দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহাওয়ারকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখিত এই কবিতায় ভোগবাদী কবির জীবনদর্শন পূর্ণভাবে প্রতিফলিত। অতিশয় দীর্ঘ এই ওড্‌টিতে তিনি জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের জগজ্জীবন ও নারী সম্পর্কিত নিরঞ্জনা দৃষ্টিকে গ্রহণ করেছেন যথার্থ প্রেমিকের মতো। কিন্তু ভিন্ন ভাবে। জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি ও নারীঘটিত দার্শনিকের বক্তব্যকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু দার্শনিক যেখানে ঐ সত্যের বীভৎস মূর্তি দেখে বেদনাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী, সেখানে মোহিতলাল জীবনপ্রেমিক। নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক সন্ন্যাসী জগৎ ও জীবনে কোথাও কোনো সৌন্দর্য দেখতে পান নি। জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা ধরণী তাঁর কাছে বিবর্ণ—বিষাক্ত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের জীবনে দুঃখের শেষ নেই। সৃষ্টিমূলে আছে 'দুর্জয়-দুর্বার' কাম। এই কাম হল জীবধর্ম তা 'দেহের নিয়তি'—'মোহের মঞ্জরী ঝরা বিষবীজ ধরার অঞ্চলে'। কামরূপা প্রকৃতিই হল নারী। তারই ছলনায় মোহাভিভূত পুরুষ নির্বোধের মতো তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফলে সৃষ্টিধারায় গতি অব্যাহত। মৃত্যুতেও জীবনের দুঃখকষ্টের শেষ হয় না। পুনর্জন্মের ভিতর দিয়ে দেহ-জীবনের চক্র ঘূর্ণায়মান। মোহিনী নারীর কুহকে বন্দী পুরুষের দুর্গতি এবং মরণের সমুদ্রশ্বাসে জীবনের কম্পমান অসহায় অবস্থা জ্ঞানযোগে দার্শনিক সন্ন্যাসী নিরীক্ষণ করেছেন। অথচ জীবনবিবিক্ত এই সন্ন্যাসীর প্রতি কবির গভীর অনুরাগ। সন্ন্যাসী যে-সত্য উদ্‌ঘাটন ক'রে মানুষকে সংসার-মায়া-স্বপ্নের আবেশমুক্ত করতে চান, কবি সেই সত্য স্বীকার ক'রেও আরও বেশী ক'রে সেই স্বপ্ন মায়ারই জালে জড়িত হতে চান। প্রকৃতিকে মিথ্যা সনাতনী জেনেও তিনি নারীরূপা প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছুক। নারীর 'কটাক্ষ ঈক্ষণ' কবির কাছে 'হৃদয়ের বিশল্যকরণী'। 'এ ভব ভবনে' তিনি নারীরূপা প্রকৃতি প্রিয়ারই অতিথি। অমৃতের কামনা তাঁর নেই। কামনার শেষ কোথায় তা জানবার

জন্যও তিনি ব্যস্ত নন—আকণ্ঠ পিপাসায় তিনি নারীর অধরে কালকূট পান করেই প্রাণের নির্বৃতি লাভ করবেন। এই অবস্থায় মৃত্যুও তাঁর কাছে তুচ্ছ। যদি এই সংসারে কবি আর ফিরে না আসেন, তাহলে তাঁর ক্ষুধার সুধাকে তিনি নবদেহী সন্তানদের মধ্যে রেখেও তৃপ্তি পাবেন। দেহরথে আনাগোনা করতে তাঁর এতটুকু ক্ষোভ নেই—সুন্দর মধুর জীবনজাহ্নবীর কূলে বিচরণ করতে করতে কবির স্বপ্ন আরও গাঢ় হয়—নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত হয়ে আসে। তাঁর একমাত্র ভয় চিরমৃত্যুকে। তাই অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রশ্ন—"বল বল হে সন্ন্যাসী এ চেতনা চিরতরে হবে না তো হারা?"। সন্ন্যাসীকে কটাক্ষ ক'রে কবি আরও বলেছেন যে এত ক'রেও কি তিনি জন্ম-জরার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন? জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাঁর এ-বিরূপতা কেন? এমন বেদনার ডোর যে সন্ন্যাসী বুনেছেন, তাঁরও কি প্রাণের মমতা কিছু কম? কার ওপর তাঁর এমন অভিমান? 'নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে' হরকোপানলে একদা মদন ভস্মীভূত হলে 'ম্লান চোখে অশ্রু ছলছল' উমাকে ফিরে আসতে হয়েছিল, কিন্তু অন্য একদিন কি 'ছিন্ন দুকূলের টানে' উমার মায়ায় পলাতক যোগীকে ধরা দিতে হয় নি? সংসারে যে কামনাই সত্য। এখানে দুঃখ আছে, কিন্তু—

'জানি শুধু, প্রাণের খেলায়
দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার!'

'মোহমুদগর' কবিতার আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গী এ কবিতায় একেবারেই নেই। কবির জীবনপ্রেম, নারীপ্রীতি, সৃষ্টিধারার প্রয়োজনে পুরুষের গৌরবময় নারী-পারবশ্য এবং পুনর্জন্মে সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব—সমস্তই এখানে চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তথাপি এই দীর্ঘ কবিতাটি অতিকথন দোষ থেকে মুক্ত নয়। কবির বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতা কবিতাপাঠে মাঝে মাঝে ক্লান্তি আনে।)

দেহ-বিয়োগের বেদনায় ভীত কবির দেহারতি অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে 'মৃত্যুশোক' কবিতায়। ভাষার গাঢ়বন্ধে, ছন্দের ললিতমধুর হিল্লোলে এখানে কবির বক্তব্য বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী। দেহী মানুষের দেহমাধুর্য ও দেহলাবণ্যের এমন মহিম্ন স্তব বাঙ্‌লা সাহিত্যেও অভিনব। দেহীর দেহগঠন যেমনই হোক, ত্রিভুবনে সে অনন্য—তার অনুরূপ আর একটিও নেই। মানুষের হাসি কান্না, প্রেম, আনন্দ—সকল কিছুই ঐ দেহেরই দান। দেহ নশ্বর হতে পারে, কিন্তু তার মূল্য ভুবনেশ্বরের চেয়েও বেশী। কেন না সাধনার বলে যোগী সাধকের দল ভুবনেশ্বরকে অপরোক্ষ করতে পারেন, কিন্তু যে দেহ একবার

গত হয়েছে কোনোদিনই তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অচল ও নিত্য মহাদেবের বক্ষে নৃত্যশীলা অনিত্য মহামায়ার যে চিত্র তাতে শিব-জীবের সম্পর্কই সূচিত। অনিত্যের বিয়োগেই সতীহারা শিবের বিষাণ হাহাকার ক'রে ওঠে, আর তারই নখকণা তীর্থমন্দিরে অমৃতের আশ্বাস নিয়ে আসে। কবিতাটির শেষাংশে এই অনিত্য দেহাবসানের বেদনায় কবিকণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী'র কবি বিশিষ্ট জীবনবাদ-মূলক কবিতাগুলির পরিচয় এই পর্যন্ত। এখন এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। এতক্ষণ দেখেছি যে কবি ভোগপ্রবৃত্তির মূলদেশেই কামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বস্তুত কাম স্বভাবজ। বিশ্বসৃষ্টির মূলেই যে ঐ কামের প্ররোচনা নিত্য বিদ্যমান—একথা উপনিষদ ও গীতায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত। আমাদের ধারণা, ভারতীয় সংস্কৃত ঋষি-কবিদের মতো মোহিতলালও এক উদার দৃষ্টির সাহায্যে কামকে উপলব্ধি করেছিলেন। যে কাম স্বভাবজ, যার জন্যে এই সৃষ্টি তা কখনই নিন্দনীয় হতে পারে না। বর্তমানে কামেরই পরিস্রুত রূপ হল প্রেম। কাম ও প্রেমের এই ভেদ সংস্কৃত-সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি, অমরু ভর্তৃহরি প্রভৃতির রচনায় কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে তৃতীয় বর্গরূপে কামের গুরুত্ব-স্বীকৃতি বহু পুরাতন ব্যাপার। 'ঋক্‌বেদ' ও 'অথর্ববেদ'এ কাম[৮] শব্দটি ইচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়ে পরে তৃতীয়বর্গের অন্তর্গত হয়েছে; 'স্বপনপসারী'তে মোহিতলাল 'কামনার সোমরস'কে প্রেম-রসে শোধন ক'রে দুই-কে এক করেছিলেন। 'বিস্মরণী'তে কিন্তু কাম ও প্রেমের মধ্যে কোনো ভেদই করা হয় নি। 'কাম-মুগ্ধ পশু অগণন' 'সৃষ্টিমূলে আছে কাম', 'দেহদ্রুমে বিকশিল মনোজ-মন্দার', 'প্রেম আর পরমায়ু—এর লাগি যত ব্যথা'—ইত্যাদি অংশে নানাভাবে তিনি প্রয়োজনমতো শব্দ দুটির প্রয়োগ করেছেন। এ-দু'য়ের সূক্ষ্ম-ভেদের কথা তখন তাঁর মনে জাগ্রত হয় নি। সে যাই হোক, এ কালের কবির কাম ও দেহচেতনার মূলে উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং গীতার 'বিভূতিযোগ'-এ অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই সম্পর্কিত উক্তির আদর্শ অনেকখানি সক্রিয়। যে কামাগ্নি প্রথম পুরুষযজ্ঞে উৎসৃষ্ট এবং যা থেকে নিখিল বিশ্বের সমস্ত কিছুর উদ্ভব, সৃষ্টির সেই আদিরস যে কতো পবিত্র তা' তিনি ভালভাবেই জানতেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন,—"প্রজনশ্চামি কন্দর্পঃ"[৯]। প্রজাসৃষ্টির জন্যই তিনি কন্দর্প—প্রজাসৃষ্টির জন্যেই কাম শ্রীভগবানের 'চিদানন্দবিভূতি'। নিছক সম্ভোগের প্রয়োজনে কাম নিকৃষ্ট, কিন্তু প্রজাসৃষ্টির কারণে তা ভাগবতী-লীলার অঙ্গ। কাম সম্পর্কে

কবির এই উদার সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিমূলে একদিকে উপনিষদ, গীতা ও সংস্কৃত কবিদের আদর্শ অন্যদিকে সোপেনহাওয়ারের চিন্তাধারা—দুয়েরই প্রভাব আছে। আর আছে বলেই তিনি লিখতে পেরেছেন—

'পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান'

(পাপ)

অথবা 'তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা!—বলিয়াছ, এ দেহ অমর!
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জ্জয় দুর্ব্বার।
যূপবদ্ধ পশু আমি—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে? না, না, সে যে মধুর উৎসার
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার।' (পাপ)

এখানে প্রথম উদ্ধৃতির 'ঋষি' হলেন ভারতীয় উপনিষদকার এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতির 'ঋষি' জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার।

সৃষ্টিসত্যের অনুগতরূপেই কামকে যে শুধু তিনি অনুভব করেছিলেন তাই নয়, তাঁর কাছে নারীও সৃষ্টি-রূপা প্রকৃতির বা কামরূপা প্রকৃতির প্রতীকরূপে এইকালে প্রতিভাত হয়েছিল। তাই নারীর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার তনুশ্রী ও তনুসৌরভ তাঁর কাছে পরম পবিত্র বস্তু।

আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার যে 'বিস্মরণী'র কাল থেকে তন্ত্রের সেই মহাকাব্য "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে"[১০] ধীরে ধীরে কবির চিত্তকে অধিকার করেছে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, মানবদেহ-ভাণ্ডে বা নরবপুতে তার সমস্তই বিদ্যমান। দেহকে ভালভাবে জানলে বিশ্ব-রহস্য বা বিশ্বসত্য হস্তামলকবৎ বোধ হবে। তন্ত্রে প্রবৃত্তির পথে কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত ক'রে ক্রমশ ঐ পথ অতিক্রম ক'রে চলতে হয় এবং সাধককে সহস্রারে শিব-শক্তির সামরস্য-সম্ভূত মিলনানন্দ লাভ করতে হয়। সাংখ্য-দর্শনেও পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে অসঙ্গ পুরুষের অনিবার্য প্রকৃতি-পারবশ্যের কথা আছে। উপনিষদ, গীতা ও পুরাণাদিতে প্রজাসৃষ্টির কামনায় নর-নারীর পবিত্র ও স্বাভাবিক আকর্ষণ ও মিলনপ্রসঙ্গ আছে। আমরা মনে করি নর-নারীর আকর্ষণ ব্যাপারে তন্ত্রের শিবশক্তির কথা 'বিস্মরণী'র কবির মনে উদিত হয়েছিল। বাঙালীর দীর্ঘকালীন তান্ত্রিক প্রকৃতি বাঙালী কবির রক্তের সঙ্গে যে অবশ্যই মিশ্রিত ছিল, একথা পূর্বেই বলেছি। কবির জীবনীর যতটুকু খবর জানি, তাতে 'স্বপনপসারী' রচনার সময়ে তাঁর তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো প্রমাণ নেই। আর সেইজন্য 'স্বপন-পসারী'তে

তন্ত্রশাস্ত্রের সাক্ষাৎ যোগ লক্ষণীয় নয়। কিন্তু 'বিস্মরণী'র কালে তিনি যে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, তার প্রমাণ আছে।[১১] একদিকে এই তন্ত্র অন্যদিকে ঐ সাংখ্যদর্শন বা সহজিয়া-দর্শনের সম্পর্ক—সকলই শেষপর্যন্ত পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্বে এসে পৌঁছেছে। নানাশাস্ত্রে নিষ্ণাত কবি তাঁর নারী-কেন্দ্রিক দেহাত্মবাদে এখন থেকে তাই পূর্বোক্ত সংস্কৃত সাহিত্য বা দর্শনের কাম-ভাবনার সঙ্গে আধুনিক যুগোপযোগী তন্ত্রতত্ত্বকেও[১২] যুক্ত ক'রে নিলেন। ভোগবাদমূলক ধারণাকে সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত করার প্রয়োজনে তিনি ভারতীয় পৌরাণিক চিত্র, বিশেষত হরগৌরীর পবিত্র মিলনাদর্শের যে চিত্রকে আশ্রয় করলেন, তাতে তন্ত্রের প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। তন্ত্রশাস্ত্র পুরুষজীবকে শিবরূপে এবং নারীমূর্তিকে গৌরীরূপে ভাবতে উপদেশ দিয়েছে। "যত্র জীব-স্তত্র শিবো যত্র নারী তত্র গৌরী"। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্ফুট হবে।

(ক) 'নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'!
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ব বিম্বফল!
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি!' (পান্থ)

(খ) দেবতা-দোসর বীর, তারি পরাজয়-কথা
সে হৃদয়-সাগর-মন্থন;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃত-রাগ,
মৃত্যুজয়ী জীবন কাহিনী—
যুগান্তের নিশিভোরে নিকষে সোনার দাগ
কষি' দিল, হে মনোমোহিনি!'

(অকাল-সন্ধ্যা)

এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের একটি অতি পরিচিত ঘটনার আলোকে কবি প্রথমত মহাদেব কর্তৃক উমার প্রত্যাখ্যানদৃশ্য ও মদনভস্মের কথা স্মরণ করেছেন ও শেষে ঐ উমা বা পার্বতীর আকর্ষণে মহাদেবের পরাভবের কথা বর্ণিত হয়েছে। কবির কল্পনায় চিত্রটিও অপরূপ ব্যঞ্জনাঢ্য। কিন্তু এখানে একদিকে যেমন পার্বতীর দুর্নিবার আকর্ষণে

মহাদেবের ধরা দেবার প্রসঙ্গ—অন্যদিকে এই চিত্র পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের আধারেই যে সৃষ্ট—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মানসসঙ্গিনীকে সম্বোধন ক'রে তারই আকর্ষণে দেবতা-দানব পুরুষের পরাভব-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেই আপাত-পরাজয় যে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনকাহিনী—'নীলাকাশে উদ্দাম গরলে অমৃতরাগ' এই কথা বলে কবি প্রকারান্তরে সেই পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বেরই আভাস দিয়েছেন।

তাছাড়া আমরা 'বিস্মরণী'র "নূরজহান ও জহাঙ্গীর" নামক অতিদীর্ঘ নাট্য কবিতার মূলদেশেও ঐ তন্ত্র-তত্ত্বের প্ররোচনা লক্ষ্য করেছি। মহাবৎ খাঁ নূরজহানের শত্রুতায় ভীত হয়ে সম্রাটের কাবুল যাত্রাকালে একদা তাঁকে বন্দী করেন ও সম্রাট জহাঙ্গীরের নিকট তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়ে নেন। কিন্তু ঐ আদেশপত্র নিয়ে অনিন্দ্যাসুন্দরী রূপসী নূরজহান যখন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন সেই রূপের আকর্ষণে সম্রাটের ন্যায়-বিচারের সকল অভিমান কিরূপ ধূলিসাৎ হয়েছে—তা জহাঙ্গীরের মনোরাজ্যের চিত্রে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে—

'ভালো করে' কাঁদো! ঢাকিওনা মুখ—এত শোভা, মরি মরি!
হা হা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি'।
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দরবারে,
'রোজ-কিয়ামত্'-ভেরীর আওয়াজ থেমে যাবে একেবারে!
যত পাপ, 'গোনা',—দুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ্ হয়ে যাবে! শয়তান এসে দাঁড়াইবে যোড়পাণি!…
মহাবৎ তুমি পাথর বনেছ! কোনো কথা নাই মুখে!
এত বে-দরদ!—কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে?
এখনো দাঁড়ায়ে কি দেখিছ বীর? আরো কি বিচার চাও?
বলিওনা কিছু—আর বলিওনা!—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

(নূরজহান ও জহাঙ্গীর)

'বিস্মরণী'র কালে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তন্ত্রতত্ত্বে শিব-শক্তির সম্পর্কসূত্রে বাস্তব-জীবনের মূল্য-স্বীকৃতিতে কবি বড়ই আশ্বস্ত হন। এরই ফলে তাঁর ভোগবাদমূলক কবিতার বহুস্থলে সেই তত্ত্বের আদর্শ যে উঁকি দিয়েছে—একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলে তাঁর এ কবিতাগুলি তন্ত্রতত্ত্বের ভাষ্যমাত্র একথা আদৌ সত্য নয়।

মোহিতলালের ভোগবাদসম্বলিত কবিতাগুলিতে আরও একটি বিষয়

লক্ষণীয়। সাধারণত এ জাতের কবিতায় বিশেষত নারীর দেহসম্পর্কিত বর্ণনায় এবং নারী-পুরুষের মিলন-মুহূর্তের চিত্রাঙ্কনে কবিরা অনেক সময় সংযম-শালীনতা রক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর এ-শ্রেণীর কবিতার গভীরে একটি পবিত্র আদর্শবাদ নিহিত থাকায় বক্তব্য বা চিত্র সাধারণত অসংযমের স্রোতে আবিল হয় নি। ভাষার ইঙ্গিতময়তা অথবা গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে তাই চিত্রগুলি সহজ-স্বাভাবিকতায় একটি সর্বতোভদ্র শিষ্টরূপ লাভ করতে পেরেছে। 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' উভয় কাব্য থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

(ক) 'মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল! অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস!—জানি তাহা জানি।'

(পান্থ)

(খ) 'হেরি নাই মুখ তার, বুক শুধু বাঁধি বাহুপাশে,
অঙ্গে অঙ্গে শিহরিয়া ফোটে লক্ষ-নীপ।
মিলন-রজনী মোর আঁধার শ্রাবণ—
দুই দেহতটে সে কি দুরন্ত প্লাবন!
অন্ধ হয় অন্ধকার! অন্ধ আঁখি বিদ্যুৎ বিকাশে।
সে মুহূর্তে আমি যে গো মরণ-অধিপ!'

(স্পর্শ-রসিক)

(গ) 'যে-রূপ নেহারি' আমি রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরে
ফুকারিব সৃজনের গান,
সর্ব্বদেহে সঞ্চারিবে আদিম আহ্লাদ ভরে
বিধাতার প্রয়াস মহান্!' (অকাল-সন্ধ্যা)

প্রথম উদ্ধৃতিতে 'যৌবনের পুরোহিত প্রেমদেবতার' পৌরোহিত্যে নারীরূপা প্রকৃতিকে ভালবেসে কাছে টানার কথা। অনন্ত রহস্যময়ী নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিচিত্র রূপ তো সৃষ্টিধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই। এই আদর্শের বশীভূত কবির লেখনী তাই নারীর অধর, কটিতট, নেত্র ও উরসের ইঙ্গিতময় বর্ণনায় কতো সহজ অথচ সতর্ক।

দ্বিতীয়টিতে দৃষ্টিশক্তিহীন অতিশয় স্পর্শসচেতন এক অন্ধের জবানীতে মিলনমুহূর্তে নারীদেহ-স্পর্শের তীব্র আনন্দের প্রকাশ। মিলনের পরমক্ষণে

অঙ্গের সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের লক্ষ নীপের প্রস্ফুটন এবং দুই দেহতটে দুরন্ত-শিহরণ-প্লাবন। সৃষ্টিতত্ত্বগত সভ্যাদর্শের স্পর্শে এ বর্ণনাও কতো সংযত-শোভন।

কিন্তু এ-ব্যাপারে কবি যে সদা সতর্ক থাকতে পেরেছেন—এমন বলা চলে না। মাঝে মাঝে দু'একটি স্থানে তাঁর বর্ণনায় রসাভাস ঘটেছে। ইরাণী-বালার সুন্দর সুডৌল স্তনদ্বয়ের বর্ণনায় কবি যখন লেখেন—

'উটপাখী তার ডিম-জোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে?
নাচতে গেলে গলার মালা দুই দিকে যায় ঠুকে'।' (গান)

তখন ঐ এক 'ঠুকে' শব্দটি সমস্ত চিত্রটির সৌন্দর্যকে স্থূলতার দিকে টেনে আনে না কি? কিংবা যখন পড়ি—

'লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভাল বাসিব তোমারে, হরি?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা!' (লীলা)

তখন ঐ 'মদের দারুণ নেশার' সঙ্গে 'শুঁড়ির পেশা'য় কারবারী কবির সমস্ত চিত্রটি কাব্যের কমলবন থেকে একেবারে শরবনেই নিক্ষিপ্ত হয়। 'স্বপনপসারী'র কবির চিন্তা-চেতনার অপরিপক্কতাই এ ত্রুটির প্রধান কারণ।

অতঃপর 'বিস্মরণী'র কবির ভোগবাদমূলক ভাবনা দুঃখবাদের সঙ্গে অন্বিত হয়ে তাঁকে কিরূপ ধীরে ধীরে উন্মনা করছে, চিত্তে দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সৃষ্টি ক'রে কিরূপে তাঁকে ভোগাতীত লোকে আকর্ষণ করছে—কবিহৃদয়ের ধারণা একটা পরিবর্তনের মুখে কিরূপ অস্বস্তি অনুভব করছে—সে আলোচনায় প্রবেশ করছি।

মোহিতলালের ভোগবাদ কামার্তের উল্লাসময় ইন্দ্রিয়-বিলাস নয়। তাঁর ভোগবাদের মর্মে বেদনার মঞ্জু-মধুর রক্তরাগ। ভোগমূলে যে কাম বা কামনা তা একটা কিছু চায়। যতক্ষণ সেই ঈপ্সিত বস্তু লভ্য না হয়, ততক্ষণ বেদনার অস্তিত্ব। ভোগ্যবস্তুকে পাওয়ার আশা যত বিরাট, যত সুনিশ্চিত, ভোক্তার ঐ বেদনাও তত মধুর। 'স্বপনপসারী'র কবির নিকট এই বেদনার মূল্য আরও কিছু বেশী। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, শিশুর হাসিতে যেমন চোখের জল, তেমনই ভোগের আনন্দেও বেদনার রক্তিমা। বেদনা-রশ্মি না হলে ভোগের আনন্দ মর্ত্যের বস্তু না হয়ে স্বর্গীয় অবাস্তব বস্তু হত। মানসলক্ষ্মীকে সম্বোধন ক'রে প্রথম যৌবনে একটি প্রবন্ধেও কবি একদা বলেছিলেন—

"আমি ঐ রূপ চাই, কিন্তু ধবল মরু-বালু-বিচ্ছুরিত ওই তীব্র প্রভা চাই না; অধরে কুঙ্কুম ভাঙ্গিও—ক্ষতি নাই, কিন্তু নয়ন-পল্লবে শিশিরচ্ছলে দুই ফোঁটা অশ্রু লাগিয়া থাক্।"[১৩]

কিন্তু বেদনা আগুন। তাকে একবার প্রশ্রয় দিলে তার মৃদু-উত্তাপ ঘনীভূত হয়ে শিখারূপে জ্বলতে চায়। 'স্বপনপসারী'র কবির মৃদু ব্যথা-স্পৃষ্ট ভোগবাদের উষ্ণতা 'বিস্মরণী'তে শিখারূপে মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে কবিচিত্তে জেগেছে কখনো উল্লাস, সংশয় বা ভীতি। 'স্বপনপসারী'র 'পাপ' কবিতায় 'কামনার মণি' ও 'বাসনার সোনাকে' বেদনার মূল্যে ক্রয় করার ইঙ্গিত আছে। ঐ বেদনা 'বিস্মরণী'তে ঘনীভূত হওয়ায় কবি বলেছেন—

'ত্রিযামা যামিনী খুঁজে-খুঁজে ফিরি'
মণি সে বিস্মরণী!
কামনার ফুলে গাঁথিলাম মালা—
বেদনার বন্ধনী।' (বিস্মরণী)

কামনার ফুলে মাল্যরচনার নিরতিশয় আনন্দের মধ্যেও তিনি বেদনার বন্ধনকে যুক্ত না ক'রে পারছেন না। 'শব সঙ্গীতে'এ শিব অপেক্ষা শবের শোভায় অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে এবং বদলেয়ারী ঢঙে 'কলজে খানাকে কাবাব ক'রে' শবসাধনায় মত্ত তিনি বলেছেন—

'সুখের সোয়াদ পাইনে মোটে দুখের নেশায় ঘুর লেগেছে।'

শুধু কি তাই? 'ব্যথার আরতি' কবিতায় পৃথকভাবে এই 'বেদনাকে' ঘিরে ঘিরেই কবির সানন্দ আরতি। বেদনার্ত কবির নয়নে 'নীল কাজলের জাল'। পৃথিবীতে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত ভয়—তবুও বেদনভরা রজনীর তিনি ভোর চান না। প্রিয়জনের বিয়োগ বেদনার মর্মান্তিক দাহও তাঁকে মুষড়ে ফেলে না। স্মৃতি-সুখের আনন্দে সে ব্যথার নিশাতেও জ্যোৎস্নার আলো ফোটে। প্রকৃতির ভয়াবহ অসীম শূন্যতা অন্তরে ছায়াপাত করলেও মেরু-দামিনীর ভাতি তিনি দেখতে পান। তাই তিনি বলে ওঠেন—

'যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,'
(ব্যথার আরতি)

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে কবির চিত্তে এই দুঃখ বা বেদনার জাগরণ কেন? কেনই বা তিনি দুঃখের নেশায় মত্ত হওয়ার অভিলাষী? কেনই বা তিনি ভোগচিন্তার মর্মে দুঃখের অস্তিত্ব অনুভব করছেন? একথা ঠিক যে অভাব বা অপরিতৃপ্তিই দুঃখের মূলীভূত কারণ। দুঃখ বা বেদনার তীব্রতা মানুষকে

অনেক সময় ঘোরতর নৈরাশ্যবাদী করে। কবিকে এই দুঃখ চিন্তাগ্রস্ত করলেও তিনি তার একটি সদর্থ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেইজন্য দুঃখ তাঁকে বেদনাবাদী করতে পারে নি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, শত দুঃখ-কষ্ট-জ্বালা-যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও জীবন মধুমান। জীবনপ্রেমিক মানুষকে দুঃখের সঙ্গে মিতালি করতেই হবে। 'যাতনায় হাহারবে গান' গাইতে গাইতেও তাই তিনি জীবনের উগ্র সোমরস-সুধা পান করেছেন। তাঁর অন্ধ স্পর্শরসিকও বলেছে—

'করাঙ্গুলি ক্ষত হয়—হেরি না যে কাঁটার পাহারা', (স্পর্শরসিক)

বস্তুত কবি বুঝেছিলেন যে জীবন অবিচ্ছিন্ন সুখের বাসররাত্রি নয়। দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন, আধিব্যাধি—প্রভৃতি মানবজীবনের নিত্য সহচর। বিষয়টি কবিকে চিন্তাগ্রস্ত না করলেও অতি অল্প বয়সে যে এর বীজ তাঁর মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, তার প্রমাণ 'মানসী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

একথা সত্য যে যুদ্ধোত্তর বাঙলাদেশে অর্থনৈতিক দুর্দশা-পীড়িত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণদের নৈরাশ্য ও হতাশাই মোহিতলালের মনে সর্বপ্রথম এই ভাবনাটি উদ্রিক্ত করে। পরে তাঁর প্রিয়কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের দুঃখবাদ, চার্বাকদর্শনে জীবনের মাধুর্য-বিঘোষণের অন্তরালেও দুঃখ জ্বালা, জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের দুঃখবাদ, সাংখ্য দর্শনের দুঃখ—তাঁর দুঃখভাবনাকে গভীরতার দিকে ঠেলে দেয়। জীবনপ্রিয় কবি জগৎজোড়া দুঃখের অস্তিত্ব লক্ষ্য ক'রে দুঃখের গভীরতর অর্থ সন্ধানে মনোনিবেশ করেন। বন্ধু যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো 'দুখবাদী বৈরাগী' হওয়ার প্রকৃতি তাঁর নয়। ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দুঃখের কবি শীর্ষক' কবিতায় তিনি দুঃখ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। 'দুঃখের কবি' শব্দ দুটিকে 'সোনার পাথরবাটি' বলে পরিহাস করে তিনি লেখেন—

'মিথ্যার মূলে দুঃখই আছে -সুখ যে দুর্গের ফুল।
ফুল ছিঁড়ে ফেলে মূল হেরি' তার কেন হেন শোকাকুল ?'

(দুঃখের কবি)

সোপেনহাওয়ারের ভক্ত[১৫] হওয়া সত্ত্বেও তিনি সোপেনহাওয়ার বা হার্টম্যানের মতো বলতে পারলেন না—"জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না।...যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবনপ্রবাহও রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, ইহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির

ইচ্ছা, তবে নিষ্কৃতি ঘটে না।"[১৬] কিংবা তিনি এও স্বীকার করলেন না যে—

"Suffering is essential to all life and is increased by every increase of knowledge,...There is no such thing as happiness, for an unfulfilled wish causes pain and attainment brings only satiety. Instinct urges man to procreation which brings into existence a new occasion for suffering and death."[১৭]

বড়াল-কবির দুঃখবাদের সঙ্গে তিনি গভীরভাবেই পরিচিত ছিলেন। বড়াল-কবির দুঃখবাদ তাঁর দুঃখভাবনাকে উৎসাহিত করলেও দুজনের পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একদা বড়াল-কবির দুঃখবাদের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"বড়ালের বিষাদ-গাথা নিরাশার গান, হিন্দুর দুঃখবাদ।...দুঃখবাদে তাহাদের সূচনা, সুখবাদে তাহাদের সমাপ্তি। বড়াল-কবি দুঃখের গান গাহিয়াছেন—কিন্তু দুঃখের হলাহলে সুখের সুধা ঢালিয়া দিয়াছেন।...বড়ালের কাব্যে দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হইয়াছে।"[১৮] মোহিতলালের কাব্যেও দুঃখবাদের বিষও অমৃতে পরিণত হয়েছে কিন্তু তাঁর কাব্যে দুঃখবাদ সূচিত হয়ে ধীরে ধীরে সুখবাদে পরিণতি লাভ করে নি। তিনি যখন থেকে জীবনের মূলে দুঃখের অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন, তখন থেকেই তার একটি সদর্থ নির্ণয় ক'রে নিয়েছিলেন। এ সম্পর্কিত তাঁর মনের মধ্যবর্তী ভাবনার স্তরগুলি নেপথ্যেই রয়ে গেছে। সেইজন্যই তাঁর দুঃখবাদ প্রথম থেকেই পরিণত চিন্তার স্মারক। যুগপ্ররোচনায় যে দুঃখ বাঙলাদেশের শিক্ষিত তরুণদের হতাশ করেছিল—সেই দুঃখকে ব্যক্তিগত জেনেও নির্বিশেষ জীবনগতরূপে তিনি অনুভব করেছিলেন। কবির এই দুঃখবাদকে সাংখ্যের ভাষায় ত্রিতাপ-দুঃখের মধ্যে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক দুঃখই বলা যায়। তিনি মনে করতেন, জীবনে যত দুঃখই থাক, তা বহন করবার শক্তি মানুষই রাখে। যে-মানুষের শক্তি যত অধিক, তার দুঃখকে অগ্রাহ্য করার সামর্থ্যও তত বেশী এবং সেই-ই জীবনে শেষ পর্যন্ত অমৃতের আস্বাদন লাভ করে। এই কারণেই তিনি দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহাওয়ারকে অভিমানের ছলে বলতে পেরেছিলেন—

"ওষ্ঠে হাসি নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ" (পান্থ)

দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ট্র্যাজিডি-রস বিশেষত সেক্সপীরীয় ট্র্যাজিডি-রসের তিনি ছিলেন পরম ভক্ত।

শাক্ততান্ত্রিক কবি জীবনের অনুধ্যানে দুঃখের কথা বিস্মৃত হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন দুঃখই মানুষের মনুষ্যত্ব, আত্মশক্তি ও পৌরুষকে জাগ্রত করে। বলিষ্ঠ পৌরুষধর্মী ব্যক্তিরাই যথার্থভাবে ভোগ-সামর্থ্যের অধিকারী— নারী-সম্ভোগে পুরো আনন্দ এরাই লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে নিয়তির মতো যে-দুঃখ চিরন্তন, তাকে সকল সৌন্দর্য ও সকল ভোগানন্দের সঙ্গে তিনি যুক্ত না ক'রে পারেন নি। কিন্তু আমরা মনে করি, 'স্বপনপসারী' কাব্য পর্যন্ত কবির এই দুঃখ বা বেদনা ঠিক ভাবনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নি— তাঁর মন সেখানে নির্দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু 'বিস্মরণী'তে এসে দেখা গেল যে দুঃখবাদ তিনটি বিভিন্নপথে তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছে। প্রথমত, 'স্বপনপসারী'তে যে মরণানুভব সুগভীর জীবনপ্রীতির নিবিড়তায় হৃদয়কে পীড়িত করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছিল, এ কাব্যে সেই অনুভব প্রবলতর হয়ে তাঁর মর্মমূলকে আলোড়িত করেছে। সেইজন্যই জীবনের আনন্দ ও ভোগের উল্লাসকে ব্যক্ত করতে গিয়েও কবিকণ্ঠ এখানে হয়ে উঠেছে ব্যথাতুর। মৃত্যুভয়-পীড়িত প্রাণে দেখা দিয়েছে সংশয়ের মেঘ। মৃত্যুচেতনার স্বরূপ আলোচনায় তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জীবনের আধিব্যাধি, অভাব-অনটন, ক্ষয়-ক্ষতি ও জ্বালা-যন্ত্রণাজনিত যে মূল দুঃখ, তা 'বিস্মরণী'তে ঘনীভূত হলেও কবি তার প্রকৃত মূল্যনির্ণয় করতে যে পেরেছেন—একথা পূর্বে বলেছি। তৃতীয়ত, ভোগের মধ্যে পরমা শান্তি, পরমা তৃপ্তি না পেয়ে একটা কিছুর অভাবঘটিত নূতনতর দ্বন্দ্বের আভাস 'বিস্মরণী' কাব্যেই প্রথম লক্ষ্য করা গেল। দুঃখের ত্রিমুখী স্পর্শে 'বিস্মরণী'র কবি বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। অবশ্য নশ্বরতা-বেদনা ও ভোগের অতৃপ্তিবেদনাই মূলত তাঁর হৃদয়-দ্বন্দ্বের হেতু। 'বিস্মরণী'র ভোগবাদী কবির পরিচয় আমরা বিস্তৃতভাবেই দিয়েছি। কিন্তু ঐ ভোগবাদমূলক কবিতাগুলি সতর্কতার সঙ্গে অনুভব করলে দেখা যাবে সেখানে অনেকস্থলে একটি অতৃপ্তি বা বেদনার সুরও প্রকাশমান। এ-কাব্যে এই শ্রেণীর কবিতার বাইরেও এর একেবারে প্রমাণাভাব নেই। কবির এই মনোভাব-দ্যোতক কিছু কিছু কবিতাংশ উদ্ধৃত করছি।

(ক) 'আঁখি অনিমিখ, মেটেনা পিপাসা, এ দেহ দহিতে চাই!'

(বাণ্ডার আরতি)

(খ) 'ধরিয়াছ নানা ভোগ সম্মুখে আমার—
আছে সুখ, তৃপ্তি কোথা? এই মোর দেহ

জন্মিবেনা গুপ্তচর জরা সে তোমায় ?

... ...

... ...

কহ তবে,

কতকাল ভুঞ্জিব সে ভোগ সুদুর্লভ ?

সহস্র-শরৎ আয়ু ? তার বেশী নয় ?' (মৃত্যু ও নচিকেতা)

(গ) 'এই জন্ম-মালিকার মৃত্যু-সূচী ডোর ভালবাসা,

প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—

পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত নয়ন।' (পান্থ

(ঘ) 'হৃদয়ে হৃদয় রাখি' ওষ্ঠে শুষি' সব রস

— কণ্ঠ সিক্ত গীত-রসায়নে,

ওরূপ-দীপক-রাগে দাহ করি' অপযশ,

দেহদীপ জ্বালানু যতনে।

... ...

... ...

প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া,

আজি এ দিনান্ত বরষায়

নেমেছে অকাল-সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া,

ছন্দ নাই, ভাষা না যুয়ায় !'

(অকাল-সন্ধ্যা)

'পান্থ' কবিতার নির্জন হিমাদ্রিচূড়ে মহাদেব কর্তৃক উমাকে প্রত্যাখ্যান ও পরে তাঁর পরাজয় এবং 'অকাল-সন্ধ্যা' কবিতায় 'দেবতা-দোসর বীর'এর পরাভব কথায় পুরুষ-নারীর সম্পর্কে একটি দ্বন্দ্বের অস্তিত্বও প্রচ্ছন্ন আছে; আবার এখানে প্রথম তিনটি উদ্ধৃতিতে যে অতৃপ্তির আভাস, চতুর্থ উদ্ধৃতিতে তারই ঘনীভূত রূপ। তাই দেহাত্ম-নির্ভর ভোগবাদের গানে হিমাক্ত হাওয়ার স্পর্শ ও কবিচিত্তে অবসাদ। কিন্তু এই অতৃপ্তির কারণ কি ? ভোগানন্দের মধ্যেও এই অসন্তোষ কেন ? একে কি আমরা রোমান্টিক কবিমনের মধুর ও অনির্দেশ্য বেদনা বলব ? বৈষ্ণব অলংকার শাস্ত্রে তো এইরূপ বেদনার নাম 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—রাধা-কৃষ্ণের গভীরতম প্রেমের ক্ষেত্রে এ একটি অনিবার্য ও অপূর্ব মানসিক অবস্থা। 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ, তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' মোহিতলালের এই অতৃপ্তিকে সেইভাবে দেখতে পারলে খুবই সহজ

সমাধান হতে পারত। কিন্তু তা হবার নয়। ঐ অতৃপ্তির বেদনা বা দ্বন্দ্ব তাঁর হৃদয়ে গভীরতর প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত কবি-ভাবনায় রূপান্তর না আনলে হয়তো তাই বলা যেত। এইজন্য ভোগভাবনার ঐ অসন্তোষকে রোমান্টিক কবিমনের আর্তি বা বৈষ্ণবীয় 'প্রেমবৈচিত্ত্য'—কোনোটাই বলা সমীচীন নয়। এর মূল রয়েছে আরও গভীরে। এইকালে তন্ত্রচর্চায় মনোযোগী কবির ঐ অসন্তোষের জবাব বাঙালীর তন্ত্রসাধনাতেই মিলবে। কবির অতিপ্রিয় প্রাবন্ধিকের রচনা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

"এই দেহতত্ত্বের অন্তরালে একটা প্রকাণ্ড Philosophy বা দর্শনশাস্ত্র নিহিত আছে।...দেহস্থ এই পুরুষ এবং প্রকৃতির পরিচয় পাইতে হইলে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পুরুষ-প্রকৃতির পরিচয় পাইবে। ভাব ও রসের সাহায্যে ইহাদের পরিচয় পাইতে হয়। রস মনুষ্যদেহস্থ একাদশ প্রকারের আসক্তি হইতে নির্গলিত। ভাব জীবের মিলন আকাঙ্ক্ষা হইতে উন্মেষ লাভ করিয়াছে। একটা অজ্ঞেয় অতৃপ্তিই জীবত্বের লক্ষণ। কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়াছি, কি যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারি—এই অতৃপ্তি ও লালসাই ভাবের জননী।"[১৯]

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অতৃপ্তিকে জীবত্বের লক্ষণরূপে নির্দেশ ক'রে দেহতত্ত্ব তথা তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে 'অতৃপ্তি'র যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—কবির পূর্বোক্ত অতৃপ্তি-বেদনার ব্যাখ্যায় তা প্রযোজ্য বলে আমরা মনে করি। 'বিস্মরণী'র কালে এ. অ্যাভালন সাহেবের 'The Serpent Power', প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের তন্ত্র ও দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ তিনি মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন।[২০] তাছাড়া এই সময়েই তিনি তাঁর একটি প্রবন্ধ 'দুঃখের স্বরূপ'এ ঐ অতৃপ্তির স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন।

"মানুষের সকল ক্ষুধার অন্তরালে একটা গভীরতর ক্ষুধা আছে—সেইখানে আসল অভাব, আসল দুঃখ। এই দুঃখ মনুষ্যত্বের নিদান।"[২১]

কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দেও 'বিস্মরণী' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনায় তাঁর দুঃখবাদের স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"(মোহিত-লালের) এই দেহবাদ প্রকৃতপক্ষে দুঃখবাদ; কারণ যেখানে সসীমের সত্তা, সেখানে বেদনার অনুভূতি।"[২২] কবিবন্ধু সাধারণভাবে দুঃখবাদের মূলীভূত কারণ ব্যাখ্যায় যা বলেছেন, এক হিসাবে তাও আমাদের উপরি-উক্ত 'অতৃপ্তির' দেহতত্ত্বোক্ত ব্যাখ্যার পরিপোষক। ডঃ দের মন্তব্যে বুঝি যে মানুষ

অসীম—নিজের সীমিত সত্তায় সে পূর্ণ নয়। পূর্ণতার সাধনাই তার হৃদ্‌গত কামনা। সীমাবদ্ধ মানবসত্তার তাই নিত্য অতৃপ্তির বেদনা। ডঃ সেন 'বেদনার অনুভূতি' ও উদ্ধৃতির 'কি যেন নাই · কি যেন পাইলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা'র অতৃপ্তি মূলত একই।

এই অতৃপ্তি, এই অসন্তোষ যতই সান্দ্রীভূত হল কবির মানসিক দ্বন্দ্বও তত প্রবলতর হতে থাকে—পরিশেষে দ্বন্দ্বমুক্তির প্রয়াসে তিনি ভোগে ক্লান্তি ও ভোগভবনে দেহ-মনে অবসাদ অনুভব করতে থাকেন। তখন ভোগের অতীতলোকে যাবার জন্যে তাঁর মন মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে উঠেছে। 'বিস্মরণী'র 'অকাল সন্ধ্যা' কবিতায় ভোগ-বৈফল্যের জন্যে অনুশোচনা থাকলেও তাঁর ভোগে অবসন্নতা ও অক্ষমতার মনোভাব এসেছে হৃদয়ের গোপন নেপথ্য-প্রতিক্রিয়া থেকেই। ১৩২৯ সালের 'ভারতী'র মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এ কবিতাটির প্রায় তিন বছর পরে 'প্রেতপুরী' এবং আরও ছ'মাস পরে 'নাগার্জুন' প্রকাশিত হয়। দুটি কবিতাই ভিয়েরেকের কবিতার অনুবাদ। কিন্তু অনূদিত কবিতা দুটিতে অনুবাদকের মনোরহস্য কতকটা উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। সুন্দরী নারীর নিকট সান্নিধ্য ও নিবিড় আশ্লেষ-বন্ধনে কবির অবসাদ দেখা দিয়েছে 'প্রেতপুরী' কবিতায়। তার 'অনিন্দিত কান্তির' প্রশংসা ক'রেও তিনি বলেছেন—

'তবু মনে হয়,
ও সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয়।' (প্রেতপুরী)

'নাগার্জ্জুন'-এ মর্ত্যনারীর আসঙ্গ-লিপ্সার কথা যথেষ্টই আছে। তথাপি ভোগৈকসর্বস্ব 'নিশিপদ্ম বসন্ত সেনা'ই তাঁকে তৃপ্তি দিতে পারে না। 'শুভ্র-যূথী যশোধরা'কেও চাই। একরূপে দু'জনকে ভুঞ্জনের অভিলাষই প্রবল। কবিতা দুটিতে ভোগে অবসন্ন বা উদাসীন কবিমনই প্রতিবিম্বিত। এই প্রসঙ্গে 'মৃত্যু ও নচিকেতা' এবং 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতা দুটির কথাও মনে রাখা দরকার। 'মৃত্যু ও নচিকেতা'য় বিশ্বপ্রাণের মধ্যে আত্মপ্রাণকে বিলিয়ে দেওয়ার যে সর্বব্যাপী প্রীতিসঞ্জাত ত্যাগসাধনা কিংবা 'নবতীর্থঙ্কর'এ স্বার্থত্যাগ ক'রে নির্ভীকচিত্তে আত্মবলিদানের যে আদর্শ তা 'বিস্মরণী'র ভোগবাদী কবিকে যখন আকৃষ্ট করছে, তখন বুঝতে হবে 'স্বপনপসারী'র সেই 'ত্যাগ নহে, ভোগ তারি লাগি যেইজন বলীয়ান্' এর আদর্শে বিশ্বাসী কবির মনে এখন ভাবান্তরের তরঙ্গ উঠেছে।

'বিস্মরণী'র পর 'স্মরগরল' কাব্যের ভোগবাদমূলক কবিতাগুলির পরিচয়। এ কাব্যে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে 'নারীস্তোত্র' 'দেবদাসী' 'বুদ্ধ' 'স্মরগরল' ও 'রূপমোহ'ই প্রধান। 'নারীস্তোত্র' (১৩৩৪, কালিকলম, শ্রাবণ)

দেবদাসী (১৩৩৪ বিচিত্রা, পৌষ) এবং বুদ্ধ (১৩৩৪ বিচিত্রা, চৈত্র) এই তিনটি কবিতা 'বিস্মরণী' কাব্য প্রকাশের প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই লিখিত। সেইজন্য 'বিস্মরণী'র ভোগবাদী কবির মন এই তিনটি কবিতায় অনেকখানি লভ্য। 'নারী-স্তোত্র' ও 'বুদ্ধ' দুটি কবিতাই গভীর মনস্বিতার স্বাক্ষরাঙ্কিত। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন যুগে পুরাণে, দর্শনে ও সাহিত্যে অঙ্কিত নারীর পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন, বিচিত্র ও রহস্যময় মূর্তিসমূহ কবি পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এবং সর্বশেষে নারীকে দেবী নয়, মানবীরূপে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 'নারীস্তোত্র' কবিতায়। ঋষি, দার্শনিক ও কবির চক্ষে নারী এক চিরন্তন প্রহেলিকা। কারো চক্ষে সে 'শয়তানের সহজসাধিকা'—তার তনুতে 'নরকের দ্বার' এবং তারই জন্যে মানুষের স্বর্গ থেকে চির-নির্বাসন। সে ছলনাময়ী— পুরুষের পুরুষার্থ সে-ই অপহরণ করে। অথচ সে চির উদাসীন- চিরন্তন রহস্য। আবার কারো দৃষ্টিতে তার মধ্যে অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমন্বয়। একদিকে সে যেমন 'ভূগর্ভের অগ্নি', ধরণীবক্ষের 'ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাস', বনের দাবানল এবং বন্ধ্যা বারাঙ্গনা' অন্যদিকে সে তেমনই 'গৃহকোণের দীপ' 'হোম ধূমারুণ-আঁখি 'বধূ ব্রীড়া মূর্তিমতী' এবং তারই 'অলক্ষ্য তাপে ঋতু-লক্ষ্মী পুষ্পফলবতী'। একদিকে সে 'দশমহাবিদ্যারূপা—ধূমাবতী ষোড়শী কমলা', 'অসুরনাশিনী চণ্ডী' কিংবা কপালকুণ্ডলা কালী 'মায়া মাহেশ্বরী' অন্যদিকে সে 'প্রেম-বৃন্দাবনে হৃদয় রাধিকা রুদ্রের ঘরণী' 'সতী দক্ষের ঝিয়ারী'। একদিকে সে নব বধূ 'দেহসহচরী' 'অবিদ্যারূপিণী মোহিনী অপ্সরা' অন্যদিকে সে দেবী রমা 'বিষ্ণুস্বয়ম্বরা'। চিরকাল এই নারীকে নিয়ে মানুষের মনে 'অন্তহীন কলহ-সংশয়'। 'কিন্তু মোহিতলালের বক্তব্য হল নারী সতীও নয় অসতীও নয়—সে "স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী"— আনন্দমত্ত ধরিত্রীর সে 'মর্মের উচ্ছ্বাস।' তার একহাতে সুধাভাণ্ড ও অন্যহাতে বিষামৃতও নেই। নিখিল সৃষ্টিধারাকে সচল রাখার প্রয়োজনেই তার আগমন। মানুষের গৃহে সে ধরা দেয় গৃহলক্ষ্মী রূপে—জায়া ও জননীমূর্তিতে। তার আবির্ভাবেই সংসারের সমস্ত দুঃখ-বেদনার অবসান। তার কাছে পাপ-পুণ্যের ভাবনা নিরর্থক। অন্ধ কামই তাকে ত্যাগ ও আত্মবলিদানের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু কবির দুঃখ যে এই সহজ দৃষ্টিতে মানুষ নারীকে দেখতে পারে না। আর পারে না বলেই তাকে বুঝতে না পেরে ভাবের ঘোরে অযথা তাকে স্বর্গের দেবীরূপে কল্পনা করে। নারীকে তার দেহসীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার যথার্থ স্বরূপ যারা উপলব্ধি করতে পারে নি, তাদের প্রতি কবির বিরূপতা এ কবিতায়

দুর্লক্ষ্য নয়। তথাপি মনে হয় নারীকে নিছক দেহ সীমানায় অধিষ্ঠিত ক'রে এবং তার উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে কবিকণ্ঠ যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে। আর সেইজন্য প্রিয়তমা বিয়াত্রিচকে অবলম্বন ক'রে দান্তের অসীম প্রেমের দিব্যগীত এবং সাজাহানের মমতাজকে আশ্রয় ক'রে তাজমহল রচনাকে আক্রমণ করতে গিয়েও তিনি যেন লক্ষচ্যুত। আক্রমণের জ্বালা কবিরই অলক্ষ্যে প্রশংসার মালা রচনা করে ফেলে নি কি? এই কবিতার পঞ্চদশ স্তবকে নারী-তনুকে তুচ্ছ ক'রে যারা বৃথাই আত্মার সন্ধানে প্রলয়পথে বিচরণ করে তাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষের অন্ত নেই স্বীকার করি, কিন্তু চতুর্দশ স্তবকে কবি নারীর 'দেহ মণিপদ্মে' যে আলোকের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেছেন তা কি একান্ত-ভাবেই দেহগত? নারীর বরাঙ্গে অধিষ্ঠিত যে-সুন্দর দেবতাকে প্রাণের গহনে কবি অপরোক্ষ করেছেন, সে-দেবতাও কি একান্ত-ভাবেই দেহধৃত? আমাদের ধারণা, দেহের সোপানে দাঁড়িয়েই ঐ দেহাতীত আলো ও ঐ দেহাতীত দেবতাকে অনুভব করতে হয়। দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহাতীতকেও স্বীকৃতিদান এটুকুই এ কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

'দেবদাসী' কবিতায় পূজারিণী দেবদাসী নির্বিকার ও উদাসীন নটনাথের দেউলপ্রাঙ্গণে নৃত্য ক'রে চলেছে। রূপ-যৌবনের পসরা নিয়ে সকলের মানস মোহিনী দেবদাসী বিশিষ্ট তাল-লয়ে দেবতার মনোরঞ্জন ক'রে আসছে। কিন্তু এই অভিনয়ে তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠেছে। নটনাথকে সে প্রশ্ন করেছে—'ওগো দেব! তুমি চাহনা আমারে

চাহ মোর বরতনু?'

তার দেহের রূপ ও দেহের লাবণ্য কি দেবতার একমাত্র কাম্য? কিন্তু দেহটাই তো তার 'আমি'টার সব নয়। আর দেহটারই বা মূল্য কতটুকু?

> 'দিবে কি আমারে চিরযৌবন—
> হরিবে কি মোর জরা?
> কণ্ঠে আমার ফুরাবে না সুর?
> পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর?
> র'বে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
> চিরদিন মধুভরা?'
>
> (দেবদাসী)

দেহের সমস্ত কিছুই যখন অনিত্য, তখন দেবতা দেবদাসীর পুরো 'আমি'-টাকে গ্রহণ ক'রে তার এই নিয়তি-পীড়িত করুণ জীবনধারার অবসান করুন—

এই তার কামনা। দেখা যাচ্ছে 'স্মরগরল'এর কবি 'দেহ'এর কথায় আর পূর্বের মতো মত্ত হতে পারছেন না।

'বিস্মরণী'তে যিনি জীবনপ্রেমের গভীরতায় দুঃখের বিষকেও অমৃতে পরিণত করে নিয়েছিলেন—সেই কবিমনই ধরা দিয়েছে 'বুদ্ধ' কবিতায়। মানুষের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুভাবনাকে দূর করার জন্যে মারজয়ী বুদ্ধ প্রবৃত্তি বিরোধী শূন্যতাসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে অগণিত ভক্ত বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ নিতে আগমন হয়। কিভাবে মানুষের দুঃখকষ্ট বুদ্ধদেবকে চঞ্চল করল, কিভাবে একদা এই রাজপুত্র গৃহত্যাগ ক'রে দীর্ঘকালীন সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধিসুধা অর্জন করলেন এবং কিভাবে তাঁর প্রভাবে দেশে বিদেশে মঠ মন্দির তৈরি হল—তার একটি চমৎকার চিত্র এ কবিতায় আছে। কিন্তু কবির প্রশ্ন, ব্যক্তিগত সাধনায় ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধিলাভ করেও কি নিখিল মানুষের দুর্গতি দূর করতে পেরেছেন? তাঁর অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী জগৎবাসীর প্রাণের ইষ্টমন্ত্র হলেও তাঁর প্রবৃত্তি বিরোধী কামনা বাসনা জয়ী মন্ত্রের উপাসক আছে কি?

> 'মার' কি মেনেছে বশ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা?
> তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়েছে মৃত্যুর সম্বল?
> ফোটে না কি রাধা পদ্ম কৃষ্ণ-অশ্রু নয়নের মাঝে?'
>
> (বুদ্ধ)

বুদ্ধের এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধসাধনাকে কবি তৈমুরের লক্ষ জীবননাশ অপেক্ষাও ভয়াবহ মনে করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র প্রেমই মানুষের সকল দুঃখ, সকল ভাবনা এমনকি মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন-ভীতি দূর করতে পারে। এই প্রেমের স্বরূপ কি?

> 'অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা।
> কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে,
> প্রাণের রহস্য তবু এক সেই! জন্মান্ত অবধি—
> তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা।
> সেই প্রেম। জন্ম জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই।
> এই দেহ-পাত্র ভরি' যেই দিন উঠিবে উচ্ছলি'—
> ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর।' (বুদ্ধ)

আলোচ্য কবিতায় এ প্রেমের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয় নি বটে, কিন্তু এ প্রেম যে নর-নারীর পারস্পরিক দৈহিক আকর্ষণগত

প্রবৃত্তির এক লীলামাত্র, একথা মনে করা যায় না। কবি বলেছেন এ প্রবৃত্তি কাম হলেও তা কামেরই ভিন্নরূপ। 'বিস্মরণী'তে যে কবি কাম ও প্রেমের মধ্যে কোনো ভেদ স্বীকার করেন নি—তিনিই এখানে প্রেমকে কামেরই অপর মূর্তি বলেছেন। কিন্তু কথার এখানেই শেষ নয়। এর কয়েক বৎসর পরে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি যা বলেছেন, তাতে এই প্রেমের স্বরূপ অনেকখানি স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেছেন, "মানুষ দুঃখকে বরণ করে সুখের জন্য এবং সেই সুখের কতখানি যে দুঃখ তাহা তাহার মনেই হয়না—ইহাই "সিক্রেট অব লাইফ্"। এই যে রহস্য ইহার কি নাম দিব? নাম দিতে গেলেই তর্ক উঠিবে।· আমরা সচরাচর যাহাকে প্রেম বলি তাহা এবং তাহার উচ্চতর অভিব্যক্তি ইহার অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহা জীবনের কোনও একটি বিশেষ প্রবৃত্তিমূলক নয়, পরন্তু সর্বপ্রবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।·· জীবনের সেই প্রবৃত্তিকে প্রেম নামে অভিহিত করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছি সত্য · তথাপি যখনই তাহাকে ধ্যান করি, তখনই তাহার সুস্পষ্ট সাকার মূর্তি আমার মানসপটে প্রেমরূপেই প্রকাশিত হয়, মনে হয় উহাই 'জীবনের সঞ্জীবনী অমৃতবল্লরী'[২৩]।" পরবর্তীকালের আর একটি প্রবন্ধেও তিনি এই প্রেমকে বলেছেন "অপার কারুণ্য"[২৪]। 'বুদ্ধ' কবিতায় নিঃসীম জীবনানুরাগের অন্তরালে কবির দেহগত প্রেম সম্পর্কে ধারণার রূপান্তরও লক্ষ্য করতে হবে।

তৎকালীন আধুনিক কবিবৃন্দ মোহিতলালের ভোগবাদমূলক কবিতার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে নগ্ন দেহবাদাখ্য কবিতা রচনায় অগ্রসর হলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। ক্ষুব্ধ কবির 'স্মরগরল' নামক বিখ্যাত কবিতায় নিজ কাব্যের ভোগবাদ-ব্যাখ্যা করার তাই সমালোচকসুলভ প্রয়াস। মণ্ডনকলার আতিশয্য এবং বক্তব্যকে ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ করার অত্যুৎসাহে তাঁর ভাববস্তু এ কবিতায় তেমন স্বচ্ছতালাভ করতে পারে নি। কবিতার ছন্দ, ধ্বনিমাধুর্য ও অলংকরণের প্রশংসা ক'রেও বলতে হবে এ কবিতায় সমালোচক মোহিতলাল কবির ওপর অনেকখানি উপদ্রব করেছেন। সে যাই হোক, কবির বক্তব্য যেটুকু ধরা যায় তা হল মোটামুটি এইরূপ: কবি দেহের দেহলীর উপরেই মদনের দেউল নির্মাণ ক'রে মদনের প্রিয় পাঁচফুল থরে থরে সাজিয়েছেন। দুয়ারে তাঁর 'প্রাণের পূর্ণ-কুম্ভ', 'পল্লবে অধীর চুম্বন' এবং 'রূপের আবীরে স্বস্তিক'-চিহ্ন। কিন্তু তাঁর মদন ভস্মীভূত হওয়ার পর নববেশধারী। তার বুকে দাহন-শেষের বিভূতির রেখা। বিভূতিভূষণ মদনের যোগী-বেশই তাঁর আরাধ্য। তাই তাঁর 'কেলি কদম্বমূলে উদাসীর বারাণসী।' মদনের এই রূপ-কে বরণ করতে গেলে

সুখের সঙ্গে দুঃখ, আনন্দের সঙ্গে জ্বালাকেও একসঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। তাই দুঃখহীন সুখ-লম্পটের সুরত-কৌতুকে মত্ত হওয়া চলে না। তাঁর কামকলা মিলনের মিথুন-বিলাস নয়—বধূকে কোলে ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কবির চোখে জল আসে। দেহ-অরণিকে মন্থন ক'রে যে অগ্নিকণার উদ্ভব—তারই দহন-জনিত মিঠা-বিষে তাঁর মদন-প্রশস্তি। কবির পীরিতি ঠিক দেহরীতি নয়।

"আমার পীরিতি দেহ-রীতি বটে, তবু সে যে বিপরীত—
ভস্মভূষণ কামের কুহকে ধরা দিল স্মরজিৎ!
ভোগের ভবনে কাঁদিছে কামনা—
লাখ' লাখ' যুগে আঁখি জুড়াল না!
দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!"

(স্মরগরল)

ভোগের ভবনে বাস ক'রেও তাঁর আত্মা তৃপ্ত নয়। তাঁর নয়নের অতৃপ্তি মেটে না। আর সেইজন্যই দেহবাসী অথচ দেহাতিরিক্ত আত্মা দেহের মধ্যে অতৃপ্তিতে ক্রন্দন ক'রে ওঠে। 'বিস্মরণী' কাব্যে ভোগ-রাজ্যে তাঁর যে অতৃপ্তি, যে বেদনা লক্ষ্য করা গেছে, এখানে তাই আরো ঘনীভূত।

'নারীস্তোত্র' কবিতায় নারীকে যারা দেহ-সীমার বাইরে এনে দেবীরূপে বন্দনা করতে প্রয়াসী তাদের প্রতি কবির কটাক্ষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কিন্তু 'রূপমোহ' কবিতায় তিনি নারীর এক অদ্ভুত উদাসিনী মূর্তি দেখে দেবীরূপেই তাঁকে উপলব্ধি করেছেন। অন্তরলক্ষ্মী 'দেহ-আত্মা মানসের' শেষতীর্থে শুচিস্নাতা হয়ে সর্বরাগহারা ও লজ্জামুক্ত অবস্থায় সিক্তকেশে যখন তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সঙ্গে এতকালের প্রেমকে কবির মরীচিকা বলে মনে হল। আর মনে হল—

"দেবী সে, প্রেয়সী নয়!—এ যে তাই আরো রূপ!
একি মোহ স্নেহ-অবসানে?"

(রূপমোহ)

নারীকে তিনি এখানে দেহ-সীমানার বাইরে আনেন নি বটে, কিন্তু কায়ারূপিণী নারীও যে আজ তাঁর কাছে দেবীর পদবীতে উন্নীত—এ কথাটি বিস্মৃত হওয়া চলে কি?

'নিশুতি' নামক আর একটি কবিতায় রূপ ও যৌবন সম্পর্কে কেমন একটি বিরূপ মনোভাব সহসা এক জ্যোৎস্না-রজনীতে কবির মনে উদিত হয়েছে।

কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোকে ধরণীর দিকে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছে যে সে 'শুক্লাম্বরা বিধবা রূপসী'। তার সেই ভয়ঙ্কর রূপকান্তি দর্শনে অনিচ্ছুক কবিমন ভেবেছে—

"যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার!" (নিশুতি)

'স্মরগরল'এর কবিতাগুলি আলোচনা ক'রে দেখা গেল যে কবি ভোগকেই চূড়ান্ত ক'রে দেখতে গিয়ে কোথায় যেন একটি বাধা পাচ্ছেন। তাঁর অন্তরাত্মা ভোগে মত্ত হতে গিয়েও কেঁদে উঠছে—নারী দেবীরূপে বা সংসারচক্রে আত্মনিবেদিতা গৃহলক্ষ্মীরূপে জায়া ও জননীমূর্তিতে তাঁকে আকর্ষণ করছে। প্রেমও এখন আর কামের মূর্তিতে নয়—একটি ব্যাপক সর্বভূতে প্রীতির রূপে তাঁকে আহ্বান করেছে। রূপ ও যৌবনেও কেমন একটা বিতৃষ্ণা মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে, তিনি ঠিক শান্তি বা তৃপ্তি পাচ্ছেন না। ভোগের অতীত-লোকের অস্পষ্ট একটি সংকেতধ্বনি তাঁর কানেও এসে পৌছচ্ছে। কিন্তু সে রাজ্যের স্পষ্ট চিত্র এখনও তিনি পাচ্ছেন না। এ-কাব্যেরই 'নূতন আলো' শীর্ষক কবিতাটিতে কবি এই মর্তজীবনের কূলে বসেই সেই দেহাতীত, ভোগাতীত অধ্যাত্মজগতের আলোকাভাস পেয়েছেন। কবির কাব্যধারার পরিচয়কালে আমরা কবির সেই প্রবণতার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। কিন্তু তাঁর ইহজীবনের চৌহদ্দির মধ্যে সেই অধ্যাত্ম-জীবনের অনুভব তাঁকে কতখানি আশ্বস্ত করেছে তা বলা শক্ত। কেননা 'স্মরগরল'এর অনেকগুলি কবিতায় ভোগে অতৃপ্ত কবিই আবার অপগতযৌবন-বেদনায় কাতরও হয়েছেন। এই কাতরতার মধ্যে তাঁর সুপ্ত ভোগলিপ্সাও প্রকাশমান। আবার যৌবন-হারানোর বেদনাকে জয় ক'রে স্মৃতি ও প্রকৃতি-আশ্রয়ে পুনরায় আত্মস্থ হওয়ার প্রমাণ 'স্মরগরল'এ আছে। এই সমস্তের ভিতর দিয়ে কবিচিত্ত যে বার বার দ্বন্দ্বাবর্তে পতিত—তা বোঝা যায়। স্পষ্ট অনুমান করতে পারি—স্মৃতি, প্রকৃতি ও ঈশ্বরই এখন সেই দ্বন্দ্বের অতীত-লোকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ধ্রুবতারা।

'স্বপনপসারী', 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' কাব্যের মধ্য দিয়ে মোহিতলালের ভোগবাদমূলক ধারণাকে বিস্তৃতভাবেই অনুসরণ করা হল। এখন এ কাব্যের আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। 'বিস্মরণী'তে কবি 'কাম' ও 'প্রেম' শব্দ দুটি প্রয়োগে কোনো পার্থক্য করেন নি। কিন্তু 'স্মরগরল'এর 'বুদ্ধ' ও 'নারীস্তোত্র' কবিতায় দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। 'বুদ্ধ' কবিতার আলোচনায় একথা পূর্বেই বলেছি। 'নারীস্তোত্র'এ কবি নারীর প্রেমকে বোঝাতে গিয়ে লিখেছেন—

"সর্বত্যাগী অন্ধ কাম—সেই তার প্রেমের প্রমাণ"।

অর্থাৎ যে-কাম নারীকে সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আত্মবলিদানের মন্ত্রে দীক্ষা দেয়, সেই কামেরই নাম প্রেম। দেখছি, কবি এখানে কামকে আর নিছক ভোগ নয়, ত্যাগের মন্ত্রেও শোধিত ক'রে কাম ও প্রেমকে অভিন্ন করেছেন। ভোগসর্বস্ব কাম আর প্রেমের মধ্যে সে অভিন্নতা কবি আর লক্ষ্য করছেন না। 'স্মরগরল' কবিতায় তাঁর 'কামকলা' যে নিছক মিলনের মিথুন উল্লাস নয়, 'হৃদয়নয়নের বহ্নিকণা', 'বিভূতি', 'বেদনা', 'কামনার কান্না' প্রভৃতির সংস্পর্শে শেষ পর্যন্ত তা যে এক বিশিষ্ট 'প্রেমকলা'—একথাই যেন তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন।

'বিস্মরণী'র তন্ত্রতত্ত্বও 'স্মরগরল'এর কবি বিস্মৃত হন নি। এখানেও কতকগুলি কবিতায় তন্ত্রতত্ত্বের আলোকে চিত্র সৃষ্ট হয়েছে। 'নারীস্তোত্র'এ নারীকে 'সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী কালস্রোতে কমল-আসনা' বলে তার যে বিশ্বধাত্রী মূর্তি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এবং তাকে 'প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি'—বলে যে ভাবে অনুভব করা হয়েছে—তাতে মনে হয়, এই সময় থেকে কবি তার নারীভাবনাকে একটি তত্ত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। তন্ত্রের সেই শিব-শক্তি তত্ত্বকে (সাদৃশ্যসূত্রে সাংখ্যের পুরুষ—প্রকৃতিতত্ত্ব) তিনি জীবনের সবব্যাপারে ও সর্বঘটে প্রযোজ্য বলে ক্রমশ অনুভব করেছিলেন। তখন কাম, কামরূপা প্রকৃতি, প্রকৃতিরূপা কামিনী, পুরুষ সকলেই সেই প্রত্যয়ের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে পড়েছে। 'নারীস্তোত্র' কবিতায় বিস্মরণী'র 'পান্থ' কবিতার সেই সোপেনহাওয়ারের নারী সম্পর্কিত ধারণাও আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কবির চিন্তা তত্ত্বভিত্তিক হয়ে উঠছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে তিনি তার এই তত্ত্বকে এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

'যে নিরন্তর আত্মোৎসর্গের অহেতুক (অতএব পুরুষের অবোধগম্য) উল্লাসে মহাশূন্য অফুরন্ত সৃষ্টিধারায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—সেই স্বতঃস্ফূর্ত হ্লাদিনী-শক্তির নাম কাম।...এই সৃষ্টি যদি নারীরূপা হয়, তবে সেই নারীও ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি, যে-প্রকৃতির বশে সেই 'এক' পুরুষ যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে 'বহু' বিভক্ত করিয়া সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।...নারীও ব্রহ্মের সেই অপরা প্রকৃতি, অর্থাৎ সেই যজ্ঞের কর্তা—ঐ আহুতির হোতা যিনি, আহুতির দ্রব্যও তিনি; হোমকর্তাও যিনি, হোমকর্মও তিনি। ইহাও সেই doing ও sufferingএর কথা, পুরুষ যদি

doingএর অধিকারী হয় এবং নারী যদি sufferingএর পাত্রী হয়, তবে ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি সেই একই ব্রহ্মের দুই রূপ বুঝিতে হইবে। একেরই স্বগত বিরোধের এই যে লীলারহস্য, তাহাই রস, মানুষের জীবনে ইহার যে অনন্ত নাট্যরূপ তাহাই সকল কাব্যের একমাত্র উপজীব্য।"[২৫] এখানে মোহিতলালের পুরুষ-প্রকৃতি সংক্রান্ত ভাবনা বৈদিক 'পুরুষ-সূক্ত'এ বর্ণিত পুরুষ-যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর নারী-সম্পর্কিত ভাবনা 'স্মরগরল' কাব্যে এই পর্যন্ত।

কিন্তু এ-ভাবনা আরও পরে পরিবর্তিত হয়ে নারীর কল্যাণময়ী জননী-মূর্তিতে শেষ পরিণতি লাভ করেছে।[২৬] কিন্তু কাব্যে তার প্রমাণ নেই বলে আপাতত সে প্রসঙ্গের অবতারণা করছি না। মনে রাখা উচিত যে নারীর মাতৃমূর্তির প্রতি কবির শেষ পর্যন্ত আকর্ষণের মূলে 'মা-পাগল'-বাঙালী জাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যই প্রধান। আর 'স্মরগরল'এর সময় থেকে জাতির অবক্ষয়-ভাবনা তাঁকে পীড়িত করেছে এবং পরবর্তী কাব্যে ও পরবর্তী গদ্যরচনায় উত্তরোত্তর সেই ভাবনা বৃদ্ধি পেয়ে কবিকে একরূপ মানসিক অসুস্থ ক'রে তুলেছে। এই মানসিকতারই ফল হিসেবে তাঁর নারী সম্পর্কিত সেই শেষ-পরিণত ধারণাটিকে বুঝে নিতে হবে।

কবির বিশিষ্ট জীবনবাদমূলক কবিতার আলোচনা-শেষে আরও কয়েকটি বিষয় পৃথক ভাবে আলোচিতব্য। প্রথমত, প্রেম-কবিতায় সংস্কৃত কবিদের প্রেমাদর্শের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। সংস্কৃত সাহিত্য যে বেশ ভালভাবেই তার পড়া ছিল, তাঁর কাব্যই তার বড় প্রমাণ। এ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বভাবগত আকর্ষণ তো ছিলই, পরন্তু এই আকর্ষণ সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ সুশীলকুমার দে-র সঙ্গে নিবিড় ও আজীবন ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বর্ধিত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে কাম ও প্রেমের ভেদ যে অস্বীকৃত একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেখানকার 'কাম'এর আদর্শ যে 'বিস্মরণী'তে অনেকখানি প্রতিফলিত, তাও বলেছি। সংস্কৃত কবিরা কামকে বা বর্তমানের ভাষায় প্রেমকে কখনও অবাস্তব বস্তু বলে ভাবতে পারেন নি। বাস্তবদেহেরই স্বাভাবিক ক্ষুধারূপে কামকে উপলব্ধি ক'রে তাঁরা কামের প্রতিটি বৈচিত্র্য, প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তরকে নিঃসংকোচে বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এও জানা উচিত যে তাঁরা দেহের ক্ষেত্রে যে-কামের অঙ্কুরোদগম তার সঙ্গে একটা আদর্শবাদকেও মিশ্রিত ক'রে নিয়েছিলেন। কেননা তাঁরা জানতেন খাঁটি দেহবাস্তবতা কাব্যসৃষ্টির প্রতিকূল। এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সমালোচক লিখেছেন—

"It would be absurd indeed to suppose that these sanskrit love-poems do not possess any touch of that idealism, without which no poetry is poetry, they have enough of idealism, but they do not live upon air...It (Sanskrit love-poem) does not talk about ideals and gates of heaven but walks on the earth and speaks of the insatiable hunger of the body and the exquisite intoxication of the senses. For these poets must have felt, as many true passionate poets feel, that passion in its essence is not idealism which looks beyond the real, but idolatary which finds the ideal in the real."[২৭]

কবির প্রেম-চিন্তার মূলে হর-গৌরীর পবিত্র মিলনাদর্শ, মদনের যোগীবেশ, তন্ত্রের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব—প্রভৃতি যে আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যে কথিত ঐ 'idealism'এর সাদৃশ্য তো স্পষ্ট।

তাঁর দেহ সম্বন্ধে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যে সংস্কৃত প্রেম-কবির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সগোত্র এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে তাঁর আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রেমের প্রসঙ্গে তাঁরা দেহকে গুরুত্ব দিলেও আত্মাকে কখনই অস্বীকার করেন নি। তাঁরা দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপেরই পূজারী। তাঁরা আত্যন্তিক প্যাশনের স্বভাবধর্মে দেহকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বটে এবং প্রেম তাঁদের কাছে আত্মবঞ্চনা অপেক্ষা আত্মতৃপ্তিরই হেতুরূপে দেখা দিলেও তাঁরা আত্মাকে কখনও বিস্মৃত হন নি। মোহিতলালও তাঁর কাব্যে দেহ-আত্মার প্রসঙ্গ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছেন এবং তিনিও তাঁর ভোগবাদসম্বলিত কবিতায় দেহের দিকটিতে গুরুত্ব দিলেও তা কখনই অবিমিশ্র দেহবাদ নয়। দেহ-আত্মার সম্মিলিত রূপের তিনিও উপাসক। তৎকালীন বঙ্গদেশে দেহ বা বস্তুকে পরিহার ক'রে অবস্তু বা বিদেহের সাধনা কাব্যে প্রবল হয়ে উঠছিল বলে তিনি মাঝে মাঝে আত্মাকে কটাক্ষ ক'রে দেহের কথায় জোর দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তাঁর দেহ আত্মাবিহীন মনে করার কোনো কারণ নেই। কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহায্যে আমাদের বক্তব্য বিশদ করছি।

(ক) "দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ ;
আত্মা-দেহ ভিন্ন কেহ
নয় সে কভু—এক সমান !"

(পরমলক্ষণ : স্বপনপসারী)

(খ) "প্রেম যে আত্মার আয়ু !—ক্ষয় নাহি তার ;
জন্মে জন্মে তাই মোরা একই বধূ-বর !"

(জন্মান্তরে : স্বপনপসারী)

(গ) "দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ"

(কালাপাহাড় : বিস্মরণী)

(ঘ) "দেহে-দেহে তুমি এত অভিনব !
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব ?
হাসি-ক্রন্দন—তব-উৎসব !
পিরীতির পারাবার !"

(মৃত্যুশোক : বিস্মরণী)

এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে মিলনের 'পরমক্ষণে'ও কবি আত্মাকে স্বীকার করেছেন, তবে আত্মাকে দেহ-ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ বলতে তিনি কুণ্ঠিত। দেহ-আত্মা যে অভিন্ন, তাদের যে পৃথক অস্তিত্ব নেই—মিলনানন্দে কতকটা চার্বাকীয় এই বিশ্বাস ধরা পড়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে বোঝা যায় যে তাঁর বিশ্বাস চার্বাক-অনুবর্তী নয়। এখানে প্রেমের অমরত্ব ঘোষণার উৎসাহে জন্মান্তরকেও তিনি মেনে নিয়েছেন এবং হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ও সংস্কৃত কবিদের আদর্শানুগত 'অক্ষয় অব্যয় অজর অমর' আত্মাকে পৃথক অস্তিত্ব-দান ক'রে প্রেমকে তারই আয়ুরূপে তিনি অভিহিত করেছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যখন 'দেহের দেউলে দেবতার' ইঙ্গিত করা হয়েছে, তখন বুঝতে হবে দেহ ও দেবতা এক নয়—পৃথক। আর ঐ দেবতাও যে আত্মা বা পুরুষ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এখানে উভয়ের পৃথক সত্তা স্বীকৃত এবং আত্মা দেহগত। শেষ উদ্ধৃতিতে তিনি দেহ-দেবতার বন্দনা মুক্তকণ্ঠেই করেছেন বটে, কিন্তু দেহগত আত্মা দেহাতীত হয়—এই বিশ্বাসটিতে তাঁর সংশয় দেখা দিয়েছে। অতএব এই সমস্ত উদ্ধৃতির আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কবির নিকট দেহ আত্মাবিহীন নয়। আত্মা দেহগত, তবে তা দেহাতিরিক্ত কিনা সে বিষয়ে তাঁর সংশয়-জ্ঞান আছে। এই সংশয়ের জাল কবির মন থেকে মাঝে মাঝে অপসারিত হয়ে তাঁকে কিরূপ বিশ্বাসের দিকে ঠেলা দিয়েছে, তার প্রমাণ স্বরূপ আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(ক) "আমার অন্তর-লক্ষ্মী দেহ-আত্মা মানসের
শেষ-তীর্থে শুচি-স্নান করি'

দাঁড়াইল মুক্ত-লজ্জা, সজ্জা শুধু সিক্ত কেশ—
মুক্তাস্রাবী তিমির-নির্ঝর।"
(রূপ-মোহ)

(খ) "দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত"!
(স্মরগরল)

এখানে প্রথম উদ্ধৃতিতে কবি দেহ আত্মা ও মন—এই তিনকেই স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয়টিতে দেহগত আত্মার দেহাতীত স্বরূপের কথাই ব্যঞ্জিত। 'ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা' (বুদ্ধ) কিংবা 'দেহই অমৃতঘট আত্মা তার ফেন অভিমান' (নারীস্তোত্র) প্রভৃতি 'স্মরগরল' কাব্যের উক্তিতে সমকালীন কাব্যে দেহ-অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর বেদনা ও অভিমানাহত চিত্তের পরিচয় আছে। এ-সব স্থানে দেহ আত্মাসম্পর্কিত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাটি তাই গৌণ।

সংস্কৃত কবিদের প্রেমাদর্শের সঙ্গে এই কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গেলেও বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট। কবির প্রেম-সম্পর্কিত ধারণা দুঃখবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে—তার সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের সাদৃশ্য নেই। দ্বিতীয়ত, তাঁর দেহগত প্রেম যে-ভাবে অতৃপ্তি ও দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্তে ভোগে বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তি এনেছে, তার সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের সাদৃশ্য থাকলেও কাম-মহিমাজ্ঞাপক সংস্কৃত কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তৃতীয়ত, সংস্কৃত কবিরা আত্মার যে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তার সঙ্গেও মোহিতলালের সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট নয়। যাই হোক, এ আলোচনা এই পর্যন্ত।

অতঃপর মোহিতলালের ভোগবাদমূলক কবিতাগুলি পাঠ ক'রে তাঁকে ভোগবাদী চার্বাক, সুখবাদী অ্যারিষ্টিপ্পাস বা এপিকুরস কিংবা লুক্রেসিয়াস্ বলা সমীচীন হবে কিনা কিংবা এঁদের অনুবর্তী দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর সামীপ্য কতখানি তা এই প্রসঙ্গে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। সর্বোপরি দার্শনিক কবি ওমর খৈয়ামের জীবনদর্শনের সঙ্গে কবির সাদৃশ্য কিরূপ তাও নির্ণীত হওয়া দরকার।

প্রথমত চার্বাক[২৮] বা চার্বাক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আলোচনা করা হচ্ছে। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক বা চার্বাক-সম্প্রদায় জড়বাদী। তাঁরা আত্মায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের নিকট দেহই আত্মা। তাঁদের মতে দেহ-মধ্যে যে-চেতনা, তা দেহেরই গুণমাত্র। জড়প্রকৃতি থেকে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি—স্রষ্টা বলে কোনো বিশ্ববিধাতা নেই। তাঁরা বলেন—

"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ।
কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।
মরণমেবাপবর্গঃ।"

(চাবাকসূত্র : অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি)

অর্থাৎ মানুষ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্র, কামই একমাত্র পুরুষার্থ এবং মরণই মোক্ষ।[২৯] চার্বাক বা চার্বাকপন্থী আরও বলেন—

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"

অর্থাৎ সুখই জীবের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেহ একবার ভস্মীভূত হলে আর আসে না।[৩০] চার্বাক মতের কোনো তত্ত্বগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। একখানি বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাগ্রন্থে চার্বাকের আরও কয়েকটি উক্তির যে পরিচয় আছে তা কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

"It is true that pleasure is never pure, never free from pain and there is sorrow everywhere—in King's palace and in beggar's huts. Still this world of us is not full of misery. The amount of pleasure in this world is greater than that of pain.……We should not forgo the chances of pleasure for fear of pain, that may be found with it. Shall we not take fish because there are bones and scales? Should we refrain from plucking lotuses as there are thorns in them? Should we give up rice because of its husk? We should boldly face this as it is, rejoice at the weal of our dear ones and weep at their woes.…… The heart of a man who has none to call his own is full of misery and dry as a desert.[৩১]

চার্বাক বা তাঁর মতাবলম্বীগণ আরও বলেন যে পিপাসার যন্ত্রণা যত বৃদ্ধি পায়, শীতল বারিপানে তত আনন্দ পাওয়া যায়। এইজন্য দীর্ঘ-বিচ্ছেদের পরে মিলিত হলে প্রেমিক-প্রেমিকা এত উৎফুল্ল হয়। চিরন্তন সুখ বিরক্তির কারণ। অতিশয় প্রিয় আহার্য বস্তুও প্রতিদিন গ্রহণে বিরক্তি আনে। সুতরাং চিরসুখ-কামনা বাতুলতা। চার্বাক বা চার্বাক-পন্থীদের এই সমস্ত উক্তিগুলির সঙ্গে মোহিতলালের বহু উক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা চলতে পারে। দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সাদৃশ্য দেখানো হচ্ছে।

(ক) 'করাঙ্গুলি ক্ষত হয়, হেরি না যে কাঁটার পাহারা'। (স্পর্শ-রসিক)

(খ) 'আছে কাঁটা? হায়, কাঁটা সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন—
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ!'

(বুদ্ধ)

(গ) 'মিলনে মলিন তাই, তাই তুমি বিরহে প্রেয়সী—'

(নারীস্তোত্র)

(ঘ) "ভালবাসা লভি নাই সেই দুঃখ বড় যদি হয়—
তার চেয়ে অভিশাপ আছে কিছু?"

(শেষ শিক্ষা)

(ঙ) 'ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা'

(বুদ্ধ)

কিংবা দেহকে সম্বোধন ক'রে—

(চ) 'তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা পরিবেশ!—
দেহলীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি
দর্শনে-বিজ্ঞানে।'

(মৃত্যু-শোক)

কবির এই সমস্ত উক্তির সঙ্গে চার্বাকের পূর্বোক্ত অনেক বক্তব্যের সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যই বেশী। তিনি চার্বাকের মতো জড়বাদী নন। আত্মার দেহাতীত সত্তায় তাঁর সংশয়জ্ঞান থাকলেও তিনি আত্মাকে মানেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বেও তাঁর বিশ্বাস আছে। মরণকে তিনি চার্বাকের মতো অপবর্গ বলেন নি। তিনি ভোগবাদের সমর্থক হলেও চার্বাকের মতো আস্ত খাঁটি ভোগবাদী নন। জড় প্রকৃতি থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি একথাও তিনি চার্বাকের মতো কোথাও বলেন নি। তাছাড়া চার্বাকের মতো তিনি মানুষের 'দেহাভিমান'কেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারেন নি। কাজেই দু'জনের মধ্যে মূল ধারণাতেই যখন এত পার্থক্য, তখন জীবনপ্রেমের গভীরতায় দু'জনের মধ্যে বক্তব্যে কয়েকটি উক্তিগত সাদৃশ্যসূত্রে মোহিতলালকে চার্বাক-পন্থী বলা চলে না। কবি নিজেও বলেছেন—"আমি মায়াবাদীও নই, চার্বাকপন্থীও নই,..."[৩২]

আবার চার্বাকের মতের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টিপ্‌পাস্

(খ্রীঃপূঃ ৪৫৫—৩৫৬) এপিক্যুরস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪১—২৭০) এবং তাঁর শিষ্য লুক্রেসিয়াস্ (খ্রীঃ পূঃ ৯৯—৫৫) এর সুখসর্বস্বতা নীতির সাদৃশ্য থাকায় এদের সঙ্গে মোহিতলালের তুলনার কথাও মনে সহজেই উদিত হতে পারে।

অ্যারিষ্টিপ্‌পাস্ ব্যক্তিগত সুখকেই চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন সুখবাদী (hedonist)। তাঁর মতে সমস্ত সুখই এক, কেবল তীব্রতা বা মাত্রার পার্থক্য আছে। দৈহিক সুখ যেহেতু তীব্রতম, সেইজন্য দেহগত আনন্দই অ্যারিষ্টিপ্‌পাসের নিকট সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে বর্তমানের আনন্দকে উপেক্ষা করতে তিনি চান না। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত—

"The past is dead and gone. The future is doubtful. The present is all that we have. Let us make the most of it. 'Let us eat drink and be merry' for tomorrow we may die."[৩৩]

অ্যারিষ্টিপ্‌পাসের এই সমস্ত উক্তির সঙ্গে কবির অনেক বিচ্ছিন্ন উক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(ক) "জীবন—সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু।
আনন্দ-বিহ্বল-বিধি একবার নির্ব্বিচারে করিয়াছে দান,
ওরে ভাগ্যবান!"

(মোহমুদ্গর)

(খ) "এত ছোট বেলা, কত খেলা তবু—কতো রঙ, কত রূপ"!

(দিনশেষে)

(গ) "একটি সে তিথি, তার পর সখি সব শেষ!"

(বিদায়-বাসনা)

অ্যারিষ্টিপ্‌পাসের অন্যান্য বক্তব্য অনেকখানি চার্বাকের অনুরূপ। সেই সমস্তের সঙ্গেও মূলগত ধারণায় মোহিতলালের পার্থক্য থাকায় তাঁকে অ্যারিষ্টিপ্‌পাস্ অনুবর্তী বলাও ঠিক নয়।

এপিক্যুরস্ আত্মার পৃথক অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না এবং দেহকেই তিনি আত্মা বলে জানতেন। চারটি পার্থিব বিভিন্ন বস্তুর অণুসমূহের সংযোগে দেহে আত্মা নামীয় যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়—এ মত তিনি পোষণ করতেন।

"'Pleasure' he said 'is the beginning and end of the blessed life'. The beginning and root of all good is the pleasure of the stomach, even wisdom and culture must be

referred to this. This pleasure of the mind, we are told is the contemplation of the body."[৩৪]

এপিক্যুরস্ সমস্ত প্রকার মানসিক সুখকেও দৈহিক ইন্দ্রিয়জ সুখ বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনি বেদনাবিহীন সুখের উপাসক। ভোগ্যবস্তুকে না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষুধার তীব্রতা বেদনামিশ্রিত—এ তাঁর পূর্ববর্তী সুখবাদী দার্শনিক অ্যারিস্টিপ্পাসের কথায় সক্রিয় (active or dynamic) সুখবাদ—কিন্তু এপিক্যুরস এটি পছন্দ করতেন না। তিনি ক্ষুধার নিবৃত্তিজনিত অবস্থাকেই অবিমিশ্র সুখ এবং এই সুখকেই মানুষের একমাত্র কাম্য বলে মনে করতেন। সুখের অস্তিত্ব অপেক্ষা দুঃখের অভাবের উপর তিনি অধিক গুরুত্ব দিতেন। এই জন্যই ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পরিমিত ভোজনের পক্ষপাতী ছিলেন। মানুষ যাতে বুদ্ধি বা বিবেকহীন না হয়, তার জন্যে তিনি অনেক উপদেশ দিয়েছেন; দেহগত প্রেমেরও তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী—"Sexual intercourse' The philosopher declares 'has never done a man good and he is lucky if it has not harmed him."[৩৫]

এপিক্যুরসের শিষ্য লুক্রেসিয়াস্ অবশ্য দেহগত সম্ভোগকে সমর্থন করেছেন—তবে তাঁর মতে এই ভোগ হবে প্যাশন-বর্জিত। ধর্ম এবং মৃত্যুও এপিক্যুরসের কাছে ভয়াবহ বস্তু। ইনি আবও বলেছেন যে, মর্মান্তিক দেহ-যন্ত্রণা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী, যদি তা দীর্ঘস্থায়ী হয়ও, তাহলে মানসিক শৃঙ্খলার দ্বারা সেই ব্যথাকে জয় করতে হবে।

বলা বাহুল্য দেহ-আত্মা সম্পর্কিত মোহিতলালের ধারণার সঙ্গে এপিক্যুরসের বক্তব্যের আংশিক সাদৃশ্য থাকলেও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নেই। এপিক্যুরসের মতো কবি দেহগত-প্রেমের বিরোধী নন বা ব্যক্তিগত জীবনে পরিমিত ভোজনের পক্ষপাতী নন।[৩৬] লুক্রেসিয়াসের মতো ভাবাবেগ-হীন দেহ সম্ভোগও তাঁর কাম্য নয়। এপিক্যুরসের মতো যদিও 'স্বপনপসারী' কাব্যে তিনি বিরহের বেদনা অপেক্ষা মিলনের অতিরিক্ত আগ্রহে বলেছিলেন—'একে দু'য়ে কাজ নাই, দু'য়ে এক ভালো'—কিন্তু পরবর্তী কাব্যে তিনি 'জ্বালার হরষ' 'পিপাসার তীব্রতা', 'বেদনার হাহারব'কে যখন স্বীকার করেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে এপিক্যুরসের 'স্থির সুখ' (Static pleasure)-এর সাদৃশ্য আছে বলা যায় না। বেদনাবিহীন সুখের জন্যে এপিক্যুরস্ যেরূপ জীবনধারণে সতর্কতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে সচেতন রাখার কথা বলেছেন, তার সঙ্গে কবির বক্তব্যের গুরুতর পার্থক্য। তবে এপিক্যুরসের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর উক্তিগত

সাদৃশ্য এবং মৃত্যু-সম্পর্কিত ধারণায় উভয়ের মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে মোহিতলালকে খাঁটি এপিকুারস্-পন্থী মনে করাও ঠিক নয়।

অ্যারিষ্টিপ্‌পাসের মতবাদ পরবর্তীকালে Mandiville ও Hellectius-এ পরিণতি লাভ করেছে। এঁদের মতে দৈহিক আত্মসুখই শ্রেষ্ঠ এবং 'Private vices are public benefits'.[৩৭] এপিকুারসের সুখবাদের নীতি পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল ও জেরেমি বেন্থামের মধ্যে নতুনভাবে 'হিতবাদ'-এ (Utilitarianism) পরিণতিলাভ করেছে। এই মতবাদে বাহ্যসম্পদের উপাসনায় পার্থিব উন্নতি এবং ভোগতান্ত্রিক জীবনযাপনের নির্দেশ আছে। তবে এতে ব্যক্তিগত সুখকে অধিকাংশ লোকের মঙ্গল চিন্তায় (Greatest good of the greatest number) ব্যাপ্ত ক'রে মাহাত্ম্য-দানের চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য এঁদের কারো সঙ্গেই মোহিতলালের জীবনদর্শনের সামীপ্য নেই। সে যাই হোক, কবিধর্মে তিনি চার্বাক, অ্যারিষ্টিপ্‌পাস্ বা এপিকুারস্-পন্থী না হলেও এঁদের বহু বিচ্ছিন্ন উক্তি বা খণ্ড খণ্ড ভাবে অনেক ধারণার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাই বলে কবির জীবন দর্শনের মূলে ঐ সমস্ত দার্শনিক গভীর-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—এ সত্য আমরা স্বীকার করতে পারি না। ঐ সকল দার্শনিকদের গ্রন্থ তাঁর খুব প্রিয় ছিল—এরূপ প্রমাণও নেই। আমাদের বক্তব্য হল এ সমস্তের মূলে আছে পারস্যের কবি-দার্শনিক ওমর খৈয়ামের প্রভাব। আর এও সত্য যে ঐ সমস্ত গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ প্রাচীনকালেই পারস্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তার ফলেই পারস্যের বহু কবিদের জীবনদর্শনে তাঁদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ওমর খৈয়াম মোহিতলালের খুবই প্রিয় কবি ছিলেন। কাজেই ওমর খৈয়ামের সঙ্গে মোহিতলালের তুলনামূলক আলোচনাকে কিছুতেই পরিহার করা যায় না।

পারস্যের নিশাপুর গ্রামের ওমরখৈয়াম[৩৮] অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ওমর জগৎ-রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে না পেরে হতাশচিত্তে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। কবি হিসেবে সমকালে ওমর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। তিনি তৎকাল-প্রচলিত ধর্মমতকে মানতেন না বলে অনেকের নিকট বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

চার্বাক-মতানুবর্তী, এপিকুারস-পন্থী, জড়বাদী ও দেহাত্মবাদী বলে ওমর খৈয়ামের যে পরিচয় অনেকের জ্ঞাত ছিল, ফরাসী লেখক মশিয়েঁ নিকোলা (Nicholas) তা মেনে নিতে পারেন নি। তিনি দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে

বলেছেন যে সুরা ও সাকীর রূপকের মধ্য দিয়ে ওমর অরূপের সন্ধান করেছেন। এঁর মতে পরবর্তীকালের হাফিজ প্রভৃতি অরূপ সন্ধানী কবিদেরও ওমর ছিলেন আদি গুরু। ইংরেজ কবি ফিট্‌জেরাল্ড কিন্তু মশিয়ে নিকোলার ওমর-সম্পর্কিত মতবাদকে গ্রহণ করেন নি। তিনি তাঁর অনূদিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবের মতের আলোকে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রীক শিক্ষা, সভ্যতা ও গ্রীকদর্শনের প্রভাব ওমরের মনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। লুক্রেসিয়াসের মতো ওমরও যুক্তিহীন অসারধর্ম ও মিথ্যা অনুশীলনের ভণ্ডামি সহ্য করেন নি। যথার্থ সত্যসন্ধানীর মতো তিনি ঐ সমস্ত কপটাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

দীর্ঘকাল ওমরের কবিপরিচয় লোকলোচনের অন্তরালে ছিল। ইংরেজ-কবি ফিট্‌জেরাল্ডের অমর অনুবাদ ওমরকে স্মরণীয় করেছে। উনিশ শতকের এই ইংরেজ কবি, ওমরের রুবাইতগুলির অনুবাদকালে স্বীয় যুগের অতৃপ্তি ও যন্ত্রণার সুরকে হয়তো অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন সে যাই হোক, আজ ফিট্‌জেরাল্ডের চোখেই জগৎ একরূপ ওমরকে দেখতে অভ্যস্ত। মোহিতলালও ফিট্‌জেরাল্ডের আলোকেই ওমরের কাব্যদর্শন উপলব্ধি করেছিলেন। ওমরের এই অনুবাদ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল[৩৯] কবির পিতাও ছিলেন ওমরের ভক্ত। পিতার এই ওমর-প্রীতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিট্‌জেরাল্ড অনূদিত ওমরের জীবনদর্শন তাই নানাভাবে তাঁর কাব্যে লক্ষণীয় হয়েছে।[৪০] তৎসত্ত্বেও আমরা মনে করি, ফিট্‌জেরাল্ডের ওমরকেও শেষ পর্যন্ত কবি অতিক্রম করেছেন। ওমরে যা ছিল অপূর্ণ, মোহিতলালে তা-ই যেন পূর্ণতার পথে অনেকখানি অগ্রসর।

দুই কবির তুলনামূলক আলোচনায় আমরা বলতে পারি যে দু'জনেই সুপণ্ডিত, সুরসিক ও মার্জিতরুচি। নারীর দেহ-বর্ণনায় উভয়েরই সংযম বা শালীনতা শোভনাভিরাম। দু'জনেই বলিষ্ঠ ও বরিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। দু'জনেই প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারকে আক্রমণ করেছেন। যতদিন আছে, পান ক'রে নাও—কারণ একবার গেলে আর ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই; ভোগ ভিন্ন জীবনের সার্থকতা নেই; ভোগও সকলের ভাগ্যে নেই—প্রভৃতি ওমরের উক্তির সঙ্গে 'স্বপনপসারী'র ভোগবাদী কবির সগোত্রতা অতিশয় স্পষ্ট। কিংবা ওমরের:

(ক) "আজ আমি আছি যবে জগৎ-চষকে
প্রাণপণে প্রাণ ভরি' করি সুরাপান।" (পান্থ, ২৭ অক্ষয় বড়াল অনূদিত)

(খ) "ঢাল তবে, ঢাল সুরা, ঢাল হৃদি ভরি'
চরণ মঞ্জীর তব উঠুক গুঞ্জরী।
প্রেয়সীনিচোল কবি হাসি হাসি চাও—
প্রেম হোক্ বিশ্বব্যাপী আপনা বিস্মরি।"

(পান্থ, ৩০ অক্ষয় বড়াল অনূদিত)

(গ) "সত্য শুধু বর্তমান, অসত্য সকলি
সুধু সুধা, সুধাপান সুধু তুমি সৎ"।

(পান্থ, ২৯ ঐ)

(ঘ) "অস্থির গোলকে এই কেহ নহে স্থির
সৃজনের শিরে শিরে বেদনা গভীর।"

(পান্থ, ৪০ ঐ)

প্রভৃতি ওমরের উক্তির সঙ্গে আমাদের পূর্বে উদ্ধৃত বহু উক্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। জীবনের আশাভঙ্গ, নৈরাশ্য ও বেদনা সত্ত্বেও মোহিতলাল এবং ওমর দু'জনের মধ্যেই জীবনপ্রেমের গভীরতা কোথাও মন্দীভূত নয়। দুঃখের মহিমা ওমরের মতো তিনিও অনুভব করেছিলেন।

"হৃদয় দুর্বহ অতি নহি আশাহীন
দুঃখের সোপান বাহি উঠি দিন দিন।'

(পান্থ, ৬৯ ঐ).

ওমরের জীবনপ্রেম ও দেহ-প্রীতির সঙ্গে মিল এই অংশে সহজেই চোখে পড়ে।

"থাক তর্ক, ঢালো সুরা! জীবন পাশায়
প্রতি ক্ষেপে পরাজিত, আশার আশায়
তবু খেলি প্রতিদিন সর্বস্ব হারায়ে।
দেহে নয়, মত্ত আমি দেহের নেশায়।"

(পান্থ, ৬৮ ঐ)

যৌবন-অপগমে মোহিতলালের মতো ওমরের বিষণ্ণতাও কম নয়।

"হে আত্মা এ ভগ্নদেহে কি ভুঞ্জিবে আর ?
এখনো কি আছে আশা সময় তোমার।
যে ফুল শুকায়ে গেছে, সে কি পুন ফুটে—
জগতে বসন্ত কভু আসে শতবার ?"

(পান্থ, ৭০ ঐ)

নশ্বরতার বেদনা ওমর ও মোহিতলাল দু'জনকেই সমভাবে চঞ্চল করেছে।

"There was a Door to which I found no key ;
Here was a Veil past which I could not see ;
Some little talk awhile of Me and Thee
There seemed—and then no more of Thee and Me."
(XXXII. Rubyat of Omar Khayyam. Fitzerald)

ভোগে যে তৃপ্তি নেই, তা যে ক্ষণিকের সে-ভাবনা ওমরেরও কিছু অল্প নয়।

"I think the vessel, that with Fugitive
Articulation answered, once did live,
And merry-make, and the cold Lip I kissed
How many kisses might it take-and give ?"
(XXXV, Rubyat of Omar Khayyam. Fitzerald)

পরলোক সম্পর্কে ওমরের মতো মোহিতলালও সংশয়ান্বিত ছিলেন। তবে ওমরের মতো তিনি কিন্তু অদৃষ্টবাদী নন। অদৃশ্য লেখনী মানুষের ভাগ্যের হিসেব লিখে চলেছে—মানুষের ধর্মজ্ঞান বা চোখের জল সেই লিপি মোছাতে পারে না বলে ওমর মনে করতেন। অপরপক্ষে মোহিতলাল ছিলেন পৌরুষবাদী। মানুষকে স্বভাব-দুর্বল জেনেও তিনি মানুষকে অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়নকরূপে ভাবতে পারেন নি। ধ্রুব ও চিরন্তন রহস্য-উদ্‌ঘাটনে বিফল হয়ে লোকেশ্বরের স্বরূপ-প্রকৃতি অন্বেষণের ব্যাকুলতায় চিত্ত-প্রদাহে কাতর ওমর যে চতুষ্পদীগুলি রচনা ক'রে গেছেন এবং ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদের ভিতর দিয়ে সেগুলিকে আমরা যেভাবে পাচ্ছি, তাতে ওমরের চিত্তের সংশয় ও জীবন-জিজ্ঞাসা স্পষ্টভাবেই লক্ষ্যগোচর। ভোগৈকসর্বস্ব জীবনরসে আত্মনিমজ্জনেও পরিপূর্ণ সুখ বা শান্তি যে পাওয়া যায় না—এ সত্য ওমরের কাব্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে। আর এইখানেই তাঁর চিত্তে দ্বন্দ্ব। ওমর এই দ্বন্দ্ব থেকে কোনোদিনই মুক্তিলাভ করতে পারেন নি। অপর পক্ষে মোহিতলাল ঐ দ্বন্দ্বের মধ্যে পতিত হয়েও দ্বন্দ্বমুক্তির ইঙ্গিত পেয়েছেন। ভারতীয় কবি বলেই কিংবা রক্তগত প্রকৃতিতে তান্ত্রিকতা নিহিত থাকায় হয়তো কবির পক্ষে জ্যোতির্ময় অধ্যাত্মজগতের আলো জীবন-জাহ্নবীর তটে বসে দেখা সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যের ফিট্‌জেরাল্ডের রঙীন চশমায় ওমরের কাব্যে সেই আলোর আভাস পরিস্ফুট হয় নি। সে যাই হোক, ওমরের জীবনদর্শনের সঙ্গে বহুলাংশে মিল থাকলেও মোহিতলালের ভোগবাদ-বিষয়ক ধারণা আরও অনেক জটিল ও চিত্ত-দ্বন্দ্ব-অতিক্রমণের আভাসে আরও

কতকটা চিন্তার দিক দিয়ে পরিণত। এমন ক্রমপরিণতির স্বাক্ষরাঙ্কিত হওয়ার জন্য মোহিতলালকে আমরা আদ্যন্ত খাঁটি ভোগবাদী কবিরূপে আখ্যাত করতে পারি নি। ভোগবাদের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানিয়েও স্বীয় স্বভাবধর্মবশে কবি যে অবিমিশ্র ভোগবাদীদের দলভুক্ত হতে পারলেন না— আমরা সবিস্তারে তা আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে কবির একটি নিজস্ব উক্তি উদ্ধার করলে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলবে।

"কিন্তু আমার উপায় কি? আমি মায়াবাদীও নই, চার্বাকপন্থীও নই,··· অথচ আধুনিক বৃহস্পতি মহামুনি চার্বাকের বিশুদ্ধ কামবুদ্ধির ভোগবাদেও আস্থাস্থাপন করিতে পারিনা। তাহার কারণ, মানুষের দেহাভিমানকেই আমি মানবীয় সত্তার সবটুকু বলিয়া বিশ্বাস করিতে অক্ষম—ভিতর হইতে আর একটা কি খবরদার বলিয়া ওঠে, বাক্য ও তর্কের গোঁজামিল দিয়া তাহাকে থামাইয়া রাখা আমার পক্ষে দুষ্কর।"[৪১]

মোহিতলাল যে মানুষের 'দেহাভিমান'কে 'মানবীয় সত্তার সবটুকু' মনে করেন না, অর্থাৎ তিনি যে ভোগকেই পুরুষার্থ বলে ভাবতে অনিচ্ছুক- উপরের কথাগুলিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। 'চার্বাকের বিশুদ্ধ কামবুদ্ধির ভোগবাদে' আস্থা স্থাপন করতে গেলেই তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে—অর্থাৎ তাঁর ভোগ-ভাবনার দ্বন্দ্বটি প্রবল হয়ে ওঠে—আর তখনই ভোগের অতীতলোকে যাত্রার জন্যে তাঁর মন উতলা হয়। মোহিতলাল জীবনকে গভীরভাবেই ভালবেসেছেন—জগতের প্রতিও তাঁর সুনিবিড় মমত্ব। জীবনের কক্ষে কক্ষে পরিভ্রমণ করতে করতে তিনি শেষ পর্যন্ত জীবনাতীতেরও মৃদু ও অস্ফুট চরণধ্বনি শুনেছেন। ভোগকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যেই তাঁর মন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে নি। অথচ তিনি একথাও বলেন নি যে জীবনাতীতই একমাত্র সত্য— জীবন নিরর্থক। জীবন পথ-পরিক্রমার ভিতর দিয়েই তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভব। তাঁর কাছে তাই আগে জীবন ও পরে জীবনাতীত। এই হিসাবে তাঁকে ভোগবাদী কবির পরিবর্তে জীবনবাদী কবি বলাই অধিকতর সঙ্গত। দেহবাদনির্ভর ভোগবাদমূলক কবিতার পরিচয়শেষে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছে।

সর্বশেষে জার্মান দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ব-সমন্বয় পদ্ধতির আলোকে জীবনবাদী কবির দিকে একবার চেয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করব। হেগেলের দুরূহ-জটিল তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ না ক'রেও বলা যেতে পারে যে যে-কোনো চিন্তাশীল মানুষের যে-কোনো সূক্ষ্ম-গভীর ও স্থায়ী কোনো একটি

চিন্তার মূলে তাঁর দ্বন্দ্ব-সমন্বয় প্রক্রিয়ার সত্যটি নিহিত। আমরা পূর্বে হেগেল-কথিত এই দার্শনিক মতবাদের পরিচয় দিয়েছি (দ্রঃ অধ্যায় দ্বিতীয়)। সেই হিসেবে জীবনবাদী কবির 'স্বপনপসারী' পর্যন্ত ভোগবাদ-অনুভবে কবিচিত্তের সাম্যাবস্থা; এই পর্যন্ত তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে নির্দ্বন্দ্ব। ভোগের আনন্দে এ-পর্যন্ত কবিপ্রাণে প্রসন্নতার সুর। ভোগ সম্পর্কিত কবির এই একদেশীয় জ্ঞান যেন হেগেল-বর্ণিত 'নয়' বা স্থাপনা (Thesis)। 'বিস্মরণী'তে ভোগমহিমা-বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে কবিমনে অতৃপ্তির সূত্রে যে বিরোধের সূচনা ও ক্রম-সান্দ্রীভবন —তা যেন ঐ ভোগেরই বিরোধী-জ্ঞান বা বৈষম্যের অবস্থা। একে হেগেলের ভাষায় 'প্রতিনয়' বা প্রতিস্থাপনা (Antithesis) বলা চলে। আর 'স্মরগরল'এ সর্বত্র না হলেও মাঝে মাঝে ঐ ভোগসীমা অতিক্রম ক'রে অধ্যাত্ম-রাজ্যের আলোকাভাসে কবিহৃদয়ে পুনরায় যে নির্দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের অবস্থা—তাতে ঐ দুই পরস্পর-বিরোধী জ্ঞানের সামঞ্জস্য, সমন্বয় বা সংস্থাপনা (Synthesis)। কবির কাব্যে যে কয়েকটি মূল প্রবণতাকে আমরা পূর্বে অনুসরণ করেছি, তার অধিকাংশই ঠিক এই পথেই সামঞ্জস্য খুঁজেছে। অবশ্য একটি নূতনতর ভাবনা—জাতির আত্মহননের দুশ্চিন্তা চিত্তে সমুদিত হয়ে তাঁকে ঐ সমন্বয়-রাজ্যের দ্বারদেশ থেকেও যে চিরনির্বাসিত করেছে—তা বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি। মোহিতলালের কাব্যসাধনা খণ্ডিত। তাঁর কাব্যে সমন্বয়ের ইঙ্গিতমাত্রই আছে—তার পূর্ণ পরিচয় নেই। বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক মিডলটন মারি বলেছেন—"The pure poet is not a mystic ; Contemplation of the mystry is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creater."[৪২] অন্তরের গভীরে অদ্বয়-সত্যোপলব্ধির ফলে মিস্টিকের চিত্ত যেরূপ সর্বদ্বন্দ্বমুক্ত হয়—তেমন মনোভাব কবিদের নিকট আশা করা অন্যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা বলব মোহিতলালের ভোগবাদবিষয়ক চিন্তার বিবর্তন-পথটি সহজ ও সুচিহ্নিত নয়। কবির ব্যক্তিগত অভিমান, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের ভারে একইকালে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী ভাবনার উদয়, কবিমনের দ্বিধা—প্রভৃতি তাঁর চিন্তাপথ-যাত্রায় অন্তরায় হয়ে আছে। সকল অন্তরায়ের অন্তরালেও আমাদের এই সাবধানী বিশ্লেষণে যথার্থ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিনা সুধীজন বিচার করবেন।

উল্লেখপঞ্জী

১ মোহিতলাল সম্পর্কে এই বিশেষণটি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের। তিনি লিখেছেন, "এক কথায় তিনি (মোহিতলাল) ছিলেন আধুনিকোত্তম।" 'কল্লোল যুগ' (২য় সংস্করণ, পৃঃ ১১)

২ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' গ্রন্থের 'মোহিতলালের কবিমানস' প্রবন্ধ ও ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'কবিতার বিচিত্রকথা' পৃঃ ৩৪১ দ্রষ্টব্য।

৩ 'স্মরগরল' কাব্যের ভূমিকা—মোহিতলাল মজুমদার।

৪ 'স্মরগরল'-এর ভূমিকায় এ সম্পর্কে মোহিতলালপ্রদত্ত ইঙ্গিতকে ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অনেকখানি বিশদ করেছেন তাঁর 'কবি মোহিতলাল' প্রবন্ধে (শনিবারের চিঠি, ১৩৫৯ ভাদ্র)।

৫ মোহিতলাল তাঁর 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (১ম সং ১৩৫৮ আষাঢ়) গ্রন্থের 'মনমর্ম্মর' অংশে 'জীবনধর্ম্মের' কথায় লিখেছেন—'এই কামই প্রেমের জন্মদাতা! কিন্তু শুধুই আকাঙ্ক্ষা নয়—ওই প্রবৃত্তির বেগ, ওই লুটিবার শক্তি চাই : কামনার সঙ্গে খুব বড় কল্পনার যোগ চাই—নহিলে, শক্তিহীন কামনার মত অভিশাপ আর কি আছে?' পৃঃ ২৩৮

৬ 'জীবন-জিজ্ঞাসা' (জীবনধর্ম্ম) পৃঃ ২৩৮

৭ 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'জীবনকাব্য' অংশের 'ব্যর্থ জীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯৫

৮ 'অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি' (১ম সং পৃঃ ১৯৭) গ্রন্থের লেখক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 'কাম' শব্দটি বিভিন্ন যুগে কি কি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

৯ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—বিভূতিযোগ—শ্লোক ২৮

১০ তন্ত্রশাস্ত্রের একটি প্রধান কথা। 'তন্ত্রের আলো' (১ম সং) গ্রন্থের লেখক মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং 'তন্ত্র পরিচয়' (১ম সং)-এর লেখক সুখময় শাস্ত্রী তাঁদের গ্রন্থে শ্লোকটি বহুবার প্রয়োগ করেছেন। 'বাংলার নবযুগ' (১৮৭৯ শকাব্দ, পৃঃ ৫৬) গ্রন্থে মোহিতলালও শ্লোকটি উদ্ধৃত ক'রে তন্ত্রের আলোকে তাঁর বক্তব্যকে বিশদ করেছেন।

১১ তন্ত্রের দু'খানি গ্রন্থ মোহিতলালের খুব প্রিয় ছিল। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষের সাধুসঙ্গ' এবং আর্থার অ্যাভালন সাহেব সম্পাদিত 'The Serpent Power'। 'বিস্মরণীর' কালে এই শেষোক্ত গ্রন্থটি তিনি যে খুব বেশী পড়তেন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দির মুখে। তাছাড়া 'বিস্মরণী'র অনেকগুলি কবিতাতেও সে প্রমাণ আছে। মোহিতলাল নিজেও একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিরূপ অভিভূত হয়েছিলেন সে কথা উল্লেখ করেছেন 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অন্তরের কথা' গ্রন্থটির সম্পাদনাকালে তার 'পাঠসঙ্গিনী টীকা' লেখবার সময় কুণ্ডলিনী শক্তিকে বোঝাতে গিয়ে তিনি প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—পৃঃ ২৭১-৭২। আবার 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে মোহিতলাল আর্থার অ্যাভালন সাহেবের সম্পাদিত 'The Serpent Power' থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। 'বাংলার নবযুগ'-এ তন্ত্রতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"তথাপি ইহার যে সত্য, তাহাও সনাতন, তাহার প্রমাণ ইহার বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি যেমনই হোক,—ইহার ঐ তত্ত্ব আজিকার মানবধর্ম্মবাদের মধ্যেও উঁকি দিতেছে; কেবল সাধনার পদ্ধতিটাই আধুনিক জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। জীবনের কিছুকেই বর্জ্জন নয়, গ্রহণ করিবার যে আকূতি—এই দেহটা যে কোন অর্থেই অশুচি নয়, ভোগের

অধিকার যে একটা বড় অধিকার, মানুষের প্রাণের সেই নূতন অনুভূতি, ইহাতে শুধুই অনুমোদন নয়, একটা বড় তত্ত্বের আশ্রয় পাইতেছে।" অ্যাভালন সাহেবের গ্রন্থ থেকে যে উক্তিটি কবি 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন, আমরা মিলিয়ে দেখেছি, তা ঐ গ্রন্থের 'Theoretical basis of Yoga' এই অধ্যায়ের ২৯১-৯২ পৃঃ আছে। গ্রন্থটির নাম—'The Serpent Power, being the Sat-chakra Nirupana and Paduka Panchaka :—Translated from the Sanskrit with introduction and Commentary by Arthur Avalon.

১২ এই তন্ত্রতত্ত্বের পরিচয় 'বাংলার নবযুগ' গ্রন্থে মোহিতলাল আধুনিক যুগোপযোগী ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। ১১ নং এ দ্রষ্টব্য।

১৩ 'জীবন-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'জীবনকাব্যের' অন্তর্গত 'ব্যর্থজীবন' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯৫

১৪ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় মোহিতলালের লেখা—'গী স্থ মোপাসাঁ'—'প্রবন্ধ'।

১৫ মোহিতলাল গদ্য ও কবিতায় বহুস্থলেই সোপেনহাওয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। 'বিস্মরণী'র 'পান্থ' কবিতাটি তো দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহাওয়ারের উদ্দেশে লিখিত। 'জীবন-জিজ্ঞাসা'র 'কবিতা ও বৈরাগ্য' প্রবন্ধে সোপেনহাওয়ারের প্রসঙ্গ আছে—পৃঃ ৩০। এছাড়া 'বিদেশী প্রবন্ধসঞ্চয়ন' নামক স্বীয় গ্রন্থে তিনি সোপেনহাওয়ারের ইংরেজি অনূদিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ করেছেন। এই প্রবন্ধ দুটি—'গ্রন্থরচনা ও রচনারীতি' এবং 'প্রেমের গূঢ়তত্ত্ব'। লেখিকা Rudolf Dircks-এর Essays of Schopenhauer নামক ইংরেজি অনূদিত গ্রন্থ থেকে কবি কর্তৃক বাঙলা ভাষায় অনুবাদিত।

১৬ 'রামেন্দ্র রচনাবলীর (সাহিত্যপরিষৎ সং) অন্তর্গত 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'সুখ না দুঃখ প্রবন্ধ পৃঃ ১৫৩।

১৭ Bertrand Russell-এর 'History of Western Philosophy' গ্রন্থের (6th impression 1960) Schopenhauer-এর আলোচনায় রাসেলের উদ্ধৃত মন্তব্য পৃঃ ৭৮৩-৮৪

১৮ 'অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলী'তে (মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত ১ম সং) ভূমিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উদ্ধৃত মন্তব্য।

১৯ ১৩২৯ বঙ্গবাণী' ভাদ্র সংখ্যার লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেহতত্ত্ব' প্রবন্ধ।

২০ মনোযোগ সহকারে মোহিতলালের ঐ সমস্ত গ্রন্থ-পাঠের কথা মথুরেন্দ্রনাথ নান্দ ও অধ্যাপক তারাচরণ বসুর মুখে শুনেছি।

২১ মোহিতলালের স্বরচিত 'দুঃখের স্বরূপ' প্রবন্ধ—'শনিবারের চিঠি' ১৩৩৪ চৈত্র।

২২ 'প্রবাসী' (পুস্তক সমালোচনা) ১৩৩৪ আষাঢ়—ডঃ সুশীলকুমার দে।

২৩ 'জীবন-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'অতিপুরাতন কথা' প্রবন্ধ।

২৪ 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'অভয়ের কথা' গ্রন্থ-সমালোচনা।

২৫ 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' 'বঙ্গদর্শন' অষ্টম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৫৪।

২৬ মোহিতলাল তাঁর 'বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থের 'বাঙালীর মাতৃপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"ওই পত্নীরূপা নারীও প্রচ্ছন্ন মাতৃরূপা—প্রকৃতি একাধারে শাসয়িত্রী ও পালয়িত্রী এবং শেষ পর্যন্ত তাহার মাতৃমূর্ত্তিই যেন মূলা প্রকৃতি মূর্ত্তি। এ রহস্য সত্যই দুরবগাহ, তন্ত্রশাস্ত্রে

ইহার ব্যাখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। তথাপি পত্নীর মধ্যেও যে সেই মা লুকাইয়া আছেন এবং যাহাকে দাম্পত্যপ্রেম বলে তাহাতে পুরুষের প্রতি নারীর এক অপূর্ব্ব স্নেহ যে উছলিয়া ওঠে ইহা সত্য। এমন ঘটনা আর কোথাও না হোক,—আমাদের বাঙালীজীবনে নিত্যই লক্ষ্য করা যায়। সেখানে নারীর প্রেম যেন এরূপ স্নেহেরই নামান্তর মাত্র।" —পৃঃ ১৮০

২৭ 'Treatment of Love in Sanskrit Literature' (1st Edition, P. 36)—By Dr. Sushil Kumar De.

২৮ 'চার্বাক' শব্দের উৎপত্তি রহস্যাবৃত। কেহ কেহ বলেন যে প্রাচীনকালে চার্বাক নামে জনৈক ঋষি ছিলেন, তিনি জড়বাদের প্রতিষ্ঠা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে চর্বণ অর্থে চর্ব ধাতু হইতে চার্বাক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জড়বাদীরা খাদ্য ও পেয় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া তাহাদিগকে চার্বাক বলা হয়, অথবা তাহাদের কথাগুলি বড় সুন্দর ও মনোহর। (চারু বাক্) বলিয়া তাহাদিগকে চার্বাক নাম দেওয়া হইয়াছে।" (ভারতীয় ও পাশ্চাত্যদর্শন। কঃ বিশ্ববিদ্যালয়-সং ১৯১৯)—সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২০-২১

২৯ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থের মোহিতলালকৃত পাঠসঙ্গিনীটীকা —পৃঃ ২৩৮

৩০ 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা,'—ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য। পৃঃ ১৯৬

৩১ 'History of Philosophy': Eastern and Western, Vol 1, Editorial Board; Chairman Sarvapalli Radhakrishnan, page 136—137.

৩২ 'জীবন-জিজ্ঞাসা'—'অতিপুরাতন কথা' প্রবন্ধ—মোহিতলাল মজুমদার।

৩৩ 'Principles of Ethics' (Seventeenth Edition) chap XI,—By P. B. Chatterjee. Page 151.

৩৪ 'History of Western Philosophy' (6th impressin)—Page 266 chap XXVII. B. Russell.

৩৫ Do. Do. Do. Page 268.

৩৬ কবির বিশিষ্ট আত্মীয় শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত এবং বন্ধুদের মুখে শুনেছি তিনি অত্যন্ত ভোজনরসিক ব্যক্তি ছিলেন।

৩৭ 'Principles of Ethics' (Seventeenth Edition)—By P. B. Chatterjee. Page 155

৩৮ E. G. Browne তাঁর 'Literary History of Persia' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৬ পৃষ্ঠায় ওমরের যে ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়েছেন—তারই আলোকে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় (vol 16, Page 785) লিখিত আছে—

Omar Khayyam (Ghiyathuddin Abulfath 'Omar Ibu Ibrahim Al—Khayyam) the great Persian, mathematician, astronomer, free thinker and epigramatist, who derived the epithet Khayyam (the tent-maker) most likely from his father's trade, was born in or near Nishapur, where he is said to have died in A. H. 517. (A. D. 1123)

৩৯ মোহিতলাল তাঁর 'সাহিত্যকথা' নামক গ্রন্থের (২য় সং) 'রস ও রূপ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"অনুবাদ করিতে হইলে ফিট্‌জিরাল্ডের ইংরেজি হইতেই করিতে হইবে, যিনি তাহা করিবেন না, তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু রচনায় রসসঞ্চার করিতে পারিবেন না" পৃঃ ১০। মোহিতলাল যে ফিট্‌জিরাল্ডের চোখেই ওমরকে দেখেছিলেন এই প্রবন্ধে তারও প্রমাণ আছে।

৪০ কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ওমরের রোবাইতগুলির যে বঙ্গানুবাদ করেন, অল্প বয়সে মোহিতলালের সেগুলি খুবই প্রিয় ছিল। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'মানসী'তে 'জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম' এর সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেন তাতে ওমরের রোবাইতগুলির যে সমস্ত উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির সমস্তই অক্ষয়কুমার বড়াল কৃত অনুবাদ। এই জন্যই আমরা বড়াল-কবির অনেকগুলি অনুবাদের আলোকে ওমরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

৪১ 'জীবন-জিজ্ঞাসা'—গ্রন্থের অন্তর্গত 'অতি পুরাতন কথা' প্রবন্ধ, পৃঃ ১৩৫

৪২ 'Keats and Shakespeare' (6th impression 1951) Page 92, chap VII—by Middleton Murry.

চতুর্থ অধ্যায়

অনূদিত কাব্যবিচারণা

অনুবাদ কবিতার অজস্রতায় লোককান্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। মোহিতলালের অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা সত্যেন্দ্রনাথের মতো অসংখ্য নয়। তাঁর মৌলিক কবিতাগুলি কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট হলেও সংখ্যায় অল্প। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক উভয় শ্রেণীর কবিতার তুলনা করলে কিন্তু অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা নিতান্ত অল্প মনে হয় না। মোহিতলালের এ-শ্রেণীর কবিতা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনালোচিত।[১] তাঁর কবিমানসকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে গেলে অনুবাদ-কাব্যেরও বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এইজন্য এই পৃথক অধ্যায়ে অনুবাদ-কবিতাবলীর বিচার-বিশ্লষণে করা হল।

মোহিতলালের পূর্বে ও সমকালে সাহিত্যের এই বিভাগটির অনুশীলন-ধারা অব্যাহত ছিল।[২] দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, বলদেব পালিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিভাগে বেশ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন মোহিতলালের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি।[৩] সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য ও বিচিত্র অনুবাদ-কবিতার অন্তরালে তিনি একটি মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। সে উদ্দেশ্য হল—মাতৃভাষাকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করার এক দুর্দমনীয় বাসনা। আমাদের বিশ্বাস, এ-শ্রেণীর কবিতা রচনায় প্রাথমিক প্রেরণাটুকু তিনি প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের নিকট পেয়ে থাকলেও শক্তিবৈভবে এবং সৃষ্টিসাফল্যে তাঁর কৃতিত্ব অনেক বেশী। বাঙলা সাহিত্যের এই বিভাগটির পুষ্টিসাধনে তাঁর উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় গূঢ়তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। সেইজন্যে তাঁর এ-প্রকার কাব্যানুশীলন-প্রয়াস সাহিত্যে চিরাগত একটি ধারার অনুবর্তনমাত্রই নয়।

অনুবাদ-কবিতা রচনায় প্রারম্ভিক প্রেরণার জন্যে মোহিতলাল হয়তো সত্যেন্দ্রনাথের নিকটই ঋণী। কিন্তু এ প্রেরণা একটি বিশেষ লগ্নে কবিমনে দোলা সৃষ্টি করেই নিরস্ত হয় নি, তাঁর কবিচেতনার মর্মমূলেও নাড়া দিয়েছিল। তাই দীর্ঘ কাব্যানুশীলনের কালে অনুবাদ-সাধনাকেও তিনি অতিশয় পবিত্র এক কবিকর্মরূপে মনে করেছিলেন। ১৩২১-২২ বঙ্গাব্দে কুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত 'বীরভূমি' পত্রিকায় সর্বপ্রথম তাঁর মোপাসাঁ-রচিত দু'য়েকটি গল্পের অনুবাদ বের হয়।[৪] অতঃপর ১৩২৬ সালের 'ভারতীর' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ওয়াল্টার

ল্যাভেজ ল্যাণ্ডরের একটি সুদীর্ঘ গাথা কবিতার তিনি অনুবাদ করেন।[৫] এই সালের মাঘ মাসের 'ভারতী'তে ভিক্টর হুগোর অনুসরণে 'স্বপনপসারী'র অন্তর্গত 'উচ্চৈঃশ্রবা' কবিতাটি বের হয়। ১৩২৬ থেকে ১৩৩৪ সালের মধ্যে আরও যে সমস্ত কবিতার তিনি অনুবাদ করেন, মোটামুটি তাদের একটি তালিকা দেওয়া গেল।

'হাফিজের অনুসরণে' (১৩২৮, ভারতী, পৌষ) ও 'গজলগান' (১৩২৮, ভারতী, অগ্রহায়ণ) কবিতা এবং 'প্রেমাঞ্জলি' (১৩২৯, ভারতী বৈশাখ) ও 'ফারসী ফরাস্' (১৩২৯, ভারতী আশ্বিন) নামে একগুচ্ছ ফারসী কবিতার ইংরেজি গদ্যানুবাদের তিনি কবিতায় বঙ্গানুবাদ করেন। এছাড়া ইংরেজ কবি আর্থার ও স্যাগ্‌নেসির বিখ্যাত 'ওড্'এর অনুবাদ কবিগাথা', (১৩২৯, প্রবাসী পৌষ) সুফী-কবিতা 'শরাবখানা', (১৩৩০, ভারতী চৈত্র) সুইনবার্নের অনুসরণে 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি',[৬] (১৩৩১ প্রবাসী অগ্রহায়ণ) টেনিসনের সামার-নাইটের অনুকরণে 'নিশীথরাতে', (১৩৩১ প্রবাসী পৌষ) সুইনবার্নের আরও একটি কবিতার ছায়ায় 'বাণীবৈজয়ন্তী',[৭] (১৩৩২ প্রবাসী শ্রাবণ) মার্কিন কবি জর্জ সিল্‌ভিস্টারের অনুসরণে তিনটি কবিতা--'প্রেতপুরী', (১৩৩২ কল্লোল অগ্রহায়ণ) 'নাগার্জ্জুন' (১৩৩২ কালিকলম বৈশাখ) 'তীর্থপথিক', (১৩৩৩ উত্তরা বৈশাখ), ইংরেজ কবি ডে-লা মেয়ারের তিনটি কবিতার অনুসরণে 'জাগো', 'ঘুম-ভাঙানি' ও নিদালি'[৮]—প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায় মোহিতলালের অনুবাদ-কবিতা রচনার আগ্রহ তাঁর কবিপ্রতিভা বিকাশের কাল থেকেই জন্মলাভ করেছিল। 'বিস্মরণীর' পর 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত গোধূলির কালে যখন তাঁর কাব্যপ্রবাহ মন্থর, তখন এ-শ্রেণীর কবিতাও বিরল।

কাব্যজগৎ থেকে একরূপ বিদায় নেওয়ার পর, যখন তিনি 'বঙ্গদর্শন' ও পরে 'বঙ্গভারতীর' সম্পাদক, তখন বহু বিদেশী গল্প ও প্রবন্ধের তিনি ইংরেজি অনুবাদ থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করলেও এ-কালে কাব্যানুবাদ একরূপ দুর্লভ। সমালোচক-অধ্যাপক হরনাথ পাল মোহিতলালের অনুবাদ কবিতা-গুলির রচনার পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান হলেও তথ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ নয় তিনি লিখেছেন—

"সাম্প্রতিককালে কবিতার নামে বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে প্রকৃষ্টপ্রকার জঞ্জালই যেন স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মোহিতলালের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। ......অথচ নূতন করিয়া কবিতা রচনায় ব্রতী হওয়ার সাহস কবির নাই—

মৌলিক সৃষ্টিধর্মী কবিশক্তি তখন অপচিত। তথাপি এই দুর্গতির হাত হইতে কাব্যলক্ষ্মীকে মুক্ত না করিয়াও তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। মনের এমনই এক বিচলিত-বিমূঢ় অবস্থায় তিনি স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন— তাঁহাকে পুনরায় বিদেশী শ্রেষ্ঠ কবিতার অনুবাদ করিতে হইবে। সেইকালে তাঁহারই সম্পাদনায় 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়,·· প্রখ্যাতনামা বিদেশী কবিদের অতিশয় সার্থক কবিতার অনুবাদ দিয়াই তিনি উহার পাঠক-পাঠিকার কাব্যরস-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করেন।"[৯]

সমালোচকের উপর্যুক্ত মন্তব্যে প্রথমত, মোহিতলালের মৌলিক কবিতা রচনার কালে অনূদিত কবিতা রচনার কারণ বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টা নেই। দ্বিতীয়ত ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের 'শ্রাবণ' মাস থেকে কবি যে পত্রিকাখানি সম্পাদনা করেন, তার নাম 'বঙ্গদর্শন'। প্রথম সংখ্যার 'পত্রসূচনা' অংশের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর 'বঙ্গদর্শন'কে 'দ্বিতীয় নবপর্য্যায়ের প্রথম সংখ্যা' নামে অভিহিত ক'রে প্রথম নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন'এর সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করেছেন। তৃতীয়ত 'বঙ্গদর্শন'এ 'বিদেশী কবিদের অতিশয় সার্থক কবিতার অনুবাদ দিয়াই মোহিতলাল 'পাঠক-পাঠিকার কাব্যরসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে মনস্থ করেন'—সমালোচকের এই মন্তব্যও যথার্থ নয়। কারণ এই পত্রিকায় বিদেশী গল্প ও প্রবন্ধ যে পরিমাণে অনূদিত হয়েছে, তুলনায় কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত কম। 'বঙ্গদর্শন'এর অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্যটি সাধারণভাবে সত্য হলেও কাব্যানুবাদ সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। চতুর্থত অনুবাদকাব্য রচনার কালে তাঁর 'সৃষ্টি শক্তিও অপচিত' নয়। আর সর্বশেষে বলা যায় যে তিনি 'প্রখ্যাত বিদেশী কবিদের' কবিতাও সব সময়ে অনুবাদ করেন নি। আমাদের ধারণা, কবির অনুবাদ কবিতাগুলির সৃষ্টির মূল আরও গভীরে। প্রথমেই এ-বিষয়ে কবির নিজের কথা শোনা দরকার।

"এগুলির (বিদেশী কবিতাসমূহ) অধিকাংশ বহুপূর্ব্বে রচিত ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার এরূপ অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প নয় ; ইচ্ছা ছিল, সবগুলিকে একখানি পৃথক পুস্তকে সংগ্রহ করি। নানা-কারণে তাহা এ পর্য্যন্ত সম্ভব না হওয়ায় এবং বর্তমানে কাগজ অত্যন্ত দুর্মূল্য হওয়ায়, আমি নিজের ও পরের কবিতা একই মলাটে একই বাঁধনে বাঁধিয়া দিলাম। অনুবাদগুলির চয়নে লোভ দমন করিতে হইয়াছে, অর্থাৎ অনেক বাদ দিয়াছি। বলাবাহুল্য যে কবিতাগুলি ইংরেজি নয়, সেগুলিরও অনুবাদ ইংরেজিরই মারফতে।"[১০]

১৩৪৮ সালে 'হেমন্ত-গোধূলি'র ভূমিকায় কবির এই উক্তিতে আমরা দেখছি যে তাঁর অধিকাংশ অনুবাদ-কবিতা 'বহুপূর্ব্বে' অর্থাৎ তাঁর মৌলিক কবিতাগুলি রচনার কালেই লিখিত এবং ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত তাঁর এ-শ্রেণীর কবিতার সংখ্যাও একখানি পৃথক গ্রন্থের দাবি করতে পারে। কবির এই স্বীকৃতিতে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের অনেকখানি সমর্থন পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন, অনুবাদ-কবিতা রচনায় তাঁর অতি আগ্রহের গূঢ়তর তাৎপর্য কি? কবির বিভিন্ন বয়সের অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন হেতু নির্ণয় করেছি। 'বিকাশ পর্বের' 'স্বপনপসারী'র কালে এ-শ্রেণীর কবিতা লেখার আগ্রহের মূলে কবির ব্যক্তিস্বার্থের প্ররোচনাই লক্ষ্য করেছি। কবিতার ভাষা ও ছন্দ তথা আঙ্গিকের দিকে তাঁর দৃষ্টি বরাবর সদাজাগ্রত ছিল। কবিপ্রতিভাকে রহস্যময় ও দৈবীশক্তিরূপে বিশ্বাস করলেও স্বীকার করতেই হবে যে অনুশীলন ও সাধনার মধ্য দিয়েই তার যথার্থ বিকাশশীল পরিণতি। এই বিশ্বাসের অনুবর্তী মোহিতলাল স্বীয় দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্যই অনুবাদ-কবিতা সৃষ্টিতে প্রথম আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কারণ দেশী বা বিদেশী ভিন্নভাষী কোনো মহৎ কবির কবিতা অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদক কবিকে অতিশয় সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। মূল কাব্যের কবিতার ভাববস্তুই নয়, তার প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অনুচ্ছেদ, মিলবন্ধন অথবা মিল বৈচিত্র্য—প্রভৃতি ধীরভাবে লক্ষ্য করতে হয়। প্রতিভা-স্ফুরণের প্রাথমিক পর্বে কবিদের এই কাজ অতিশয় স্বাভাবিক। আর এই কারণেই কবির এ-কালের অনুবাদ কবিতা রচনার পশ্চাতে ব্যক্তিস্বার্থের বিষয় উল্লেখ করেছি। ভাষা, ছন্দ, স্টাইল, অলংকার, চিত্রকল্পনা—ইত্যাদিতে বাঙলা কাব্যে মোহিতলাল যে বৈশিষ্টতা লাভ করেছেন, তার মূলে এ-কালের অনুবাদ কবিতাগুলির অবদান উপেক্ষণীয় নয়।

কিন্তু 'সমৃদ্ধিপর্বে'র কাব যখন আত্মশক্তিতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন অর্থাৎ 'বিস্মরণী' ও কতকটা 'স্মরগরল'এর কালে তাঁর অনুবাদ কবিতা লেখার আগ্রহ সম্পর্কে কি বলা চলে? আমাদের ধারণা, এইকালে তিনি নিজ জীবনদর্শন অথবা নিজ ভাব চিন্তার সঙ্গে দেশী বা বিদেশী যে কোনো কবির কাব্যে উপাদানগত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্যও লক্ষ্য করেছেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাব্যের উপাদান কোনো দেশের কবিবিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কিন্তু সেই উপাদানগুলিকে দেখবার ও দেখাবার কৃতিত্বের ওপরই কবির মৌলিকতা। বাস্তবজীবন-রসপিপাসা, ভোগকামনা, স্বপ্নাবিষ্টতা, মৃত্যুভাবনা, নিখুঁত-সুন্দর

চিত্রকল্পনা, কাব্যকে নাট্যগুণোপেত করার অভীপ্সা, সনেটের কঠিন নাগপাশে রোমান্টিক মনোবৃত্তির বন্ধনমাধুর্য—প্রভৃতির যে কোনো একটি বা একাধিক নিজস্ব লক্ষণ ভিন্নভাষী কোনো কবির মধ্যে যখনই তিনি লক্ষ্য করেছেন, তখন তাঁর কবিতা-অনুবাদে তিনি প্রলুব্ধ হয়েছেন। আসল কথা, যাঁদের কাব্যে কবি নিজ প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনেছেন অথবা যাঁদের কাব্য তাঁর বিশিষ্ট কবিমনকে কোনো না কোনো দিক দিয়ে নাড়া দিয়েছে, তাঁরা খ্যাতই হন বা অখ্যাতই হন, তাঁদের কবিতা-অনুবাদে তিনি ভিতর থেকে একটি তাগিদ অনুভব করেছেন। 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'বিদেশী কবিতা' পর্যায়ে 'নমস্কার' কবিতায় তিনি বিদেশী কবিদের যে ভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, তাতে আমাদের এ-অনুমানের যাথার্থ উপলব্ধ হয়। তিনি লিখেছেন -

"যাদের সামগানে জীবন-সোমযাগ
স্রবিয়া সুধারসে সবারে দিল ভাগ ;
যাদের বাণীময়ী দিঠি সে অনাবিলা
প্রচারে দিকে দিকে মধুর নরলীলা
ভরসা দিল প্রাণে—কোথাও নাহি পাপ,
নাহি এ আয়ুমূলে আদিম অভিশাপ,—
অতীত, অনাগত, জীবিত যেথা যত,
সবারে নমি আমি নীরবে অনিবার।"

(নমস্কার)

মোহিতলালের 'স্মরগরল' কাব্যের কবিতাগুলি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ থেকে লিখিত হলেও কাব্যগ্রন্থটি ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৬-৩৭ সালের 'শনিবারের চিঠি'র প্রবন্ধগুলিতে এবং 'স্মরগরল'-এর কিছু কিছু কবিতায় তাঁর দেশ ও জাতিপ্রীতি ফুটে উঠে। অতঃপর ১৩৪৮ সালে 'হেমন্ত-গোধূলির' প্রকাশকাল পর্যন্ত যে-সমস্ত অনুবাদ-কবিতা লিখিত হয়েছে, সেগুলির পশ্চাতে আমাদের পূর্বোক্ত কারণের সঙ্গে দেশ, জাতি ও ভাষা-প্রীতির কারণটিও যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ ভিন্নভাষী কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাদির অনুবাদ-সাহায্যে সেকালের আদর্শভ্রষ্ট জাতির সম্মুখে বিশেষত নীতিভ্রষ্ট[১১] আধুনিক কবিদের সম্মুখে (মোহিতলালের ধারণায়) উৎকৃষ্ট কবিতার আদর্শ স্থাপন করার একটি ইচ্ছা তাঁর জাগ্রত হয়। এই সমস্ত কবিদের প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ তো ছিলই, তার সঙ্গে এই ইচ্ছা—অর্থাৎ এই যুগ্ম-প্রেরণাই এ-কালের অনুবাদ-কবিতাসৃষ্টির হেতু।

'হেমন্ত-গোধূলি'র পর ১৩৫৪-৫৬ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনাকালে তাঁর অনুবাদ-কবিতার সংখ্যা অল্প হলেও গল্প ও প্রবন্ধ অনুবাদের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক কবিতাগুলির সম্পর্কে কি বলা যায়? এগুলি কি অবসিত-শক্তি কবির আত্মাভিমানের শেষ নিষ্ফল প্রয়াস?[১২] কবির একনিষ্ঠ কাব্য-সাধনার সঙ্গে যাঁরা[১৩] আদ্যন্ত সুপরিচিত, তাঁরাই জানেন তাঁর সম্পর্কে এ-রূপ উক্তি কতখানি অশ্রদ্ধেয়। আমাদের ধারণা, সাহিত্যপ্রাণ কবি মোহিতলালের শেষজীবনের অনুবাদ-সাহিত্যের অনুশীলন তাঁর সুদীর্ঘকালের পবিত্র সাহিত্য-সেবারই অঙ্গ। কবি নিজেও একবার বলেছিলেন—"অন্যান্য ভাষায় যে সব উৎকৃষ্ট লেখা আছে, সেগুলোর অনুবাদ, অন্তত সন্ধান দেওয়াও সাহিত্যসেবা।"[১৪]

'হেমন্ত-গোধূলি'তেই কবির কাব্যজীবনের একরূপ অবসান। সমালোচনার জগতে এবং জাতিপ্রেমের উগ্রতায় রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে নেমে শেষ বয়সে তিনি আর্তনাদও করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবিত্ব-শক্তির প্রেরণা যখন অবসিত তখনও কবি অনুবাদ-কবিতা রচনার দ্বারা একদিকে যেমন তাঁর দীর্ঘকালের সাধনায় লব্ধ স্টাইলটিকে বঙ্গবাণীর সেবায় নিয়োজিত করেছেন,[১৫] অন্যদিকে বিদেশী ভাবরাজি আহরণের দ্বারা মাতৃভাষা ও জাতির তিনি সমৃদ্ধিসাধন করেছেন। তাঁর শেষ বয়সের এই কার্যও বিশেষভাবে শ্লাঘনীয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকৃত কবিতার কি ভাষান্তরণ সম্ভব? ভাব ও রূপের হরগৌরী সম্পর্কে উৎকৃষ্ট কবিতায় যে বাণীরূপ জীবন্ত হয়ে ওঠে, তা বিশেষ-ভাষারই একক ও অখণ্ড মূর্তি। তাকে তো পাত্রান্তরিত করা যায় না। কবি নিজে কাব্যের রস-রূপ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন, তাতে এ সত্যের স্বীকৃতি আছে।[১৬] প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আরও অনেক কবি, সমালোচক ও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ সত্য মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুবাদ-সাহিত্যরচনার ইতিবৃত্ত বহু পুরাতন। আর কবিরা যে নানাকারণে সাহিত্যের এই বিশেষ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হন, তা মোহিতলালের প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। মূলের রস অনূদিত কবিতায় সঞ্চারিত করা না গেলেও শক্তিমান কবি মূলের কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভাববস্তু, চিত্রকল্প, অলংকার ও সুরকে যথাসম্ভব ধরবার চেষ্টা করেন এবং স্থল বিশেষে তার জন্মান্তর-প্রাপ্তি কিছু বিচিত্র নয়।[১৭]

অনুবাদ প্রধানত দুই শ্রেণীর—আক্ষরিক (Literal)[১৮] ও ভাবানুবাদ (Free translation)। প্রথম প্রকারে অনুবাদকের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নেই—পদে পদে বাধা ও মূলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য। দ্বিতীয় প্রকারে মূলের

অধীনতা স্বীকার করেও প্রয়োজন মতো স্বাধীনতার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য মোহিতলালের অধিকাংশ কবিতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। এই ভাবানুবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইংরেজ কবি-সমালোচক জন টড্ হাণ্টারের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "The second method (Free translation) is that of free fantasia, in which the sense is rehandled in paraphrase with more or less freedom and metre altered if necessary. It is the only method possible where the grammatical construction and the metrical form of the original are widely different from those of the translator's language, as in the case of translations from the classics into English."[১৮]

সাধারণত অনুবাদ-কবিতার এ-দুটি প্রকারভেদই সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু কবির অনুবাদকর্মের দিকে চাইলে আরও একশ্রেণীর কবিতা নজরে পড়ে। কোনো বিখ্যাত বিদেশী কবিতার পঙ্‌ক্তি বিশেষ বা মূল ভাব অনুবাদক মোহিতলালকে নতুন প্রেরণায় যখন উদ্দীপ্ত করেছে, তখন ক্ষেত্রবিশেষে একরূপ নিজস্ব পথেই আর একটি অভিনব কবিতা তিনি সৃষ্টি করেছেন। এ-জাতীয় কবিতা ঠিক মৌলিকও নয় আবার ঠিক ভাবানুবাদও নয়। অন্য নামের অভাবে এগুলিকে আত্মপ্রবর্তনামূলক অনুবাদ-কবিতা বলা যেতে পারে। কবিতার ভাবানুবাদে অগ্রসর হয়ে মাঝে মাঝে তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে তবে এ-শ্রেণীর কবিতা তিনি বেশী লেখেন নি। ভাবানুবাদের সংখ্যাই তাঁর বেশী এবং এ-বিষয়ক অনুবাদ-কবিতার সার্থকতার উপরই তাঁর কৃতিত্ব মূলত নির্ভরশীল।

মূল কবিতাকে ভাষান্তরিত করলে কতকগুলি পরিবর্তন অনিবার্য। প্রথমত, মূল ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াপদ, ইডিয়ম—প্রভৃতির প্রতিরূপ সব সময় অনুবাদকের ভাষায় পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে মূল ব্যঞ্জনার দিকে একাগ্র হয়ে ভাবানুবাদের আশ্রয় নেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে মূলের ছন্দ, ছন্দোস্পন্দ, অন্ত্যমিল, বাক্যপ্রয়োগের রীতি যদি অনুবাদকের ভাষায় অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়, তাহলে আনুগত্যই বিধেয়, অন্যথায় স্বাধীনতা। দ্বিতীয়ত, মূল কবিতার গভীরে প্রবেশ ক'রে তার মূল ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করার মতো অনুবাদকের সামর্থ্য থাকা দরকার। মূলভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্ট বাক্‌পদ্ধতি সম্বন্ধেও ভিন্নভাষী কবির স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, অনুবাদকের

নিজ মাতৃভাষার ওপরও অসামান্য অধিকার চাই। সর্বোপরি একটি পরিচ্ছন্ন রসবোধ ও স্বচ্ছ-গভীর প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা অনুবাদককে চালিত হতে হবে। এ সকলের সমন্বয় না হলে সার্থক অনুবাদ-কবিতা লেখা দুরূহ। মোহিতলালের পূর্ববর্তী কবি সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতা সম্পর্কে একদা রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তাতে ভাবানুবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিস্ফুট হয়েছে। একখানি গ্রন্থ[১৯] থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

"(ক) মূলের রস কোনমতেই অনুবাদে ঠিকমতো সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে আমার বিশ্বাস, কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবও তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।"[২০]

(খ) "তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি- আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, সৃষ্টিকার্য।"[২১]

বোঝা গেল, সার্থক ভাবানুবাদকে রবীন্দ্রনাথ 'একইকালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য' ও তা আত্মার 'এক দেহ থেকে অন্য দেহে' গমনজনিত 'জন্মান্তরপ্রাপ্তি' এবং 'সৃষ্টিকার্য' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মা' অর্থে এখানে নিশ্চয়ই ভাবব্যঞ্জনা—ইংরেজি spirit শব্দের প্রতিরূপ।

অনুবাদকের দায়িত্ব ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক অনুবাদ বিষয়ে কথাগুলি মনে রেখে এ সম্পর্কে কবির বক্তব্যটুকু স্মরণ করা যেতে পারে। 'হেমন্ত-গোধূলি'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

"আমার কাব্য যেমন মূলের যথাযথ অনুবাদ নয়, তেমনই, ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও, আমি মূলের বাণীচ্ছন্দকে যতদূর সম্ভব বাঙলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনা হিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না; আমার বিশ্বাস সবগুলি সমান না হইলেও, কতকগুলি—অনুবাদ এবং কবিতা, দুই-ই হইয়াছে।"[২২]

কবি-সমালোচক মোহিতলাল অনুবাদ কবিতার আদর্শ সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। তাঁর অনুবাদ যে ভাবানুবাদ ও 'কতকগুলি অনুবাদ এবং কবিতা দুই-ই' তিনি এইরূপ দাবি করেছেন। কবিতাগুলির আলোচনাকালে এ-উক্তির যাথার্থ বিচার করা যাবে।

তাঁর বিদেশী কবিতাগুলির মধ্যে মূল ইংরেজি থেকেই অনুবাদের সংখ্যা

বেশী। আর 'যে কবিতাগুলি ইংরেজী নয়, সেগুলিরও অনুবাদ ইংরেজীরই মারফতে'[২৩] —একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। মূল ইংরেজি কবিতাগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি ভাষা থেকে বাঙলাভাষায় অনূদিত। কিন্তু অন্যগুলি অনুবাদের অনুবাদ। সেইজন্য মূলের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর অনুবাদিত কবিতাগুলিকেও এক হিসেবে দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—(ক) মূলানুবাদ ও (খ) অনুবাদানুবাদ। মোহিতলাল নিজে ইংরেজি বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যদেশের ভাষায় অধিকার না থাকায় তাঁকে অনুবাদানুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে। মূল ফরাসী, জার্মান ও ফারসী ভাষায় অধিকার না থাকলে ঐ সকল ভাষা থেকে অনূদিত কবিতার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া অনুবাদক কবিও যখন ঐ সমস্ত কবিতাবলীর ইংরেজি অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন, তখন মূল ভাষার কথা চিন্তা করা নিরর্থক। সেইজন্যে মূলানুবাদ শ্রেণীর কবিতাগুলি ভাবানুবাদ হিসেবে কতদূর সার্থক, তারই আলোচনা প্রয়োজন। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অনুবাদানুবাদ সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা উচিত।

যে সমস্ত ইংরেজ কবিদের কবিতা কবি কর্তৃক অনূদিত হয়েছে, নিম্নে তাদের একটি তালিকা দেওয়া হল।[২৪]

ক্রিস্টিনা জর্জিনা রসেটি (১৮৩০-১৮৯৪), উইলিয়ম মরিশ (১৮৩৪-১৮৯৬), আলজেরনন্ চার্লস্ সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯), জন কীটস্ (১৭৭৫-১৮২১), আলফ্রেড টেনিসন্ (১৮০৯-১৮৯২), ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর (১৭৭৫-১৮৬৪), রবার্ট বুকানন (১৮৪১-১৯০১), উইলিয়ম বার্নেস (১৮০১-১৮৮৬) কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোর (১৮২৩-১৮৯৬), অ্যানড্রু ল্যাং (১৮৪৪-১৯১২), হেন্‌রি অষ্টিন্ ডবসন (১৮৪০-১৯২৪), আর্থার উইলিয়ম এডগার ও স্যাগনেশি (১৮৪৪-১৮৮১), আর্নেস্ট ডাউসন (১৮৬৭-১৯০০), জোসেফ্ ব্ল্যাংকো হোয়াইট (১৭৭৫-১৮৪১), ওয়াল্টার ডে-লা মেয়ার (১৮৭৩-১৯৫৬) এডওয়ার্ড ডাউডেন (১৮৪৩-১৯১৩), রুপার্ট ব্রুক (১৮৮৭-১৯১৫), জন এডিংটন সাইমণ্ডস্ (১৮৪০-১৯১৩) প্রভৃতি।

এ-তালিকা থেকে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে উনবিংশ শতকের ইংরেজ কবিদের প্রতিই মোহিতলালের বিশেষ প্রীতি ছিল। আরও জানা যায় যে তিনি প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি-গোষ্ঠীদের মধ্যে রসেটি, মরিশ ও সুইনবার্নের ভক্ত ছিলেন। এই সমস্ত কবিদের সৌন্দর্যরস-রসিকতা, বস্তুতন্ত্রতা, পরিচ্ছন্ন বাস্তব চিত্রকল্প, উত্তপ্ত প্যাশন, কবিতার গঠন-পারিপাট্য এবং আন্তরিকতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে কীটস্,

টেনিসন, রুপার্ট ব্রুক ও ওয়াল্টার ডে-লা মেয়ারের কিছু কিছু কবিতার তিনি বঙ্গানুবাদ করেছেন। কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ কবিই ভিক্টোরীয় যুগের সাধারণ বা মধ্যম শ্রেণীর কবি। এঁদের কাব্যের কোনো একটি দিক অথবা এঁদের জীবনাদর্শ তাঁকে মুগ্ধ করে থাকবে। কিন্তু অপ্রধান ইংরেজ কবিদের কাব্যানুবাদের এইটিই কি একমাত্র কারণ? এর পশ্চাতে আর কি কোনো গূঢ়তর কারণ নেই? আমাদের মনে হয়, এর হেতু আরও কিছু। মোহিতলাল বিশ্বাস করতেন, খ্যাতনামা কবিদের কাব্য বা কবিতার খবর রসিক পাঠক ও পাঠিকারা সাধারণত রাখেন বা রাখবেন। কিন্তু যাঁরা স্বল্পকালীন কাব্যসাধনায় অল্প দু'চারটি কবিতা লিখে কিংবা একখানি কাব্যগ্রন্থে একটিমাত্র উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে অসাধারণ মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, খ্যাতিসম্পন্ন কবিদের ভিড়ে, লোকলোচনের অন্তরালে প্রস্ফুটিত সেই সব অরণ্যকুসুমের খবর অনেকেই রাখেন না। এঁদের সেই গৌরবময় দু'একটি কীর্তির সঙ্গে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করিয়ে দিয়ে একদিকে তিনি যেমন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহিত্যসেবীর গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, অন্যদিকে এর অন্তরালে তাঁর কবিচিত্তের অভিমানমথিত দ্বন্দ্ব যে পরিস্ফুট হয় নি—একথা জোর করে বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাব, জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির যুগে তাঁর মতো স্বল্পসংখ্যক কবিতা-রচয়িতাও (রবীন্দ্রনাথের তুলনায়) মৌলিকতায় ও স্বরস্বাতন্ত্র্যে ঐ সমস্ত ইংরেজ কবিদের মতই স্মরণীয়। রসিক জনগণ মোহিতলালের জীবিতকালে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেন নি বলে অভিমানী কবির বড় আক্ষেপ ছিল।[২৫] ঐ সব গৌণ কবির স্বল্পসংখ্যক কীর্তির স্বীকৃতি দিয়ে অভিমানী কবি স্বীয় কীর্তির কথাই বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। বলাবাহুল্য, এঁদের কবিতা-অনুবাদে কোথাও তাঁর নিষ্ঠা বা সতর্কতার অভাব নেই। তথাপি তাঁর এ প্রবৃত্তির মূলে ঐ দ্বন্দ্বের কথাও মনে রাখতে হবে। "রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছাড়া কালের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে আর কেউ পারবেন না।"[২৬]—কবিবন্ধু কালিদাস রায়ের এ-ভাব সম্বলিত কবিতার জবাবে মোহিতলাল যা লেখেন, তাতে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন, "এত বড় অসত্যকে মনে পোষণ করা এবং তাকে সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—কত বড় দুর্ব্বলতা, আত্মপ্রত্যয়হীনতা ও ইন্‌ফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের পরিচয় আছে ঐ কটা লাইনে তা' বুঝতে পারছেন না?...মনে রাখবেন, একটামাত্র রচনার দ্বারাও একজন লেখক অমর হয়ে থাকতে পারে।"[২৭]

খ্যাতিমান কবিদের প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসার কোলাহলমুখর রাজ্যে অপ্রধান কবিদের দু'একটি কবিতায় তিনি যেখানে অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়েছেন (অথবা সমালোচকদের কণ্ঠে তা স্বীকৃত হয়েছে) এবং যার সঙ্গে তিনি নিজেও কোনো না কোনো বিষয়ে আত্মীয়তা-অনুভব করেছেন, মূল ইংরেজি কবিতার প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারেন নি। এর ফল কোনোক্রমেই মন্দ হয় নি। অনুবাদ-হিসেবে তাঁর এ সমস্ত কবিতায় দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ কবিমন সক্রিয় থাকলেও সে দ্বন্দ্বের ক্ষতচিহ্ন এগুলিতে নেই।

উনিশ শতকের ইংরেজ কবি টেনিসনের কাব্য মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।[২৮] টেনিসনের ছন্দ ও ধ্বনির ওপর অসামান্য অধিকার এবং অপরূপ চিত্রকল্পনা ও সঙ্গীতধর্মিতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। টেনিসনের কবিতার বাণী-বিগ্রহ-নির্মাণের আদর্শ এবং ঐ সমস্ত প্রবণতার সঙ্গে তাঁরও সামীপ্য ছিল।[২৯] ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত টেনিসনের 'Volume of Poems' গ্রন্থের অন্তর্গত 'The Lady of Shalott' নামক দীর্ঘ কবিতাটির তিনি অনুবাদ করেন 'শ্যালটবাসিনী' নাম দিয়ে। এই কবিতাটির কাহিনীর অন্তরালে যে-সত্য নিহিত আছে তার প্রতি কবির আকর্ষণও যথেষ্ট। স্বপ্ন ও কল্পনার কল্পিত রাজ্যে একশ্রেণীর মানুষ বাস করতে চায়—এরা রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। কিন্তু নিজেদের রাজ্যেও এরা স্বস্তি পায় না স্বপ্নের অলীক দুর্গ থেকে বাস্তবের সুকঠিন পথে যেদিন এরা বেরিয়ে আসে, সেদিন সামঞ্জস্যশক্তির অভাবে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কবিতাটির এই মূলভাব বস্তুসচেতন ও 'স্বপনপসারীর' কবি মোহিতলালকে যে আকৃষ্ট করবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আবার টেনিসনের 'The Princess' নামক বিখ্যাত কবিতার একটি অংশবিশেষ 'Summer Night'এর মিলহীন চরণগুলির ধ্বনিসম্পদ ও মাধুর্য তাঁকে বিস্মিত করেছিল বলে তিনি 'নিশীথরাতে' নাম দিয়ে তার অনুবাদ করেন।

ইংরেজ কবি ল্যাণ্ডরও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কবি। ল্যাণ্ডরের সুদীর্ঘ সাহিত্যিকজীবনে যে বহুবিচিত্র বিরোধের সমন্বয় দেখা যায় এবং তাঁর কাব্যে Romanticism ও Classicismএর যে চমৎকার সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, তার সঙ্গে মোহিতলালেরও কবিধর্মের সাদৃশ্য ছিল। ল্যাণ্ডরের পাণ্ডিত্যাভিমান তাঁরও কিছু কম ছিল না। ল্যাণ্ডরও তাঁর মতো জনপ্রিয় কবি ছিলেন না। নিজের সম্পর্কে ল্যাণ্ডর যে কথাটি প্রায়ই বলতেন[৩০] তা তাঁরও অন্তরের কথা ছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ল্যাণ্ডরের 'Charysaor'

নামক কাব্যসঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত একটি দীর্ঘ গাথা কবিতায় Hamadryad এর 'তরুকুমারী' নাম দিয়ে তিনি বঙ্গানুবাদ করেন।

কীটসের ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা ও সৌন্দর্যধ্যান, সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও বস্তুজ্ঞান মোহিতলালকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর অতিশয় বিখ্যাত La Belle Dame Sans Merci' শীর্ষক কবিতাটি 'নিঠুরা রূপসী' নামে তিনি অনুবাদ করেন।

রুপার্ট ব্রুকের[৩১] জীবনের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতি, প্রেম ও মৃত্যু-বিষয়ে অতিরিক্ত সচেনতা ও সনেট রচনায় দক্ষতায় তিনি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কয়েকটি সনেটের অনুবাদ করেন।

ওয়াল্টার ডে-লা মেয়ারের[৩২] ছন্দো-বৈচিত্র্য, শিশুসুলভ বিস্ময়, রোমান্স-প্রীতি ও বাস্তব-কল্পনার সেতুবন্ধন-প্রয়াসই তাঁকে আকর্ষণ করার হেতু। আর সেইজন্যেই তাঁর 'The dream of Wake' গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা তিনি অনুবাদ করেন।

বুকাননের[৩৩] ব্যালাড-জাতীয় কবিতা রচনায় নৈপুণ্য বাস্তবপ্রীতি ও আপোসহীন সংগ্রাম, আর্থার ও স্যাগনেসির[৩৪] প্রি-র‍্যাফেলাইট কবি গোষ্ঠীর সঙ্গে সগোত্রতা, ভাবের স্বতঃস্ফূর্ততা ও মাধুর্য, অ্যান্ড্রু[৩৫] ল্যাংএর সর্বতোমুখী প্রতিভা, কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোর[৩৬]এর কবিতারচনায় অভিনবত্ব, সাইমণ্ডসের[৩৭] অনুবাদকর্মে কৃতিত্ব ও সনেট রচনায় নৈপুণ্য, ডাউসনের[৩৮] যৌবনবন্দনা ও কলাকৈবল্যবাদে আস্থা, ড্রাইডেনের[৩৯] মনীষা, ডবসনের বিশেষ একটি কবিতার মিল-বিন্যাসে কৌশল[৪০] ব্ল্যাংকো হোয়াইটের[৪১] সর্বশ্রেষ্ঠ সনেটের মহিমা—প্রভৃতি মোহিতলালের চিত্ত-আকর্ষণের হেতু। এরই সঙ্গে এ সমস্ত গৌণ কবিদের প্রতি আকর্ষণের পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তিগত কারণ যুক্ত হওয়ায় তিনি এঁদের কবিতা অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর মধ্যে সুইনবার্নের তিনটি, ক্রিস্টিনার পাঁচটি এবং মরিশের ঢুটি কবিতার তিনি অনুবাদ করেন।

ভাবানুবাদ শ্রেণীর কবিতা রচনায় কবির কৃতিত্ব-বিচারের জন্যে অতঃপর বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করা চলে। সুইনবার্নের 'Before the begin ning of years' শীর্ষক কবিতাটির তিনি যে অনুবাদ করেছেন, আলোচনার সুবিধার জন্যে তার প্রথম স্তবকটি পর পর উদ্ধৃত করছি।

'Before the Beginning of Years.

Before the beginning of years.
There Came to the making of man
Time, with a gift of tears ;
Grief, with 'a glass that man ;
Pleasure, with pain for leaven.
Summer, with flowers that fell ;
Remembrance fallen from heaven,
And madness risen from hell ;
Strength without hands to smite ;
Love that endures for a breath ;
Night the shadow of light
And life the shadow of death.

অনুবাদ 'সৃষ্টির আদিতে'

হ'ল যবে আয়োজন সৃষ্টির আদিতে,
মানুষের মর্ম্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে—
মহাকাল নিয়ে এল অশ্রুর ডব্না,
চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্না ;
সুখ,—যার স্বাদ নাই বেদনার বিহনে,
মধুমাস নিয়ে এল ঝরাফুল পিছনে ;
স্বর্গের-স্মৃতি—কি বা সুন্দর ধারণা !
—অন্তরে উন্মাদ, নরকের তাড়না।
বল, তার বাহু নাই ধরিবারে প্রহরণ ;
প্রণয়ের পুলকেতে পলকেরি শিহরণ।
দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রূপ !

এখানে প্রথমেই দেখি, মূল কবতাটির 'নাম'এর কবি ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না ক'রে চমৎকার ভাবানুবাদ করেছেন। আক্ষরিক অনুবাদে ব্যঞ্জনা ক্ষুণ্ণ হত। মূল কবিতাটি Iambic Tetrametre এ লিখিত, অর্থাৎ প্রতি পর্বে ২টি অক্ষর—একটি অনাহত ও একটি আহত। ইংরেজি ছন্দ ঠিক বাঙলায় অনুকরণযোগ্য নয়। মোহিতলালও সেই কারণে মূলের ছন্দকে

অবিকল না ধরে মূলের পর্বকে প্রতি চরণে যথাসম্ভব ধরে দিয়ে স্বাভাবিকতা আনয়নের চেষ্টা করেছেন। তাঁর অনুবাদে প্রতি চরণে ৪টি পর্ব ও প্রতি মূল পর্বে ৪টি মাত্রা। অবশ্য মূলের প্রতি চরণের পূর্ণ পর্ব তিনি সর্বত্র রক্ষা করতে না পারলেও উদ্ধৃত অংশের নবম থেকে দ্বাদশ চরণে তা রক্ষিত হয়েছে। পর্বের সমতা দেখানো যাচ্ছে—

১ /১ ১ /১ ১ /১ ১ /১
Be-fore | the beg | inning | of years

১ /১ ১ /১ ১ /১ ১ /১
There Came | to the | ma king | of man

অনুবাদ— ১১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ২ ১ ১ ১
হ'ল যবে | আয়োজন | সৃষ্টির | আদিতে,=৪+৪+৪+৩

১ ১ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১
মানুষের | মর্ম্মের | ছাঁচখানি | বাঁধিতে— =৪+৪+৪+৩

এখানে মূলে অক্ষর এবং অনুবাদে মাত্রা গণনা করতে হয়েছে, কারণ বাঙলা ছন্দে মাত্রাসমকত্বই বড় কথা, অনুবাদককেও তাই মাত্রার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। প্রশ্ন উঠবে, এই অংশকে শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে অনুবাদ করলে তো অক্ষর ও মাত্রা—দুইই 'চার' হতে পারতো। কিন্তু এতে মাপ ঠিক থাকলেও অনুবাদের অর্থ-স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হতো : কাজেই ৪ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আশ্রয়-গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক। অবশ্য মিলযোজনায় মোহিতলাল যে স্বাধীনতা নিয়েছেন, তা না নিলে মূলানুগত্য আরও কিছু বেশী হতো। মূলের মিল একান্তর এবং অনুবাদে আছে পরস্পর দুই চরণে অন্ত্যমিল। মূলের দ্বাদশ চরণের স্তবকবন্ধন অনুবাদে অক্ষুণ্ণ আছে।

বক্তব্যকে বিশদ করার জন্যে এবং ছন্দো-সৌকর্যের প্রয়োজনে 'হ'ল যবে আয়োজন' অংশটুকু কবির নূতন সংযোজন। 'Making of man'এর অনুবাদে 'মানুষের মর্ম্মের ছাঁচখানি বাঁধিতে'-নিশ্চয়ই সুন্দর—মূলের সূক্ষ্মতা-লাভ। 'gift of tears' এর অনুবাদে 'অশ্রুর ভর্না' কবি সত্যেন্দ্রনাথকে স্মরণ করালেও শ্রুতিমধুর। 'Grief with a glass that ran'এর অনুবাদে 'চিরসাথী হইবারে দুখ দিল ধর্না' ঠিক আক্ষরিক না হলেও মূলের ব্যঞ্জনাসমন্বিত। ইংরেজদের প্রিয় কাল 'Summer'এর পরিবর্তে আমাদের প্রিয় কালের সাদৃশ্যে 'মধুমাস' যেমন ব্যঞ্জনাঢ্য, তেমনই কবিজনোচিত।' শেষ দুই চরণের অনুবাদনৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। মূলের আক্ষরিক

অনুবাদে এই দুই চরণ হয়—'রাত্রি দিবসের ছায়া' এবং 'জীবন মৃত্যুর ছায়া'—কিন্তু এতে কাব্যসৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় বলে কবি লিখেছেন—

"দিবসের ছায়া—সেই নিশীথের নীল-রূপ,
জীবনের হাসিমুখে মৃত্যুরি বিদ্রূপ !"

উক্ত কবিতায় বর্তমান মানবজীবনে দুঃখকষ্ট এবং আনন্দ ও অখণ্ড শান্তির অভাব লক্ষ্য ক'রে ইংরেজ কবি তাকে জীবনের নিয়তিরূপে দেখতে চেয়েছেন এবং সেই সূত্রে এক আদিম চিত্রাঙ্কনের সাহায্যে মানুষকে আশ্বস্ত করেছেন। মানবজীবনের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে মোহিতলালেরও ধারণা এইরূপই ছিল। তাছাড়া কবিতাটির ছন্দোমাধুর্য এবং আঙ্গিক সৌষ্ঠবও তাঁকে কম প্রলুব্ধ করে নি। আমাদের বিচারে অনুবাদটি একই কালে ভাবানুবাদ ও কাব্য।

ক্রিষ্টিনা রসেটির 'Song' নামক কবিতাটি আয়তনে দীর্ঘ নয় বলে মূল ও অনূদিত দুটি কবিতাই পর পর উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা করা যেতে পারে।

মূল কবিতা

Song

"When I am dead, my dearest,
Sing no sad songs for me ;
Plant thou no roses at my bed,
Nor shady cypress tree.
Be the green grass above me
With showers and dew drops wet ·
And if thou wilt remember,
And if thou wilt forget.
I shall not see the shadows
I shall not feel the rain ;
I shall not hear the nightingale
Sing on, as if in pain :
And dreaming through the twilight
That doth not rise nor set
Haply I may remember
And haply may forget."

অনুবাদ

গান

"আমি মরে' গেলে ওগো প্রিয়তম,
গেয়োনা কাতরে করুণ গান,
কবরে আমার দিওনা গোলাপ,
অথবা ঝাউয়ের ছায়া সে ম্লান।
নবীন দূর্ব্বা আপনি দুলিবে
হিমকণা আর বৃষ্টিধারে—
মন চায়, রেখো অভাগীরে মনে,
মন নাহি চায়, ভুলিও তারে।
এই আলো-ছায়া পড়িবে না চোখে,
গায়ে লাগিবে না বৃষ্টি-শীত,
রাতের পাখিটি গাবে সারারাত—
শুনিবনা তার ব্যথার গীত ;
নাই কভু যার অস্ত-উদয়—
সেই গোধূলির স্বপন-বনে
হয়তো তোমায় ভুলে যাব, সখা,
হয়তো তোমারে পড়িবে মনে।"

কবিতা দুটির প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি বা চরণের ছন্দোলিপি এইরূপ—

When I´ | am de´ad | my de´ | are´st

Sing no´ | sad so´ngs | for me´.

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
'আ মি মরে' গেলে, | ওগো

১ ১ ১ ১
প্রিয়তম'

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
গেয়োনা কাতরে | করুণ গান,

=৬+৬+৬+৫

মূল কবিতাটি Iambic tetrametre ও tremetre এ লিখিত। দুই পঙ্‌ক্তি মিলে এক একটি চরণ। প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে মোট ১৪ অক্ষরের চরণ। চার পঙ্‌ক্তির একান্তর মিলের সাহায্যে স্তবক গঠিত এবং কবিতার মূল রস করুণ। কবিতাটির অঙ্গীরসের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদক মোহিতলাল

১৪ অক্ষরের পয়ারের পরিবর্তে ৬ মাত্রার মূল পর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখেছেন। স্তবক সজ্জায় এবং চরণ-সংখ্যায় মূলানুগত্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির মতো প্রথম ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে একান্তর মিল থাকলে অবশ্য অনুবাদটি আরও শ্রুতিমধুর হতো। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অনুবাদে অতিরিক্ত 'কাতরে' শব্দটি বাক্যটির স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছে। এইরূপ 'rain'এর পরিবর্তে 'বৃষ্টিশীত', দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির অতিরিক্ত 'অভাগী' পদ, কিংবা তৃতীয় স্তবকের Nightingaleএর অনুবাদে 'রাতের পাখিটি' ও শেষ স্তবকের 'সখা' শব্দটি অনুবাদের সৌন্দর্য-বৃদ্ধি করেছে। অনেকস্থলেই এসব ক্ষেত্রে অনুবাদককে মূল ব্যঞ্জনার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। প্রথম স্তবকের শেষের পঙ্‌ক্তির অনুবাদে কিছু ত্রুটি আছে।

> 'রোপণ করোনা গোলাপের চারা আমার সমাধি পরে
> অথবা যতনে করো না বপন ছায়াভরা তরুবরে।'[৪২]

এরূপ হলেই বোধ হয় বেশী সার্থক হত। সে যাই হোক 'সৃষ্টির আদিতে' কবিতার তুলনায় এই অনুবাদ কতকটা দুর্বল হলেও সার্থক। ক্রিষ্টিনা রসেটির 'মনে রেখো' (মূল কবিতা Remember) 'দুর্গম' (মূল— uphill) 'জন্মদিন' (A birth day) প্রভৃতি অনুবাদে কবি সাফল্য-লাভ করেছেন বলে আমরা মনে করি। শেষ কবিতাটির মূল ও অনুবাদের প্রথম স্তবক উদ্ধৃত করছি।

> "My heart is like a singing bird
> Whose nest is in water'd shoot,
> My heart is an apple tree
> Whose boughs are bent with thick-set fruit.

অনুবাদ

> "আজি এ হৃদয় পাখিটির মত
> গান গেয়ে কচি শাখায় দোলে,
> আপেল-তরুর মতন আজি সে
> ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে!"

মূলের 'Singing bird'এর আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও তার অর্থ অনুবাদে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। 'water'd shoot'এর পরিবর্তে 'কচিশাখা' ও 'nest'কে বর্জন ক'রে বাক্যটিকে অনুবাদে স্বাভাবিক ক'রে তোলা হয়েছে।

'My heart'এর বদলে 'আজি এ হৃদয়' না লিখে 'আমার হৃদয়' লিখলে অধিকতর বিশ্বস্ততার পরিচয় দেওয়া হত, কিন্তু নির্লিপ্ততার সুর ফুটত না। মোটের ওপর এ অনুবাদটিও সার্থক। ক্রিষ্টিনার[৪৩] জীবনদর্শন, স্টাইল ও কবিভাষা মোহিতলালকে আকৃষ্ট করেছিল বলেই তিনি এঁর এতগুলি কবিতার অনুবাদে অগ্রসর হন।

ইংরেজ কবি কীটসের 'La Belle Dame Sans Merci' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি মোহিতলাল এবং তাঁর অগ্রজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দুজনেই অনুবাদ করেছেন। দুই কবিরই অনুবাদের একটি ক'রে স্তবক উদ্ধৃত ক'রে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মূল কবিতার ৩য় স্তবক

I saw a lily on thy brow
With anguish moist and fever dew
And on thy cheek a fading rose
Fast withereth too.

মোহিতলাল-কৃত অনুবাদ

"কেয়াফুল জিনি' পাণ্ডু-ললাট
জ্বরের শিশিরে ভিজিয়া-ওঠে,
দুই গালে দেখি শুকায় গোলাপ—
রক্তের আভা নাই যে মোটে।"

(নিঠুরা-রূপসী)

সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ

"কমলের মত ধবল ললাটে
কেন বা ছুটিছে কালঘাম
কপোল গোলাপ উঠিছে শুকায়ে
নাহি বিরাম।"

(নিঠুরা সুন্দরী)

দেখা যাচ্ছে, অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ অপেক্ষা মোহিতলাল বেশী বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের 'কালঘাম' অপেক্ষা মোহিতলালের 'জ্বরের শিশিরে' আক্ষরিক ও শ্রুতিমধুর। 'রক্তের আভা নাই যে মোটে' এই নূতন অংশটুকু সংযোজনে মূল ভাবটি সত্যেন্দ্রনাথের অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট। এর

পরবর্তী স্তবকে 'I met a lady in the meads; full beautiful-a fancy's child'এর অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ যেখানে লিখেছেন, 'মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট, সুন্দরী সে যে পরীকুমারী'—সেখানে মোহিতলালের—

'আমি দেখেছিনু প্রান্তরপথে
সুন্দরী এক পরীর পারা'—

অনেক বেশী সুন্দর। এ-শ্রেণীর কবিতার আর বিশ্লেষণ করব না। যে-কয়েকটি কবিতা আমাদের বিচারে অনুবাদ হিসেবে সার্থক, সেগুলির একটি তালিকা দিচ্ছি। কভেন্ট্রি প্যাট্‌মোরের 'The Toys' কবিতার অনুবাদ 'খেলনা' উইলিয়ম বার্ণেসের 'The wife a lost' কবিতার অনুবাদ—'পত্নীহারা' সাইমণ্ডসের 'To death' কবিতার অনুবাদ 'মৃত্যুর প্রতি' রুপার্ট ব্রুকের 'After death'এর অনুবাদ 'মৃত্যুর পরে' টেনিসনের 'Summer night'এর অনুবাদ 'নিশীথরাতে' ডাউসনের সর্বশ্রেষ্ঠ[৪৪] কবিতাটির সেই 'Non sum qualis eram bonae, sub regno cynarae'এর অনুবাদে 'সিনারা' ডবসনের 'গন্ধ ও পন্থ' ও ডে-লা মেয়ারের 'নিদালি'। এগুলির মধ্যেও যে-কয়েকটি স্বাভাবিকতায় এবং সহজ প্রবাহে অনুবাদ বলেই মনে হয় না সেগুলি হলো, 'নিদালি' 'গন্ধ ও পন্থ' রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজি কবিতার বাংলা অনুবাদ—প্রভৃতি। আমাদের ধারণা, পাণ্ডিত্য, রসবোধ, কবিচিত্তের সহমর্মিতা এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির সমন্বয় মোহিতলালের মধ্যে ছিল, এইজন্যেই অনুবাদ-কাব্যে তিনি এমন সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন।

অনুবাদানুবাদ কবিতাগুলি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনায় কোনো প্রয়োজন দেখি না। তথাপি বিশেষ কারণে দু'চারটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা ক'রে কবির কৃতিত্ব বিচার করব। এই শ্রেণীর কবিতাবলীর মধ্যে ফরাসী কবি চার্লস বদলেয়ারের[৪৫] দুটি কবিতা, ফরাসী কবি ক্লেমাণ্ট ম্যারটের[৪৬] একটি, ভিক্টর হুগোর[৪৭] একটি, স্তেফান ম্যালার্মের[৪৮] একটি, জার্মান কবি হেনরিক হাইনের[৪৯] এগারটি, ফার্সী কবি জালালুদ্দিন রুমির একটি 'গজল' ও একটি সুফী কবিতা, হাফিজের অনুসরণে একটি—তাছাড়া বিভিন্ন ফারসী কবির একগুচ্ছ প্রেমের কবিতা, মার্কিন কবি জর্জ সিল্‌ভিস্টারের[৫০] তিনটি কবিতা ও ঋগ্‌বেদের[৫১] একটি কবিতা মোহিতলাল ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন।

বদলেয়ারের 'Harmonie de Soir'[৫২] শীর্ষক কবিতাটির অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল দুজনেই করেছেন। উভয়ের অনুবাদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে কার কৃতিত্ব অধিক তা সহজেই বোধগম্য হবে।

মোহিতলাল-কৃত অনুবাদ

সন্ধ্যার সুর

এখনও সন্ধ্যা, কুঞ্জলতিকা দুলিছে মন্দবায়,
ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়, যেন সে ধূপের ধূম ;
বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে. গীতের মূর্চ্ছনায়—
নৃত্যের তালে মূর্চ্ছার রেশ, চরণে জড়ায় ঘুম।"

সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ

সন্ধ্যার সুর

"ওই গো সন্ধ্যা আসিছে আবার স্পন্দিত সচেতন
বৃন্তে বৃন্তে ধূপাধার সম, ফুলগুলি ফেলে শ্বাস ;
ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে, বায়ু করে হা হুতাশ,
সান্দ্র ফেনিল মূর্চ্ছা শিথিল নৃত্য আবর্তন।"

মোহিতলালের 'কুঞ্জলতিকা' শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথে নেই। মোহিতলাল যেখানে 'ফুলেরা সবাই গন্ধ বিলায়' লিখেছেন, সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ফুলগুলি ফেলে শ্বাস' এবং পরে মোহিতলালের মতো উৎপ্রেক্ষা অলংকারের পরিবর্তে উপমা অলংকার প্রয়োগ করেছেন। এতে মোহিতলালের অনুবাদ অধিকতর ব্যঞ্জনাঢ্য হয়েছে। তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের 'স্পন্দিত সচেতন' 'সান্দ্র ফেনিল' 'হা হুতাশ' 'নৃত্য আবর্তন' শব্দগুলি মোহিতলালের তুলনায় শ্রুতিসুভগ হয় নি। মোহিতলালের উৎপ্রেক্ষার চিত্র সত্যেন্দ্রনাথের উপমা দ্যোতিত করতে পারে নি। আবার সত্যেন্দ্রনাথের 'ধ্বনিতে গন্ধে ঘূর্ণি লেগেছে' অপেক্ষা মোহিতলালের 'বাতাস ভরিছে বসন-সুবাসে' ভাবানুবাদের দিক দিয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী। মোহিতলালের আত্মস্থতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের গভীরতা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। সেইজন্যে অনুবাদক কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপরিধি বহু-বিস্তৃত হলেও সীমিত ক্ষেত্রে মোহিতলালের কৃতিত্ব বেশী।

ফরাসী কবি স্তেফান ম্যালার্মের 'Angoisse' শীর্ষক কবিতাটির অনুবাদ মোহিতলাল ও তাঁর পরবর্তী শক্তিমান আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত করেছেন। উভয়ের কবিতা একই সঙ্গে পাঠ করলে মোহিতলালের স্টাইলের স্বাভাবিকতা এবং বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা আমাদের বেশী আকৃষ্ট করে।

সুধীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ

উৎকণ্ঠা

প্রথম স্তবক

"সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে জান্তব শরীরে
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত ;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত।"

মোহিতলাল-কৃত অনুবাদ

অন্তর দাহ

প্রথম স্তবক

"আজ রাতে আসি নাই দেহ তব করিতে হরণ,
পিশাচী! তোমার দেহে ত্রিলোকের পাপের লাঞ্ছনা—
আজ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ স্রস্ত করিব না
উত্তপ্ত চুম্বন-ঝড়ে" :…

অনুবাদ হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের কবিতাটিও সুন্দর। কিন্তু তাঁর অন্বয়ের আড়ষ্টতা মোহিতলালে নেই বলে শেষোক্ত অনুবাদ বেশী স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

জার্মান কবি হাইনের অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে। সেইজন্যে এ কবিতাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন মনে করি। হাইনের বহু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জন টড হাণ্টার। অনূদিত কবিতাগুলি হাইনের যে-গ্রন্থের অন্তর্গত অনুবাদক হাণ্টার তার নাম দিয়েছেন 'Book of Songs." প্রেমের অফুরন্ত বৈচিত্র্যসম্বলিত জনপ্রিয় এই গ্রন্থটিতে হাইনে অনন্যসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলাল হাইনের সমস্ত কবিতা এই গ্রন্থ থেকেই অনুবাদ করেছেন। ইংরেজ অনুবাদক হাইনের এ গ্রন্থটি সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে বোঝা যায় মোহিতলাল কেন জার্মান কবির এতগুলি ছোট ছোট গীতিকবিতার অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন।

তিনি লিখেছেন—

"Of all Heine's works, the 'Book of Songs' is by far the most popular. It contains some of his most exquisite songs and lyrical poems and some of the best examples of his power of dealing with a dramatic incident in ballad

form. Yet even in the worst pieces in this volume, he usually remains a master of his craft as a lyrical poet."[৫৩] টড্ হাণ্টার অনূদিত হাইনের 'Lyrical Intermezzo'র অন্তর্গত XLVIII সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'এমন রবেনা', XLVII সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'চরম দুঃখ'[৫৪] XIV সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'আমার প্রিয়তমা', L সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'প্রেমের স্বরূপ', LXV সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'দ্বিতীয়বার' এবং হাইনের 'The Return Home'এর অন্তর্গত XIV সংখ্যক কবিতার অনুবাদ 'ঘোষণা'—প্রভৃতি মোহিতলালের 'হেমন্ত-গোধূলি'তে অনুবদ্ধ। হাণ্টারের ইংরেজি অনুবাদই যে তাঁর আদর্শ ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ উভয়ের একটি কবিতার প্রথম স্তবক পর পর উদ্ধৃত করছি—

I

"Hot summer now is flushing
Thy cheek, dear lady mine,
And icy winter is freezing
That little heart of thine."

এমন রবে না

"এখন তোমার গাল দু'খানিতে
গোলাপের নব ফাগুন-রাগ,
বুকের মাঝারে সুকঠিন শীত'
সেথা বাস করে দারুণ মাঘ!

'হেমন্ত-গোধূলি'র অন্তর্গত মোহিতলালের 'ফার্সীফরাস' শীর্ষক কবিতাগুলি ১৩২৯ সালের 'ভারতী'র বৈশাখ ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় এস্ খুদাবক্সের 'Love offerings' নামে ইংরেজিতে যে ফারসী গদ্য কবিতাগুলি বের হয়, 'প্রেমাঞ্জলি' ও 'ফার্সীফরাস' আখ্যায় মোহিতলাল 'শ্রীমধুব্রত' এই ছদ্মনামে তার কয়েকটির বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদগুলিও বেশ স্বাভাবিক ও সহজ।

অনুবাদক কবির পরিচয় এই পর্যন্ত। কবির অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন হেতু এবং মূলানুবাদে অপ্রধান কবিদের প্রতি প্রীতির গূঢ়তর কারণ সবিস্তারে আলোচনা করেছি। অনুবাদক কবি হিসেবে অল্পসংখ্যক কবিতাতেও মোহিতলাল একটি স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেন

বলেই আমাদের বিশ্বাস। এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের কথা চিন্তা করলে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর সার্থক অনুবাদের সংজ্ঞাটি মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন—"কিন্তু এর (অনুবাদ কবিতার) সত্যিকার প্রেরণা জেগে ওঠে তখনই, যখন কোন বিদেশী কবির সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন, কিংবা কোন অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিতা হঠাৎ তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগে যায়। নারী হোক বা কবিতা হোক, ভাল লাগলেই মনের মধ্যে একটা বেগ জেগে ওঠে, আর সেই বেগের পরিণতি সুখদাকে দখল করার আকাঙ্ক্ষায়। এবং নারীর মতোই কবিতাও দাবী করে যে তাকে 'পেতে হলে' নিজেকে আমরা মিলিয়ে দেব তার সঙ্গে, নিজের একটা অংশ দান করবো তাকে। এই পরম মিলনের নাম অনুবাদ।"[৫৫]

মোহিতলালের অনুবাদের বহুস্থলেই এই 'পরম মিলনের' সাক্ষ্য আছে। ফারসী সুফীতত্ত্ব যেমনই হোক না কেন, সুন্দরী নারীর রূপকে সেখানে অতিশয় বাস্তব প্রেম-মনস্তত্ত্ব, বদলেয়ার, ম্যালার্মে ও ক্লেমাণ্ট ম্যারটের বাস্তবদেহকে মর্যাদাদান, সিলভিস্টার ভিরেকের প্রেম-সম্পর্কিত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল হাইনের গীতিকাব্যিক শ্রেষ্ঠত্ব—প্রভৃতি তাঁকে তাঁদের প্রতি আত্মীয়তা-সুলভ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

মোহিতলালের আর এক শ্রেণীর অনুবাদ-কবিতা আছে যেগুলিকে আমরা 'আত্মপ্রবর্তনামূলক' আখ্যা দিয়েছি। এই সমস্ত কবিতা ঠিক অনুবাদ নয় বলে কয়েকটিকে তিনি তাঁর মৌলিক কবিতাভুক্ত গ্রন্থের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করেছেন—যেমন 'সুইনবার্নের অনুসরণে' 'ভিক্টর হুগোর অনুসরণে' উইলিয়ম মরিশের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অনুপ্রেরণায় 'শুভক্ষণ' প্রভৃতি। 'সুইবার্নের অনুসরণে' কবিতাটি ইংরেজ কবির Lines from Anactoria কবিতার ৪৯ থেকে ৬২ পঙ্‌ক্তির নামমাত্র অনুবাদ। 'হেমন্ত-গোধূলি'র বিদেশী কবিতা পর্যায়ে 'ভাগবত পাঠ' নামক একটি অনুবাদ-কবিতা আছে। কবিতাটির শীর্ষনামের নিচে কবি লিখিয়াছেন, 'জার্মান কবিতার ইংরাজি অনুবাদ হইতে।' আমরা অনুসন্ধান ক'রেও মিলিয়ে দেখেছি কবিতাটি জার্মান কবি হাইনের। টড হাণ্টার অনূদিত ইংরেজি কবিতাটিকে মোহিতলাল কিরূপ পরিবর্তন করেছেন, তা চিন্তার বিষয়। যে সমস্ত কবিতা মূল কবিতা-বিশেষের কোনও একটি পঙ্‌ক্তি বা নামমাত্র মূল ব্যঞ্জনাটিকে আশ্রয় ক'রে প্রায় মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে তিনি বিদেশী পর্যায়ের ভাবানুবাদমূলক কবিতার ক্ষেত্রে স্থান দেন নি। অথচ 'ভাগবত পাঠ' কবিতায় কবি কেন এমন

যথেচ্ছ স্বাধীনতার আশ্রয় নিলেন এ কথার জবাব দেবার পূর্বে মূল কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদের কিয়দংশ এবং মোহিতলালের অনুবাদের কতকাংশ উদ্ধৃত করি।

The Return Home

XXV

1

"The one half-noon of autumn
Peers out from the gloomy skies,
There all alone by the church yard
The quite parsonage lies.

2

The Mother's reading her Bible
The son's at the Candle-a-gage,
One danghter drowsily stretches,
Her younger sister says

ভাগবত পাঠ

"শোন্ দেখি বাছা, দরজায় কেন কিসের শব্দ হয়—
এত রাত্তিরে কেন বা এমন নড়ে!
না গো, মা জননী! শব্দ ও কিছু নয়—
বাতাসের ডাক, দুয়ার কাঁপিছে ঝড়ে।
শার্সিতে পড়ে প্রবল বৃষ্টিধার!
স্থির হয়ে শুয়ে থাকো,
মিছে ভয় পেয়ো নাকো—
ভাগবত-লীলা পড়ি, শোন আরবার।"—

3

They hear a tap at the window,
There comes a beckoning hand;
Without, in his worn black cassock
They see dead father stand.

"জেরুজালেমের যতেক যুবতী আজ রাতে ঘুমায়ো না,
বন-পথ বাহি' আসিছে বঁধুয়া—ওই যে যেতেছে শোনা!
পথের পাথরে—শুনি আমি, তার চরণের ধ্বনি বাজে,
নিশার শিশির জমিয়াছে তার সুরভি-কেশের মাঝে।"

উদ্ধৃতি বাহুল্যের ভয়ে আর অগ্রসর হচ্ছি না। কিন্তু উদ্ধৃত অংশ দুটিতে একটি অতিদূর ক্ষীণ সাদৃশ্য ছাড়া আর কি আছে? ভাবানুবাদের আদর্শ সম্পর্কে কবি তো অতিরিক্ত সতর্ক-সচেতন। তাঁর অনুবাদ কবিতায় এরূপ কবিতার সংখ্যা অত্যন্ত কম হলেও দু'চারটি কবিতায় ভাবানুবাদের আদর্শ লঙ্ঘিত হওয়ার কারণ কি? এমন কয়েকটি কবিতাকে তিনি অনুবাদ বিভাগে স্থান দিতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন। বিরল ক্ষেত্রে হলেও এরূপ পঙ্‌ক্তিবিশেষ বা কবিতার মর্মার্থের প্রেরণায় আত্ম-প্রবর্তনামূলক অনুবাদে কবির কেনই বা আগ্রহ? মনে হয়, অত্যন্ত মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী কবি ভাবানুবাদের পারবশ্য-স্বীকার করতে মাঝে মাঝে অস্বস্তিবোধ করেছেন। মূল কবিতার নিগড়বদ্ধ সীমিত প্রাঙ্গণে বিচরণ করতে গিয়ে কখনো কখনো তাঁর কবিপ্রাণ বিদ্রোহ করেছে। আর তখন খুব সম্ভবত তাঁর মনে অনুবাদ কবিতার ভিন্নতর একটি আদর্শ দেখা দিয়েছে। "Triumphant translation has normally resulted where the translator has not been dominated by the original."[৫৬]

অর্থাৎ ভাবানুবাদের স্বাধীনতা মাত্রা ছাড়ালেই অনুবাদক কবি মূল কবির অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়ে আশ্চর্য-সুন্দর অনুবাদে সমর্থ হন। মোহিতলালের অল্প কয়েকটি আত্ম-প্রবর্তনামূলক অনুবাদ কবিতা সৃষ্টির মূলে এই আদর্শই সক্রিয় ছিল। অবশ্য এরও মূলে তাঁর চিত্তের সেই দোলাচলবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা। কবিতা হিসেবে এগুলি যেমনই হোক, অনুবাদ কবিতার একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়েও অন্যতর আদর্শের প্রতি পক্ষপাত—অন্তরস্থিত দ্বিধারই সূচক। কোনো একটি বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তাশীলতার সূত্রেই এই দ্বন্দ্বের উদ্ভব। ইংরেজি সাহিত্যের গৌণ কবিদের কাব্যানুবাদ-আগ্রহে পূর্বে এই অধ্যায়েই তাঁর অভিমানপ্রসূত এ দ্বন্দ্বকে লক্ষ্য করা গেছে। এই দ্বিধা বা দ্বন্দ্বই মননশীল কবির কাব্যকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মোহিত-লালের কাব্যধারা বিশ্লেষণের সময় বিষয়টি বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর জীবনবাদ বা ভোগবাদ-মূলক কাব্যালোচনায় তার ইঙ্গিত করা হয়েছে—অনুবাদ কাব্যেও তা লক্ষ্য করা গেল।

উল্লেখপঞ্জী

১ মোহিতলালের 'অনুবাদ'-কবিতা কেউ আলোচনা করেন নি। প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের 'মোহিতলালের কাব্যপরিক্রমা'র (১ম সং জুলাই, ১৯১৯) 'হেমন্ত-গোধূলি'র আলোচনায় কয়েকটি অনুবাদ-কবিতার মূল ভাববস্তু বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু কবিমানসের আলোকে অনুবাদ-কাব্যের বিচারণা নেই। অন্য গ্রন্থগুলিতে প্রাসঙ্গিকভাবে দু'চার ছত্র মন্তব্য আছে মাত্র।

২ 'সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যরূপ'—(২য় সং ১৩৬৬, শ্রীপঞ্চমী) গ্রন্থের লেখক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বে ও সমকালে অনুবাদ-কাব্যের কবিদের একটি তালিকা দিয়েছেন।

৩ সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পর্কে মোহিতলালের প্রবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা এবং নিজ কাব্যের 'উন্মেষ' ও 'বিকাশপর্বে' সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণ, স্বপ্নফিরি—প্রভৃতি থেকে আমাদের এ সিদ্ধান্ত।

৪ ১৩৪৬ মাঘ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস মোহিতলালের সেইকাল পর্যন্ত জীবনীতে এই তথ্যের উল্লেখ করেছেন।

৫ অনূদিত কবিতাটির নাম 'তরুকুমারী'।

৬ 'বিস্মরণী'র অন্তর্গত 'সুইনবার্ণের অনুসরণে' 'প্রবাসী'তে (১৩৩১, অগ্রহায়ণ) 'স্মৃতি ও বিস্মৃতি' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়, Lines From Anactoria কবিতার অংশবিশেষের এটি নামমাত্র ভাবানুবাদ।

৭ 'বাণীবৈজয়ন্তী' কবিতাটি কোনো গ্রন্থভুক্ত নয়। অনেকদিন পরে কবিতাটি সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছিলেন, "সুইনবার্ণের যে কবিতাটিকে···দিব্যপ্রেরণার উদ্‌গীথ বলিয়া মনে হয়, বাংলা ছন্দে তাহার সেই বাণীরূপ ও উদাত্তগম্ভীর ছন্দ-ধ্বনি ধরা যাইবে না, তথাপি এককালে আমি এই কবিতাটির...বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলাম।···মূল কবিতাটির নাম "Super Flumina Babylonis". এই কবিতায় ইংরেজকবি, য়িহুদী-ইতিহাসের একটি ঘটনাকে ভাবব্যঞ্জনার সহায় করিয়া, অষ্ট্রিয়ার পদানত ও অত্যাচারপীড়িত তদানীন্তন ইটালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে মহিমান্বিত করিয়াছেন এবং ইটালির বীর সন্তানগণের জবানীতেই ইহা রচনা করিয়াছেন। (জয়তু নেতাজী, ১ম সং ১৩৫৭, পৃঃ ৪-৫)

৮ ওয়াল্টার ডে-লা মেয়ারের কবিতাটি 'রূপকথা' (২য় সং ১৩৫৬) গ্রন্থে 'ঘুম-পাড়ানি' নামে মুদ্রিত হয়েছে।

৯ 'কবি মোহিতলাল' (১ম সং) গ্রন্থে অধ্যাপক হরনাথ পালের মন্তব্য।

১০ 'হেমন্ত-গোধূলি' (১ম সং) কাব্যের ভূমিকায় কবির মন্তব্য।

১১ অতি-আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নে বার বার মোহিতলাল তাঁদের সম্পর্কে নীতি-ভ্রষ্টতার অভিযোগ এনেছেন। 'শনিবারের চিঠির' ১৩৩৬ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'আধুনিক তারুণ্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন— বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন সফল হইল না।···অসহযোগ আন্দোলনের চিত্তশুদ্ধি ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বাংলার যুবকগণ আবার জীবনকে ভোগ করিতে চাহিল।···অক্ষমের যৌবন-উপভোগের একটিমাত্র পথ আছে, সে মানসিক কামবিলাস। ···আধুনিক তরুণ সাহিত্যের ইহাই গোড়ার কথা।"

১২ অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকদের মুখে এরূপ শুনেছি। এমন শ্রুত মন্তব্যের প্রসঙ্গ অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দিও উল্লেখ করেছেন। "কোন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাই যে মোহিতলালের সাহিত্যসম্বন্ধে বক্তব্য ফুরাইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি শেষ জীবনে সাহিত্য ত্যাগ করিয়া রাজনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন।" (বিদেশী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, অনুবাদক ও সম্পাদক মোহিতলাল মজুমদার—গ্রন্থের ভূমিকা—মথুরেন্দ্রনাথ নন্দি পৃঃ ৵.)

১৩ ভক্তদের কথা বাদ দিলেও বহু নিরপেক্ষ সাহিত্যিক যাঁরা মোহিতলালের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই তাঁর সাহিত্যপ্রাণতার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—'সাহিত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চাই ছিল মোহিতলালের সমগ্র জীবন" (কথাসাহিত্য, ভাদ্র ১৩৫৯ প্র. না. বি. র পাতা)

১৪ 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৫৯ ভাদ্র) 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধে উদ্ধৃত মোহিতলালের পত্রের অংশবিশেষ। পত্রটি কবিশেখর কালিদাস রায়কে লিখিত।

১৫ 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধে কালিদাস রায় লিখেছেন—

"কবিতার অনবদ্য রচনাভঙ্গী বহু সাধনায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, সেটি আর কাজে লাগল না; কতকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করে সেই সাধনার বস্তুকে কিছু কাজে লাগিয়েছিলেন।" (১৩৫৯, ভাদ্র শনিবারের চিঠি)

১৬ মোহিতলালের 'সাহিত্যকথা' (২য় সং ১৩৬৬) গ্রন্থের 'রস ও রূপ' প্রবন্ধ। পৃঃ ৫৬-৭২

১৭ ইংরেজি ভাষায় ড্রাইডেন ও পোপের ভার্জিল ও হোমার, ফিট্জেরাল্ডের ওমর খৈয়াম, সাইমন্সের ফরাসী কবিতার অনুবাদ--ইত্যাদি সার্থক অনুবাদরূপে উল্লেখযোগ্য।

১৮ হাইনের 'Book of Songs' গ্রন্থের অনুবাদক জন টড হাণ্টারের 'Preface'এ মন্তব্য।

১৯ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ (২য় সং ১৩৬৬ শ্রীপঞ্চমী)

২০ ও ২১ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ।

২১ পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ।

২২ 'হেমন্ত-গোধূলি'র (১ম সং ১৩৪৮) ভূমিকা।

২৩ ঐ ভূমিকা

২৪ ইংরেজ কবিদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ 'The Oxford Book of English Verse' (1250-1918) chosen and edited by Sir Arthur Quiller Couch (New edition) গ্রন্থটি থেকে এবং The Oxford Companion to EnglishLiterature (Third edition, compiled and edited by Sir Paul Harvey) গ্রন্থটি থেকে নেওয়া হয়েছে।

২৫ ১৩৫৯ সালের 'বঙ্গভারতীর' আশ্বিন সংখ্যায় 'মোহিতলালের শেষ জীবন' প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্যামসুন্দর মাইতিকে লিখিত কবির ৩০. ৮. ৫২. তারিখের একটি পত্র উদ্ধৃত হয়। সেখানে কবির আক্ষেপ স্পষ্ট, "রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্যে, কি গদ্যে কি পদ্যে, আমার স্থান কি তাহা জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও জানিবে; কিন্তু আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি—কাহারও মনোরঞ্জন করি নাই বলিয়া আমার জীবদ্দশায় আমাকে কেহ আমার প্রাপ্য দিল না—যাহা দেয় তাহা বাধ্য হইয়া.' এ ছাড়া 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার বহু স্থানেই তাঁর এই অভিযোগ শোনা যায়।

২৬ 'চল্লিশ বছরের বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধ (১৩৫৯ ভাদ্র, শনিবারের চিঠি)।

২৭ ঐ

২৮ বিদেশী কবিদের মধ্যে ল্যাণ্ডর ও টেনিসনের প্রভাবের কথা কবিবন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে উল্লেখ করেছেন—'প্রবাসী'র 'পুস্তক সমালোচনায়' ১৩৩৪ আষাঢ় সংখ্যায়।

২৯ মোহিতলাল টেনিসনের যে কতো বড় ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ আছে 'বাংলা ছন্দ' (১ম সং ১৩৫২ শ্রাবণ) গ্রন্থে পৃঃ ২১১, 'The Cambridge History of English Literature, Vol XIII. (The Nineteenth Century II, 6th Edition—1953) গ্রন্থে টেনিসন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হয়েছে—He was able to delight by the musical and picturesque interpretation of mood and dream" Page 42.

৩০ ল্যাণ্ডরের উক্তিটি হল—'I shall dine late, but the dining room will be well-lighted, the guests few and select'—Hugh Walker লিখিত 'Literature of the Victorian Era, (Second Indian Reprint 1953 পৃঃ ১২৬) গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। মোহিতলাল 'স্মরগরল'এর ভূমিকায় অভিমানের সঙ্গে কথাগুলি 'ইংরেজ কবির বচন' বলে উল্লেখ করেছেন।

৩১ রুপার্ট ব্রুক সম্পর্কে কবি-সমালোচক স্যার হেন্‌রি নিউবোল্ট লিখেছেন—"Brooke's work is remarkable for originality and sanity which in combination have always made for permanence. His subjects were for the most part love and death and he had no fears of coming to them in too late a day." (Modern Essays in Criticism, second edition 1947,—Edited by A. S. Cairngross, M. A. D. Litt. Page 250-51) মোহিতলালের 'ছন্দ-চতুর্দশী' (১৩৫৮ আশ্বিন) গ্রন্থে 'মৃত্যুর পরে' এবং 'প্রেমহীন' নামে ব্রুকের দু'টি সনেট অনূদিত হয়েছে।

৩২ Cazamian ডে-লা মেয়ারের কবিকৃতিত্বের পরিচয় অল্পকথায় সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন—"Walter de la Mare is the poet of dim suggestions, of fugitive thrills , he evokes the wandering of a child and communicates the feeling of invisible presences" (A History of English Literature, Revised edition, Reprinted 1953, Page 1951)

৩৩ বুকাননের বৈশিষ্ট্যগুলি Hugh Walker এর 'Literature of Victorian Era' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এই সমস্ত কবিদের কবি-বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। H. Walker এর 'Literature of Victorian Era', 'The Cambridge History of English literature' (Vol. XIII, The Nineteenth Century II, Edited by Sir A. W. Ward and A. R. Waller, 6th edition, 1953), The Oxford companion to English Literature প্রভৃতি। শেষোক্ত গ্রন্থে ডাউসন সম্পর্কে লিখিত আছে যে 'Dowson Earnest (1867-1900) author of a book of remarkable poems (1886) of which the best known is 'Non sum qualis eram'. মোহিতলাল এই শ্রেষ্ঠ কবিতাটির অনুবাদ করেন।

৪০ ডবসনের কবিতাটি সম্পর্কে মোহিতলাল লিখেছেন—"কবিতাটি মূলে ইংরাজী হইলেও, ইহা ফরাসী 'Ballade a Double Refrain' নামক ছন্দ-রীতিতে রচিত ; ইহার আগাগোড়া

মিলবিন্যাসের কৌশলই লক্ষণীয়।" ('বাংলা ছন্দ,' ১ম সং, ১৩৫২ পৃঃ ১৮৯)। কবিতাটি অনুবাদ করতে গিয়ে মোহিতলাল 'বিপদে পড়িয়াছিলাম' বলে ঐ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন। কবিতাটির নাম "গন্ধ ও পদ্য।'

৪১ জোসেফ ব্ল্যাংকো হোয়াইটের 'To Night' ও 'To death' নামক দু'টি বিখ্যাত সনেটের মধ্যে প্রথমটির মোহিতলাল 'অন্ধকার' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। মূল কবিতা দু'টি সম্পর্কে 'The Oxford companion to English Literature' গ্রন্থে লিখিত আছে, 'He wrote the sonnet on night and death (published in the Bijou 1828) which Coleridge declared the most finest and most grandly conceived sonnet in our language.'' পৃঃ ৮৪৬

৪২ বর্তমান লেখক-কৃত অনুবাদ।

৪৩ ক্রিষ্টিনা সম্পর্কে ওয়াকার লিখেছেন—"Life she thinks, is sad but she accepts the sadness, and lives on doing what seems to her duty. She does not ask whether it is worth doing. Her style is simple and limpid, her diction faultless. What she says is what she feels." (The Literature of the Victorian Era, Page 359)

৪৪ ৩৯ নং এ কবিতাটি সম্পর্কে উদ্ধৃত মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৪৫ ফরাসী দেশীয় কবি চার্লস বদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭)-এর ইংরেজি অনূদিত কবিতা থেকে 'সন্ধ্যার সুর' ও 'নারীবন্দনা' (১৩৩৩ কালিকলম, আষাঢ়) মোহিতলাল অনুবাদ করেন। বদলেয়ারের জন্ম প্যারিসে। কবি-সমালোচকরূপে তিনি অসাধারণ খ্যাতিমান। সাহিত্য, চিত্রশিল্প এবং সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর সমালোচনা আধুনিককালে অতিশয় মূল্যবান বলে স্বীকৃত। জীবিতকালে কিন্তু তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান নি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—'His life was one of excess···He was a precursor of modern poetry by his perception of the symbolic correspondences of colours, scents and sounds, by his exploration of the musical possibilities of the French Language and and above all by his 'evocation power'. With one phrase or one word he could suggest an infinity of passion, melancholy or aspiration," (The Oxford companion to French Literature, First Published 1959—Compiled and edited by Sir Paul Harvey and J. E. Heseltine, Page 53-54).

৪৬ পঞ্চদশ শতকের ফরাসী কবি ক্লেমাণ্ট ম্যারট (১৪৯৬-১৫৪৪)-এর ইংরেজি অনুবাদিত একটি কবিতার 'প্রেমের পাঠ' নাম দিয়ে মোহিতলাল অনুবাদ করেন। ম্যারট প্রচুর কবিতা লিখেছেন। কোয়ের্সির অন্তর্গত ক্যাহোর্সে তাঁর জন্ম। তার বাক্‌বৈদগ্ধ্য, অনুবাদ-কৃতিত্ব এবং বহু-বিচিত্র ছন্দো-প্রয়োগ প্রশংসনীয়। "In most of his poems he is essentially a court-poet, light, subtle, graceful, assuming with an artificial simplicity, neither sentimental nor passionate" (Tha Oxford Companion to French Literatuse, Page 456-457).

৪৭ বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হুগোর 'The Toilers of the Sea'-এর আত্মবিধ্বংসী প্রেম মোহিতলালকে কিরূপ মুগ্ধ করেছিল তার উল্লেখ তিনি নিজেই 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের 'বাংলাসাহিত্যে ট্র্যাজিডি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

৪৮ স্তিফেন ম্যালার্মের ইংরেজি অনূদিত একটি কবিতার 'অন্তরদাহ' নাম দিয়ে মোহিতলাল

অনুবাদ করেন। এই ফরাসী কবির প্যারিসে ১৮৯২ খ্রীঃ জন্ম। তাঁর সমস্ত জীবন কাব্যানুশীলনে উৎসর্গিত। স্টাইল ও সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তিনি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। "He believed that a poem should suggest rather than describe, and that words, as the poet employs them, have an evocative content beyond their everyday significance" (The Oxford Companion to French Literature, Page 441-42)। তাছাড়া সনেট রচনায় তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

৪৯ 'হেমন্ত-গোধূলিতে হাইনের মোট ৯টি গান, একটি বড় কবিতা 'ভাগবত পাঠ' এবং আর একটি 'গান' এর (১৩৩৪ কার্তিক কালিকলম) মোহিতলাল অনুবাদ করেন।

৫০ জর্জ সিল্‌ভিস্টার ভিয়েক (১৮৮৪-১৯০৪) মূলত জার্মান গ্রন্থকার। তিনি অত্যন্ত অল্পবয়সে জার্মান ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই ইংরেজি ভাষায় এই লেখক আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর Gedichte (১৯০৪), Nineveh (১৯০৮) The Candle and the Flame (১৯১২), Songs of Armageddon (১৯১৮) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মোহিতলাল এ কবির তিনটি কবিতা 'প্রেতপুরী' 'নাগার্জ্জুন' এবং 'তীর্থপথিক' (উত্তরা, বৈশাখ ১৩৩৩) অনুবাদ করেন। কবিধর্মে ভিয়েক সুইনবার্ন ও বদলেয়ারের অনুগামী। The Autobiography of the wandering Jew '(written with Paul Eldrige) গ্রন্থে লেখক ভিয়েক Personal note-এ লিখেছেন—'No understanding of love is possible until we realize that each sex bears within itself the replica of the other.'

৫১ বৈদিক সংস্কৃতের অর্থাৎ ঋগ্বেদের সোমসূক্তের ইংরেজি অনুবাদ থেকে মোহিতলাল-কৃত অনুবাদ—কবিতাটির নাম 'সোমপায়ীর গান'।

৫২ অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় 'অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ' (১ম সং, ১৯০৪ আশ্বিন) গ্রন্থে কবিতাটির আক্ষরিক গদ্যানুবাদ করেছেন, পৃঃ ১৮১-৮২

৫৩ হাইনের 'Book of Songs' (Translated by John Todhunter) গ্রন্থের অনুবাদকের Preface থেকে।

৫৪ আধুনিক কবি বিষ্ণু দেও হাইনের এ-কবিতাটির অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদও বড় সুখপাঠ্য। বিষ্ণু দে-কৃত অনুবাদের প্রথম স্তবকটি এইরূপ :—

'হেনেছে তারা অনেক জ্বালা
দীর্ঘকাল ধ'রে
কেউ-বা তারা ভালোবাসায়
কউ-বা ঘৃণা ক'রে।' (বিষ্ণু দে র শ্রেষ্ঠ কবিতা)

৫৫ বুদ্ধদেব বসুর 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' (১৩৬৩ ফাল্গুন ১ম স') গ্রন্থে 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ পৃঃ ১১৪

৫৬ 'The concise Encyclopaedia of English and American poets and Poetry' (First published in 1963. Edited by Stephen Spender and Donald Hall) Page 333.

পঞ্চম অধ্যায়

বাণীরূপ রচনা

কাব্যবিচারে ইংরেজি Expression বা Form এর বাঙ্‌লা প্রতিশব্দরূপে সমালোচক মোহিতলাল 'রসরূপ' বা 'বাণীরূপ' শব্দ দু'টি নির্বাচন করেছিলেন।[১] আলোচ্য অধ্যায়কে সেইজন্যে 'বাণীরূপ' আখ্যায় অভিহিত করা হল। কবিতা-রচনায় কবিচিত্তে আগে ভাব, পরে রূপ, না ভাব ও রূপ শিব-শক্তির মতো অদ্বয়-তত্ত্বে অভিন্ন—এ বিষয়ে মতান্তর অবশ্যই আছে। কিন্তু কবির সৃষ্টির পর সার্থক কবিতাকে যে রূপে পাওয়া যায়, সেখানে ভাব ও রূপ পার্বতী-পরমেশ্বরের মতোই নিত্যসম্বন্ধ। তাই ভাব ও রূপের সর্ব-দ্বন্দ্বনিরসনে যেখানে ভাবই রূপ হয়ে ধরা দেয়, মোহিতলাল তাকেই কাব্যের রসরূপ বা বাণীরূপ বলেছেন।[২] এরূপ ক্ষেত্রে ভাব ও রূপকে পৃথক করা খুবই কঠিন। কবিতার এই অখণ্ড রূপের কথা মনে রেখে তিনি লিখেছিলেন—"কবিতার সর্বস্ব তাহার এই বাণীরূপ, কাব্যবিচারে সবচেয়ে বড় কথা এই রূপসৃষ্টি, কবির কৃতিত্ব বিচার করিতে হইবে এই বাণীর উৎকর্ষ-লক্ষণে।"[৩]

তত্ত্বত যা এক ও অভিন্ন, সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই ভাব ও রূপকে পৃথক ভাবে বিচার না করলে কাব্যবিচার বিশ্লেষণাত্মক না হয়ে অনুভববেদ্য এক তুরীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যে কবিতার রসরূপ বা বাণীরূপ বলতে আমরা সূক্ষ্মভাবে যা অনুভব করি, তার কথা মনে রেখেও পৃথকভাবে ভাব নয়, রূপের প্রসঙ্গই আলোচনা করতে হবে।

মোহিতলালের কবিতার রূপ বা বাণীমূর্তির বিস্তৃত পরিচয় দানের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা। কবিতার ভাষা, শব্দ, ধ্বনি, স্টাইল, রীতি, অলংকার, চিত্রকল্প, ছন্দ, গঠন—সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে ভাব রূপলাভ করে—বাণী মূর্তিমতী হয়। এই কারণে বর্তমান অধ্যায়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হচ্ছে।

(ক) কবিভাষা ও স্টাইল।

(খ) অলংকার ও চিত্রকল্প।

(গ) ছন্দ।

(ঘ) গঠন।

কবিভাষা ॥ মোহিতলাল নিজেই বলেছেন—'কাব্যসৃষ্টির প্রধান উপাদান ভাষা।[৪] কবিতার ভাষা দৈনন্দিন জীবনের লোকমুখের বুলিকে আশ্রয় করবে, না অলংকৃত ধ্বনিবৈভবযুক্ত হবে—এ নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে একদা তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল।[৫] আমাদের ধারণা, কাব্যের ভাষা নিত্য-ভাবানুষঙ্গী। প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় যে-ভাষায় ভাব-বিনিময় চলে, সেই গতানুগত ভঙ্গীতে সর্বদা শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হতে পারে না। কবিতার ভাষায় যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কবিমানসের একটি বিশিষ্ট ক্রিয়ায় সজ্জিত, কাব্যভাবোপযোগী এবং ছন্দোগত গতিসৌন্দর্য-পরিস্ফুটনে সমর্থ। কবি-আত্মার গভীরতম তলদেশ থেকেই ঐ শব্দাবলীর উদ্ভব, কবিব্যক্তিত্বের রঙে তারা অনুরঞ্জিত এবং যখন কাব্যে নিবেশিত, তখন তারা ব্যঞ্জনাঢ্য। সেই-জন্যেই ভাষা এবং কবিভাষা কখনোই অভিন্ন হতে পারে না[৬] প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার মধ্যে যে তুচ্ছতা আছে, অতিপরিচয়-জনিত যে একটি সাধারণত্ব আছে—কবিভাষায় তা অনুপস্থিত। আবার কবিভাষা সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগহীন দুরূহ আভিধানিক ব্যাকরণশুদ্ধ শব্দের সজ্জামাত্রও নয়। কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। এ জগতের ভাষাও তাই খাঁটি লৌকিক হতে পারে না। রসানুভূতির প্রেরণায় কবির লেখনীমুখে শব্দসমষ্টি যেভাবে উপস্থিত হয় এবং একটি আবেশ-বিহ্বল মুহূর্তে কবি যে-ভাবে সেগুলিকে কাব্যে বিন্যস্ত করেন, তাতে ভাষায় অসাধারণত্বের মায়াঘোর স্বতঃবেষ্টিত হয়।

একজন ইংরেজ সমালোচকও ঠিক এই কথাই বলেছেন—"Poetry is, properly speaking a transcendental quality— a sudden transformation which words assume under a particular influence—and we can no more difine the quality than we can difine a stage of grace."[৭]

মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যভাষাও একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় উন্নীত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের অতিপরিচিত সমতলক্ষেত্রের প্রাকৃতজনের মুখের বুলিকে তিনি কাব্যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাতে পারেন নি। প্রতিটি ভাষায় দু'টি প্রধান বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। একটি সংযম ও অপরটি স্বাধীনতা। চিরাগত ঐতিহ্য-অনুসরণের মধ্যেই সংযম এবং ঐতিহ্যবন্ধনের মধ্যেও ভাষায় নূতনত্ব সৃষ্টি-প্রয়াসের মধ্যে স্বাধীনতার অবকাশ। ভাষার ক্ষেত্রে এই সংযম ও স্বাধীনতা পাশাপাশি চলেছে।[৮] ভাষাগত সর্বযুগের এই সূত্রটি সকল কবির কবিভাষায় অনুসৃত হয় না। সেইজন্য সকল কবির কবিতাষাও

উৎকৃষ্ট নয়। মোহিতলালের কবিভাষায় সংযমের সঙ্গে স্বাধীনতার চমৎকার সমন্বয় হয় নি। তিনি ভাষায় যে পরিমাণ সংযম ও শুচিতার পক্ষপাতী, সে পরিমাণে স্বাধীনতার পক্ষপাতী নন। এইজন্য তাঁর ভাষা সর্বত্র সার্থকতার শিখরে উঠতে পারে নি।

'উন্মেষ-পর্বের' কাব্যে তাঁর কবিতার ভাষায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় নয়। একালে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের ভাষার প্রভাব তাঁর কাব্যে স্পষ্ট। 'বিকাশ-পর্বের' 'স্বপনপসারী' কাব্যের বহু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও দু' একটি কবিতায় নজরুল ইসলামের ভাষার প্রভাব আছে। তবে এ কাব্যের 'পুরূরবা' 'উচ্চৈঃশ্রবা' 'পাপ' 'অঘোর-পন্থী' 'নাদিরশাহের জাগরণ' 'নাদিরশাহের শেষ' 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান' ও 'বেদূঈন' কবিতায় তাঁর স্বকীয়তা দৃষ্টিগোচর। 'বিস্মরণী'তে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ধ্বনিসমৃদ্ধ ক্লাসিক কৌলীন্যযুক্ত ভাষা উজ্জ্বল হয়ে 'স্মরগরল'এ পূর্ণতা পেয়েছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে ভাষা আবার রাজবেশ অনেকখানি ত্যাগ ক'রে নববেশ ধারণ করেছে।

স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, কাব্যে ভাষা-ব্যবহারে মোহিতলালের এতটুকু শৈথিল্য লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর কান ও মন এ-বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষা ও বাঙালীর দীর্ঘকালীন সাধনায় জাতীয় ভাষালক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট-জ্ঞান, অন্যদিকে ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার সঙ্গে গভীর পরিচিতি তাঁকে শব্দ নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে তিনি কখনো প্রাণহীন জড় বলে ভাবতেন না। শব্দের মন্ত্রশক্তিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।[৯] কোন্ শব্দে কতখানি শ্রুতিসুভগতা, কোন্ শব্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য, কৌলীন্য ও ব্যঞ্জনা অধিক—সে বিষয়ে তাঁর ধারণা অতিশয় স্বচ্ছ ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারের তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। ধ্বনির ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাধু বা শিষ্টরীতির প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত ছিল। তিনি বলেছেন—"এই সাধু-রীতিকে সাধু বা পাণ্ডিতী বলিয়া নাসাকুঞ্চিত করিবার কোন কারণ নাই—এই রীতিই বাঙালীর চিৎপ্রকর্ষের নিদান, ইহাই তাহার ভাবচিন্তাকে ও কল্পনাকে মার্জিত, তাহার সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশকে অব্যাহত এবং তাহার মনের মেরুদণ্ডকে দৃঢ় ও ঋজু করিয়াছে।"[১০]

মোহিতলালের মধ্যে আত্মাভিমানের লক্ষণ ছিল প্রবল। তাঁর মধ্যে ছিল একটি বিদ্রোহী সত্তা—প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন সুপণ্ডিত সুরসিক ও আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ। ঐ পুরুষ কবিভাষায় 'ললিতলবঙ্গবিলাস' কখনো বরদাস্ত

করতে পারতেন না। রবীন্দ্রযুগে যে জীবনদর্শনকে তিনি কাব্যে তুলে ধরেছিলেন, পাছে তার গুরুত্ব হ্রাস পায়, জনগণ কদর্থ করে, অমার্জিত রুচির পাঠক-পাঠিকারা ভুল বোঝে—সেইজন্য তিনি ধ্বনিগম্ভীর আভিজাত্যমণ্ডিত শব্দের দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ধ্বনির মাধুর্য ও ঝংকারের দিকেও কম সতর্ক ছিলেন না। প্রচুর তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে, কখনো দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদযোজনায়, কখনো অপ্রচলিত ক্লাসিক শব্দের প্রয়োগে কখনো বা বৈষ্ণবপদাবলী, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ ও বিজ্ঞানের রাজ্য থেকে পারিভাষিক শব্দচয়নের দ্বারা কিংবা কখনো আরবী-ফারসী শব্দের সহায়তায় তিনি কবিভাষাকে ঐশ্বর্যদানের চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের ক্লাসিক কৌলীন্য এবং ভারতচন্দ্রের বুদ্ধি-স্পৃষ্ট ঔজ্জ্বল্যকে সম্মিলিত ক'রে তিনি স্বকীয় মানস-প্রবণতার বৈশিষ্ট্যে তাঁর ভাষাকে স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণযুক্ত করতে পেরেছিলেন। মোটের ওপর তাঁর কাব্যের ভাষায় ক্লাসিকের সংযম ও স্থিরতা। আবার ঋজুতার সঙ্গে কারুতা, স্বচ্ছতার কতকটা সঙ্গে বর্ণবিলাস এবং সঙ্গীতের সঙ্গে আলংকারিকতার সমন্বয়ে তা উদ্দীপ্ত। তাঁর শব্দাবলী সুচয়িত এবং বাক্যে স্বল্প ক্রিয়াপদপ্রয়োগে গাঢ়তা সঞ্চারিত। তাঁর বাক্যের গতি অনেকখানি মন্থর। ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা, বক্রোক্তির চাতুর্য, গমনের আভিজাত্য এবং গাঢ়বদ্ধ অবয়বে শাণিত ইস্পাতদীপ্তি তাঁর ভাষাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

ক্লাসিক পারিপাট্যযুক্ত ভাষাই মোহিতলালের ভাবচিন্তার উৎকৃষ্ট বাহন। তাঁর রোমান্টিক কবিচিত্তের সূক্ষ্ম অনুরণনগুলি, আলো-ছায়া-চঞ্চল মনোগহনের ঊর্মিগুলি বা জীবনের অস্পষ্ট বা অনির্দেশ্য সংকেতগুলি ঐ ক্লাসিক ভাষাবন্ধনীর মধ্য দিয়ে চমৎকার গুঞ্জন তুলেছে। আমাদের বিশ্বাস 'স্বপনপসারী'র 'উচ্চৈঃশ্রবা' কবিতায় কবি নিজের অজ্ঞাতেই নিজের ভাষাদর্শ সম্পর্কে কতকটা ইঙ্গিত করেছেন—পৌরাণিকী উচ্চৈঃশ্রবাকে আয়ত্তে আনতে কবির কি বিপুল প্রয়াস!

"আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন—" (উচ্চৈঃশ্রবা)

পথে কবিগুরু বাল্মীকির সঙ্গে দেখা।

"শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে?'
"কহিলাম, তাত! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিকী—
চরাইতে যাই স্বর্গ-তুরগরাজে।" (উচ্চৈঃশ্রবা)

পৌরাণিকী উচ্চৈঃশ্রবাকে আয়ত্তে এনে কবি স্বপনের ফুলবনে অর্থাৎ

গীতিকাব্যের রাজ্যে তাকে নিয়ে গেছেন। পৌরাণিক ক্লাসিক আদর্শের ভাষার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক কবিমনের প্রকাশ—ভাষাগত এই কবিধর্ম যেন ঐ কবিতায় উঁকি দিয়েছে।

দীর্ঘকালের অতন্দ্র অনুশীলনে মোহিতলাল এই ধ্রুপদী রীতির ভাষাটিকে আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর কাব্যের ভাব যেখানে গহন-গম্ভীর, সেখানে এ-ভাষা সামঞ্জস্যহেতু অপরূপ। কবির আত্মগত ভাব ও ভাবনার জোয়ার যেখানে চিত্তে দুর্দমনীয়, সেখানেও সংযতগম্ভীর সার্থক ভাষারূপ-দানে তিনি সমর্থ। কবির সনেট বা সনেট-পরম্পরায় ভাষামূর্তির কথা মনে রেখেই একথা বলছি। নাট্যকাব্যগুলিতে যেখানে তাঁর কল্পনা মূলত বস্তুনিষ্ঠ এবং যেখানে সংলাপ প্রাণবন্ত হওয়া অত্যাবশ্যক, সেখানেও তাঁর কবিভাষা যথোপযুক্ত। ক্লাসিক মহিমাযুক্ত মোহিতলালের বিশিষ্ট কবিভাষার সাধারণভাবে প্রশংসা ক'রেও বলতে হবে যে তাঁর ভাষা সর্বত্র সহজবোধ্য বা স্বচ্ছ নয়। ওজোগুণ, ধ্বনিবৈভব এবং সঙ্গীতধর্ম থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধির দীপ্তি, আত্মমগ্নতা এবং ইঙ্গিতময়তার স্পর্শে তাঁর কবিভাষা অনেকস্থলে প্রসাদগুণ থেকে বঞ্চিত। সনেট ও নাট্যকবিতাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁর বাকী শ্রেষ্ঠ দীর্ঘ কবিতাগুলি নিজস্ব আকর্ষণীশক্তিতে আমাদের কৌতূহলকে ধরে রাখতে পারে না।[১১] 'বিস্মরণী'র ভূমিকায় অভিমানবশত কবি একদা বলেছিলেন—"আজিকার শর্টস্কার্ট্-পরিধানা নবীনা কাব্যবধূ-দের আসরে, আমার এই 'শ্রোণীভারাদল্প সগমনা' অতিদীর্ঘ-চেলাঞ্চলা ও সালঙ্কারা পৌরাণিক কবিতা-সুন্দরীকে কেহ যে অনুরাগের চক্ষে দেখিবে, এমন আশা করি নাই।"[১২] তথাপি মনে হয়, কবির কবিতাসুন্দরীর ঐ বিশেষণগুলি তাঁর সমস্ত কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আমাদের ধারণা, তাঁর কবিভাষা মূলত ধ্রুপদী রীতির হলেও সর্বত্র তিনি এ-আদর্শকে মেনে চলতে পারেন নি। .কবিচিত্তের যে একটি বড় দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি—এ তারই ফলশ্রুতি। ভাষার ক্ষেত্রে এর ফল শুভই হয়েছে। সর্বপ্রকার তুচ্ছতা ও অতি-পরিচয়ের মালিন্যমুক্ত ক'রে কবিতার ভাষাকে একটি নিয়মনিষ্ঠার অধীন করবার যে সংকল্প, তা অনেকসময় কাব্যরচনাকালে কবি বিস্মৃত হয়েছেন। ভাবের স্বকীয় প্রবাহপথে এসব ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন অথবা তিনি আপন কবিভাষার উচ্চাসন থেকে নেমে এসেছেন। এর ফলে 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' এর মতো কাব্যেরও অনেকগুলি কবিতায় ঐ 'শ্রোণীভারাদল-সগমনা' কাব্য-লক্ষ্মীর পরিবর্তে পরিমিতা বেগবতী ছন্দোময়ী কাব্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পাই।

মোহিতলালের আরও একরূপ কবিভাষার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'রূপকথা' কাব্যে। কিশোরদের জন্যে রচিত এ গ্রন্থে তাঁর কবিভাষা সকল অভিমান ও আভিজাত্য বর্জন করে সহজ সাবলীলতায় নবরূপ ধারণ করেছে। যথাসময়ে তিনরূপ ভাষাদর্শের দৃষ্টান্ত দেওয়া হবে।

মোহিতলালের কবিভাষার এই সাধারণ আলোচনার পর আমরা বিশেষ আলোচনায় প্রবেশ করছি। তাঁর কাব্যে যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যাই বেশী। তৎসম যুক্তবর্ণ-প্রধান শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে কাব্যের খাতিরে কোমল করার প্রয়োজনে ক্বচিৎ তিনি ভগ্ন বা অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। বিদেশী শব্দের মধ্যে তাঁর কাব্যে আরবী ও ফারসী শব্দেরই বাহুল্য। ইংরেজি ও পোর্তুগীজ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত বিরল। বিদেশী শব্দাবলীর প্রয়োগে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। ওমর বা হাফিজের অনুসরণে গান বা কবিতা রচনাকালে, আরব-পারস্যের রোমান্টিক প্রণয়-গাথা বর্ণনায় কিংবা নাট্যকাব্যে মুসলমানী চরিত্রগুলিকে বাস্তবতাদানের প্রয়োজনে তাঁর আরবী-ফারসী শব্দ-ব্যবহারের আগ্রহ। বন্ধুকে পত্র লেখায় সময়ে কৌতুকরস সৃষ্টির জন্যে কিংবা শিশুদের নিকট অতিপরিচিত আবহাওয়াকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তৎসম শব্দের ব্যবহারে প্রধানত তিনি ঐতিহ্যের অনুবর্তন করলেও মাঝে মাঝে তাঁকে স্বাধীনতার পথেও চলতে হয়েছে। মোটকথা শব্দচয়নে ও শব্দপ্রয়োগে তাঁর সিদ্ধি তর্কাতীত।[১৩]

মোহিতলালের কবিভাষায় ক্লাসিকধর্মী তৎসম শব্দের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

পুন্নাগ, খদ্যোতিকা, স্বরযোষা, জালায়ন, উত্তান, (পুরূরবা) অরদ (পাপ) ভাক্ত (আবির্ভাব) প্রাবৃট (কেতকী) তামরস (কামনা) দুকূল (দেবেন্দ্রনাথের সনেট) উপায়ন, পুণ্ডরীক (কবি করুণানিধানের প্রতি) কুহু, রজোহীন, কবোষ্ণ (মোহ-মুদ্গর) পুনর্ভব, কলহংস, বেপথু, উদধি, আমোদক, খর্পর, ঈক্ষণ, (পান্থ) ময়ূখ, অরাতি (কালাপাহাড়) ইরম্মদ, আতট (সুইনবার্ণের অনুসরণে) সুনৃত, গতাসু, ন্যগ্রোধ, ঈষিকা, শুভশংসী, মুক্তা, (মৃত্যু ও নচিকেতা) পঙ্ক, সিক্ত (রূপমোহ) গ্রথিল, চুচুক (রুদ্র-বোধন) পীবর, স্বস্ত্যয়ন (শেষ আরতি) কার্ষাপণ, পারণ (বুদ্ধ), জতু (নির্ব্বাণ) পনস (কবিধাত্রী) কণ্ডূয়ন, ঊর্জ্জস্বল, কুট্টিম (মধু-উদ্বোধন) বঞ্জুল-মঞ্জুল (বঙ্কিমচন্দ্র) স্নুষা (বধূ-বাসন্তী)। চাতুর্মাস্য (দুঃখের কবি), বল্মীক (প্রশ্ন) করঙ্ক, (রবীন্দ্র-জয়ন্তী) কপিশ (উৎসর্গ কবিতা) প্রভৃতি।

সমাসবদ্ধ পদ :—পক্ষবিধূনন, অহীনকান্তি, বালারুণ-রক্তরাগে-অমৃতায়মান, (পুরূরবা) বর্ণযোনি (একখানি চিত্র দেখিয়া) হেমস্তন্দন (উচ্চৈঃশ্রবা) দেহক্রম, চেলাঞ্চল (পান্থ) জলদর্চিশিখা (সুইনবার্ণের অনুসরণে) ঋষিঋভুচয়, স্ফুরৎ-কদম্ব-শিহরণ (অকালসন্ধ্যা) ভস্মাস্তৃত, অমৃতবর্তি, (রতি ও আরতি) বীচিবিভঙ্গে (রুদ্র-বোধন) মদিরেক্ষণা (চাঁদের বাসর) রথারূঢ়া-বাদিত্রবাদিনী (মৃত্যু ও নচিকেতা), সুধাসিন্ধু-মন্থশেষ, পর্য্যাপ্ত-স্তবক-নম্রা (নারীস্তোত্র) দিবস-বিগমে (চাঁদের বাসর) যমধুপ, মধুকরক্ষ (দিনশেষে) কেলি-কদম্ব-মূলে, বিদ্যুদ্দাম (স্মরগরল) পরিমল-পরাগ-রভসে (প্রেম ও জীবন) ব্রত-অসিধারে (শেষ-আরতি) অম্বুমুখে-ক্ষণবিম্ব-বুদ্বুদ-বিলাস (এক আশা) স্যমন্তক-মণি; নীবার-মঞ্জরী (কবিবরণ) উদ্বেল-অম্বুধি (বিস্মরণী) কোটি-জীব-কল্লোলিত, দেহ-পঞ্চবটী-তলে (মোহমুদ্গর) দুষ্টক্ষত-কণ্ডূয়ন-সুখ (মধু-উদ্বোধন) জবাকুসুম-সঙ্কাশ তরুণার্করূপে (রবীন্দ্র-জয়ন্তী) প্রভৃতি।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রচলিত তৎসম শব্দগুলি প্রয়োগ করেই মোহিতলাল সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানতেন, "The medium of the art of poetry is words; the difficulty of the poet is that words like coins are rubbed by long use and so lose their freshness. The poet tries to look at words afresh—so arrange them that they give pleasure."[১৪]

এইখানেই কবিরা ভাষার ক্ষেত্রে সংযমের অধীন হয়েও আমাদের পূর্বকথিত 'স্বাধীনতা'র আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোহিতলালও তাই কিছু কিছু অপ্রচলিত নূতন শব্দকে নিজ কাব্যে প্রবেশ করিয়ে বহুপ্রচলিত শব্দের ক্লান্তিকর বৈচিত্র্য-হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। নিম্নে এরূপ কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

বৈদিক শব্দ :—হবিঃশেষ, মাধ্যন্দিন সবন, অগ্নিষ্টোম, সোমযাগ, অহনা, চিতি, বৈবস্বত, তর্পণীয়, উপরতি, বীতমন্যু (মৃত্যু ও নচিকেতা) কনীনিকা (প্রেম ও জীবন) অপাদশীর্ষ, ভরণ্যু জ্বালাকেশ, ত্রিতনু, ত্রিশিখ, মধুজিহ্ব, প্রসীদ, জুহূ (অগ্নি-বৈশ্বানর) জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন, (প্রকাশ) পুরোডাশ (অন্তিম)—ইত্যাদি।

তন্ত্র :—দেহ-মণি-পদ্ম (নারীস্তোত্র), নাড়ীচক্র (নাগার্জ্জুন), সহজসাধিকা (নারীস্তোত্র), মূর্দ্ধজে (রুদ্রবোধন), মিথ্যা-সনাতনী (পান্থ), শবসাধনা (শবসঙ্গীত) বীরাচারী (শরৎচন্দ্র)—ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদ :—নিদান, ভিষক্‌ (বুদ্ধ) উদূখল (স্মরগরল) সূচিকাভরণ (অকালসন্ধ্যা) স্তনস্রাবী (এক আশা) ধন্বন্তরি (মহামানব) গর্ভাধান (নারীস্তোত্র)—প্রভৃতি।

বহু প্রচলিত নয় এমন কিছু শব্দ :—অনচ্ছ (পুরূরবা), প্রতনু (কবিবরণ) বৃতি (বুদ্ধ) তারাস্তোম (বিবেকানন্দ) লোহ (রুদ্র-বোধন) আগামিনী (এক আশা) বিগম (চাঁদের বাসর) আনীল (আহ্বান) প্রভৃতি।

কিছু শব্দের অভিনব প্রয়োগ—আতপত্র (শ্রীপঞ্চমী) কামদুঘা (নাগার্জ্জুন) 'কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার হৃদয়ের বিশাল্যকরণী' (পান্থ) নমেরু (বঙ্কিমচন্দ্র) নিপানে (রবীন্দ্র-জয়ন্তী) 'যৌবন-সঙ্কটে তুমি প্রাণেশ্বরী পীন-পয়োধরা (নারীস্তোত্র)। আত্মার নিশীথে, 'আনন্দই হবিঃশেষ' (মৃত্যু ও নচিকেতা)—প্রভৃতি।

বিদেশী শব্দের মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার 'নাদিরশাহের জাগরণ', 'নাদিরশাহের শেষ' 'শেষ-শয্যায় নূরজাহান' 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' হাফিজের অনুসরণে' 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' 'বেদুঈন' প্রভৃতি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব আবহরচনা, ইন্দ্রিয়ঘন প্রতিবেশ সৃষ্টি, রোমান্সরস-সঞ্চার, বাঙলা ভাষাভাণ্ডারে নূতন ধ্বনিসম্পদ বৃদ্ধি—প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনে কবি এ শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। এগুলি চিনতে কোনো অসুবিধে হয় না বলে এদের তালিকা অপ্রয়োজনবোধে দিলাম না। অন্যান্য বিদেশী শব্দের কিছু নমুনা দিচ্ছি।

'মীটিঙ্‌ পাউডার, (শিউলির বিয়ে) স্যার, ডেস্ক, ইস্টুপিড্‌ (চালাক-জগাই) পেন্সিল, সিগারেট গ্লাশ, পকেট (আড়ি ও ভাব) ডাক্তার (শান্ত খোকা) এস্টাকিন, ফ্রক, মনিব্যাগ, হোপ্‌ (পূজোর পোষাক) ইত্যাদি। কেবলমাত্র শিশুদের জন্যে রচিত কিশোর-কাব্য 'রূপকথা'য় এগুলির প্রয়োগ আছে। আর বাদুড়বাগান লেনের মেসের এক বন্ধুকে কবিতায় লেখা 'রোগ-শয্যার চিঠি'তে এরূপ কিছু ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ আছে।

ললিত-মধুর ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি কবির আকর্ষণ খুব বেশী ছিল 'স্বপনপসারী'র কালে। পরবর্তী কাব্যে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ঝিরিঝিরি (মৃত্যু) খিলখিলিয়ে, ঝুনঝুনিয়ে (ক্ষ্যাপা) রুনিঝুনি, শির্‌শিরিয়ে, রিমঝিমিয়ে (চুড়ির আওয়াজ) ঝম্‌ঝমাঝম্‌, তুলতুলে, ঢুলঢুলে (ইরাণী) কুলকুল, বুলবুল, জুলজুল (বেদুঈন) ঝুমঝুম্‌ (বিভাবরী) রিনিরিনি (বসন্ত-বিদায়) রণরণি (চাঁদের বাসর)।

কবি তাঁর প্রিয়কবি মধুসূদনের মতো তাঁর নিজকাব্যে প্রচুর নাম-ধাতুর

প্রয়োগ করেছেন। কাব্যকে সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়তা-দানের জন্যে এবং কখনো কখনো কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনে নামধাতুর প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অধিকাংশ স্থলেই ঔচিত্যবোধের পরিচয় দিলেও দু'এক স্থলে অনুচিত প্রয়োগও ঘটেছে। তৎসম শব্দের ও খাঁটি বাঙলা শব্দের বিশেষ্য ও বিশেষণ পদকে তিনি নামধাতুরূপে ব্যবহার করেছেন। 'প্রচারিল (ফেরদৌসী) উপজিল (পুরূরবা) প্রদানিল (দেবেন্দ্রনাথের সনেট) চয়নিয়া (কবি করুণানিধানের প্রতি) ঝঙ্কারিবে (অকালসন্ধ্যা) ধেয়াইয়া (মোহমুদ্গর) আঁধারিলে (পান্থ) বাখানিল (মাধবী) জিজ্ঞাসিব (মৃতপ্রিয়া) বাহিরিনু (বিস্মরণী) নিরমিল (বুদ্ধ) আরম্ভিল (বুদ্ধ) সম্বরিল (পৌর্ণমাসী) সাঁতারিয়া (রূপার্ট ব্রুক) প্রভৃতি। কতকগুলি অনুচিত প্রয়োগ যেমন— আগুলিয়া (রূপমোহ) লীলাইয়া (নাগার্জ্জুন) আলুলিবে (কবিবরণ) শিথিলিয়া (শেষ আরতি) বীজনিয়া (বঙ্কিমচন্দ্র) প্রভৃতি।

প্রত্যেক কবির যেমন মোহিতলালেরও তেমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ ও ধাতুর প্রতি অত্যধিক মমত্ব ছিল। যেমন—শব্দ :—অতি, তবু, দুকূল, মন্থশেষ, হবিঃশেষ, সোমযাগ, মর্মান্ত, উজালা, জন্মান্ত, আরতি, রতি, রভস, আতপ্ত, রাগ, পৌর্ণমাসী, নিশীথ।—ইত্যাদি।

ধাতু :—প'ল, জুয়ায়, দোলে, উথলায়, ভায়, ঝাঁপি, বাসি, নিবসে, ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের প্রয়োগকে বাক্যে যথাসম্ভব হ্রাস করে এবং বিশেষণ ও সমাসবদ্ধ পদের সাহায্যে তিনি বাক্যকে কিরূপ গাঢ়তা-দান করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই—

> "অধরে মূর্চ্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
> মুদিত উর্দ্ধগ দৃষ্টি ; ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল—
> অনিন্দ্য আসনভঙ্গী! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
> জয়োল্লাস—জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎসবে।" (বুদ্ধ)

উদ্ধৃত অংশে একটিও ক্রিয়াপদ নেই—আর সেই জন্যেই বাক্য দু'টি এমন গাঢ়বদ্ধ হতে পেরেছে।

'মুকুতা' 'মরম' 'পরাণ' 'পরকাশ' 'পিরীতি' 'দরশন' 'পরশ' 'হরষ' 'গরব'—প্রভৃতি ভগ্নতৎসম শব্দ প্রয়োগে তিনি চিরাগত ঐতিহ্যের অনুবর্তন করেছেন। দীর্ঘকালের প্রথিতযশা কবিদের সাধনায় বাঙলা কাব্যভাষার যে একটি ব্যাকরণ প্রায় আদর্শরূপে দাঁড়িয়ে গেছে, বলাবাহুল্য সেই কবিভাষার আদর্শকে তিনি

প্রথার সঙ্গেই অনুসরণ করেছেন, যেমন—সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রিত রূপ, সনে, তরে, মাঝে, লাগি, চেয়ে ইত্যাদি বিবিধ অনুসর্গের ব্যবহার, শুধুমাত্র কাব্যে প্রচলিত কিছু সংখ্যক শব্দাবলীর প্রয়োগ, যেমন—ঝুরে, নারিনু, নিঠুর, নিদয়, সায়র, তিতি, দেউটি, বয়ান—প্রভৃতির প্রয়োগ, কর্ম ও সম্প্রদানকারকে 'কে'র বদলে 'রে' এর ব্যবহার ইত্যাদি।

কবি শ্রীমধুসূদনের মতো 'সু' উপসর্গটির প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত দেখা যায়। যেমন—'সুনির্জ্জন' (সত্যেন্দ্রনাথ) সুপবিত্র (শরৎচন্দ্র) সুবিচিত্র (শরৎচন্দ্র) সুদুর্গম (ফেরদৌসী) সুনির্ভয়ে (মধু-উদ্বোধন) সুলোহিত (অকালসন্ধ্যা) সুচিকন (প্রেম ও ফুল) প্রভৃতি। 'আ' উপসর্গের সাহায্যে গঠিত বহুপদও তিনি প্রয়োগ করেছেন, যেমন—আরক্ত, আনীল, (শ্রীপঞ্চমী) আতট (সুইনবার্ণের অনুসরণে) আপিঙ্গল (মধু-উদ্বোধন) (প্রীতি-উপহার) ইত্যাদি।

অতঃপর মোহিতলালের যে তিনপ্রকার ভাষাদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। প্রথমত 'উন্মেষপর্বের' কিছু কিছু কবিতায় এবং 'স্বপনপসারী'র অধিকাংশ কবিতায় ব্যবহৃত উচ্ছল রসাবেশযুক্ত সুরধর্মী ভাষা। দ্বিতীয়ত তাঁর ব্যক্তিত্বচিহ্নিত গুরুগম্ভীর ওজোগুণ সমন্বিত ধ্রুপদী রীতির ভাষা এবং তৃতীয়ত অতিশয় সহজ সরল ভাষা। এই তিনপ্রকার ভাষারই দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন কবিতার একটি ক'রে স্তবক উদ্ধৃত হল।

প্রথম প্রকার :—'নীলশাড়ী খুলি' পোরোনা খয়েরী খানি।
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও রাণি!
মুখর নূপুর করি' দাও দূর!
আজ শুধু ভালো—কালো চুড়ী আর কাঁকনের রুনিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি বালা, দেখি, আর তাই শুনি।"
(ভাদরের বেলা—স্বপনপসারী)

দ্বিতীয় প্রকার :—"গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি,
বনে তুমি দাবানল—দিগন্তের দাহন-উৎসব।
হোম-ধূমারুণ-আঁখি বধূ তুমি, ব্রীড়া মূর্তিমতী!
তুমি বন্ধ্যা বারাঙ্গনা, নগ্ন অঙ্গ অনঙ্গ-গৌরব—
অধর পিপাসা-পাণ্ডু, নয়নে আরক্ত রাগ আসব-সম্ভব।"
(নারীস্তোত্র)

তৃতীয় প্রকার :—"শ্রাবণের দিনে কি লিখিব ভাবি তাই,
আকাশের পানে চাহিলে কিছুই নাই,
কারণ কবিরা চাহে না মাটির পানে—
বলা বাহুল্য একথা সকলে জানে।" (শ্রাবণের কবিতা)

আর যে-সব স্থলে কবিতার অংশ বিশেষের রস আস্বাদ্য না হ'য়ে চর্বণীয় হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যেখানে ভাষা অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে এমন দু'একটির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(ক) "সদ্যপাতি জীবনের বেপথু সে মরণের উদধি উচ্ছ্বাসে।" (পান্থ)

(খ) "যে মূরতি-রতি-রস-বিহ্বলা
এ তিন ভুবন স্খলদঞ্চলা
মেরু হতে মেরু পৃথ্বী-শরীর পুলকে বেপথুমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার আমি যে করেছি পান!"
(শেষ আরতি)

(গ) "যবে ওই কৃষিহীন নীল-নভ-উষর-অঙ্গন
দীর্ণ করি', তীব্রদ্যুতি ইরম্মদ করিবে লঙ্ঘন
যোজন সমান ব্যোম!" (সুইনবার্ণের অনুসরণে)

মোহিতলালের কবি ভাষার পরিচয় এই পর্যন্ত।

আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। তাঁর কাব্যধারার আলোচনায় ভাবনার বৈপরীত্যের (antithesis) কথা বলেছি। এর ফলস্বরূপ কবিচিত্তজাত দ্বন্দ্বের প্রভাব তাঁর ভাষাদর্শের মধ্যেও লক্ষণীয়। সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ বাণীসাধনায় তিনি যে ধ্রুপদী রীতির একটি কবিভাষা অায়ত্ত করেছিলেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্যসাধনার দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তিনি সর্বত্র যে ঐ আদর্শকে মেনে চলতে পারেন নি, একথা পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'রূপকথা'র ভাষাদর্শের কথা বাদ দিয়েও বলা বলা যায় যে একই কাব্যগ্রন্থে মোহিতলাল মাঝে মাঝে দুইরূপ ভাষাদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। এর ফল ভাল ও মন্দ দুই-ই হয়েছে। এমন হওয়ার মূলে তাঁর অন্তরস্থিত সেই দ্বন্দ্বেরই নিগূঢ় প্ররোচনা। স্বকীয় বিশিষ্ট কাব্যাদর্শ অনুসরণ করতে করতেও তাঁর বিপরীত আদর্শের দিকে পক্ষপাত। 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' এর ভাষায় এ দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবি দ্বন্দ্বমুক্ত অভিমানহীন আত্মস্থ একটি বিশিষ্ট ভাষাদর্শের পূজারী। 'স্বপনপসারী'র উচ্ছল রসাবেশযুক্ত ভাষা ও 'বিস্মরণী'-'স্মরগরলে'র আভিজাত্যমণ্ডিত ভাষার মধ্যবর্তী সে এক নূতনতর কবিভাষা। 'হেমন্ত-গোধূলি'তেই তাঁর কবি ভাষার শেষ পরিণতি।

স্টাইল ॥ প্রত্যেক মহৎ কবি বা শিল্পীর একটি স্বতন্ত্র স্টাইল থাকে। বলাবাহুল্য মোহিতলালও সেইরূপ বিশিষ্ট স্টাইল-সম্পন্ন কবি। ইংরেজি Style শব্দটির ঠিক বাঙলা প্রতিরূপ নেই বলে সমালোচক মোহিতলাল শব্দটিকে বাঙলা ভাষায় গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে স্টাইলতত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত অবহিত ছিলেন। সমালোচক রূপে তিনি 'স্টাইল'এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ[১৫] রচনা ক'রেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। বিভিন্ন কবিদের কাব্যবিচারে তিনি ঐ তত্ত্ব প্রয়োগেরও চেষ্টা করেছেন।[১৬] সারা জীবনব্যাপী যে-কবি কাব্যবিচারে স্টাইলতত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে এত সতর্ক ছিলেন, স্বভাবত তাঁর নিজ কাব্যে সেই স্টাইলতত্ত্বের স্থান কিরূপ তা ভেবে দেখতে ইচ্ছা করে।

রচনারীতি বা লিখনভঙ্গিমা স্টাইলের একটি লক্ষণ হলেও তা স্টাইল নয়। তিনটি দিক থেকে স্টাইলের স্বরূপ-প্রকৃতি বুঝতে হয়। শব্দ-প্রয়োগে ঔচিত্য-বোধ, বাক্যের অর্থস্বচ্ছতা এবং ভাব ও রূপের মোটামুটি একটি সামঞ্জস্যবিধানই হল স্টাইলের বুদ্ধিগত (Intellectual) দিক। কিন্তু এগুণেই কোন কাব্য উৎকৃষ্ট স্টাইলযুক্ত হতে পারে না—যদিচ এইরূপ গুণও অপরিহার্য। স্টাইলের দ্বিতীয় লক্ষণটি হল তার শিল্পগত সৌন্দর্যের দিক। সঙ্গীতে, চিত্রকল্পনায়, অলংকরণে, মণ্ডনতায়, রূপসুষমায় ও সুরসঙ্গতিতে যে কলাসম্মত সৌন্দর্য-মাধুর্য কাব্যে স্বতঃ-উৎসারিত হয় তাকে স্টাইলের শিল্পগত (aesthetic) দিক বলা চলে। উৎকৃষ্ট কাব্যে স্টাইলের এ বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য হলেও—একে সর্বস্ব বলা যায় না। আর স্টাইলের যে লক্ষণে শিল্পীর শক্তি, ব্যঞ্জনানৈপুণ্য, পাঠক-চিত্তকে নাড়া দেবার শক্তি এবং স্বীয় অন্তরতম রসানুভূতিকে অপূর্বতার সঙ্গে তুলে ধরবার কৃতিত্ব প্রকাশমান—তা হল তার ভাবগত (emotional) দিক।

স্টাইলের উপরি-উক্ত তিনটি লক্ষণের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট বাক্-ভঙ্গীর (Personal idiosyncracy of expression) কথাও মনে রাখতে হবে। মোহিতলাল নিজেই বলেছেন—"ভাষার যে ব্যক্তিঘটিত লক্ষণ দ্বারা আমরা অনায়াসে লেখককে চিনিতে পারি, লেখার সেই ভঙ্গীচিহ্নকে স্টাইল বলে।···স্টাইলতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই ভাষার ব্যক্তিগত ভঙ্গী হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ স্টাইল যাহাই হউক, এবং সেই ব্যক্তিত্ব যতই গভীর হউক, স্টাইলের আদি ও চরম পরিচয় ভাষায়।"[১৭] স্টাইলের এই ব্যক্তিঘটিত লক্ষণের জন্যে আমরা ল্যাম্ব, বেকন, মিল্টন, আর্নল্ড কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ামাত্রই চিনতে পারি। সেইজন্যেই Style is mentis character' ইংরেজি ভাষার এ-প্রবচন মিথ্যা নয়। বস্তুত স্টাইলের অন্তরালে

শিল্পী আত্মগোপন ক'রে থাকেন। কোন্ পরিবেশে তিনি বর্ধিত, তাঁর শিক্ষা, সংস্কার, রুচিবোধ ও মানসিক গঠন কেমন, জগজ্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিরূপ—এরূপ অনেক প্রশ্নের সদুত্তর স্টাইলতত্ত্বের মধ্যেই নিহিত থাকে। স্টাইলতত্ত্বের বিচারে যিনি আলোচিত লক্ষণগুলির অনুসন্ধান করবেন, নিশ্চয়ই তিনি কিছু ভুল করবেন না। কিন্তু মনে রাখা উচিত, সর্বোৎকৃষ্ট স্টাইল এ-সমস্ত লক্ষণে চিহ্নিত হয়েও আরও এক ধাপ ওপরে ওঠে, তখন ব্যক্তিঘটিত যাবতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি নির্বিশেষ রসরূপ লাভ করে। দীপশিখা যেমন নিজে আলোকিত হয়েও গৃহাভ্যন্তরকে আলোকিত করে, উৎকৃষ্ট স্টাইল তেমনই ব্যক্তিঘটিত লক্ষণকে বহন ক'রেও নৈর্ব্যক্তিক রস-পরিণতি লাভ করে। বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা সম্ভব নয় বলে ইংরেজ সমালোচক Walter Pater লিখেছেন—"When we say Marlowe had style, we are refreshing to a quality which transcends all personal idiosyncracy, yet needs—or seems to need—personal idiosyncracy in order to be manifested. Style in this absolute sense is a complete fusion of the personal and the universal."[১৮]

মোহিতলালের কাব্যের স্টাইল বিচারের পূর্বে স্টাইল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল। বাঙ্‌লা সাহিত্যে কবিবিশেষের আলোচনায় সাধারণত এ দিকটি উপেক্ষিত। তাই কাব্যবিচারে অবহেলিত বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত কথা বলা হল। বস্তুত কোনো কবি বা সাহিত্যিকের স্টাইল তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই প্রতিফলিত। কিন্তু বিন্দুতে যেমন সিন্ধুর সংকেত, তেমনই রচনার অংশবিশেষেও স্টাইলতত্ত্ব উঁকি দেয়। সেইজন্যে কবির বিভিন্ন কালে লিখিত কয়েকটি কবিতার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত ক'রে স্টাইল-তত্ত্বের অনুসন্ধান করছি।

(ক) "বিশ্বনিখিল ফুটে উঠে যেন কাহার পূজার ছলে
শতদল সম সমীর-পরশে মোহন-মন্ত্র বলে।
স্ফুটনোন্মুখ হৃদয় আমার তাহারি একটি দল
আলোকে আঁধারে খোঁজে দিশেহারা পরম চরণতল।"

(মন্দির-পথে, ১৩১৬, মানসী পৌষ)

(খ) 'ত্যাগ নহে ভোগ—ভোগ তারি লাগি', যেইজন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণ-ধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয়নি নিমন্ত্রণ।" (পাপ—স্বপনপসারী)

(গ) যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা !
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর !
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বারবার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা !

(পান্থ—বিস্মরণী)

(ঘ) আছে কাঁটা ? হায় সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন—
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ !
কীট ? —সে তো চিন্তাশূল—মর্ম্মকোষে পরাগের ব্যাধি—
শীর্ণদল, তিক্ত মধু, পুষ্পপুট রাগরক্তহীন !
চারিপাশে বিকশিত স্নেহশ্যাম চিকণ পল্লব—
এত শোভা !—তবু সে শিহরি' ওঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি !

(বুদ্ধ—স্মরগরল)

(ঙ) "সেইদিন মোর নিতেছে বিদায়, আসিল গোধূলি বেলা—
দেউল-দুয়ার বন্ধ হবে যে প্রথম-প্রহর রাতে !
ক্ষণেক দাঁড়াও, শ্রীঅঙ্গে তব ছায়া-আলোকের খেলা—
আঁকি ল'ব চোখে' অনুরাগের সুকোমল রেখাপাতে।"

(পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে হেমন্ত-গোধূলি)

'মন্দিরপথে' কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ-বিশেষে 'স্ফুটনোন্মুখ' শব্দটি ব্যতীত বাকী শব্দের সজ্জায় কবির ঔচিত্যবোধ, অর্থস্বচ্ছতার দিকে দৃষ্টি এবং ভাব ও রূপের সঙ্গতিবিধান-নৈপুণ্য প্রথমেই লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বনিখিলের সৌন্দর্য-বিমুগ্ধ কবিকল্পনা বিশ্বকে কোনো এক অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত শতদলরূপে অনুভব করেছে পরে কবি নিজ হৃদয়কে ঐ শতদলের একটি অংশরূপে অনুমান ক'রে সুন্দর-দেবতার চরণতলের সান্নিধ্যলাভ-কামনায় অধীর হয়েছেন। যে-ভাষা ও ভঙ্গিমায় ঐ মূল ভাবটি প্রকাশমান, তাতে সাবলীলতার সঙ্গে ব্যঞ্জনা ও সঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম মোটামুটিভাবে লক্ষ্য করা যায়। বোঝা যায়, স্টাইলের বুদ্ধিগত ও সৌন্দর্যগত দিক সম্পর্কে কবি সচেতন। সহৃদয়ের চিত্তে কাব্যাংশটির মূল ভাব সহজেই সঞ্চারিত হতে পারে বলে এতে স্টাইলের ভাবগত দিকটিও নিন্দনীয় নয়।' কিন্তু কবির ব্যক্তিঘটিত লক্ষণ এতে কি

আছে? পৃথিবীপ্রীতি, সৌন্দর্যারতি ও দেব-সান্নিধ্যের-উৎকণ্ঠা কোনো বিশেষ কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাছাড়া এর বাকৃভঙ্গীও মোহিতলালের স্বকীয়তায় দীপ্ত নয়। আবার ব্যক্তিঘটিত লক্ষণে চিহ্নিত হয়েও তা অতিক্রম ক'রে যাওয়াতে স্টাইলের যে চরমোৎকর্ষ, তাও এখানে অনুপস্থিত। অতএব কাব্যাংশটি ঠিক স্টাইলগুণসম্পন্ন নয়। তবে দেখা গেল, 'উন্মেষপর্বে'ই কবি স্টাইলের তিনটি লক্ষণ আয়ত্ত করেছেন মাত্র।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির প্রথম ও তৃতীয় চরণের শব্দসন্নিবেশে ইংরেজি ভাষার কিছু প্রভাব থাকা সত্ত্বেও অর্থস্বচ্ছতা এবং ভাব ও রূপের সাধারণ সঙ্গতি ক্ষুণ্ন হয় নি। এর সাঙ্গীতিক আবেদন পূর্বের তুলনায় কিছুটা কম এবং বক্তব্য যুক্তিধারায় বুদ্ধি-শাণিত। জীবনোৎসবে দুর্বলের স্থান নেই—বলবান ও শক্তিমানের ভোগ্য জীবন ও পৃথিবী—এই বলিষ্ঠ ভাবটি বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে এবং ব্যক্তিত্বের প্রত্যয়ে কবিতাংশটিতে নিহিত থেকে স্টাইলের ভাবগত ও ব্যক্তিঘটিত লক্ষণকে স্পষ্ট করেছে। আবার এই ব্যক্তিগত ভঙ্গীও যে নির্বিশেষ রস-পরিণতি লাভ করেছে কাব্যাংশটি আস্বাদনকালে তা বোঝা যায়। শিল্পগত দিকে অবশ্য যুক্তি ও মনন কতকটা ত্রুটির কারণ হয়েছে। মোটের ওপর কাব্যাংশটির স্টাইল প্রশংসনীয়। কবি যে স্টাইলের সব কয়েকটি লক্ষণ আয়ত্ত করেছেন একথা লক্ষ্যযোগ্য।

'পান্থ' কবিতাটির উদ্ধৃত অংশে শব্দপ্রয়োগে মোহিতলালের ঔচিত্যবোধ, ভাবের স্বচ্ছতা, সুরময়তা, ধ্বনিবৈভব, ছন্দোসৌষ্ঠব—সমস্তই আছে। দুরন্ত জীবনপিপাসায় উল্লসিত, অন্ধ প্রকৃতিশক্তির আকর্ষণে মায়ামুগ্ধ কবি জীবনরস-বিমুখ দার্শনিক সন্ন্যাসী সোপেনহাওয়ারকে সুতীব্রভাবে কটাক্ষ করতে গিয়েও কোথায় যেন একটি দ্বিধা অনুভব করেছেন। ভাষার ঝাঁঝও তাই এখানে অশ্রুর স্পর্শে কেমন সংযতমধুর। কবির দ্বন্দ্বমথিত ব্যক্তিত্বের ছাপ ব্যক্তিঘটিত লক্ষণকে সূচিত করেছে। আবার স্টাইলের বুদ্ধিগত, শিল্পগত ও ভাবগত লক্ষণের এতে অসদ্ভাব নেই। কবির ব্যক্তিগত বাকৃভঙ্গী ও কবিচরিত্র নির্বিশেষ রসতাপ্রাপ্ত হয়েছে এখানে। আমাদের বিচারে কাব্যাংশটি উৎকৃষ্ট স্টাইলের লক্ষণাক্রান্ত।)

কিন্তু 'বুদ্ধ' কবিতার উদ্ধৃত স্তবকটিকে স্টাইলের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলতে কিছু দ্বিধা হয়। কবির বক্তব্য—জীবনে অনন্ত দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষণিক জীবনের রস সর্ব-ইন্দ্রিয়-দ্বারে পান করতে হবে। কিন্তু একথা জেনেও মানুষ জীবনের পুরো মূল্য আদায় করতে ভয় পায়। জ্বালা-যন্ত্রণার ভয় যদিও

বা কাটে, মৃত্যুভয়কে সে জয় করতে পারে না। কবি-চরিত্রের বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল, কবির বাক্‌ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান এই স্তবকটি স্টাইলের বুদ্ধিগত ও শিল্পগত লক্ষণগুলিকে স্পষ্ট করতে কতকটা বাধা পেয়েছে। যুক্তিমূলক মননঋদ্ধ বক্তব্যে ভাষার লালিত্য ও সুরমাধুর্যও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। কাব্যাংশটি প্রাঞ্জল নয় সহৃদয়ের চিত্তে এর আবেদন মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হয়। কাজেই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সম্বলিত কাব্যাংশটি নির্বিশেষ রসরূপের দিকে অগ্রসর হতে গিয়েও পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি।

শেষ উদ্ধৃতিটি অবশ্য এই দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। অর্থবোধগম্যতা, শব্দপ্রয়োগে মাত্রাজ্ঞান, ছন্দোসৌন্দর্য, সুরমাধুর্য—সমস্তই এতে আছে। আবার জীবনের বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তে ধীর পরিবর্তনজনিত প্রশান্তির ভাব ও সুন্দরের উদ্দেশ্যে বিনম্র কবিকণ্ঠ—মোটকথা ভাবে ও বাক্‌-ভঙ্গিমায় এ স্টাইলের ব্যক্তিগত লক্ষণকে সূচিত করছে। কবির ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরাঙ্কিত এই কবিতাংশটি পাঠকালে আমাদের যেখানে নিয়ে যায়, সেখানে যথার্থই বিশেষ ও নির্বিশেষে একাকার—"Complete fusion of the personal and the universal."

উৎকৃষ্ট স্টাইলের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তার আলোকে বিচার করলে বাঙলা সাহিত্যের কোনো কবিই বিরূপ সমালোচনার হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাবেন না। রবীন্দ্রনাথে এই স্টাইলতত্ত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছলেও তাঁর শেষ বয়সের সকল রচনাকে উৎকৃষ্ট স্টাইলের নিদর্শনরূপে গণ্য করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় মোহিতলালের কবিতায় সংখ্যা অল্প। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে প্রায় অর্ধেক উৎকৃষ্ট স্টাইল-গুণোপেত। উদ্ধৃত পাঁচটি কবিতা কবির বিভিন্ন বয়সের। প্রথম দুটির সঙ্গে তৃতীয়টির তুলনায় দেখা যায় তাঁর স্টাইল ধীরে ধীরে উন্নত হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ উদ্ধৃতিটি কতকটা ত্রুটিযুক্ত হয়ে আবার পঞ্চম উদ্ধৃতিটি ত্রুটিহীন হওয়ার কারণ কি? আমাদের বিশ্বাস, কবিহৃদয়ের সেই দ্বন্দ্বই এর মূলীভূত কারণ। কবিভাষার মহিমা প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহে তিনি যে একটি ক্লাসিক আদর্শের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, কবিতা রচনাকালে অনেক সময় তাঁর এ-অভিমান প্রবলতর হয়েছে। একদিকে ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ ও অন্যদিকে ঐ অভিমান -এ দুয়ের দ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্য স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে নি। একথা জানলেও তাঁর ঐ অভিমান মজ্জাগত। চতুর্থ উদ্ধৃতিতে কবির ভাবনা প্রাঞ্জলতার পথ খুঁজছে, কিন্তু তাঁর অভিমানবশত কঠোরতা তার প্রতিবন্ধক।

এ দুয়ের সংঘাতে কবিতাংশটি যুক্তি, তর্ক ও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়েও উৎকৃষ্ট স্টাইলগুণসম্পন্ন হতে পারে নি। পঞ্চম উদ্ধৃতিটি সেই দ্বিধার অভাবে ত্রুটিহীন।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় চিন্তনীয়। স্টাইলবিচারে অনেক সময় রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক্যাল শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্বে যে অর্থে স্টাইলতত্ত্ব বিচার করেছি, তার সঙ্গে ঐ দুই শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রচনারীতির আদর্শের কথা মনে রেখে রোমান্টিক স্টাইল ও ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের প্রয়োগ চলতে পারে। ক্ল্যাসিক সাহিত্যে কল্পনার কেন্দ্রাভিগ গতি আর রোমান্টিক সাহিত্যে কেন্দ্রাতিগ গতি।[১৯] কল্পনার গতি কেন্দ্রাভিগ বলে ক্ল্যাসিক রীতিতে শৃঙ্খলা, সঙ্গতি, সংহতি এবং সাধারণ জ্ঞানের প্রাধান্য। আর রোমান্টিক রীতিতে কল্পনার গতি কেন্দ্রাতিগ বলে বৈচিত্র্য, স্বাধীনতা, বৈপরীত্য, আকৃতি-উৎকণ্ঠা এবং দূরাভিসারের প্রাধান্য। প্রত্যেক কবিই কোনো একটি রীতির দিকে অধিক প্রবণতা দেখান। কিন্তু কোনো কবিই উভয় রীতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেন না। পরিহার করলে কি হয়, সেকথা একজন ইংরেজ সমালোচক সুন্দর ক'রে বলেছেন—

"The dangers were, on the one hand, of order degenerarating into routine, harmony into mere mechanism, restraint into durance vile, and commonsense into formulas, on the otherhand, of variety giving place to variegation, contrast to wilfulness, liberty to licence and imagination to idiosyncracy [২০]

বস্তুত সুন্দরের রাজ্যে এ-দুই প্রবণতার মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই—এ-তত্ত্ব মোহিতলাল জানতেন। তাই তিনিও তাঁর কাব্যে ঐ দুই রীতির সমন্বয়ের জন্যে সাধনা ক'রে গেছেন। আমাদের ধারণা, 'উন্মেষ পর্বে'র কাব্যে এবং 'বিকাশপর্বে'র কাব্যে তিনি রোমান্টিক ও ক্ল্যাসিক্যাল রীতি উভয়কেই মান্য করেছেন, তবে রোমান্টিক রীতিরই এ-দুই পর্বে আধিক্য। 'সমৃদ্ধিপর্বে' অর্থাৎ 'বিস্মরণী'তে এ-দুয়ের চমৎকার সমন্বয়-প্রয়াস। 'পরিণতি পর্বের' 'স্মরগরল'এ আবার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি প্রাধান্যলাভ করেছে। 'হেমন্ত-গোধূলি'তে দুই-রীতির সমন্বয়। ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক রীতির মধ্যে সমন্বয়ের ওপরই কবির কৃতিত্ব নির্ভরশীল একই কবিচিত্তে তাই এ দুই প্রবৃত্তির অবিরোধে অবস্থান কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তবে বিশেষ কবির বিশেষ রীতির প্রতি অধিক পক্ষপাতের জন্যে তিনি 'জন্ম-রোমান্টিক' ও 'জন্ম-ক্ল্যাসিসিস্ট'

আখ্যা লাভ করতে পারেন। ফর্মের সুনির্দিষ্ট রূপের প্রতি আকর্ষণ, ঐতিহ্যানুগ ভাষা ও রচনারীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে পারে এমন বিষয়বস্তুর প্রতি পক্ষপাত জন্ম-ক্ল্যাসিসিস্টদের মধ্যে লক্ষণীয়। আবার চিরাচরিত বস্তু অপেক্ষা মৌলিক ভাববস্তুর প্রতি আকর্ষণ, সৌন্দর্যের সঙ্গে বিস্ময়কে অধিকমাত্রায় প্রশ্রয়দান, কল্পনার ওপর অত্যধিক নির্ভরতা—প্রভৃতি জন্ম-রোমান্টিকদের বৈশিষ্ট্য। 'স্বপনপসারী' থেকে 'স্মরগরল' পর্যন্ত মোহিতলালের রচনারীতির প্রবাহের কথা মনে রেখে তাঁকে 'জন্ম-ক্ল্যাসিসিস্ট' বলা দোষের নয়। কিন্তু 'উন্মেষপর্ব'এর কাব্য এবং 'হেমন্ত-গোধূলি'র কথা স্মরণ করলে তাঁকে কিন্তু ঐ আখ্যা দেওয়া ঠিক হবে না।

মোহিতলাল তাঁর কাব্যসাধনায় ('স্বপনপসারী' থেকে 'স্মরগরল' পর্যন্ত) রচনারীতিতে যে একটি সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা এবং সংযমের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তা মিথ্যা নয়। শব্দনির্বাচন, শব্দপ্রয়োগ, পদান্বয়রীতি, বাক্য-যোজনা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি যে সুপ্রাচীন জাতীয় একটি ভাষাদর্শকে বরণ করেছিলেন, তা অবশ্যই ক্ল্যাসিক্যাল রীতিকেই স্মরণ করায়। অথচ তাঁর কবিতায় কল্পনা, বিস্ময়, বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার প্রতি প্রাণের পক্ষপাতও কিছু কম নেই। আমাদের মতে কবি রচনারীতির ব্যাপারে সমন্বয়-প্রয়াসী ছিলেন—সে সমন্বয় রোমান্টিক রীতির সঙ্গে ক্ল্যাসিক্যালের নয়—ক্ল্যাসিক্যালের সঙ্গে রোমান্টিক রীতির। এইজন্যেই তাঁর কাব্যে ক্ল্যাসিক ফর্মের অন্তরালে রোমান্টিক মনের গুঞ্জরণ। এই দুই রীতির সুষ্ঠু সমন্বয় তাঁর সকল কবিতায় হয়েছে—এমন বলা যায় না। আর তা হয় নি বলে তাঁকে কবি হিসেবে শক্তি-হীন মনে করছি না; কারণ জগতের বড় বড় কবিরাও এক্ষেত্রে কচিৎ সাফল্যলাভ করেছেন। একজন ইংরেজ সমালোচক লিখেছেন—

"But explain the terms as we may, in application to particular epochs, there are these two elements always recognisable; united in perfect art—in Sophocles, in Dante, in the highest work of Goethe, though not always absolutely balanced there.[২১]

মোহিতলাল বাঙলা কাব্যে স্টাইল ও রচনারীতির যে নিদর্শন রেখে গেছেন, তা বিশিষ্টতায় দীপ্ত এবং মৌলিকতায় অনন্য। 'স্মরগরল' কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"'স্মরগরলে'র কবিতাগুলিতে আমার নিজস্ব স্টাইল আরও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। সেই স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ইংরেজিতে যাহাকে রচনার 'form' বলে, তাহাই এতদিনে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি

বলিয়া আমার বিশ্বাস। 'form' বলিতে রচনার একটি পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বুঝায় ভাষাও যেমন গাঢ়বদ্ধ হইবে, কবিতার গঠনও তেমনই সুসম্বদ্ধ এবং আকার সুপরিমিত হইবে। এই সকলের সমবায়ে যে একটি 'রূপ' পাঠকের চিত্তগোচর হয়, তাহাই কবিতার 'form' কিন্তু সেইজন্য আমার কবিতা শুধুই ক্ল্যাসিক্যাল নহে, অর্থাৎ ঐ একটি নাম দিয়া তাহাকে বিদায় করা যাইবে না।[২২]

মোহিতলালের 'স্টাইল উৎকৃষ্ট কিনা' এবং তা শুধুই 'ক্ল্যাসিক্যাল' কিনা আমরা সবিস্তারে তারই আলোচনা করেছি।

অলংকার॥ কবিতা শব্দধার। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর দুটি রূপ। একটি তার ধ্বনিময় রূপাবয়ব, অন্যটি অর্থঘন রূপমূর্তি। দুয়েরই কাজ সৌন্দর্য-সৃষ্টি। প্রথমটি শ্রুতিকে এবং দ্বিতীয়টি অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে; ধ্বনিমুখর শব্দগুলির পারস্পরিক ও সুকৌশল সমাবেশে অর্থও যে অনেক সময় আভাসিত হয়—একথা স্বীকার ক'রেও বলতে হয়, মূলত ধ্বনি-মধুর শব্দসমষ্টির আবেদন আমাদের কর্ণে এবং অর্থমুখ্য শব্দসমূহের আবেদন চিত্তের গভীরে। এইরূপ ভেদে কাব্যে শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগ দীর্ঘকালের। অলংকার কাব্যের প্রাণ না হলেও সার্থক অলংকার সুকবির হাতে কাব্যাত্মার অঙ্গীভূত হয়েই জন্ম নেয়। এরূপ সীমিত ক্ষেত্রে অলংকার রসানুকূল এবং অতিশয় মূল্যবান। অলংকার ব্যতীতও কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব, তবে নিরলংকৃত কবিতার সংখ্যা চিরকালই দুর্লভ। এইজন্যে প্রতি কবিকেই অল্পবিস্তর অলংকারের আশ্রয় নিতে হয়। শক্তিমান কবি অলংকার প্রয়োগে সর্বত্র অলংকার শাস্ত্রোক্ত ঔচিত্যবোধের[২৩] পরিচয় দেন।

মোহিতলাল শব্দালংকার ও অর্থালংকার প্রয়োগে মোটের ওপর ঔচিত্য-বোধেরই অধিকারী। অলংকার-প্রয়োগে বিশেষত অর্থালংকারের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সজ্ঞান প্রয়াস নেই। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যে নিবেশিত তাঁর অলংকারগুলি কোথাও ধ্বনিমাধুর্যকে বৃদ্ধি করেছে, কোথাও বক্তব্যকে ব্যঞ্জনাঢ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত করেছে আবার কোথাও বক্তব্যকে স্পষ্ট ও বিশদ করেছে। কবিতার আঙ্গিক-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে অলংকার-যোজনায় তাঁর শৈথিল্য তেমন চোখে পড়ে না।

শব্দালংকারের মধ্যে কবির ধ্বন্যুক্তি এবং অনুপ্রাসের দিকেই বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যমক অলংকার দু'একবার সৃষ্ট হলেও শ্লেষ ও বক্রোক্তি তাঁর কাব্যে বিরল। বস্তুত সুকবি কখনো শব্দালংকারের মোহে

পড়েন না। অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তি বাক্যকে ধ্বনির দিক থেকে অত্যন্ত শ্রুতি-মধুর করে এবং কর্ণে তাদের প্রত্যক্ষ আবেদন এসে পৌঁছয় বলে এ-দুই অলংকারকে উপেক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ঠিক এই কারণেই এ-দুই অলংকারের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। নজরুল ইসলামের একটি কবিতার[২৪] অন্ত্যানুপ্রাসের আকর্ষণ-কাহিনীও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ধ্বন্যুক্তি অলংকারে নিরর্থক শব্দ পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট হয়ে কবিতার মূল অনুভূতিটি উপলব্ধিতে যেমন সাহায্য করে, তেমনই ধ্বনিগত মাধুর্যেও শ্রুতিকে তৃপ্ত করে। উভয় অলংকারের কিছু নিদর্শন উদ্ধৃত করছি। প্রথমেই অনুপ্রাস।

(ক) "নটকনা-রঙ শাড়ীটির ভাঁজে দেহের সকল রেখা
নত-উন্নত তনুটির তটে ছবিটির মত লেখা!" (মাধবী)

(খ) "ইহারি হরষে বরষে বরষে ভুবন-বনে
ফুল-যৌবন একবার জাগে শুভক্ষণে।" (চাঁদর বাসর)

(গ) "নদীয়ার নদীপথে মর্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে।" (বঙ্কিমচন্দ্র)

(ঘ) "চাঁদেরে বেড়িল রামধনু-রঙ কুয়াশায়!" (বিদায়-বাসনা)

(ঙ) "পাপড়ি, কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার মধু—কার মুখ।
নাহি গুঞ্জন, শুধু ভুঞ্জন! সুধাপান—শুধু সুখ।" (আঁধারের লেখা)

(চ) "মেঘে চাপা বাজ! আওয়াজ তবু সে, মিঠা যেন এস্রাজ!"
(নাদিরশাহের জাগরণ)

(ছ) "গুরু-উরুর গুমর-ভরা জোড় পায়েলা পায় বাজে।" (ইরাণী)

(জ) "দিনান্ত সমীরে
বনের মর্মরে শুনি মনেরি বারতা!" (এক আশা)

(ঝ) "তারি টঙ্কার-ঝঙ্কারে রচি রতি-বিলাপের ঋক্!" (স্মরগরল)

(ঞ) "পিপাসার জল, দুটি স্বাদু ফল
সম্বল ছিল তা'র।" (দেবদাসী—স্মরগরল)

(ট) "উচ্ছ্রিত ফণা মূর্চ্ছিত হ'ল বাঁশরীর শ্বাসে শ্বাসে!" (শেষ আরতি)

এইরূপ বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কবির চিত্তে ভাবের অবশ আকর্ষণবশে এই অনুপ্রাস-অলংকারগুলি জন্ম নিলেও দেখা যাচ্ছে, তারা স্বেচ্ছায় অলংকার-শাস্ত্রোক্ত বিধিগুলিকে মঞ্জাররূপে গ্রহণ করেছে। উদ্ধৃত প্রথম দুটি অলংকার বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদাহরণ। প্রথমটিতে 'নত' এবং 'তন' স্বরূপ-সাদৃশ্য অনুসারে সজ্জিত। দ্বিতীয়টিতে 'রষে' ধ্বনিগুচ্ছ তিনবার ক্রমসাদৃশ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত। এরূপ বিন্যাসের

ওপরই এ শ্রেণীর অনুপ্রাসের শ্রুতিসুভগতা। তৃতীয় উদাহরণটির আদিতে 'নদী' শব্দটি একটি যমক অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেছে, পরে 'জ্বল' ধ্বনিগুচ্ছ দ্বিরাবৃত্ত হওয়ায় ছেকানুপ্রাসের সৃষ্টি। চতুর্থ উদাহরণে 'র' ও 'ল' অন্তঃস্বর্বর্ণ হওয়ায় এবং 'দ' 'ধ' ও 'ন' দন্ত্যবর্ণ হওয়ায় শ্রুত্যনুপ্রাসের সৃজন করেছে। পঞ্চমটি যুগপৎ ছেকানুপ্রাস ও অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ। আমাদের সর্বশেষ দৃষ্টান্তটিতে 'শ্বাস' শব্দটি একই অর্থে দ্বিরাবৃত্ত হওয়ায় লাটানুপ্রাসের জন্ম দিয়েছে। অবশিষ্ট অনুপ্রাসগুলিও এইভাবে অলংকারশাস্ত্রোক্ত পথে বিশ্লেষণ করা চলে। মোটের ওপর অনুপ্রাস অলংকার প্রয়োগে কবি যে ঈশ্বরগুপ্ত বা কবিওয়ালাদের মতো উৎকট ধ্বনিসাম্যের মোহাভিভূত কোথাও হন নি—একথা বেশ বোঝা যায়।

কয়েকটি ধ্বন্যুক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(ক) "ঝিনি-ঝিনি করে সকল শিরায় রজনীর রসাবেশ!" (বসন্তবিদায়)

(খ) "হাহা করে হাওয়া, দীপ নিভে যায় সাথীহীন অমারাতি,
(ব্যথার আরতি)

(গ) "ধূ-ধূ ধূ সুদূর প্রান্তরপথে শীত-শেষ রজনীতে।" (স্বপনপসারী)

(ঘ) "টুকটুকে লাল, কেহ বা গোলাপী, কেহ বা শুভ্র দল—"
(আঁধারের লেখা)

(ঙ) "ঝিক্‌ঝিক্ করে' বহিছে নদীটি পাহাড়ের পা'য় পা'য়,"
(নাদিরশাহের শেষ)

(চ) "উত্তর হ'তে হুহু-হুহু –হাওয়া ছুটে আসে দিশেহারা।
(নাদিরশাহের জাগরণ)

অর্থালংকারের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলংকারের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণ। উপমা অলংকার ব্যাপক অর্থে সাদৃশ্যমূলক সমস্ত অলংকারকেই বোঝায়, যেমন 'উপমা কালিদাসস্য'। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে রূপক এবং সমাসোক্তির প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। গূঢ়ার্থ-প্রতীতিমূলক ও শৃঙ্খলামূলক অলংকারের প্রয়োগ তাঁর কাব্যে কম, তবে মাঝে মাঝে বিরোধমূলক অলংকারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মোহিতলালের কবিমনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী এবং তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর সবাপেক্ষা বড় পার্শ্বচর রূপক অলংকার। রূপক ব্যতীত যেন তাঁর বাণী বিকশিতই হতে পারে না। খাঁটি উপমা অলংকারের (Simile) সংহত রূপই হল রূপক (Metaphor)। কাব্যবাক্যকে সংহতিদান ও বাক্যকে সংযত শ্রীমণ্ডিত রূপদান করতে এ অলংকারের জুড়ি নেই। এখানে উপমেয় এবং

উপমানের অভেদ প্রতিষ্ঠা ক'রে উপমানেরই কথঞ্চিৎ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। রূপক অলংকার সাদৃশ্যমূলক অলংকারের অন্তর্গত এবং ব্যাপক অর্থে একে উপমা-অলংকারও বলা চলে। এই উপমা তথা রূপক অলংকারের মহিমা ঘোষণা ক'রে কবি লিখেছেন—"আসলে উহা কবিদের একটি বাণীভঙ্গী এবং তাহাও সকল কবির একরূপ নয়। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি মান্য করিয়া উহার জন্ম হয় না, একটি ভাব কবিহৃদয়কে যেমনই বিদ্ধ করিয়াছে, অমনি সেই বিদ্ধস্থল হইতে, ভাবের সেই শোণিত ধারা হইতে—একটি বাণীপুষ্প আপনি ফুটিয়া উঠে, যাহা মূলে অরূপ বা নিরবয়বী তাহাই অবয়ব ধারণ করিবার জন্য রূপজগৎ হইতে অনুরূপ উপাদান সংগ্রহ করে। ভাবজগতের ও বস্তুজগতের মধ্যে এই যে সেতুযোজনা, ইহাই উপমা, ইহাই আদি এবং চিরন্তন কবিভাষা, ইহা অলঙ্কার নহে।"[২৫]

উদ্ধৃতিতে অলংকার শাস্ত্রের বিধি-বিধানের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ পেলেও অজ্ঞাতে তাঁর কাব্যে যে-সমস্ত অলংকার এসেছে, তারা কিন্তু অলংকারশাস্ত্রের বিধিকে লঙ্ঘন করে নি। তাঁর প্রত্যেক কবিতায় প্রায় প্রতি স্তবকেই এক বা একাধিক রূপক অলংকারের সাক্ষাৎলাভ করা যায়। কাজেই এ অলংকারের মহাভারত সংকলন ক'রে কোনো লাভ নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ক) "আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে" (পান্থ)

(খ) "তাই প্রেম-বৃন্দাবনে তুমি কভু হৃদয়-রাধিকা" (নারীস্তোত্র)

(গ) "কণ্টকে ফোটে রক্ত-কুসুম বাসনা-সুরভি ঢালা" (ব্যথার আরতি)

(ঘ) "এই জন্ম-মালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালবাসা—
প্রকৃতি যোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন!" (পান্থ)

(ঙ) "দেহ-অরণিরে মন্থন করি' লভি যে অগ্নি-কণা—
সেই দহনের মিঠা-বিষে মোর মদনের আরাধনা!" (স্মরগরল)

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রথম দুটিতে রূপক অলংকার কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত। উপমেয় 'বাসনা'কে উপমান 'বহ্নি' বলা। উপমেয় 'চুম্বন'কে উপমান 'বৈশাখী' বলতে হয়েছে। উপমেয় 'প্রেম'কে উপমান 'বৃন্দাবন' মনে করায় হৃদয়কে 'রাধিকা' ভাবতে হয়েছে। একটি বস্তুতে রূপের আরোপ, তার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত অন্য বস্তুতে রূপের আরোপের হেতু হয়েছে—এই জন্যে এ দুটি পরম্পরিত রূপক অলংকার। চতুর্থটিতে 'জন্ম'কে প্রথমত 'মালিকা'র সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা

হয়েছে। পরে জন্ম বা জীবনের অঙ্গ হিসেবে মৃত্যু, ভালবাসা নারী ও পুরুষের সঙ্গে মালিকার অঙ্গ—সূচী, ডোর, ফুল প্রভৃতিরও অভিন্নতা কল্পিত হয়েছে। ফলে এটি একটি সাঙ্গরূপক অলংকারের সৃষ্টি করেছে। শেষটিতে 'দেহ'কে অরণি মনে ক রে পরে ঐ উপমান 'অরণি' প্রসঙ্গে কবির বক্তব্যে প্রাধান্য সূচিত হওয়ায় 'কেবল রূপকে'র সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অলংকারশাস্ত্রের বিধিগুলিকে তিনি অজ্ঞাতেই কেমন মেনে নিয়েছেন। 'বৈশাখী-চুম্বন' সেকালের বাঙলা সাহিত্যে একটি অভিনব রূপক। তাছাড়া চিত্রের দ্যোতনা করাও অলংকারের কাজ। উদাহরণগুলিতে সৃষ্ট চিত্রাবলী একাধিক ইন্দ্রিয়কেও তৃপ্ত করছে

রূপকের পর সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রতি আকর্ষণের কথা বলতে হয়। কবির প্রকৃতি-প্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলিতে প্রচুর সমাসোক্তি অলংকারের নিদর্শন আছে। আবার উপমা অপেক্ষা উপমানকে কিঞ্চিৎ প্রাধান্য দিতে গিয়ে রূপকপ্রিয় কবি যখন এক কোটিক সংশয়ের আবর্তে পতিত, সেখানে অনিবার্য ভাবেই উৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি। আর উপমানের অপ্রতিহত প্রভাবে যেখানে উপমেয় অন্তরালে আত্মগুপ্ত, সেখানে কবিকল্পনার চাতুর্যে অতিশয়োক্তির জন্ম। এই তিন প্রকার অলংকারের কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(ক) "ঊর্দ্ধে আকাশে দশমীর চাঁদ – কাঁসার পাত্রখানি"—(মিনতি)

(খ) "কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী।" (পান্থ)

(গ) "পুঁথি একখানি, এ যেন শুভ্র সুরভি শ্লোকের তোড়া।" (কেতকী)

(ঘ) "দ্রৌপদীর শাড়ী যেন—
"ঊর্দ্ধে হের, অফুরন্ত আলোক নীলিমা।" (জন্মান্তরে)

(ঙ) "জীবনসায়রে ফুটিয়া উঠিব অপরূপ তামরস।" (কামনা)

(চ) "আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর" (উচ্চৈঃশ্রবা)

(ছ) "রূপোর নূপুর বাজায়ে তটিনী—
নটিনী চলেছে একা।" (স্বপনসারী)

(জ) "জ্যোৎস্না এলো জরীর চাদর ধূলায় লুটিয়ে।" (শিউলির বিয়ে)

এখানে প্রথম দু'টি উদাহরণে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার এবং তৃতীয় ও চতুর্থটিতে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম দুটিতে উৎপ্রেক্ষা-বাচক শব্দ নেই, সম্ভাবনার ভাবটি অনুমানসাপেক্ষ। সেইজন্যে তারা প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। অপরপক্ষে পরের দুটিতে ঐ শব্দ 'যেন' থাকায় তারা

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। ৫ম ও ষষ্ঠ উদাহরণে আতিশয্যপূর্ণ উক্তি অতিশয়োক্তি অলংকারের সৃষ্টি করেছে। সপ্তম ও অষ্টম উদাহরণে প্রস্তুতের ওপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, উল্লেখ, সন্দেহ, নিশ্চয়, অপহ্নুতি প্রভৃতি অলংকারের প্রাচুর্য না থাকলেও মোহিতলালের কাব্যে মাঝে মাঝে তাদের প্রয়োগ ঘটেছে। 'শ্রাবণ-রজনী'তে কিশোরী বধূর রূপ বর্ণনায় তিনি যখন বলেন, 'রাইকিশোরীর রূপগুণ হরে আমারি কিশোরী-বধূ' তখন প্রণিধানগম্য বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হয় এবং একই বাক্যে উপমেয় ও উপমানের অবস্থান ঘটায় নিদর্শনা অলংকার দেখা দেয়। 'নারীস্তোত্র'এ কবি যখন একই নারীকে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে স্তব ক'রে বলেন—

"গৃহকোণে দীপ তুমি—আঁধারের মধুর আরতি
বনে তুমি দাবানল দিগন্তের দাহন-উৎসব"

তখন চমৎকার উল্লেখ অলংকার স্বতঃস্ফুর্ত হয়। কল্পনায় যখন কবি স্বর্গীয়-সুন্দর অলৌকিক চিত্রকে বাস্তব বস্তুর ওপর আরোপিত ক'রে চিত্রাঙ্কনে অগ্রসর হন, তখন 'ভ্রান্তিমান' অলংকার দেখা দেয়। 'পুরূরবা', 'পান্থ', 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' প্রভৃতি কবিতায় তার নিদর্শন মিলবে।

উপমেয় ও উপমানের উভয়ত্র সংশয়, উপমেয়কে অপহ্নব ক'রে উপমানের প্রতিষ্ঠা অথবা উপমান অপহ্নবের সাহায্যে উপমেয়ের স্থাপনা—এই তিনের মধ্যে কবির বাণীভঙ্গীর নৈপুণ্য যথেষ্টই আছে। সন্দেহ, অপহ্নুতি ও নিশ্চয় অলংকারের আশ্রয়ে তিনি কিছু কিছু স্থলে সে দক্ষতাও দেখিয়েছেন। 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'মুক্তা নাই, শুক্তি আছে, মুক্তি নয় মন্ত্র জপ করি'—তখন তিনি মন্ত্র জপ করার কথাই বলেন উপমান 'মুক্তি'কে অস্বীকার ক'রে। 'হাসি যে রঙীন ধূলা। অশ্রু নয় অভ্র সে কঠিন'—'পান্থ' কবিতার এই উক্তিতে উপমেয় অশ্রুকে অস্বীকার ক'রে উপমান 'অভ্র'-এর স্থাপনা করা হয়েছে। এখানে প্রথমটিতে 'নিশ্চয়' এবং দ্বিতীয়টিতে অপহ্নুতি অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে। 'রূপকথা' কবিতায় 'ফুল না সে মুখ? যাই বল তাই কি হবে সে ভুল ধরি'—ইত্যাদি উক্তিতে 'ফুল' ও 'মুখ' উভয়দিকে সংশয়জড়িত সন্দেহ অলংকার দেখা দিয়েছে।

'কেতকী' কবিতায় কবি যখন সাপের আলয়ে কেতকী পুষ্পের অসহায় অবস্থার চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে বলেন—

"গরল শ্বাসে মেলিতে পারেনা আপন দীর্ঘদল
গোরাচনা-গোরী পাণ্ডুর হ'ল—যৌবন নিষ্ফল।"

তখন উপমেয় এবং উপমান পৃথক বাক্যে অবস্থান ক'রে প্রণিধানগম্য বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় এবং সাদৃশ্যবোধক পদ-লুপ্তিতে দৃষ্টান্ত অলংকারের সৃজন করে। বলাবাহুল্য মোহিতলালের মধ্যে আমরা মধুসূদনের মতো অতিরিক্ত অলংকরণ-প্রবণতা লক্ষ্য করি না। তবে সীমিত ক্ষেত্রে তাঁর প্রযুক্ত অলংকারগুলি ঔচিত্যবোধের দ্বারা উদ্দীপিত এবং নিখুঁত ও ব্যঞ্জনাময় চিত্রাঙ্কনে সমর্থ। তাঁর কবিহৃদয় গহন-গম্ভীর ভাবের উৎসস্থল বলে তাঁর কাব্যে সংকর-অলংকারই বেশী অর্থাৎ একই বাক্যে একাধিক অলংকারের অবস্থান। উদ্ধৃত অনেক উদাহরণেই এর প্রমাণ আছে। অলংকার প্রয়োগে বিশেষত উপমামূলক অলংকারে উপমান নির্বাচনে কবি ঐতিহ্যকে যেমন অনুসরণ করেছেন, তেমনই বাস্তবজীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভাণ্ডারের দিকেও চেয়েছেন সাধারণভাবে তিনি উপমামূলক অলংকারেরই ভক্ত। আবার বিশেষভাবে রূপক অলংকার তাঁর কবিস্বভাবের অনুকূল—এই হল আমাদের শেষ কথা।

চিত্রকল্প॥ অতঃপর মোহিতলালের কাব্যের চিত্রকল্প সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। অলংকার কাব্যে নিশ্চয়ই চিত্রের সৃষ্টি করে। কিন্তু অলংকার ব্যতীতও চিত্র-সৃষ্টি সম্ভব। অলংকারের আলোচনায় আমরা মূলত কবির অলংকারসৃষ্টি-কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখেছি। কিন্তু অলংকারগুলির আশ্রয়ে যে সমস্ত চিত্র সৃষ্ট হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র দৃশ্যাত্মকই নয়—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারেও সেগুলি উপভোগ্য। তথাপি সেখানে চিত্রালোচনা মুখ্য নয় বলে অলংকারের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

ইংরেজি Imagery বা Image শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দরূপে চিত্রকল্প বিশেষ পরিচিত। পাশ্চাত্যে Metaphor ও Simile এ দুই অলংকারের ঐতিহ্য অতিশয় পুরাতন। এদের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও এ-দুই অলংকারাশ্রিত বা অন্য অলংকারাশ্রিত চিত্রগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা নীরব। রোমান্টিক যুগের পূর্বে পাশ্চাত্যে চিত্রের মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি।[২৬] ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সমালোচকেরা চিত্রকে নিছক অলংকরণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারেন নি।

পরবর্তীকালে Metaphor ও Simileএর সঙ্গে 'পোয়েটিক ইমেজ' বা চিত্রকল্পের যে পার্থক্য নির্ণীত[২৭] হয়েছে, তাতে দেখি যে অলংকারাশ্রিত চিত্র শুধুমাত্র দৃশ্যাত্মক (visual)। কিন্তু চিত্রকল্পের চিত্র একাধিক ইন্দ্রিয়কে— পরিতৃপ্তি দেয়—তা আরও গভীর আরও মধুর। আর দ্বিতীয় কথা বলা হল যে অলংকার গর্ভ চিত্রগুলি কবির সৃজনশীল কল্পনার গভীরতম অংশের সঙ্গে যোগরহিত। অপরপক্ষে চিত্রকল্পের কল্পনায় সেই যোগ নিত্যসম্বন্ধ। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ সমালোচক মিডলটন মারি মহোদয়ের এই মতবাদ তর্কসাপেক্ষ। পাশ্চাত্যে চিত্রকল্প ও অলংকারের সঙ্গে এরূপ পার্থক্য রচনার একটি কারণ আছে বলে মনে করি। তাঁরা আমাদের দেশের আলংকারিকদের মতো ধ্বনি বা রসকে কাব্যের প্রাণ বলে স্বীকার করেন নি। কাব্যাত্মা সম্বন্ধে অনেকখানি সুনিশ্চিত ও সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তের নজির না থাকায় চিত্রকল্প-বাদীরা ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্র বা চিত্রসমষ্টিকে কাব্যের প্রাণ মনে করেছেন। এঁরা সেইজন্যে অলংকারগর্ভ চিত্রগুলির অলংকারমূল্যকে গুরুত্ব দিলেও অলংকারহীন চিত্রকল্পগুলির তুলনায় তাদের চিত্রমূল্যকে স্বীকারই করতে চান নি। আমাদের দেশে রস কাব্যাত্মরূপে ব্যাপক স্বীকৃতি পাওয়ায় নিছক চিত্রের আলোচনায় কেউ অগ্রসর হন নি। রসের অনুকূল হয়ে অলংকার, চিত্র, ছন্দ, শব্দ—যা কিছুর আগমনই কাব্যে ঘটুক না কেন, আমাদের কাছে তা মূল্যবান। অলংকারের বিচারে তাই আমরা চিত্রমূল্যকে বড় ক'রে দেখি না—রসের মূল্যই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু তাই বলে যে আলোচনা আমাদের দেশে অপ্রয়োজন বোধে হয় নি, সে চিত্র যদি অলংকারাশ্রিত হয়েও ব্যঞ্জনাময় হয়—রসের অনুষঙ্গী হয়, তাহলে কেন তাকে মূল্যহীন বলব? চিত্রকল্প-বাদীদের এই ধরনের একদেশদর্শিতা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের বক্তব্য, নিরলংকার চিত্রকল্পও যেমন অলংকৃত চিত্রও তেমনই ব্যঞ্জনাময় হতে পারে। ব্যঞ্জনাগর্ভ এবং রসানুকূল হলেই তাকে সার্থক চিত্রকল্পরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। চিত্রকল্প ও চিত্রের মধ্যে তাই কোনো পার্থক্য করা সমীচীন নয়।

সার্থক চিত্রকল্পের কথা মনে রেখে বলা যেতে পারে যে কবিকল্পনার জয়-যাত্রার ইতিবৃত্ত থাকে চিত্রকল্পে। একটি বিশেষণ, একটি Phrase, একটি বর্ণনামূলক অনুচ্ছেদও চিত্র সৃজনে সক্ষম। কিন্তু কবিতায় কেন এই চিত্রের সমাবেশ? উত্তরে বলা যায়, দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তা, রুক্ষতা, 'প্রাণধারণের গ্লানি' নিরন্তর মানবচিত্তকে পীড়িত করছে। অথচ একটা সুসঙ্গতি, একটা

ঐক্য বা একটা অখণ্ডতার বোধ তার মনে নিয়ত প্রচ্ছন্ন আছে সেই ঐক্য, সেই সামঞ্জস্য কাব্যের জগতেই মানুষ লাভ করতে পারে। চিত্রের সাহায্যেই কবিরা মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় ঐক্যসূত্র যোজনা করেন—বিশ্বপ্রকৃতির গোপন সুর বা বিচিত্র প্রাণস্পন্দনকে মানবজীবনে প্রতিফলিত করেন। জীবনের অসঙ্গতি, জ্বালাযন্ত্রণা বা উল্লাসময় মুহূর্তগুলিকে প্রাকৃতিক জগতের অনুরূপ সুর ও ছন্দের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে কবিরা যে চিত্রসৃজন করেন, তাতে বড় আশ্বাসের কারণ আছে। তখন বহির্বিশ্বের বুকে বিচরণের আনন্দ, আত্মীয়তার সুখ, আপাত বিরোধের অন্তরালে অখণ্ডতা বা সঙ্গতিবোধের বিস্ময়-প্রসন্নতায় মন ভরে ওঠে। ঊর্ধ্বে অনন্ত বিস্তৃত নীলাকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, চন্দ্র, সূর্য, ছায়াপথ, বজ্র-বিদ্যুৎ, মেঘ—নিম্নে পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী—ধরণী বক্ষে প্রভাত, দ্বিপ্রহর, গোধূলি, সন্ধ্যা, রাত্রি—কোন অনাদিকাল থেকে মানুষকে আহ্বান করছে। চিত্রনির্মাণে প্রকৃতিজগতের এই অফুরন্ত ভাণ্ডার কবিদের প্রধান অবলম্বন। আবার হারানো অতীতের গৌরবময় অধ্যায়, পুরাণ ও ইতিহাসের রাজকীয় বা নাটকীয় মুহূর্তনিচয়, বর্তমান সমস্যাপূর্ণ জীবনকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বর্তমান জীবনের চিত্রাঙ্কনেও তাই বিলীয়মান অতীতের গর্ভ থেকে তাঁরা রঙ-রস সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি, দর্শনের অভ্যুন্নতি, জ্ঞানের সমুন্নতি, সমাজমানসের বিবর্তন—প্রভৃতির ফলস্বরূপ মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গীর যে রূপান্তর, তার ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা রাজ্য থেকে কবিদের চিত্রবলী রস সংগ্রহ ক'রে অভিনবত্ব লাভ করে। কাব্য-সমালোচনায় বর্তমানকালে তাই চিত্র এমন সমাদৃত।

কাব্যে চিত্রকল্প সৃজননৈপুণ্যে মোহিতলালও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর পড়াশোনার পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁর বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল আবার তিনি ছিলেন একজন মৌলিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বস্তু সচেতন কবি। সেইজন্য তাঁর কাব্যে আমরা অসংখ্য চিত্রকল্পের সাক্ষাৎ পাই। তাঁর চিত্রকল্পগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, তাঁর জ্ঞানলব্ধ বা পুঁথিগত পরোক্ষ অভিজ্ঞতার চিত্র। দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ মৌলিক ও সজীব চিত্র। প্রথম প্রকার চিত্রগুলি পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বলে সব সময় কিন্তু বিশেষত্ববর্জিত নয়। যে-সব চিত্র জ্ঞানলব্ধ, সেখানেও তিনি 'আপন মনের মাধুরী' রস-সিঞ্চনে কার্পণ্য করেন নি। অবশ্য দ্বিতীয় প্রকার চিত্রেই স্বাধীনতার পূর্ণ অবকাশ। এগুলিতেই তাঁর কৃতিত্ব অধিক। এ শ্রেণীর চিত্রগুলির অধিকাংশই পরিচ্ছন্ন সুন্দর ও ইঙ্গিত-

গর্ভ। কেবল যেখানে কবির মধ্যে সমালোচকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং যেখানে কবিচিত্তের আত্মাভিমান প্রকট, সে-সব ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মগ্নতার ফলে তাঁর চিত্রগুলি অস্পষ্টতার কুহেলিজালে আচ্ছন্ন। কবিচিত্তের দ্বন্দ্বই এর প্রধান কারণ। 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল'এর দ্বন্দ্বমথিত কবিচিত্তের উৎসাররূপে এ-দুই কাব্যে ঐ অস্পষ্ট চিত্র কিছু দেখা দিয়েছে। 'হেমন্ত-গোধূলিতে এরূপ চিত্র বিরল।

মোহিতলালের চিত্রনির্মাণের তিনটি প্রধান কৌশল আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, পরিচিত বা অল্প-অপরিচিত একটি বস্তুকে মূর্তি দেবার জন্যে অধিক পরিচিত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ। দ্বিতীয়ত, অমূর্ত বা অশরীরীকে শরীরীরূপ-দানের নিমিত্ত পরিচিত বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ। তৃতীয়ত, অপরিচিত স্বর্গ, নরক, অলৌকিক ব্যাপার ও অজ্ঞাত রহস্যকে ব্যক্ত করার জন্যে সংস্কার-অনুগ প্রেক্ষাপট সৃজন। তিন প্রকার চিত্রেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

প্রথম প্রকার ক) "আঁধার ঘরে আচম্বিতে জ্যোৎস্না ফিনিক্ ফোটে!
শীতের শেষে প্রথম যেন কোকিল ডেকে ওঠে!"
(চুড়ির আওয়াজ)

(খ) "মসলা-বাটা সে পাথরের মত, চক্‌চকে-তেলা ঘোড়ার পিঠে—"
(বেদুঈন)

(গ) "দড়ির মতন মিহিন মাজা, হাসি ডালিমভাঙা।" (বেদুঈন)

(ঘ) "সাথে থাবে শুধু
একখানি স্মৃতি-মেঘ প্রেমধনু-আঁকা!" (জন্মান্তরে)

(ঙ) "সারাটা-জোয়ান বয়স আমার ছুরীর মুঠাতে আসিবে ছুটে।"
(বেদুঈন)

উদাহরণগুলির প্রত্যেকটি অলংকারগর্ভ চিত্র আছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এখন চিত্রের প্রতি। পরিচিত বস্তুকে অপর একটি পরিচিত বা অধিক পরিচিত উপমানের আশ্রয়ে প্রকাশ ক'রেও চিত্রগুলি উজ্জ্বল, যথোপযুক্ত, সুন্দর এবং স্বাভাবিক। সবগুলি না হলেও প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম দৃষ্টান্তটি নয়ন-ইন্দ্রিয় ছাড়াও শ্রবণ ও অন্তর-ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করছে।

দ্বিতীয় প্রকার (ক) "নিমেষে যেমন পূর্ব্ব-গগনে পূর্ণিমা-সমুদয়,
শ্রেষ্ঠ চেতনা তড়িৎ-চকিত প্রাণ যথা পরশয়,
জনম-অন্ধ নয়ন মেলিলে হেরে সে যেমন করি'—
তেমনই বিভোর করিল তোমার অপরূপ কারিগরি!"
(একখানি চিত্র দেখিয়া)

(খ) "নিঃশ্বাসে যদি একবার তার বুকটি দোলে,
কত ফুল-কলি অমনি মাটিতে মুখটি তোলে,
ভুলে' যাওয়া কোন্ ব্যথার সলিলে
মিটায় তৃষা,
সেথা সুখ নাই, দুখ নাই সেথা,
— দিবা কি নিশা।" (মানস লক্ষ্মী)

(গ) —"মৃত্যুরে হেন মুখোমুখি দেখিয়াছ ?
... ...
... .
বাহির দুয়ারে সম্মুখে একেবারে ?
রক্তনয়ন, বিকটবদন, হাসিতে রক্ত ঝরে
নিঃশ্বাসে বাক্ হরে।
কণ্ঠে রজ্জু, জিহ্বা বিগলিত, ভীষণ দশনমালা,
শ্মশানের ধূম, চিতা-অগ্নির জ্বাল —" (মৃত্যু)

একটি চিত্রকে দেখে মানব অবর্ণনীয় বিস্ময়, বিদেহী মানসলক্ষ্মীর স্বরূপ, জীবনপ্রান্তের নিবিড়তায় দুর্জ্ঞেয় মৃত্যুর রূপ চিত্রগুলিতে কিরূপ শরীরী মূর্তি লাভ ক'রে জীবন্ত হয়েছে, তা লক্ষ্য করবার। বস্তুত উদাহরণ দিয়ে এদের পরিচয় শেষ করা যাবে না। অমূর্ত ভাবকে ও চিরচঞ্চল কল্পনাকে ভাষা ও ছন্দের পটে তুলে ধরবার দুর্লভ ক্ষমতা এখানে লক্ষণীয়। 'বিস্মরণী' কাব্যের 'শিউলির বিয়ে' '[illegible]শরৎ' 'বাঁধন' 'মৃতপ্রিয়া' 'দীপশিখা' 'কালাপাহাড়' 'ঘুঘুর ডাক' প্রভৃতি কবিতায় বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রগুলিই শুধু উল্লেখযোগ্য নয় চিত্র সমষ্টির আশ্রয়ে এই সমস্ত কবিতায় এক একটি প্রতিবেশের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় প্রকার (ক) "বেদনার চেতনায় স্তব্ধ হ'ল সারা চিত্তভূমি,
সোমসূর্য-রথচক্র— নেমিহারা—অনন্ত অম্বরে,
জাগাইল মহাত্রাস— সিন্ধুশেষে দিগন্তর চুমি'।
অস্ত গেল বর্ণচ্ছটা! অন্তহীন তুহিন-নির্ঝরে,
ঢাকা প'ল ধরণীর শ্যামশোভা—বিধবা সে যৌবন সম্বরে!"

(পাপ)

(খ) "সহসা কাননতলে অসম্ভব বিভা
স্থিরদীপ্ত সৌদামিনী, প্রখর ভাস্বর,
দীর্ঘায়ত, অতর্কিতে খসি স্বর্গ হ'তে
ভরিল পাদপস্থলী। সহস্র শাখার
অসংখ্য সে রন্ধ্রময় জালায়ন দিয়া
ঢালিল কৌমুদী-ধারা মেঘ মুক্ত শশী,
আরোহিয়া গগনের গম্বুজ শিখরে;
নিদ্রাতুরা ধরণীর ঢুলনেত্র-উপরি
স্বর্ণ-শতদল যেন উঠিল ফুটিয়া
উচ্চবৃন্তে,— তাহারি সে নাভি-পদ্মনালে।" (পুরূরবা)

মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষে স্বপ্নাঞ্জনটুকু নিঃশেষে মুছে গেলে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। সেই দুর্দিনটি বেদনাবাদী সোপেনহাওয়ারের জীবনে কল্পনা ক'রে কবি সেই ভয়াবহ ছবি অঙ্কনে পরিচিত অপরিচিতের রহস্যে ঘেরা বস্তুনিচয়ের সাহায্য প্রথম দৃষ্টান্তটিতে নিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে পুরূরবার সম্মুখে অলৌকিক এক স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটকে অনুরূপ বস্তুর সহায়তায় উপস্থাপিত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের চিত্রকল্পবাদীদের অতি-সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতি মোহিতলালের কাব্যে সর্বত্র প্রয়োগ ক'রে লাভ নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে তাঁর চিত্রমাত্রেই দৃশ্যাত্মক নয়। পাশ্চাত্যের এ শ্রেণীর সমালোচকদের সুকঠিন অগ্নিপরীক্ষাতেও সমস্ত না হোক, তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা উত্তীর্ণ হতে পারে। 'বেদুঈন' কবিতায় তিনি যখন বলেন 'সারাটা আকাশ একখানা যেন ঝাঁঝরের মত ঝিমিকি বাজে' তখন কি উৎপ্রেক্ষা-গর্ভ চিত্রটিতে আমরা নয়নাভিরাম ঝাঁঝরের ছবিই দেখি? তার বাদ্যধ্বনি কি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে না? কিংবা 'মোহমুদ্গর' কবিতায় যখন তিনি বলেন— হৃদয় বাঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ পঙ্ক টীতলে তিতি অশ্রুজলে'— তখন রূপকাশ্রয়ী এই চিত্র কি আমাদের নয়নকেই তৃপ্ত করে? দেহ ও হৃদয়ের প্রতি মমতায় অন্তরেন্দ্রিয় কি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না? নিশ্চয়ই ওঠে। আর ওঠে বলেই মোহিতলাল চিত্রকল্প-সৃজনে শক্তিমান শিল্পী।

অতঃপর অভিজ্ঞতাসূত্রে জ্ঞানলব্ধ বা পুঁথিগত চিত্রকল্পনার কথা। এ জাতের চিত্রকল্পগুলির দেহে বিভিন্ন শাস্ত্র, কাব্য, দর্শন বা পুরাণের রঙ আছে। কবি প্রয়োজনমতো সেগুলিকে কখনো অবিকল, কখনো যুগোপযোগী ঈষৎ পরিবর্তিত ক'রে প্রয়োগ করেছেন। এ পরিবর্তন অবশ্য

আমাদের দীর্ঘকালাগত সংস্কার বা বাসনাকে আঘাত করে না। বরং তাঁর মৌলিকতা অনেক সময় চমকিত করে। এ শ্রেণীর চিত্ররচনায় বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ, বৈষ্ণব সাহিত্য, কালিদাসের কাব্য, পুরাণের রাজ্য, ইংরেজি সাহিত্য—প্রভৃতি থেকেই কবি প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

বেদের ইষ্টিযাগ, পশুযাগ, সোমযাগ ও পুরুষযজ্ঞ সম্পর্কে কবির একটি স্বচ্ছ ধারণা ছিল। বৈদিকযজ্ঞ বিশেষত পুরুষযজ্ঞ ও সোমযাগের মহিমা তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কাব্যের বহু চিত্র কল্পনার পশ্চাতে এ-যজ্ঞের আদর্শ নিহিত। এ-আদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারই একটি মহাযজ্ঞরূপে কল্পিত হয়েছে। বিরাটপুরুষ স্বেচ্ছায় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কোনো দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য ত্যাগই হল যজ্ঞ। জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপারে যজ্ঞদেবতা বিরাটপুরুষরূপে যজ্ঞপুরুষরূপে নিজেকে ত্যাগ করেছিলেন-আহুতি দিয়েছিলেন। বেদের পুরুষসূক্তে এই যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ঐ যজ্ঞদেবতাকে পশুরূপে বন্ধন ক'রে অন্যান্য দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ভাবী জীবের কল্যাণের জন্য ঐ বিরাটপুরুষ নিজেকে আহুতি দেন। সমস্ত বিশ্বজগৎ ঐ যজ্ঞীয় পশুর দেহ—যাবতীয় জীবের কাছে এ বিশ্ব ভোগ্যরূপে অন্নরূপে নির্দিষ্ট আছে। যাবতীয় জীব হবিঃশেষরূপে একে আত্মস্থ এবং আত্মসাৎ ক'রে বিরাটপুরুষের শরীরে নিজ দেহ মিশিয়ে দিচ্ছে। বিরাটপুরুষ এভাবে নিজেকে কেবলই ত্যাগ ক'রেও বিনষ্ট হচ্ছেন না। মহাকালব্যাপী এই ত্যাগের ব্যাপার চলেছে—এর আরম্ভও নেই—শেষও নেই। এ-যজ্ঞই হল বিশ্বব্যাপার। মানুষের জীবনেও এই পুরুষযজ্ঞের নিত্য আয়োজন। সারাজীবন ধরে মানুষ ইটের পর ইট গেঁথে পুরুষযজ্ঞেরই চিতি নির্মাণ করছে। আর তার কেন্দ্রস্থলে বৈশ্বানর অগ্নির প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে কেবলই আত্মাহুতি দিচ্ছে। এ শুধু ত্যাগের ব্যাপার—এখানে ভোগের কোনো অবসর নেই। এখানে মানুষ একই সঙ্গে যজমান, ঋত্বিক ও দেবতা। মানুষের সমগ্র জীবনই হল এই যজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞের এ-আদর্শের কথা মনে রেখে মোহিতলালের 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতার নিম্নোক্ত অংশগুলি পাঠ করা যেতে পারে।

(ক) "মনে হ'ল পশ্চিমের যজ্ঞ-বেদিকায়
দেবতারা করে যাগ—দীর্ঘ অগ্নিষ্টোম,
উষা তাই নিত্য বলি, সবিতা ঋত্বিক্
হোম করে আপনার পরাণ-বধূরে।

এ রহস্য বুঝিনা যে! তবু কহ শুনি,
সন্ধ্যা-রক্তরাগ, পশুর শোণিত পঙ্ক—
সে কি, মৃত্যু! তোমারি ও আঁধার ললাটে
লোহিত তিলক?" (মৃত্যু ও নচিকেতা)

(খ) "আমি যজ্ঞ, আমি সেই অপরূপ হোম।
যেই অগ্নি সেই সোম—কহি আববার,
ওই দেহ সোমের কলস। যজমান
করে সোমযাগ—করে পান আপনি সে
আপনারে আনন্দই হবিঃশেষ তার।
সে আনন্দ—সেই মৃত্যু—অমৃত-সোপান।
এই যজ্ঞ করেছিনু আমি, নচিকেতা,
তারি ফলে লভিয়াছি ধ্রুব অধিকার
যমলোকে," (মৃত্যু ও নচিকেতা)

এখানে প্রথম চিত্রে নচিকেতা মৃত্যুদেবতাকে মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব কথা বলছেন। মৃত্যুব একটি ভীষণসুন্দর মূর্তি অঙ্কন করতে গিয়ে কবি বৈদিক যজ্ঞকথার তত্ত্বটির সঙ্গে ঋগ্বেদের সূর্য-উষার কাহিনীকে মিলিয়ে চমৎকার চিত্রসৃষ্টি করেছেন। শালবনে সূর্যাস্তের একটি দৃশ্যকে অবলম্বন ক'রে তিনি প্রথমেই অপ্রাপনীয়া কুমারী উষার পশ্চাতে সারা দিনমান সূর্যের পশ্চাদ্ধাবনের কথা অনুমান করেছেন। দিনান্তে প্রণয়ী সূর্যের প্রগাঢ় চুম্বনে উষার কালো কেশপাশ উন্মুক্ত হয়েছে এবং তিনি ধরা দিয়েছেন। এ পর্যন্ত বৈদিক উষা সূক্তের কাহিনী অনুসবণ ক'রে তিনি নিজস্ব কল্পনায় উষাকে বধূবেশে সন্ধ্যায় রূপান্তরিত হতে দেখেছেন এবং মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে তাঁর অধীরতার কল্পনা থেকে বৈদিক যজ্ঞকথার আদর্শে চিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে। তখন পশ্চিমের দিগন্তে তিনি দেবতাদের যজ্ঞবেদী লক্ষ্য ক'রে সেই চিতাতে যজমান বা ঋত্বিক সবিতা কর্তৃক পরাণবধূ উষার নিত্য পশুরূপে উৎসর্গের কল্পনা করেছেন - আর দিগন্তের রক্তিমাকে উৎসর্গিত পশুর বা উষার শোণিত পঙ্করূপে অনুভব করা হয়েছে। চিত্রটি মৃত্যুর রহস্যোদ্‌ঘাটনে সার্থক।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে মৃত্যুদেবতা যে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলেছেন, তাতে বৈদিক পুরুষযজ্ঞেরই আদর্শ সক্রিয়। কবি মৃত্যুদেবতার মুখ দিয়ে বলেছেন, দিব্যজ্ঞানরূপী যে অগ্নিবৈশ্বানর জীবেরও প্রাণ, সেই অগ্নির যজ্ঞ-বেদিকা বা চিতি হল মানুষের দেহ। দ্যুলোকে অবস্থানকারী উত্তর দিকের

রাজা সোমদেবতা (মর্ত্যে যাঁর প্রতিনিধি সোমলতা) এবং অগ্নিবৈশ্বানর যখন অভিন্ন, তখন মানুষের দেহ সোমেরই কলস। মানুষের প্রাণ ঐ যজ্ঞের হবিঃ। বিরাটপুরুষের যজ্ঞে বা বিশ্বযজ্ঞে বিলিয়ে দিয়ে যজমান মানুষ আত্মোৎসর্গ করছে। আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে যজমান আনন্দস্বরূপ হবিঃশেষ পান ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠছে। এ মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোনো মহাশূন্যতার রাজ্যে গমন নয়। এ হল বিরাটপুরুষের দেহে নিজেকে উৎসৃষ্ট ক'রে জীবনে পুরুষযজ্ঞের মৃত্যুঞ্জয় অনুষ্ঠান।

'বিস্মরণী'র 'নবতীর্থঙ্কর' 'স্মরগরল'এর 'রূপার্ট ব্রুক' 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'মধু উদ্বোধন' 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'প্রশ্ন' 'নির্ব্বেদ' 'নমস্কার' প্রভৃতি কবিতার অংশ বিশেষে কবি ঐ যজ্ঞীয় তত্ত্বকথাকে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। উদ্ধৃতি বাহুল্যের ভয়ে সেগুলির বিশ্লেষণ আর করছি না।

ঋক্‌বেদে প্রায় দু'শত শ্লোকে অগ্নিদেবতার বন্দনা আছে। 'অগ্নি-বৈশ্বানর' কবিতায় ঋক্‌বেদীয় অগ্নির মূর্তি নানাভাবে নানাস্থলে চিত্রে বিধৃত; 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের 'শ্রীপঞ্চমী' কবিতায় বাগ্দেবীর বন্দনায় অনেকগুলি বৈদিকচিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'সোমপায়ীর গান' কবিতাটি বৈদিক কবিতারই অনুবাদ। এতেও কতকগুলি সুন্দর বৈদিক চিত্র আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের হরগৌরীর চিত্র, মদনের মূর্তি, অনঙ্গের কল্পনা, 'মেঘদূতে'র অনেক খণ্ড চিত্র এবং 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের কয়েকটি চিত্র মোহিতলালের বিশেষ প্রিয় ছিল। নানা প্রসঙ্গে এগুলি তাঁর নিজ কাব্যের চিত্রনির্মাণে সহায়ক হয়েছে। অবশ্য এ-সব স্থলে তিনি কালিদাসের চিত্রকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নি। অনুসরণের মধ্যেও নিজ মৌলিকতার স্বাক্ষর অনুপস্থিত নয়; 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের ৫ম অঙ্কের ২নং শ্লোকটি তাঁর অনেকগুলি চিত্রের মূলাদর্শে বর্তমান।

> "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বম্
> ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।"

কালিদাসের এ-শ্লোকের অন্তর্গত চিত্রের প্রভাব তাঁর নিম্নলিখিত চিত্রগুলিতে লক্ষণীয়।

(ক) "সন্ধ্যা-মেঘের ছায়াখানি যেথা ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সাথে
মিলাইয়াছিল, দেখা হ'ল দোঁহে সে মোহের মোহানাতে;

শুধালেনা কিছু—জনমান্তর-সৌহৃদ যেন স্মরি
আপন আসনে আগন্তুকেরে বসাইলে হাত ধরি।"
(নামহীন উৎসর্গ-বিষয়ক কবিতা, হেমন্ত-গোধূলি)

(খ) "সন্ধ্যা বেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে।"
(এক আশা, স্মরগরল)

(গ) "কত বর্ষ কত ঋতু ঘুরে গেছে কালচক্র পরে,
মোর আয়ু ব্যাপিয়াছে ভাব স্থির একটি নিমেষ।"
(যাত্রাপথে, হেমন্ত গোধূলি)

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'এর হরগৌরীর চিত্র তাঁর 'পান্থ' কবিতার ২৬নং স্তবকটির চিত্রনির্মাণে, 'স্মরগরল' কবিতার শেষ স্তবকটির সৃষ্টিতে ও 'রুদ্র-বোধন'-এর চতুর্থ স্তবকটির সৃজনে সহায়তা করেছে। 'মেঘদূত'এর 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিতৈস্তত্র' ইত্যাদি শ্লোকের ছায়ায় 'স্মরগরল' কবিতায় 'অঙ্গদে ফুরে বিদ্যুদ্দাম' রচিত হয়েছে 'কুমারসম্ভব'এর 'পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ' (৩৷৩৯) ইত্যাদি চিত্রের সূত্রে 'নারীস্তোত্র' কবিতায় 'পর্য্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবনম্রা বসন্তের নব অশোকাশোভন' প্রভৃতি এসেছে।

জয়দেবের প্রতিও তাঁর বিশেষ প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। 'স্মরগরল' কাব্যটির নামকরণের কথা ছেড়ে দিলেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের সেই বিখ্যাত শ্লোক 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ'এর চিত্র 'কবিবরণ' কবিতার ৪র্থ স্তবকের ও 'সত্যেন্দ্রনাথ' সনেটটির ঘটক অংশের মূলে লক্ষ্য করা যায়।

'বিস্মরণী' প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে থেকেই কবি তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন। তন্ত্রতত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আধুনিক জীবনোপযোগী ক'রে নিতে পারলে তন্ত্রতত্ত্বেই জীবনের চরম সত্য মিলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর 'শব সাধনা' কবিতাটিতে 'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' কবিতার মূল ভাববস্তুতে 'শরৎচন্দ্র' 'রুদ্র বোধন' 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'নাগার্জ্জুন, প্রভৃতি কবিতার নানাস্থলে তন্ত্রের খণ্ডচিত্র লক্ষ্য করা যায়। দু'একটির নিদর্শন দিই—

(ক) "শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা-বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জাগে।" (শরৎচন্দ্র)

(খ) "কামের পূজারী আমি, হে মহেশ। দেহযন্ত্রে করিয়াছি
নাড়ী-চক্রভেদ।" (নাগার্জ্জুন)

(গ) "রমণীর দেহ-মণিপদ্মে যেই আলোক উথলে—
জন্মান্ধের কিবা তায়?—স্পর্শ করে মৃদ্‌ভাণ্ড শুধু করতলে।"
(নারীস্তোত্র)

পিতা নন্দলাল মজুমদার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু জীবনকালী রায়[২৮] দুজনেই ছিলেন আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক। এঁদের প্রভাবে মোহিতলালের কাব্যের চিত্রকল্পে কয়েকটি স্থলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ছায়া আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

(ক) "মর্ত্ত্য পারিজাত ওই দু' অধর শোণিত-বরণ,
পিপাসার মৃত-সঞ্জীবনী—
নিবিড় চুম্বন যার—মুমূর্ষুর স্বচিকাভরণ,
নেচে ওঠে সকল ধমনী" (অকালসন্ধ্যা)

(খ) "জরা-মৃত্যু—বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান—
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' দানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
বিষের ঔষধ-বিষ পিয়াইলে, ভিষক্-প্রধান।" (বুদ্ধ)

(গ) "এই সুগঠন দেহ-উদূখলে
কঠিন মর্ম্ম দলি কুতূহলে,"
আমি নিদাঘের দাবদাহে রচি হিন্দোল-মূর্চ্ছনা।" (স্মরগরল)

এখানে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির চিত্র-ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রথমটিতে 'পিপাসার মৃতসঞ্জীবনী' বা 'মুমূর্ষুর স্বচিকাভরণে'র চিত্র কিংবা তৃতীয় উদ্ধৃতির দেহকে উদূখল মনে ক'রে মর্মদলনের চিত্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয়।

এছাড়া রবীন্দ্র কাব্যের অনেক চিত্র, বৈষ্ণব কাব্যের কিছু চিত্র, পুরাণ ও ইতিহাসের বিভিন্ন চিত্র, ওমরের কিছু কবিবচন, সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, গীতার বাণী প্রভৃতি—মোহিতলালের চিত্রকল্পনাকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। কীটসের 'To Autumn', 'The Eve of St Agnes', 'Faney' 'Ode' 'Hyperion', টেনিসনের 'In Memorium' 'The Ptincess' 'Morte D' Arthur, সুইনবার্নের 'Atalanta in Calydon', 'Hymn to Proserpine,' 'Thalassius' 'Ilicet' আর্নল্ডের 'Philomela', 'Sohrab and Rustum', ব্রাউনিঙের প্রণয়-কবিতা—প্রভৃতি বিভিন্ন কাব্যের বহু খণ্ডচিত্রের সহায়তায় তিনি কাব্যলক্ষ্মীর শৃঙ্গারবেশকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন। চিত্রকল্প-রচনে তিনি যে একজন দক্ষ শিল্পী এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছন্দ ॥ মোহিতলালের কাব্যের ছন্দোগত মাধুর্য ও রূপবৈচিত্র্য বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর শ্রুতি ছিল অত্যন্ত সচেতন। ছন্দের গতিসৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে তিনি কখনোই অসতর্ক নন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে কবি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিগৌরব, অক্ষয়কুমার বড়ালের ছন্দো-লালিত্য, ছন্দোযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের বিচিত্র দোল, রবীন্দ্রীয় ছন্দের সম্মোহন, ইংরেজি সাহিত্যের প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিগোষ্ঠীর নিখুঁত কাব্যছন্দ, বিশেষত ডি, জি রসেটির সনেটের গঠন-পারিপাট্য, টেনিসনের সৌষ্ঠবযুক্ত ছন্দের অপরূপতা—প্রভৃতি তাঁকে নিজ কাব্যের ছন্দোনির্মাণে সচেতন, উৎসাহী ও অনুরাগী করেছিল। অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অনুবাদ রচনার ভিতর দিয়ে তিনি বাঙলা ছন্দের মূল তত্ত্বটি চমৎকার হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ছন্দোবিজ্ঞানে তিনি কিরূপ নিষ্ণাত ছিলেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর 'বাংলা ছন্দ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করতেন, "ছন্দ কবিতার প্রসাধন বা অলংকার নয়—ছন্দ কাব্যেরই অঙ্গ,…ছন্দ যেখানে বাণীর অঙ্গ হইয়া উঠে নাই, সেইখানেই আমরা কাব্যের কৃত্রিমতা অনুভব করি।"[২৯]

কবিতার রসরূপের অঙ্গীভূত হয়েই মোহিতলালের কাব্যে ছন্দের আগমন এবং অধিকাংশ কবিতায় সে ছন্দ ত্রুটিহীন।[৩০] সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো তিনি ছন্দো-বৈচিত্র্যের অতিরিক্ত মোহে পতিত হন নি। তাঁর কাব্যের ছন্দ সম্পর্কে এটি একটি বড় কথা। কিন্তু প্রচলিত বাঙলা ছন্দগুলির নির্ভুল অনুসরণ এবং ভাবানুযায়ী ছন্দ-ব্যবহার করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। কোনো মৌলিক ছন্দের স্রষ্টা না হয়েও তিনি এক্ষেত্রে বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রচলিত ছন্দ-গুলিকে বিচিত্রভাবে বাজিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছেন। বাঙলা ভাষায় প্রচলিত তিন জাতের ছন্দের মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অধিক—আবার এ দুয়ের মধ্যে অক্ষরবৃত্ত জাতীয় ছন্দই ছিল তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাহন। বাঙলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় তাঁর দানের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য হলেও এই কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি।

(ক) উদাত্ত-গম্ভীর ভাবের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ থাকায় মোহিতলাল তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বরণ করেছেন। এই ছন্দের অন্তর্গত পয়ার (৮+৬) দিঘক্ষরা (১০+১০) এবং মহাপয়ার (৮+১০) এ রচিত তাঁর কবিতাগুলি ছন্দের গতি-সৌন্দর্যে অপরূপ।

(খ) কবি মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য বা ধাতুপ্রকৃতি সঠিকভাবে পরবর্তীকালে অনেকেই অনুধাবন করতে পারেন নি। এ ছন্দে যতি ও ছেদের সহাবস্থান যে অনিবার্য নয়, ভাবপ্রবাহই আসল এবং এতে ছেদের গুরুত্ব যে বেশী ও অন্ত্যমিল-যোজনা যে বারিত—এ তত্ত্ব তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন। মধুসূদনের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে রচিত তাঁর 'মধু-উদ্বোধন' কবিতাটি অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক দৃষ্টান্ত। প্রসিদ্ধ 'পুরূরবা' কবিতায় এবং 'যম ও নচিকেতা'য় (নেপথ্যে পিতৃগণের গান অংশটুকু ব্যতীত ; এ ছন্দের সার্থক প্রয়োগ আছে।

(গ) কবি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের বিশিষ্ট অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতি মোহিতলালের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্র-প্রবর্তিত এই ছন্দকে গ্রহণ ক'রে পঙ্‌ক্তি ও স্তবকসজ্জায় রবীন্দ্র-অনুকরণের মধ্যেও তিনি কতকটা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত তাঁর 'মহাপ্রয়াণ' কবিতাটি পাঁচটি বিভিন্ন আয়তনের স্তবকে গঠিত। প্রতি স্তবকে চরণ বা পঙ্‌ক্তি সজ্জার মধ্যেও সর্বত্র অন্ত্যমিল নেই। কিন্তু প্রতি চরণের মূলপর্বটি ৮ মাত্রার হওয়ায় এবং অন্যান্য পর্বগুলি ৮, ১০ কিংবা ৬ মাত্রার হওয়ায় কবিতাটি 'বলাকা'র বিশিষ্ট ছন্দের কথা স্মরণে আনে। তাঁর 'প্রেতপুরী' ও 'নাগার্জুন' কবিতাতেও এই আদর্শ অনুসৃত। 'বলাকা'র কোনো বিশেষ কবিতার পুরোপুরি অনুসরণ অবশ্য তাঁর কবিতা-বিশেষে নেই।

(ঘ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত সনেট ও সনেট-পরম্পরা রচনায় তাঁর সাফল্য অসাধারণ। সনেট রচনায় সিদ্ধকাম শিল্পীরূপে বাঙলা সাহিত্যে তিনি অনন্য ; সেই জন্যে পরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

(ঙ) রবীন্দ্রনাথের মতো সমিল প্রবহমান পয়ার ছন্দেও কবিতা লেখার আগ্রহ তাঁর 'স্বপনপসারী'র কালে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থবহির্ভূত একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

"সারাদিন ধরি'
বসে' থাকি, শুয়ে কভু, শূন্য বিছানায়
জানালার ধারে। চেয়ে দেখি আঙিনায়
ভ্রমিছে শরৎ-রৌদ্র, উর্দ্ধে নীলাম্বর—
এখনো রয়েছে চাঁদ, শীর্ণ কলেবর।

(রোগ-শয্যার চিঠি)

(চ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরেই মোহিতলালের কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্থান। এই ছন্দের মূল পর্ব ৪, ৫, ৬, ৭ বা ৮ মাত্রার হলেও তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল ৬ মাত্রার প্রতি। কিন্তু এরও মূলে আছে তাঁর পয়ার ছন্দের প্রতি আকর্ষণ। তিনি এ-বিষয়ে নিজেই বলেছেন—"গীতিচ্ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত) পয়ার জাতীয় ছন্দ হইতে বিলক্ষণ হইলেও তাহাতে সাধু ভাষার উচ্চারণ রীতির প্রভাব আছে, পর্ব্বগত ঝোঁক সত্ত্বেও স্বরধ্বনির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না। এই ছন্দের গঠন-বিশেষে ইচ্ছামত ঘন ঘন ঝোঁক এবং সেই ঝোঁককে একটু প্রবলতর করিবার উপায় থাকিলেও, পয়ারের আভ্যন্তর গতি বা লয় ইহাতে অনেকখানি বজায় রাখা যায় —স্বরসঙ্কোচন ও স্বর-প্রসারণের দ্বারা ইহার ধ্বনিস্রোতকে গম্ভীর ও বিলম্বিত করা যায়।"[৩১] পয়ারের 'গতি বা লয়' মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'অনেকখানি বজায় রাখা যায়,' বিশেষত ৬ মাত্রার মূল পর্বেই তার সম্ভাবনা বেশী বলে তিনি এই ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'বিস্মরণী' কাব্যে ২৫টি কবিতার মধ্যে ১০টি ৬ মাত্রার মূল পর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত—যেমন মানস-লক্ষ্মী, ব্যথার আরতি, কালাপাহাড়, দীপ-শিখা, অগ্নি-বৈশ্বানর, মাধবী, বাঁধন, মৃত-প্রিয়া, মৃত্যু-শোক ও বিস্মরণী। 'স্মরগরল' কাব্যে সনেটগুলি বাদ দিলে যে ২২টি কবিতা থাকে, তার মধ্যে ১০টি ৬ মাত্রার মূলপর্বযুক্ত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত—যেমন স্মরগরল, দেবদাসী, মিলনোৎকণ্ঠা, রুদ্র-বোধন, বসন্ত-বিদায়, চাঁদের বাসর, নিশি-ভোর দিনশেষে বিদায়-বাসনা ও শেষ আরতি। এই তথ্য থেকে আশা করি আমাদের উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। ৪, ৫ কিংবা ৮ মাত্রার মূলপর্ববিশিষ্ট মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কাব্যলক্ষ্মী 'ললিতলবঙ্গলতা' হয়ে পড়বেন—এই আশঙ্কায় তিনি এদের বর্জন করেছেন। অনুবাদ-কবিতায় একটিমাত্র স্থলে একবারমাত্র তিনি ৭ মাত্রার মূলপর্বযুক্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন,

১ ১ ২ ২   ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
"চলেছি ভোর হ'তে | সাঁঝের পুরীপানে = ৭ + ৭
২ ১ ১ ২ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
পথের শ্রম হরি' | তাদে'রি গানে গানে!" = ৭ + ৭ (নমস্কার)

(ছ) বাঙলা ছন্দের ক্ষেত্রে স্তবক সজ্জায় ও মিলযোজনায় মোহিতলাল যথেষ্ট মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এ'দুটি বিষয়ও পৃথকভাবে আলোচিতব্য।

(জ) শ্বাসাঘাত প্রধান বা ছড়ার ছন্দের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল

না। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে তিনি এ ছন্দকে 'ভেকপ্রলম্ফী' ছন্দ নামে আখ্যাত করেছেন। ছড়ার ছন্দ কথ্য বাঙলাভাষার ছন্দ বলে গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশের উপযোগী হবে না—এইরূপ বিশ্বাসের জন্যে মোহিতলাল এ ছন্দের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে এ ছন্দ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের হাতে যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে, তা তিনি স্বীকার করেছেন। আর নিজেও অনেকগুলি কবিতায় এ-ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। শিশু বা কিশোরদের জন্যে রচিত 'রূপকথা' কাব্যের কতকগুলি কবিতায়, 'স্বপনপসারী' কাব্যের চুড়ির আওয়াজ, পদ্মমঙ্গল, ক্ষ্যাপা, ঘরের বাঁধন, বেদুঈন কবিতার অন্তর্গত 'গান'এর প্রথম অংশে 'বিস্মরণী'র কল্প-শরৎ, শিউলির বিয়ে, সত্যেন্দ্র-বিয়োগে, বাদলরাতের গান ও ঘুঘুর ডাক কবিতায় এবং 'স্মরগরল'এর 'নূতন আলো' ও 'প্রেম ও ফুল' (কাহিনী অংশ) কবিতায় তিনি এই ছন্দকেই বাহন করেছেন। উপরের ঐ তথ্য থেকে দেখা যায় এ ছন্দের ব্যবহার তার কাব্যে উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়েছে।

(ঝ) বাঙলা ছন্দে মিলের দিক দিয়ে মোহিতলাল একটি অভিনব রীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত শ্লোকের ন্যায় ইংরেজি ছন্দের অনুকরণে মিলহীন চতুষ্ক লেখার ইচ্ছা একদা তার মধ্যে প্রবল হলে তিনি একটি কবিতার অনুবাদকালে সে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইংরেজ কবি টেনিসনের 'দি প্রিন্সেস' কাব্যটির একটি স্থলের অনুকরণে তিনি 'নিশীথরাতে' কবিতাটিতে এই অভিনব ছন্দটিকে আমদানি করেছেন। কিন্তু অচিরেই তিনি এ ইচ্ছা দমন করেন। এই ছন্দোবন্ধকে তিনি বাঙলাভাষায় 'দুর্বল ও অসম্পূর্ণ'[৩২] মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'মানসীর' 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় মিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত মোহিতলালকে কতকটা উৎসাহিত ক'রে থাকবে। তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এ রীতির জনক। অতঃপর তার কাব্যের পদবন্ধ বা স্তবক, মিল ও সনেটের আঙ্গিক সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস এ সবক্ষেত্রে তার কবিরূপে বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

পদবন্ধ বা স্তবক

ইংরেজি Stanzaর প্রতিশব্দরূপে মোহিতলাল 'পদবন্ধ'[৩৩] শব্দটি নির্বাচিত করেছিলেন। পয়ার ছন্দের পদবন্ধ রচনায় তার কৃতিত্ব লক্ষণীয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তার পদবন্ধগঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-অনুসারী। দীপ-শিখা, শেষ আরতি, দুঃখের কবি, কালবৈশাখী প্রভৃতি কবিতায় ৬ অথবা ৫ চরণের পদবন্ধ,

পরস্পর দুই চরণে অন্ত্যমিল, প্রতি স্তবকের প্রথম দুই ও শেষ দুই চরণের শেষ পর্বগুলি অপূর্ণপদী এবং কখনো কখনো চরণের মধ্যেও অতিরিক্ত মিলযোজনার সাহায্যে পদবন্ধটিকে শ্রুতিমধুর করার প্রয়াস আছে। স্বপনপসারী, মৃত্যু-শোক, দেবদাসী প্রভৃতি কবিতায় একই ছাঁদের পদবন্ধকে বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে সজ্জিত ক'রে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে নূতনত্ব আনতে চেয়েছেন। কোথাও বা পদবন্ধের ভাবগত সম্পূর্ণতাকে চোখের নিকট স্পষ্ট ক'রে তোলবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি কোনো একটি পদ, পদনিচয় বা পঙক্তির আবর্তন দেখিয়েছেন—যেমন, 'নতুন আলো' কবিতাটির প্রথম পদবন্ধের প্রথম ও ষষ্ঠ পঙক্তিতে 'রুদ্ধ বাতায়ন' অংশ, তৃতীয় পদবন্ধের প্রথম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে 'শ্বাস' পদটি, চতুর্থ পদবন্ধের প্রথম ও ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে 'ঘুমহারা কোন্ পাখী' অংশটি। 'বিদায়-বাসনা' কবিতাটির প্রথম পদবন্ধের তৃতীয় পঙ্‌ক্তি, দ্বিতীয় পদবন্ধের চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে পুরোপুরি আবর্তিত হয়েছে। এরূপ অনেক আছে। এ-বিষয়ে 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে মোহিতলাল লিখেছেন—"এইরূপ পুনরাবৃত্তি বাংলা গীতি কবিতায় স্বভাবসিদ্ধ বলিলেও হয়—পুরাতন কবিরাও ইহাতে রীতিমত অভ্যস্ত ছিলেন।…রবীন্দ্রনাথই ইহাকে সত্যকার কাব্যছন্দের মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। এইরূপ পুনরাবৃত্তির একটি সুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা সহজেই পদবন্ধগুলিকে বদ্ধ করা যায়, অর্থাৎ উহার ভাবস্রোতকে পৃথক করিয়া একটি সমাপ্তিচিহ্ন দেওয়া যায়।"[৩৪]

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লিখিত কবিতাগুলির পদবন্ধে মোহিতলাল মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আনয়নের চেষ্টা করেছেন। 'বিস্মরণী'র 'বাঁধন' কবিতায় প্রতিটি পদবন্ধকে কবি দশটি পঙক্তিতে সজ্জিত করেছেন। প্রথম পদবন্ধের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'কলভাষে' শব্দটি ঐ পদবন্ধের দশম পঙ্‌ক্তিতে আবর্তিত। আবার শেষ পদবন্ধে প্রথম পদবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি পুরোপুরি আবর্তিত। কবিতাটির পদবন্ধের গঠন অপরূপ। চরণগুলিকে ভেঙে পঙ্‌ক্তির আকারে লিখে এ কবিতায় কবি মিলেরও অভিনব খেলা দেখিয়েছেন। 'দীপ-শিখা' কবিতার পদবন্ধে ঈষৎ হস্তক্ষেপের ফলে 'দিন-শেষে' কবিতার পদবন্ধে বৈচিত্র্য এসেছে। এখানে ৫ম চরণকে ভেঙে তিনি দু'টি পঙ্‌ক্তিতে লিখে মোট ৭ পঙ্‌ক্তির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পদবন্ধ রচনা করেছেন। 'নিশি-ভোর' কবিতায় কবি ৭ চরণের পদবন্ধকে ১৪ পঙ্‌ক্তিতে ভেঙেছেন—প্রতি চরণের অপূর্ণপদী পর্বটিকে একটি পৃথক পঙ্‌ক্তির মর্যাদা দেওয়ায় এই বৈচিত্র্য। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'রূপদর্পণ' কবিতাটির পদবন্ধের সৌন্দর্য তিনি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন।[৩৫]

ছড়ার ছন্দে লিখিত 'ঘুঘুর ডাক' ও 'বাদল রাতের গান' কবিতা দু'টিতে পদবন্ধের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমটির পদবন্ধগুলির পঙ্‌ক্তি সংখ্যা এক নয়। ৭টি পদবন্ধে যথাক্রমে ১০, ৯, ৯, ১২, ১১, ১০ ও ১৩ পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় কবিতাটির পাঁচটি পদবন্ধে যথাক্রমে ১২, ১৪, ১৬ ও ১২ পঙ্‌ক্তি। বলা বাহুল্য এ ছন্দের পদবন্ধ-নির্মাণে মোহিতলালের কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব নেই।

পয়ারছন্দে রচিত কবিতাগুলির পদবন্ধগঠনে কবির নৈপুণ্য সর্বাধিক। 'বিস্মরণী'র 'স্পর্শ-রসিক', 'হেমন্ত গোধূলি'র 'শ্রীপঞ্চমী' এবং 'স্মরগরল'এর 'কবিবরণ' কবিতায় পদবন্ধের কলাকৌশল কবি নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন। এই কবিতাগুলির পদবন্ধে দূরান্তরত মিল বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। মহাপয়ারে রচিত 'বুদ্ধ' কবিতার পদবন্ধে মোহিতলাল বহু পঙ্‌ক্তিতে ঐ দূরান্তরিত মিলের ক্রিয়া পরীক্ষা করেছেন। হ্রস্ব-দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিসজ্জার নিপুণতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত 'মোহমুদ্গর' কবিতাটিও পদবন্ধে মৌলিকতা দাবি করে। ইংরেজ কবি কীটসের 'ওড্ টু নাইটিঙ্গেল' এবং সুইনবার্নের Ave Atque Vale কবিতার পদবন্ধের আদর্শে মোহিতলাল 'স্মরগরল এর 'প্রেম ও জীবন' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' কবিতা দু'টি লিখেছেন। 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' কবিতায় দুটি চতুষ্ক ও একজোড়া সমিল পঙ্‌ক্তি ছাড়া পদবন্ধে আর কিছু নেই—আছে কেবল মিলবিন্যাসের অপরূপ চাতুর্য। সুইনবার্নের কবিতার পদবন্ধের দুরতিক্রম্য আকর্ষণের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি নিজেই লিখেছেন—

"ছন্দ ও মিলের এমন সূক্ষ্ম কলাকৌশল আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাই আমাদের কবিগুরুকে বাংলা ছন্দের সেই যাদুকরকে স্তুতি নিবেদন করিবার জন্য আমি এই ইংরেজি পদবন্ধের সাহায্য লইয়াছিলাম। আত্মকৃতির মোহবশে ইহাও মনে করি যে আমার এই রচনাটিও বাংলা পদবন্ধের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।"[৩৬]

ইংরেজি Spencerian Stanza-র আদর্শে 'স্মরগরল'এর নামীস্তোত্র কবিতাটি লিখিত। ইংরেজিতে এটি ৯ চরণের পদবন্ধ, এতে Iambic pentametreএ লেখা দু'টি চতুষ্ককে একটি Alexandrine metre দ্বারা যুক্ত করা হয় এবং শেষের চরণটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়। এর মিলবিন্যাস কখ কখ খ গখ গগ। ইংরেজিতে 'It is a stanza admirably suited to a lengthy narrative and descriptive poem with lofty

rhetorical passages.[৩৭] বাংলাভাষাতেও এ-ছন্দ যে অনুরূপ ভাবপ্রকাশের বাহন হতে পারে মোহিতলাল তা দেখিয়েছেন।

'স্মরগরল'এর 'শেষশিক্ষা' কবিতাটির পদবন্ধে ইংরেজি Terza Rima-র আদর্শ অনুসৃত হয়েছে। ইংরেজি আদর্শে এই কবিতাটির পদবন্ধ তিন চরণের। প্রথম ও তৃতীয় চরণে পরস্পর অন্ত্যমিল এবং দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় পদবন্ধের প্রথম ও তৃতীয় চরণের অন্ত্যমিল।

আমাদের ধারণা মোহিতলালের অতিবিখ্যাত 'পান্থ' কবিতায় ইংরেজি Rhyme Royalএর ছাঁচ অনেকখানি রক্ষিত হয়েছে। সাত চরণের এই পদবন্ধে মিলবিন্যাস কখ কখ খ গগ। 'পান্থ' কবিতার পদবন্ধের শেষ চরণগুলি ২২ মাত্রার অর্থাৎ কিছু দীর্ঘ। ইংরেজি ছন্দের মিলটিকে পঞ্চম চরণে দূরান্তরিত ক'রে কবি অবশ্য কিছু নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন।

গ্রের 'এলিজি'র 'কোয়াট্রেন' ছন্দে মোহিতলাল 'ফার্সীফরাস' এবং 'পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে' রচনা করেছেন। এর মিলবিন্যাস কখ কখ।

সুইনবার্নের আদর্শে কবি একটি কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সম বা অসম—আয়তনের পদবন্ধ গঠন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'সুইনবার্নের অনুসরণে' ও 'সাকী' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে। প্রথমটিতে ১২ পঙ্‌ক্তির দুটি পদবন্ধ এবং শেষেরটিতে ৭, ১০, ও ১১ পঙ্‌ক্তির তিনটি পদবন্ধ।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত দিগক্ষরা (১০+১০)=২০ মাত্রার দু'টি চরণকে ১০ মাত্রার ৪টি পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে কবি 'স্মরগরল'এর 'নির্বাণ' কবিতাটি লিখেছেন। অতি প্রচলিত পয়ারের দীর্ঘ ত্রিপদীকেও নূতনভাবে সাজিয়ে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াস দেখা যায় 'স্মরগরল'এর 'রূপমোহ' কবিতায়। ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার ত্রিপদীর চরণ এখানে ১৬+১০ এই দুই পঙ্‌ক্তিতে সজ্জিত। এখানে চরণ-মধ্যগত মিল বর্জিত হলেও অন্ত্যমিল রক্ষিত। 'স্মরগরল' এর 'জ্যোৎস্না-গোধূলি' ও 'বিভাবরী' কবিতায় পদবন্ধ গঠনে নূতনত্ব আছে। প্রথম কবিতাটিতে দীর্ঘ ত্রিপদীর (৮+৮+৮+৬=৩০) সঙ্গে প্রথমে ও শেষে ৮+৬=১৪ মাত্রার একটি ক'রে দু'টি চরণ যুক্ত করা হয়েছে প্রতি পদবন্ধে। এর ফলে পদবন্ধের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতায় ১৪ মাত্রার চারটি চরণের ফাঁকে ১০ মাত্রার ছোট দু'টি পঙ্‌ক্তি ভরে নূতনত্ব আনা হয়েছে।

মিল

কবিতার ছন্দে মিলযোজনার ব্যাপারে কবি মোহিতলাল কোথাও অমনোযোগী নন। বাঙলাকাব্যের ছন্দে মিলের অপরিহার্যতা সম্পর্কে তিনি

'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের 'বাংলা ছন্দে মিল' প্রবন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তিনি সেখানে লিখেছেন, "বাঙালী কবি যদি সত্যকার রস-প্রেরণার বশে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে মিল তাঁহার ছন্দে আপনিই আসিবে।" তাঁর এ বক্তব্য অবশ্যই বিতর্ককণ্টকিত। কিন্তু যে বিশ্বাসবলে তিনি কাব্যে মিলযোজনা করেছেন, তাতে তাঁর কাব্যছন্দের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা কাব্যে 'মিল'কে কাব্যছন্দের সহকারী একটি কৌশলরূপেই মনে করি, এবং এ ব্যাপারে নৈপুণ্যকে কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ মনে করি না। তথাপি সমিল কাব্যছন্দে কবিতা লিখে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা সকলেই মিলের দিকে যত্নবান ছিলেন। ভারতচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ—প্রভৃতি কবিদের কাব্যে বিচিত্র প্রকার মিল লক্ষ্য করা যায়। এঁদের মতো কাব্যে যুক্তাক্ষর-ঘটিত মিল, খণ্ডিতমিল, মধ্যমিল, জোড় মিল—প্রভৃতি মোহিতলালও দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু বিদেশী কবিদের মিলের অনুকরণে যখন তিনি 'স্মরগরল'-এর 'শেষ-শিক্ষা' কবিতায় বেণীবন্ধনের মতো (কখক | খগখ | গঘগ) মিলের প্রয়োগ করেন তখন ইংরেজি Interlaced Rhyme-এর কথা মনে আসে।[৩৮] চতুষ্ক গঠনে ইংরেজিতে যে 'Cross Rhyme' (একান্তর মিল) ও Enclosing Rhymeএর প্রচলন আছে তার অনুসরণ 'হেমন্ত-গোধূলি' কাব্যের 'বনস্পতি' ও হৃদয়যমুনা' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

ফরাসী Ballade a Double Refrain নামক ছন্দে একটি ইংরেজি কবিতার বঙ্গানুবাদকালে তিনি মিলের দিক দিয়ে একটি নূতন আদর্শ আমদানি করেছেন। Austin Dobsonএর লেখা এই কবিতাটি 'গদ্য ও পদ্য' নামে তিনি অনুবাদ করেন। এতে মোট ২৮টি পঙ্‌ক্তি থাকলেও, আসল মিল ৮টি, কারণ ১১টি শব্দের মিল। কথ্যভাষা ব্যতীত এ-মিল রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে কবি একে কথ্যভাষায় অনুবাদ করেছেন।

সনেট

আমরা পূর্বেই বলেছি বাঙলাসাহিত্যে সনেট-রচয়িতা হিসেবে মোহিতলাল অসাধারণ খ্যাতিলাভের অধিকারী। এমনও মনে হয় যে এ ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত তিনি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পেতে পারেন। তাঁর কবিমনের গঠন ও প্রবণতার সঙ্গে এই বিশেষ ধরনের কবিতার একটি চমৎকার সঙ্গতি ছিল বলেই তাঁর এমন সাফল্য। কবি নিজেই একস্থলে বলেছেন—"আমার কান উদাত্ত-মধুর দীর্ঘছন্দের অনুরাগী।... আমার মনে হয় গীতিকবিতার পদবন্ধেও

সেইরূপ স্নিগ্ধমধুর অথচ গভীর-গম্ভীর সুর শুধুই সম্ভব নয়—উপাদেয়ও বটে। কারণ রোমান্টিক গীতি-বিহ্বলতার মধ্যেই ক্ল্যাসিক্যাল সংযম ও দার্ঢ্য থাকিলে, রস যেমন গভীর—তাহার আবেগও তেমনই স্থায়ী হইয়া থাকে।"৩৯ কথাগুলি অক্ষরবৃত্ত জাতীয় ছন্দে রচিত পদবন্ধ প্রসঙ্গে বলা হলেও ঐ ছন্দেরই অন্তর্গত সনেটগুলি সম্পর্কে আরও বেশী সত্য।

মোহিতলালের 'দেবেন্দ্র মঙ্গল' (১৩১৯) পুস্তিকায় ১৬টি চতুর্দশপদী কবিতা আছে। এগুলিতে খাঁটি বা আদি পেত্রার্কীয় সনেটের লক্ষণ নেই। পরে অবশ্য দীর্ঘকালের সাধনায় তিনি সনেটের আঙ্গিকটি চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন। সনেট সম্পর্কে তিনি যে কত ভেবেছেন, এর স্বরূপ-প্রকৃতিটি জানবার জন্যে তিনি যে কিরূপ পড়াশুনা করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের প্রবাসীর চৈত্রসংখ্যায় 'সনেটকাব্য ও দীপালি' নামক কাব্যপুস্তক সমালোচনায় এবং 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থের 'বাংলা সনেট' প্রবন্ধে। তাঁর দীর্ঘ কাব্যজীবনের রচিত সনেটগুলি বা সনেট-পরম্পরা 'ছন্দ-চতুর্দ্দশী' (১৩৫৮, আশ্বিন) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আদি পেত্রার্কীয় সনেটের কঠিন নিয়ম-নিষ্ঠা পরবর্তীকালে অনেকেই অনুসরণ করতে চান নি বা পারেন নি। পরবর্তী সনেটগুলিতে নানারূপ বৈচিত্র্য তাই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বৈচিত্র্য বেশী হলে তাকে আদি সনেট বলা যাবে না। অধিক বৈচিত্র্যসম্বলিত সনেটগুলিকে সাধারণভাবে চতুর্দশপদী বলাই সমীচীন। বস্তুত আদি সনেটের বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে উভয়ত্র একটি সুদৃঢ় বন্ধন আছে। অতিশয় গভীর একটি ভাব বা ভাবনাকে অথবা হৃদয়াবেগকে একটি ক্ষুদ্রায়তনে ঢেলে যতই ছোট করা হয়, তার স্ফূর্তি, দীপ্তি ও সংহতিশক্তি ততই বৃদ্ধি পায়। এই জন্য সনেটের বন্ধন দূষণ নয়—ভূষণ।

মোহিতলাল নিজে আদি সনেটেরই বিশেষ ভক্ত। এই সনেটে ১৪টি পঙ্‌ক্তির অষ্টক ও ষটক ভেদে দু'ভাগ। অষ্টকে প্রথম চার পঙ্‌ক্তির পর একটি বিরতি ও আট পঙ্‌ক্তির পর পূর্ণ বিরতি। এর মিলবিন্যাস রীতিটি এইরূপ—কখখক, কখখক। ষটকের মধ্যেও দুটি ভাগ, প্রত্যেকটিকে ত্রিপদিকা বলা চলে। ষটকের মিলবিন্যাসে কিছু স্বাধীনতা পেত্রার্কীয় সনেটেই আছে।

যেমন—গঘঙ, গঘঙ
গঘঙ, ঘগঙ
গঘগ, ঘগঘ।

আরও নিয়ম হল যে অষ্টকে ও ষটকে পঙ্‌ক্তিগত কোনো যোগ থাকবে না—অষ্টকের চৌপদী দু'টি বিযুক্ত থাকবে এবং ষটকের ত্রিপদিকা দু'টিও যুক্ত হয়ে থাকবে না। অষ্টক ও ষটকের ভাবগত সমাবেশ-পদ্ধতি সম্পর্কে মোহিতলাল নিজে যা বলেছেন, তা অত্যন্ত মূল্যবান। "আমার মনে হয়, মোটামুটি এই দুই ভাগে ভাবের একটি আবর্তন থাকিলেই চলিবে—প্রথমটিতে একটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টিতে তাহার উত্তর, প্রথমটিতে বিস্ময়, দ্বিতীয়টিতে তাহার কারণ-নির্দেশ, প্রথমটিতে আক্ষেপ, দ্বিতীয়টিতে সান্ত্বনা, কিংবা প্রথমটিতে কোনো কিছুর একটা দিক্ ও দ্বিতীয়টিতে তাহার পরিপূরক হিসাবে অপরদিকের বর্ণনা—এইরূপ হইলেই যথেষ্ট।"[৪০]

সনেটের আঙ্গিক সম্পর্কে এতখানি সচেতন হয়েও অল্পবয়সে রচিত 'দেবেন্দ্রমঙ্গল'এ তিনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। আদি সনেটের অষ্টক ও ষটক বিভাগ এ পুস্তিকায় স্পষ্ট নয় এবং অষ্টক ও ষটকের মিলবিন্যাসও আদি সনেটের নিয়মানুগ নয়। এগুলির অষ্টক ও ষটকের মিলে বহু-বৈচিত্র্য। যেমন অষ্টকের মিলে—কখকগ ঘগচচ (১নং) কখগক, ঘগখচ (২নং) কখ কখ, গগঘঙ (৩নং) কখকখ, গঘঙচ (৪নং) কখকখ, গঘগঘ (৫নং, ৭নং, ৯নং ও ১০নং) কখকখ, গখগখ (৮নং) কখকখ, গঘঘগ (১১ নং ও ১৪নং) ইত্যাদি।

ষটকের মিলে—চছজ ঝঝঝ (১নং) ঘঙচ জঝঝ (২নং) ঘঙচ ছছচ (৩নং) ঘঙছ চজজ (৪নং) ঙখগ ঙখগ (৫নং) গঘগ খচচ (৯নং) প্রভৃতি। 'দেবেন্দ্রমঙ্গল' কাব্যের সনেটগুলির যে-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় এগুলি আদি সনেটের লক্ষণাক্রান্ত নয়। 'স্বপনপসারী'র কাল থেকেই মোহিতলালের সনেট রচনার দক্ষতা দেখা দিতে থাকে এবং 'স্মরগরল'এর কালেই তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'স্বপনপসারী'র 'কর্মফল,' 'অমৃতের পুত্র,' 'কবিভাগ্য' এবং 'সাগর ও বাঁশী'—এগুলি চতুর্দশপদী কবিতা হিসাবেই সার্থক, কিন্তু আদি সনেটের গঠনভঙ্গিমা এগুলিতে তেমন লক্ষণীয় নয়। 'স্বপনপসারী' কাব্যের যে তিনটি সনেটকে কবি পরবর্তীকালে তাঁর 'ছন্দ-চতুর্দশী' গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, তাদের মধ্যে 'মুক্তি' কবিতায় অষ্টকের মিল কখখক কখখক—আদি সনেটেরই অনুরূপ—আর ষটকে চছচ ছছচ অর্থাৎ শেষ দুই পঙ্‌ক্তিকে উল্টিয়ে কবি কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। এ কবিতার ভাবগত বিভাগ সুন্দর ও আদি সনেটের অনুবর্তী। 'সতীধর্ম' কবিতায় অষ্টকে কোনো গোলমাল নেই—কিন্তু ষটকের মিলবিন্যাসে নূতনত্ব আনার ঝোঁক আছে।

মোহিতলালের সার্থক সনেটগুলির অধিকাংশই মহাপয়ার ছন্দে লিখিত। আদি সনেটের সুদৃঢ় নিয়মকানুনের অনুবর্তী হয়েও এগুলি কবির সুগভীর ব্যক্তিগত আবেগযুক্ত ভাব ও ভাবনাকে রূপদান করতে সমর্থ হয়েছে। 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে কবি 'বিস্মরণী'র 'উৎসর্গ' কবিতা 'স্মরগরল'এর 'ত্রিস্রোতা' 'শ্রাবণ-শর্ব্বরী' এবং 'হেমন্ত-গোধূলি'র 'উপমা' এই চারটি স্বরচিত সনেটের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু যেগুলির তিনি বিশ্লেষণ করেন নি, সেগুলির আলোচনায় প্রবেশ ক'রে আমরা দেখি যে সনেট-রচনায় তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেট অথচ মহাপয়ারে লিখিত সনেটগুলির মধ্যে 'পয়ার', 'ত্রিস্রোতা', 'সত্যেন্দ্রনাথ', 'পৌর্ণমাসী', 'নিশুতি', 'নিশান্তে', 'প্রকাশ', 'বিদায়', সনেট-পরম্পরা 'কবিধাত্রী' এবং 'রূপার্টি ব্রুক'এর নাম করা যায়। এগুলির মিলবিন্যাস ও গঠনশিল্পে আমাদের পূর্বনির্দিষ্ট পেত্রার্কীয় আদর্শ। এগুলির অষ্টকের চতুষ্ক দু'টির মধ্যে ছেদ, দূরান্তরিত মিলের জন্যে ভাবাবর্তনের স্বচ্ছতা এবং ষটকের দুই ত্রিপদিকার মধ্যে স্পষ্টতা সুন্দরভাবে রক্ষিত হয়েছে। পেত্রার্কীয় সনেটে ষটকে মিলের দিক দিয়ে যে স্বাধীনতা আছে, মোহিতলাল সে কথা মনে রেখে মহাপয়ার ছন্দে 'বিবেকানন্দ', 'চৈত্ররাতে', 'প্রীতিউপহার', 'যৌবন-যমুনা' প্রভৃতি সনেট লিখেছেন। কিন্তু ষটকে যে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত পেত্রার্কের মধ্যে নেই, মিলবিন্যাসে তিনি কয়েকটি কবিতায় তা গ্রহণ করেছেন। 'আহ্বান' 'শরৎচন্দ্র' 'এক আশা'—প্রভৃতি কবিতা এর দৃষ্টান্ত। এই তিনটি কবিতায় ষটকের মিলবিন্যাস যথাক্রমে এইরূপ :—প্রথম—চছজ জছচ, দ্বিতীয়—চছছ চছচ, ও তৃতীয়—গঘঙ ঙঘগ। শক্তিমান কবিমাত্রই এইরূপ ষটকের ঈষৎ-পরিবর্তন-সাহায্য নিজেদের মৌলিকতা না দেখিয়ে পারেন না।

প্রচলিত পয়ার ছন্দেও তিনি অনেকগুলি সনেট লিখেছেন, যেমন—'নির্ব্বেদ' (সনেট-পরম্পরা) 'স্বপ্ন নহে', 'স্বপ্নসঙ্গিনী' (সনেট-পরম্পরা) 'ফুল ও পাখী' (ঐ) ইত্যাদি।

ভাবগত গাম্ভীর্য, ভাষার ওজস্বিতা সঙ্গীতগুণ এবং আবেগের তীব্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটি সুকঠিন নির্দিষ্ট ছাঁচে বাংলা ভাষায় কি অপরূপ সনেটের সৃষ্টি হতে পারে মোহিতলাল তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সনেট-রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙলা-সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত কবির সনেট নির্মাণের আশ্চর্য কলাকৌশল বারংবার সেই থিওডর ওয়াটস্ ডানটন লিখিত অপূর্ব-সুন্দর কবিতাটির কয়েক ছত্র স্মরণে আনে।

"A sonnet is a wave of melody,
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the 'octave' then returning free
Its ebbing surges in the 'sestet' roll
Back to the deeps of life's tumultous soul"[৪১]

গঠন ॥ মোহিতলাল মুখ্যত গীতিকাব্যের কবি। জগজ্জীবন সম্পর্কে স্বানুভূত একটিমাত্র ভাব বা অনুভূতিকে স্বল্প পরিসরে সর্বজনহৃদয়গ্রাহী আবেগময় নিটোল কাব্যরূপ দানে তিনি সমর্থ। তথাপি তাঁর গীতি কবিতাগুলির কিছু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। আত্মলীন ভাবকে অতিসূক্ষ্ম মানস-উৎকণ্ঠায় পরিণত ক'রে যে আত্মরতি অথবা বাস্তবজীবন ও জগতের পৃথক অস্তিত্ব একরূপ অস্বীকার ক'রে নিজেরই অস্তিত্বের জবানীতে একটি আত্ম-মনোহর কাল্পনিক রূপের মধ্যে যে আত্ম-বিহ্বলতা - মোহিতলালের কাব্যে তা লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর গীতিকাব্যিক প্রাতিভা ভাবতান্ত্রিক হ'লেও তা পুরোদস্তুর অহংসর্বস্ব নয়। যে সমস্ত কবিদের ভাবানুশীলনে ভীষণ ও মধুর, কোমল ও কঠোর সুন্দর ও কুৎসিত—সকলই সম রসমূল্য দাবি করে—অথচ যাঁরা আত্মছাড়া সহৃদয় পরকেও মর্যাদা দেন এবং যাঁদের সঙ্গে সূক্ষ্ম অর্থে তন্ময়-দৃষ্টি সম্পন্ন (objective) কবিদেরও যোগ আছে—মোহিতলাল ঠিক সেই শ্রেণীর গীতিকবি। আসল কথা, তাঁর কবিপ্রতিভায় তন্ময় ও মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটি সুন্দর বোঝাপড়া ছিল। তিনি সমকালীন রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কাব্যে অবাস্তব ভাব-বিলাসিতায় ও যুগধর্মের প্ররোচনায় অত্যন্ত পীড়িত হয়ে নিজ কাব্যে বস্তু বা দেহকে অত্যন্ত মর্যাদা দিয়েছিলেন। আত্মগত ভাবমগ্নতার মধ্যেও এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিকতার মধ্যেও তিনি বস্তুর বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিতে চান নি। আবার কোনো প্রতিভাই কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রে খাঁটি বাস্তবকে নিয়ে কেলি করতে পারে না। এইজন্য বাস্তব ও কল্পনার যে দ্বন্দ্ব—দেহ-আত্মার যে বিরোধ তা মোহিতলালও উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ বিরোধ উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা—তাঁর কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দ্বন্দ্বের জন্যেই তাঁর বহু লিরিক কবিতায় মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গীর (Subjective) সঙ্গে কতকটা তন্ময়-দৃষ্টিরও মিশ্রণ ঘটেছে। কোথাও এই তন্ময় দৃষ্টির প্রাধান্য আবার কোথাও মন্ময়-দৃষ্টির প্রাবল্য। 'দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে এ-দু'য়ের মধ্যে যত পার্থক্যই থাক্ না কেন, গভীরতর দৃষ্টিতে দুই-ই কবি প্রতিভার নিদান। এ দু'য়ের

দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে একটি সমন্বয়মূলক রস-সৃষ্টিতে পৌঁছতে পারার মধ্যেই কবি প্রতিভার সার্থকতা। আর এই সার্থকতার জন্যে কবিতার আঙ্গিকও বিশিষ্টতা লাভ করে।

কবিচিত্তের ঐ দ্বন্দ্ব এবং তা উত্তীর্ণ হওয়ার নেপথ্য ইতিহাস মোহিতলালের কাব্যের গঠন-শিল্পে প্রভাব বিস্তার করেছে। এইজন্যে খাঁটি লিরিক কবিতার মধ্যে সুরময় আবেগের অতি-তীব্র যে একটি রেশ বেজে ওঠে, তার পরিবর্তে তাঁর এ-শ্রেণীর কবিতায় নাটকীয়তা অথবা বিবৃতিধর্মী লক্ষণ অনেক সময় অনেকখানি ফুটে উঠেছে। এ-সব ক্ষেত্রে আবেগ ও সঙ্গীত একেবারে অনুপস্থিত নয়—কিন্তু তার আধিপত্য নেই। আবার তাঁর গীতি কবিতায় এপিকের গাম্ভীর্যও মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়েছে।

কবিতার গঠনের দিক দিয়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা লিখেছেন—লিরিক, ওড, শোকসূচক কবিতা, (Elegy) কাহিনী কাব্য, নাট্যকাব্য, (Dramatic Lyric) স্বগতোক্তিমূলক নাট্যকাব্য (Dramatic monologue) ও সনেট। তবে শেষোক্ত তিন শ্রেণীর কবিতার গঠন-নৈপুণ্যের কৃতিত্ব তাঁর সবচেয়ে বেশী। তাঁর মন গহন-গম্ভীর ভাবজগতে অধিক বিচরণ-লিপ্সু ছিল বলে তাঁর লিরিক-কবিতার আয়তন অনেক সময় দীর্ঘ। 'স্বপনপসারী'তে যখন তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ঠিক নন, তখন ক্ষুদ্রায়তন গীতি কবিতা কিছু লিখলেও পরবর্তী কাব্যে তা বিরল। গীতি কাব্য দীর্ঘতম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ক্ষেত্রবিশেষে দীর্ঘ হওয়ায় দোষ থাকে না যদি স্তবকে স্তবকে একটিমাত্র ভাব ও তার বিস্তার পরম্পরা অব্যাহত থাকে। মোহিতলাল এ বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। তথাপি তাঁর কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা ঐ একটিমাত্র ভাবের স্বচ্ছন্দপ্রবাহ হতে পারে নি। এ ত্রুটির কথা বাদ দিলে তাঁর অন্যান্য গীতি-কবিতাগুলি মোটের ওপর গঠনের দিক দিয়ে সার্থক।

খাঁটি লিরিক কবিতার গঠনকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়।[৪২] কোনো একটি অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত কবির মর্জি (mood) অনুযায়ী এই বিভাগ। কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণে বা প্রথম স্তবকে ঐ অনুভূতিটির উল্লেখ বা ব্যঞ্জনা থাকে—এতেই লিরিকের গতিধর্ম নিহিত (Cause of movement)। দ্বিতীয় অংশে ঐ ব্যঞ্জিত ভাবকে বিশদ করা হয় স্পষ্টাকারে। এই অংশে কবির ভাবগত তীব্রতা চরমে ওঠে, আর প্রকাশভঙ্গিমাও এই অংশে লাবণ্যে টলমল করে। লিরিকের শেষ অংশটি প্রথম অংশের মতোই ক্ষুদ্র। এখানে কবির ভাবাবেগের স্তিমিত অবস্থা। কবি খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তির বশে

এখানে বিচারকের মতো মন্তব্য (Judgment) বা অতি-সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ সার-মর্মের (Pointed summary) ভিতর দিয়ে বিষাদ বা প্রসন্নতার সুরে কাব্য শেষ করেন। গঠনগত এ বৈশিষ্ট্য গীতিকাব্যের আদর্শ। সর্বত্র না হলেও মোহিতলালের অনেক কবিতায় এ আদর্শ তাঁর অজ্ঞাতেই অনুসৃত। দু'একটি কবিতার গঠন-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

'ভাদরের বেলা' ও 'সাগর ও শশী' স্বপনপসারীর অন্তর্গত দু'টি গীতি কবিতা। প্রথমটির প্রথম স্তবকে ভাদরের মেঘান্ধকারে প্রিয়তমাকে কবির কেশ-বন্ধনে নিষেধ—সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটির মূল ভাবও ব্যঞ্জিত—কারণ ঐ নিষেধের মধ্যে বোঝা যায় কবি তাঁর মনের অনেক গোপন কথা প্রিয়তমাকে বলতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয় স্তবকে প্রিয়তমাকে মনের মতো ক'রে সজ্জিত করার কামনা স্পষ্ট। এ অংশে কবির আবেগ ও প্রকাশ-সুষমাও অপরূপ। শেষ স্তবকে কবি কালো চুড়ি আর কাঁকন-পরা মানস-বধূর মালা গাঁথা দেখতে ও তার অলংকারের রুনিঝুনি শুনতে চেয়েছেন। অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও স্বকীয় মন্তব্যের সাহায্যে প্রসন্নতার সুরে কবিতাটির শেষ।

'সাগর ও শশী' কবিতাটির তিনটি স্তবক। প্রথম স্তবকে গভীর রজনীতে ঊর্ধ্বে চন্দ্র ও নিম্নে বিশাল সাগরের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ের আভাস—দ্বিতীয় স্তবকে সাগর-শশীর বিরাট-বাসর ও তার রহস্যময়তা স্পষ্ট। তৃতীয় স্তবকে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিতে সেই রহস্যের অবসান। বলা বাহুল্য 'স্বপনপসারী'র এ দু'টি কবিতাতেই লিরিকের ঘনপিনদ্ধ রূপ কবি চমৎকার রক্ষা করেছেন। 'স্বপনপসারী'র আর একটি দীর্ঘ কবিতা 'মৃত্যু'। এর স্তবকসজ্জাও অভিনব। কিন্তু কবির উপলব্ধ অনুভূতিটি এ কবিতাতেও একটি ভাবৈকসূত্রে গ্রথিত। প্রথম স্তবকে জীবনপ্রিয় মানুষের কাছে মৃত্যুর ভয়াবহ মূর্তির আভাস, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে তার হৃদয়হীন নির্মমতাকে স্পষ্টতাদান, চতুর্থ স্তবকে মৃত্যুর ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে জীবনকে সাগ্রহে বরণ করার আগ্রহ এবং সর্বশেষে স্বাভাবিক মৃত্যু কামনা। মৃত্যু-চিন্তায় জীবনের ভাবনা অপরিহার্য—কাজেই এখানে কবির ভাবনা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয়। লিরিক-কবিতার গঠন-সুষমা এখানেও অক্ষুণ্ণ আছে।

'বিস্মরণী'র 'অকালসন্ধ্যা' কবিতাটি কতকটা দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এর গঠন-কৌশল প্রশংসনীয়। প্রথম স্তবকে কবির এতকালের মানসলক্ষ্মীকে নিয়ে অতি প্রবল জীবন-রস-লীলায় অবসাদের আভাস। দ্বিতীয় স্তবকে মানস-সুন্দরীর

সেই মোহ-উদ্রেককারী রূপ-লাবণ্য কবির চক্ষে প্রতিভাত না হওয়ার হতাশা ও সেই একই অবসাদ। তৃতীয় স্তবকে বিগত দিনের রভস-লীলার স্মৃতি-অনুধ্যান—দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে কবিচিত্তের হতাশার হেতু বিশদীকৃত। আর শেষ স্তবকে কবির কণ্ঠে পুনরায় বিষাদের সুর।

কিন্তু 'বিস্মরণী'র 'পান্থ' 'বিস্মরণী' 'মৃত্যু-শোক' 'স্মরগরল'এর 'নারীস্তোত্র' 'বুদ্ধ' 'প্রেম ও জীবন' প্রভৃতি কবিতায় গীতিকাব্যের নিখুঁত গঠনাদর্শ লক্ষ্য করা কঠিন। এ-সব কবিতায় কবির বক্তব্য অনেক সময় পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট—একটিমাত্র ভাব ও তার সুনিপুণ বিস্তারের দিকে তাঁর একাগ্র দৃষ্টি অনেক সময় বিচলিত। গঠন-শিল্পের দিক থেকে তাই তাঁর সমস্ত কবিতাই ত্রুটিহীন নয়।

মোহিতলালের গীতি কবিতাগুলি সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। তিনি তাঁর অনেকগুলি গীতি কবিতায় ভাবের টানে চলতে চলতে মাঝে মাঝে প্রশ্ন তোলেন—জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ব্যবহার ক'রে তিনি এগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেখাবার চেষ্টা করেন। এর ফলে তাঁর অনেক গীতিকবিতা নাটকীয় গুণমণ্ডিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাঁর কবিতাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য বা কতকটা বিবৃতিমূলক ভঙ্গীতে বলার প্রবণতা লক্ষ্য করা কঠিন নয়। 'পান্থ' কবিতার ১৮নং ও ২৫নং স্তবকে, 'নবতীর্থঙ্কর' কবিতার শেষ স্তবকে, 'রুদ্রবোধন' কবিতায় প্রথম ও নবম স্তবকে, 'দেবদাসী' কবিতার সপ্তদশ স্তবকে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এর থেকে বোঝা যায়, মোহিতলালের মধ্যে আত্মগত ভাবদৃষ্টির সঙ্গে বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গীজনিত নাটকীয়তার কিরূপ সুন্দর সমন্বয় ঘটেছিল।

লিরিক কবিতার অন্তর্গত এক শ্রেণীর কবিতাকে 'ওড' বলে। বাঙলা কাব্যে মধুসূদনই সর্বপ্রথম 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে এই ওডের আমদানি করেন। পরে হেমচন্দ্র পিণ্ডরিক ওডগুলির ভিতর দিয়ে মধুসূদনের আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। 'ওড' কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। সে যাই হোক, পাশ্চাত্যের গ্রীক ওড পরবর্তীকালে শেলী, কীট্স প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের হাতে নানারূপ বৈচিত্র্যলাভ করেছে। মোহিতলালও কয়েকটি 'ওড' কবিতা লিখেছেন। পান্থ, বুদ্ধ, নারীস্তোত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, মহামানব, আবির্ভাব, কবিবরণ—প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর। একটিমাত্র বিশেষ ভাবে প্রাণিত হয়ে অভিভাষণ সম্বোধন বা উচ্ছ্বাস যখন একটি গীতিকাব্যিক পন্থায় ব্যক্ত হয়, তখনই ওডের জন্ম।

মোহিতলালের সনেট, নাট্যকাব্য এবং স্বগতোক্তিমূলক নাট্যকবিতাগুলিও গীতিকাব্যের অন্তর্গত। তাঁর সনেটগুলির গঠন-কৌশল যে অপরূপ তা তাঁর ছন্দের আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন তাঁর নাট্যকাব্যের অপর দু-শ্রেণীর কবিতার গঠন-কৌশল পরীক্ষা করা দরকার। নাট্যকাব্য রবীন্দ্রনাথ প্রচুর লিখেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর সাফল্য সর্বজনবিদিত। মোহিতলালের কয়েকটি এ শ্রেণীর কবিতা আছে। তাঁর কবিপ্রতিভায় নাট্যগুণ (Dramatic element) ছিল বলে তিনি এ জাতীয় কবিতা রচনার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত নাট্য-কবিতাগুলি তাঁকে উৎসাহিত ক'রে থাকবে, কারণ তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্যের পরম ভক্ত ছিলেন এবং এ-কাব্যের বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।[৪৩] বৃহত্তর দৃষ্টিতে এ-কবিতাগুলি লিরিক-কবিতারই সগোত্র। কারণ এ সব কবিতায় লিরিকের সঙ্গীত, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও চরিত্রগুলির বিশেষ একটি মানসিক অবস্থা বা দিককে ফুটিয়ে তোলা হয়। নাট্যকবিতাগুলি মুখ্যত কবিতা—কাব্যরসই সেখানে প্রধান—কিন্তু সেই সঙ্গে তাতে নাট্যরসেরও যথেষ্ট মিশ্রণ থাকে। এই মিশ্ররীতির রচনা পাশ্চাত্যের আদর্শে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাঙলা ভাষায়। প্রবর্তন করেন। মূলত এগুলি আবৃত্তির জন্যেই—অভিনয়ের জন্যে নয়। মোহিতলাল এ জাতের মোট চারটি কবিতা লিখেছেন—'শেষ শয্যায় নূরজাহান', 'নূরজাহান ও জহাঙ্গীর', 'মৃত্যু ও নচিকেতা' এবং 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' (মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে লিখিত)। এই কবিতাগুলিতে একদিকে যেমন তাঁব অতীত ইতিবৃত্ত ও উপনিষদ প্রীতি লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে তাঁর সমকালীন জীবন-দর্শনের ইঙ্গিতও এদের মধ্যে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলিতে যেমন তাঁর বিশিষ্ট মানবধর্ম তথা নিত্যধর্মের বিজয় ঘোষিত হয়েছে, মোহিতলালেরও এ শ্রেণীর কবিতাগুলিতে তেমনই প্রেম, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব চিন্তার ছাপ প্রতিফলিত হয়ে এগুলিকে নবীভূত তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

'শেষ-শয্যায় নূরজাহান'[৪৪] নাট্যকাব্যে ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নূরজাহান চরিত্রের মনের গভীরে কবি স্বাধীন কল্পনা বলে প্রবেশ করেছেন। জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে শেষশয্যায় নূরজাহান 'নওরাতি' উৎসবের দিনে অসহ্য হৃদয়-দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করতে গিয়েও পূর্বস্বামী শের আফ্‌কনের স্মৃতিভারে তাঁর পীড়িত প্রাণ সহসা কিরূপ প্রতিবাদ ক'রে উঠেছিল, বাদশাহের মৃত্যুর পর

সে বেদনা তীব্রতম হয়ে তাঁকে কিরূপ মানস-নিগ্রহের মধ্যে নিপতিত করেছিল—অবশেষে মৃতস্বামী সেই অসহায় অবস্থায় স্বপ্নে তাঁকে ক্ষমা ক'রে কি ভাবে দীর্ঘকালসঞ্চিত বেদনার বহ্নিকে নির্বাপিত করেন—নূরজাহান চরিত্রের সেই সংকটজনক পরিস্থিতিকে কবি অপূর্ব ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের সাহায্যে সহচরী জোহারার সঙ্গে সংলাপে তুলে ধরেছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে রূপ, সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে কবির রোমান্স-রাগরঞ্জিত মনোভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এত বড় একটি দীর্ঘ কবিতা প্রচুর রোমান্স-রসে সিক্ত হয়ে অগ্রসর হলেও কোথাও কোনো ক্লান্তি বা বিরক্তির সৃষ্টি করে না। কবিপ্রতিভার নাট্য-রস-প্রবণতা এ জাতের কবিতায় অনেকখানি স্বক্ষেত্রকে লাভ করায় কবিতাগুলি উদ্দিষ্ট রস-সঞ্চারে সাফল্যলাভ করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট নূরজাহানের চরিত্রটি কিরূপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সমগ্র কবিতাটি পাঠ না করলে তা বোঝা যায় না।

'নূরজহান ও জহাঙ্গীর' নাট্য-কবিতাটি দীর্ঘ হলেও এতে পূর্ব-কবিতার তথ্য-প্রাচুর্যের পরিবর্তে দুই চরিত্রকে বিশেষ একটি সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে রেখে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভাবসংঘাতের সাহায্যে মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস আছে। নূরজহানের রূপলাবণ্য ও কামনা-মদির মূর্তির কাছে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত জহাঙ্গীরের ন্যায়-বিচারের সকল অভিমান শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়েছে। মহাবৎ খাঁর প্ররোচনায় অন্যায়ের জন্যে নূরজহানের প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়েও অতি-দীন অসহায় ব্যক্তিরূপে সম্রাট ঐ মহাবতের নিকট নূরজহানের প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছেন। প্রাণময় সংলাপ, সুতীব্র হৃদয়দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি ও রোমান্স-রসের উচ্ছলনে নাট্য-কবিতাটি অপরূপ নাট্যগুণমণ্ডিত হয়ে দ্রুততার পথে ধাবমান হয়েছে। দুই চরিত্রের মনোগহনে প্রবেশ করবার জন্যে স্বল্পতম ঘটনার আয়োজনে কবি নাট্য-কবিতাটির যেরূপ অঙ্গসজ্জা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

'মৃত্যু ও নচিকেতা'র মতো দীর্ঘ কবিতাতেও উপনিষদের যম ও নচিকেতার কাহিনীকে নামমাত্রই গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্বল ও ভীরুর নিকট মৃত্যু ভয়াবহ, কিন্তু বিশ্বের প্রাণে যে মহাপ্রাণ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে, সে মৃত্যুঞ্জয়ী—কাহিনীর এই মর্মার্থকে কেন্দ্রস্থলে রেখে কবি চমৎকার বৈদিক প্রতিবেশের সৃষ্টি করেছেন। যম ও নচিকেতার কথোপকথনের মধ্যে আদ্যন্ত একটি নাট্যিক উৎকণ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি নাট্যরস ও কাব্যরসের অভিব্যক্তিতে এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর নিজস্ব মৃত্যু-বন্ধ-ভাবনা উত্তীর্ণ হওয়ার বাণী নচিকেতার মুখেই ব্যক্ত হয়েছে।

কবির জীবন সায়াহ্নে রচিত 'দারার ছিন্নমুণ্ড ও আরংজীব' কবিতাটিও নাট্যকবিতা হিসেবে সার্থক। অগ্রজ দারাকে নির্মমভাবে হত্যা ক'রে তাঁর শিরোদেশ বহন ক'রে আনার আদেশ নাজির খাঁর ওপর ন্যস্ত হয়। জহ্লাদ নাজির, আরংজীবের ভয়ে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে যখন তাঁর কাছে ফিরে আসে, তখন আরংজীবের মনের গভীরে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাকেই এই নাট্যকবিতার ভিত্তিমূলে স্থাপন করা হয়েছে। ইতিহাসের পাষাণ চরিত্র আরংজীবের হৃদয়ের তলদেশে অগ্রজ দারার প্রতি জহ্লাদের কৃতকর্মে ক্ষণিকের জন্যে যে অনুশোচনা জেগেছে, তাতেই এ-চরিত্র ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়েছে। আবার জহ্লাদ খোদার দরবারে চির-অপরাধী জেনেও আরংজীবের হুকুম তামিল করার আনুগত্যে সম্রাটের নিকট যে বেইমানি করে নি—এই দ্বন্দ্বের মধ্যেও জহ্লাদের চিত্ত কম অন্তর্দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট নয়। উভয় চরিত্রে এই সম্ভাব্য অন্তর্সংঘাত কল্পনার মধ্যেই মোহিতলালের মৌলিকতা নিহিত। আর এরই জন্যে অতিদীর্ঘ নাট্যকবিতাটি যুগপৎ কাব্যরস ও নাট্যরসের প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে গতি ও দ্রুতিলাভ করেছে।

সংকটজনক পরিস্থিতির মাঝখানে চরিত্রগুলিকে সংস্থাপিত ক'রে এই সমস্ত নাট্যকবিতায় কবি যে ভাব-সংঘাত বা মানস-দ্বন্দ্বের সৃজন ক'রে নিয়েছেন, তার সঙ্গে ইতিহাস বা পুরাণের বড় একটা সম্পর্ক নেই। আর ঐ একটিমাত্র ভাবদ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বিন্দুকে ঘিরে বৃত্তের মতো চরিত্রকল্পনা নাট্যকবিতাগুলিকে বৃত্তরূপ দান করেছে।

কিন্তু এইখানেই এ-আলোচনার শেষ নয়। তাঁর আরও কতকগুলি স্বগতোক্তিমূলক নাট্যকবিতা আছে। এই কবিতাগুলির কায়া-নির্মাণে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ শ্রেণীর কবিতায় চরিত্র মাত্র একটিই। নীরব শ্রোতার নিকট বক্তৃতার ঢঙে এর বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এ জাতের কবিতার মূল উদ্দেশ্য চরিত্র বিচার বা মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। নাটকীয় সংলাপ বা নাটকীয় ঘটনাসংস্থান এখানে থাকে না। চরিত্রটি স্বগতোক্তির ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে। ভিতরের মানুষটিকে জানবার এই স্বগতোক্তিমূলক নাটকীয় রীতিটি ইংরেজি সাহিত্যে Browning প্রয়োগ ক'রে অমর হয়েছেন। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'The Ring and the Book' দশটি Monologue—পরম্পরায় প্রবাহিত। টেনিসন তাঁর 'Ulysses' কিংবা 'Tithonus'এ এই পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন করলেও Browning 'Monologue' প্রয়োগে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য এঁদেরও পূর্বে ইংরেজি সাহিত্যে ল্যাণ্ডর

তাঁর 'Imaginery Conversations' গ্রন্থে এ রীতির প্রয়োগ করেছিলেন। মোহিতলালের প্রিয় কবি ছিলেন ল্যাণ্ডর। সেইজন্যে খুব সম্ভবত তিনি এঁর নিকট থেকেই এর মূল প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরে টেনিসন ও ব্রাউনিঙ্-এর দৃষ্টান্তে তিনি অধিকতর উৎসাহী হয়েছিলেন—এমন মনে করা যেতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক জর্জ সেণ্টস্ বেরি এই Dramatic Monologue সম্পর্কে লিখেছেন—"The poet takes a character, an anecdote, sometimes little more than a name ; and instead of focussing it from the outside, or making it speak in simple dramatic fashion, with such passages of ornament as he can give, he shakes it about dissecting or trying to dissect, its 'soul' analysing its constituents, folding or unfolding it to get different lights and aspects, but never exactly summing up or giving us the whole."[৪৫]

সমালোচকের এই মূল্যবান উক্তিটিতে Dramatic Monologue-এর লক্ষণ সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বাঙলা কাব্যে মোহিতলাল সর্বপ্রথম সার্থক-ভাবে পাশ্চাত্যের এই রীতিটি কাব্যে প্রয়োগ ক'রে একটি নূতন সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন।

'বেদুঈন' কবিতায় বেদুঈন চরিত্রটিকে এবং 'নাদিরশাহের জাগরণ' ও 'নাদিরশাহের শেষ' কবিতা দু'টিতে নাদির চরিত্রটিকে আত্মবিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়াস আছে। এ শ্রেণীর কবিতায় চরিত্রের মনোরহস্য চরিত্র নিজেই উদ্ঘাটিত ক'রে চললেও তার মধ্যে কবির নিজস্ব ভাব-চিন্তাই মুখ্যত ফুটে ওঠে। একান্ত নির্লিপ্তভাবে চরিত্র-রহস্য বিশ্লেষণের জন্যে Dramatic Monologue নয়। সেইজন্যে চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত কবির নিজস্ব ভাবচিন্তা-প্রকাশের বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এই তিনটি কবিতায় কবির নিজস্ব শাক্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শ, বলিষ্ঠ প্রাণের দুর্মদ কামনা, অসীম আত্ম-প্রত্যয়—প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। 'বেদুঈন'-জীবনের বাস্তবতা এবং নাদিরশাহ চরিত্রের ঐতিহাসিকতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও আত্মকথনের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির আত্মোদ্ঘাটন এই রীতিতে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এ কবিতাগুলিতে নাটকীয় লক্ষণ কি আছে? আসলে এ জাতের রচনা অংশত কবিতা ও অংশত নাটক। পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান অথবা বর্জন ক'রে দৃশ্যপটের মধ্যে রঙ্গমঞ্চে এই জাতীয় কবিতা আবৃত্তিযোগ্য। চরিত্রই এ সব কবিতায় মুখ্য হওয়ায় নাটকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রত্যুক্তির

অভাব ও গতির অনুপস্থিতিতে এখানে নাট্যরস ঘনীভূত হতে পারে না। পুরোদস্তর নাটকে যে স্বগতোক্তি থাকে, তার সঙ্গেও কিন্তু এ কবিতার মিল নেই। নাটকের স্বগতোক্তি চরিত্রবিশেষের মনোগহনে আলোকপাত করে বটে, কিন্তু তা অপর কারো শ্রোতব্য নয়। নাট্যকারের যদি দর্শকের কাছে চরিত্রের সেই সংগুপ্ত অবস্থাটি তুলে ধরবার অন্য কোনো উপায় থাকত, তাহলে কখনোই তিনি স্বগতোক্তির আশ্রয় নিতেন না। কিন্তু Dramatic Monologue বিশেষভাবে শ্রোতব্য। চরিত্রটি যখন আত্মকথন শুরু করে, তখন সে অপর এক বা একাধিক কল্পিত ও অনুপস্থিত চরিত্রকে উপলক্ষ্য ক'রেই বক্তব্যকে ন্যস্ত করে। মাঝে মাঝে যেন নেপথ্যে সেই অপর চরিত্রের প্রত্যুক্তি শুনে নেবার ভান ক'রে সে নিজ বক্তব্যের প্রবাহে নাট্যতরঙ্গ তোলে। এইভাবে কবিতাগুলি একাধারে নাট্যরস ও কাব্যরসে সিক্ত হয়ে পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে। মোহিতলালের স্বগতোক্তিমূলক নাট্যকবিতার সংখ্যা মাত্র তিনটি। কিন্তু এই তিনটি কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—এদের গঠন-কৌশলে যে সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, তা একজন প্রথম শ্রেণীরই কবিকৃত্য।

ব্রাউনিঙের 'Christina' কবিতার 'She has lost me. I have gained her' ইত্যাদি তিনটি চরণের মর্মার্থকে একটি নিজস্ব কাল্পনিক প্লটের ভিত্তিমূলে স্থাপন ক'রে মোহিতলাল 'প্রেম ও ফুল' নামক যে একটি কাহিনী কাব্য লিখেছেন, তার গঠনেও অভিনবত্ব আছে। কাহিনীর দুটি পর্ব এবং প্রতি পর্বেরও আবার পাঁচটি ভাগ। ছড়ার ছন্দে লিখিত কবিতাটিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ৪ চরণের স্তবকবিশিষ্ট ৫টি ছোট কবিতাও আছে। ছোট কবিতাগুলি দীর্ঘ কাহিনীপাঠের ক্লান্তি থেকে যেমন মুক্তি দেয়, তেমনই কাব্যের মূলভাবকে ব্যঞ্জিত করতে সাহায্য করে। কবির যৌবনকালের প্রেম-স্মৃতি সুরভিত কবিতাটিতে ফুল ও প্রিয়তমার চমৎকার সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। দীর্ঘ কবিতা রচনার এ কৌশলও প্রশংসনীয়।

উল্লেখপঞ্জী

১ মোহিতলালের 'সাহিত্যকথা' (২য় সং ১৩৬৬) 'গ্রন্থের রস ও রূপ' প্রবন্ধ, পৃঃ ৫৬-৭২
২ ,, ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ৬২
৩ ,, ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ৬৪
৪ মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (১ম খণ্ড ১ম সং ১৩৫৯) পৃঃ ৮৯
৫ ইংরেজ কবি Wordsworth 'Lyrical Ballads'এর ভূমিকার (Preface) দ্রাষ্টব্য

মানুষের ভাষাকে (man in low and rustic life) প্রকৃত কাব্যভাষা বলার এবং গদ্যভাষা ও কাব্যভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য স্বীকার না করায় বন্ধু কোলরীজের সঙ্গেও মতভেদ হয়েছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন—"Between the language of prose and metrical composition there neither is, nor can be any essential difference". এর জবাবে কোলরীজ লিখেছিলেন,—'I appeal to the practice of the best poets, of all countries and in all ages, as authorizing the opinion (deducted from all the forgoing) that in every import of the word essential, which would not here involve a mere truism, there may be, is and aught to be an essential difference between the language of prose and of metrical composition." (From Nineteenth Century Critical Essays, Reprinted in 1963, edited by Edmond D. Jones—গ্রন্থের S. T. Coleridge লিখিত 'Metrical Composition" প্রবন্ধ পৃ: ৬০

৬ কোলরীজের উদ্ধৃত মন্তব্যের আলোকেই বলা যায় ভাষা ও কবিভাষা এক নয়।

৭ হারবার্ট রীডের "Collected Essays in criticism' গ্রন্থের 'Poetic Diction' প্রবন্ধ পৃ: ৩৫

৮ "All languages must contain the elements of both Law and Liberty ; by law they are faithful to their own past and continue to be intelligible , by liberty they are saved from dull informity and give some scope to individual words" A Short History of English Words—By Bernard Groom. Reprinted in 1957, Poetic Words—Chap V Page 86

৯ মোহিতলালের 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের কবিভাষা আলোচনায় এর প্রমাণ আছে। পৃ: ১১৭

১০ 'সাহিত্যবিচার' (২য় সং ১৩৫৪)—'আধুনিক সাহিত্যের ভাষা'—পৃ: ২২৪

১১ কবি সমালোচক বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন—"কবিতাগুলির (মোহিতলালের ; রসবোধে একটু অসুবিধা আছে। বিশেষ ধৈর্য্যশীল, শ্রদ্ধাবান রসজ্ঞ পাঠক ব্যতীত অন্যের হয়তো এগুলি ভাল লাগিবে না। রচনায় স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণের অভাব আছে। পাঠকের মস্তিষ্ককেও একটু শ্রম স্বীকার করিতে হইবে।.. নিবিড় অনাবিল রসলাভ করিতে হইলে এইটুকু সহ্য করিতেই হইবে—Australian miner এর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় চাই।" বঙ্গবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ।

১২ 'বিস্মরণী'র ভূমিকা

১৩ কবিবন্ধু ডঃ সুশীলকুমার দে 'প্রবাসী'র (১৩৩৪, আষাঢ) 'কাব্যসমালোচনা'র মোহিতলালের এই সিদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন।

১৪ 'A short History of English Literature' (Reprinted in 1960)—by Sir Ifor Evans. Page 15.

১৫ 'সাহিত্যকথা' গ্রন্থের 'সাহিত্যের ষ্টাইল' প্রবন্ধ

১৬ 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'সাহিত্য বিতান' গ্রন্থের বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় এই তত্ত্ব প্রয়োগের চেষ্টা আছে।

১৭ 'সাহিত্যকথা' গ্রন্থের সাহিত্যের ষ্টাইল প্রবন্ধ পৃ: ১১৪

১৮ পেটারের Appreciations (First Published in 1889) গ্রন্থের Style প্রবন্ধ।

১৯ 'The Modern Study of Literature' গ্রন্থের লেখক Moulton এই পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—"Classic poetry emphasizes accepted forms, and echoes of the poetry that has preceded, this is to speak, the centripetal force of imagination. Romantic is the centripetal force of novelty, surprise and freedom."

২০ 'The Tutorial History of Literature' (6th edition) Chap—'The age of Wordsworth',—by A. J. Wyatt. page 185-86.

২১ Walter Pater-এর 'Appreciations' গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত 'Romanticism and classicism' প্রবন্ধ পৃ: ২৪১

২২ 'স্মরগরল' কাব্যের ভূমিকা

২৩ ভারতীয় আলংকারিক আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিবাদ'এর প্রবর্তন ক'রে অলংকার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে এই ঔচিত্যের দিকটি স্বীকৃত। তিনি বলেছেন যে রসধ্বনি অনুযায়ীই অলংকার কাব্যে নিবেশিত হবে। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলংকার যোজনা করতে হবে।

২৪ ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র একটি তথ্যের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—" 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা প্রথম বেরিয়েছিল ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে। পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের একটি কবিতায় হাফিজের ভাব ও ছন্দের অনুসরণ দেখে মোহিতলালের খুব ভালো লেগেছিল। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও এই কবিতাটি তাঁকে আবৃত্তি করতে শুনেছি।

'বাদলা কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা
এসো রিমঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর
পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।'

এই অন্ত্যানুপ্রাসের আবেশ লাগত তাঁর মনে; আনন্দ ফুটে উঠতো মোহিতলালের চোখে ও মুখে।"
(কবিতার বিচিত্র কথা—পৃ: ৩০৯)

২৫ 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের 'কবি কুমুদরঞ্জন' প্রবন্ধে মোহিতলালের মন্তব্য পৃ: ১৮২-৮৩

২৬ কবি-সমালোচক C. D. Lewis লিখেছেন—'The idea that imagery is at the core of the poem, that a poem itself be an image composed of multiple images, did not begin to have any official currency till the Romantic movement" (The Poetic Image Page 19)

২৭ যশস্বী সমালোচক মিডলটন মারি লিখেছেন,—"If we conceive the 'image' not as primary and independent, but as the most singular and potent instrument of the faculty of imagination—it is a more valuable word than those which it subsumes: metaphor and simile. to them clings something worse than false suggestion." (From Selected Criticism—Metaphor Page 67)

২৮ মোহিতলালের 'জীবনী'র পরিচয়ে প্রথম অধ্যায়ে তাঁর পিতার আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয় চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে। আর জীবনকালী রায় নিজেই লিখেছেন—'আমি একজন অখ্যাতনামা আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী, বন্ধুগণ শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানে গরীয়ান।' (১৩৫৯ শনিবারের চিঠি, ভাদ্র—'বন্ধু মোহিতলাল' প্রবন্ধ)

২৯ 'সাহিত্যবিতান' গ্রন্থের 'কবি করুণানিধানের কবিতা' প্রবন্ধে মোহিতলালের মন্তব্য।

৩০ ছন্দ সম্পর্কে অতি সাবধানী কবির সমগ্র কাব্যে দুটি স্থানে কিছু ত্রুটির কথা অনেকেই জানেন। 'জন্মান্তরে' কবিতার 'পড়িবে দু'খানি ছায়া নদী-সিকতায়'এর পরবর্তী চরণে ১৪ অক্ষর কম হওয়ার কথা অধ্যাপক তারাচরণ বসু তাঁকে জানালে তিনি লেখেন—'ছন্দের ঐ ভুলটি সংশোধন করিয়া দিয়াছি—উহা অনেকদিন যাবৎ আমাকে অসুস্থ রাখিয়াছিল।' (২৩. ৬. ৪২ তারিখে ঢাকা থেকে তারাচরণ বসুকে লিখিত পত্র।) আর 'সুইনবার্ণের অনুসরণে' কবিতায় যতিভঙ্গের জন্যে অক্ষরাতিশায্য-দোষের কথা 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থের সজনীকান্ত উল্লেখ করেছেন। পৃঃ ১৯৪

৩১ 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১ম সং ১৩৫২ শ্রাবণ) গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায় পৃঃ ৪২

৩২ ,, ,, ,, ,, ,, 'বাংলা ছন্দে মিল' প্রবন্ধ পৃঃ ১১৮

৩৩ ,, ,, ,, ,, ,, 'বাংলা কবিতার পদবন্ধ' পৃঃ ১২৫-২৬

৩৪ ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ১৩৫

৩৫ ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ১৪৪

৩৬ ,, ,, ,, ,, ,, পৃঃ ১৪৩

৩৭ 'Elements of English Rhetoric and Prosody'—By Radhika Bose and and T. S. Sterling.

৩৮ 'বাংলা কবিতার ছন্দ' পৃঃ ১৮৬

৩৯ ঐ ঐ পৃঃ ১৩৬

৪০ ঐ ঐ বাংলা সনেট অধ্যায় পৃঃ ১৫২

৪১ থিওডর ওয়াটস্ ডানটনের এই কবিতাটি মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'বাংলা সনেট' নামক প্রবন্ধে এবং 'সনেট কাব্য ও দীপালি' (১৩৩৫ প্রবাসী চৈত্র) প্রবন্ধে তিনি এটি উদ্ধৃত করেছেন।

৪২ 'The Typical forms in English Literature'—Uphamc.

৪৩ রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' কাব্য যে মোহিতলালের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সেকথা তিনি নিজেই বহুস্থলে উল্লেখ করেছেন। 'রবিপ্রদক্ষিণ' গ্রন্থের 'শিলাইদহে রবীন্দ্রস্মৃতি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। তাছাড়া অধ্যাপক মথুরেন্দ্রনাথ নন্দি এবং অধ্যাপক তারাচরণ বসুর মুখে এই কাব্যপ্রীতির কথা শুনেছি।

৪৪ ২৩. ৬. ৪২ তারিখে ঢাকা থেকে লেখা একখানি চিঠিতে মোহিতলাল তাঁর প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক তারাচরণ বসুকে এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিলে কি বলিতেন জানি না—তিনি 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—নিজের 'কবর-ই নূরজাহান' ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়া ছিলেন।" তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'কালিকলম (১৩৩৩ শ্রাবণ)-এ তিনি সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতেও এই তথ্যটি নিজেই উল্লেখ করেছেন।

৪৫ 'A Short History of English Literature—by G. Saintsburgy পৃঃ ৫৮৬]

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভাব-এষণা

বাঙলা কাব্যে মোহিতলালের প্রভাব কিরূপ, সে-প্রভাবের স্বরূপ কি—তাতে বাঙলা কাব্য কোন্ দিক দিয়ে কতখানি সমৃদ্ধ—ইত্যাদি প্রশ্ন-সমাধানের জন্যেই আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা। রবীন্দ্রযুগের কবি হয়েও দৃষ্টি ও সৃষ্টির মৌলিকতায় তিনি যে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, তাতে তাঁকে শুধুমাত্র রবীন্দ্রানুসারী কবি বলা চলে না। একথা সত্য যে রবীন্দ্রীয় কাব্যাদর্শের বহু বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে প্রকাশমান, কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা ভাবগত ততটা নয়, যতটা ভাবের রূপায়ণগত। তথাপি শুধুমাত্র রূপায়ণ বা আঙ্গিকগত বিশিষ্টতার জন্যে মোহিতলাল রবীন্দ্র-অতিশায়ী কবি-আখ্যা লাভ করতে পারতেন না। তাঁর কাব্যাদর্শের আর একটি দিক আছে—যেখানে যুগপৎ তিনি ভাব ও রসরূপের বিচারে রবীন্দ্র-ব্যতিরিক্ত। আর এখানেই তিনি রবীন্দ্রযুগের হয়েও রবীন্দ্রোত্তর: বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই এই রবীন্দ্রোত্তর যুগের সূচনা। রবীন্দ্রকাব্যের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় এবং যুগধর্মের আনুকূল্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের উদ্ভব। কাব্যকলার আদর্শ ও প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রীয় পন্থাপসরণ-প্রবণতাই এ যুগের কাব্যের প্রধান কথা।

মোহিতলালের কাব্যের এক কোটিতে আছে রবীন্দ্র-আনুগত্য 'অন্য কোটিতে রবীন্দ্র-অতিক্রমণ। অবশ্য উভয়ত্রই কবির স্বকীয়তা—একদিকে তিনি শক্তিমান রবীন্দ্রশিষ্য অন্যদিকে শক্তিশালী রবীন্দ্রোত্তর যুগশিষ্য। আর সব মিলিয়ে রবীন্দ্রোত্তর নবযুগ প্রবর্তনের তিনি অন্যতম অগ্রনায়ক কবিশক্তিতে শ্রেষ্ঠ।[১]

অতএব বাঙলা কাব্যে এ কবির প্রভাব নির্ণয় করতে গেলে দু'দিক থেকেই তা লক্ষ্য করা দরকার। রবীন্দ্র-ভাবানুসৃতির মধ্যেও তাঁর ভাষা, ছন্দ বা স্টাইল সমসাময়িক বা পরবর্তী কাব্যে কতখানি প্রতিফলিত এবং রবীন্দ্রোত্তর কবি হিসেবে তাঁর সুরস্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভাব ও রূপরীতি বাঙলা কাব্যে কতখানি অনুসৃত।

এবার প্রভাবের কথা। স্ব-মহিমায় ভাস্বর কোনো কবির কাব্যে অপর কোনো কবির প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ। প্রায় অধিকাংশ

প্রথিতযশা কবি তাঁদের কাব্যজীবনের শুরুতে যতদিন পর্যন্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যলাভ করতে পারেন না, ততদিন কোনো সমকালীন বা অনতিদূর কালের শ্রেষ্ঠ কবির অনুকরণ করতে থাকেন। এরূপ অনুকরণ কবিদের একটি সাধারণ রীতি। এ প্রভাবের মাত্রা নির্ণয় করা খুবই সহজ এবং একে আমরা প্রত্যক্ষ প্রভাব বলতে পারি। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় কোনো কবি স্বকীয় সুরে স্বাতন্ত্র্যলাভ করার পরও তাঁর কাব্যজীবন-প্রভাতের প্রিয়তম কবিকে সম্পূর্ণ-রূপে বিস্মৃত হতে পারেন না। প্রিয়তম সেই শ্রেষ্ঠ বা শক্তিমান কবির কোনো কোনো কবি-বচন, স্মরণীয় কোনো কাব্য পঙ্‌ক্তি, বিশেষ ভাষা, শব্দ বা ছন্দ কিংবা বিশেষ অলংকার, তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যায়। তাঁর স্বীয় রচনায় ভাবগত মৌলিকতার মধ্যেও চকিতে বিদ্যুতালোকের মতো সেই প্রিয় কবির প্রভাব মাঝে মাঝে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যদি কবিবিশেষের অজ্ঞাতসারেই এই অনুসৃতি ঘটে থাকে, তাহলে এতে প্রভাবান্বিত কবির কোনোই অগৌরব নেই ; বরং অনুসৃত কবিরই তাতে মর্যাদা বৃদ্ধি। এই জাতীয় প্রভাবকে গৌণ বা পরোক্ষ প্রভাব বলতে পারি। তৃতীয়ত, কোনো শক্তিমান কবির প্রদর্শিত নূতন পথটিকে গ্রহণ ক'রে আরও অধিকদূর অগ্রসরণ, পূর্ব কবির কাব্যে যা অস্ফুট ও অর্ধ-মুকুলিত, তাকে স্ফুট ও মুকুলিত-করণ, কিংবা পূর্বতন কবির কাব্যে যুগযন্ত্রণার যে চিহ্ন আভাসিত, তাতেই আশ্বস্ত হয়ে স্বকীয়তাকে খুঁজে পাওয়া ও কতকটা ভিন্নপথে পরিক্রমা—এও কিছু আশ্চর্যের নয়। এখানে কবির কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত, এক্ষেত্রে কবিবিশেষের প্রভাব তলে তলে সক্রিয়। প্রভাবিত কবি যখন আপন পথে অগ্রসর হয়ে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম ক'রে যান, তখন প্রভাব-নির্ণয় কঠিন হয়। এমন প্রভাবকে গূঢ়চারী বা নিগূঢ় প্রভাব বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্র-অনুসারী এবং রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ওপর মোহিতলালের প্রভাব বিচারকালে তাই আমাদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং নিগূঢ় তিন প্রকার প্রভাবের কথাই মনে রাখতে হবে। আর এ-প্রভাব যেমন ভাবে, তেমনই ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু 'রবীন্দ্রোত্তর' কবি বলতে আমরা কি বুঝব ? যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলামের সম্মিলিত সাধনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগটি সূচিত হয়েছে বটে, কিন্তু 'কল্লোল' 'সংহতি' 'কালিকলম' 'উত্তরা' ও 'প্রগতি' পত্রিকাকে অবলম্বন ক'রে যে অতি-আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব তারা কি রবীন্দ্রোত্তর নন ? অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর—প্রথম তিনজনে যার সূচনা, এঁদের সাধনায় তো তারই

পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা। এঁরা নিজেদের 'অতি-আধুনিক'[২] আখ্যায় ভূষিত করতে অধিক উৎসাহী হলেও আমাদের ধারণা, যতীন্দ্রনাথ মোহিতলাল ও নজরুলের কাব্যাদর্শের যে-প্রভাবে এঁদের উদ্ভব তাকেই নিগূঢ় প্রভাব বলা যেতে পারে। অতএব রবীন্দ্রোত্তর কবি বলতে মোহিতলাল সহ প্রথমদিকের ঐ দু'জন কবি এবং অতি-আধুনিক কবি-সম্প্রদায়—উভয়কেই বুঝতে হবে।

রবীন্দ্র-অনুসারী এ দু'শ্রেণীর কবিদের কাব্যে মোহিতলালের প্রভাব নির্ণয়ের সূচনায় একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। ভাব-গভীরতা, মননাতিরেক ও স্টাইলের বিশিষ্টতায় তাঁর যে স্বকীয়তা রবীন্দ্রযুগে লক্ষিত হয়েছিল, তাতে তাঁর কাব্যানুসরণ সাধারণ কবিদের পক্ষে প্রবল অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। 'স্বপনপসারীর' জীবনবাদ যে 'বিস্মরণী'-তে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে কবিকে ভিন্নতর লোকে আকৃষ্ট করছিল, 'স্মরগরল' কাব্যে কবির স্বীকৃতিমূলক 'স্মরগরল' কবিতাটি প্রকাশের পূর্বে কেউ তা লক্ষ্যই করতে পারেন নি, অথবা সেদিকে দৃষ্টি দেবার কারো ধৈর্যই ছিল না। দেহাত্ম-নির্ভর ভোগের পথে যাত্রা ক'রেও তিনি শেষ পর্যন্ত ভোগাতীত লোকে অধ্যাত্মরাজ্যের আলোক দেখেছিলেন। কবিমানসের এই বিবর্তন অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়েছিল। সেইজন্যে কবিশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও তাঁর কবিমন ঠিক পুরোপুরি উপলব্ধির অভাবে যতখানি ও যেরূপ অনুকরণের কথা, তা হতে পারে নি। তথাপি 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' পর্যন্ত কবির কাব্যের সমাদর যথেষ্টই ছিল এবং এইকালে তিনি রবীন্দ্র-অনুসারী ও রবীন্দ্রোত্তর উভয় শ্রেণীর কবিদের বহুলাংশে প্রভাবিত করেছেন। 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থে স্বীয় কাব্যাদর্শকে তত্ত্বভিত্তিক করায় এবং তাঁর কাব্যাদর্শের সঙ্গে অতি-আধুনিকদের কাব্যের বৈসাদৃশ্য নিজেই ঘোষণা করায়—অতি আধুনিক কবির দল তাঁকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। আর রবীন্দ্রানুসারী কবিকুল তাঁকে ঠিক অনুকরণযোগ্য মনে না ক'রে সভয়ে ও শ্রদ্ধায় অনেকটা দূরে থাকার চেষ্টা করেন। সেইজন্যে 'স্মরগরল' বা 'হেমন্ত-গোধূলি'র কবির প্রভাব পরবর্তী-দের ওপর আরও ক্ষীণ। অতএব 'স্বপনপসারী ও 'বিস্মরণী' কাব্যের কবি বাঙলা কাব্যে কিভাবে ও কতখানি অনুকৃত হয়েছেন, তা-ই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য।

যে তিনজন কবিকে নিয়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রারম্ভ, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সঙ্গে মোহিতলালের কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।[৩] কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এই সাদৃশ্য ঠিক পারস্পরিক প্রভাবের ফল

নয়। এ হল যুগধর্ম বা রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিক্রিয়ারই পরিণতি। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব প্রায় একইকালে। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতার বই 'মরীচিকা'র কবিতাগুলি বাঙলা ১৩১৬-১৭ সাল থেকে লিখিত। আর মোহিতলালের 'স্বপনপসারী'র কবিতাগুলি বাঙলা ১৩১৮ সাল থেকে রচিত। বাঙলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাব ১৩২৮-২৯ সালে। কাজেই যতীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নজরুল ইসলামেই মোহিতলালের প্রভাব বেশী থাকার কথা। কবি-ধর্মে তিনজনই স্বতন্ত্র হলেও কোনো না কোনো একটি দিক নিয়ে কাব্যরচনায় উৎসাহের ব্যাপারে এঁদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। যুগের প্রেরণায় বা রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতিক্রিয়ায় এঁদের কাব্যে যে সাধারণ লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছে, সেখানে প্রভাবের কথাটি বড় নয়। তবে একইকালে কাব্যরচনায় অগ্রসর হয়ে এবং বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্কসূত্রে কিছু কিছু বিষয়ে এঁরা পরস্পর প্রভাবান্বিত হয়েছেন—একথা বলা চলে। কিন্তু এঁদের নিকট মোহিতলাল প্রভাবসূত্রে কিভাবে ঋণী আলোচ্য অধ্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য তার বিপরীত। আমরা অপর কবির কাব্যেই মোহিতলালের প্রভাবের স্বরূপ নির্ণয় করতে চাই। অবশ্য যতীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের বিষয়টি প্রথম অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছি। প্রথমেই নজরুলের ওপর তাঁর প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে।

বাঙলা সাহিত্যে যে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নিয়ে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল সাদরে একজন শক্তিমান কবিরূপে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন, সে-কবিতাটির ভাব ও ভাষার সঙ্গে তাঁর 'আমি' প্রবন্ধের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ ক'রে মোহিতলাল নিজেই লিখেছেন—"'আমি' শীর্ষক রচনাটি এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, এই রচনাটি একালের একটি বহু বিখ্যাত কবিতার সাক্ষাৎ প্রেরণা, এবং স্থানে স্থানে ভাব ও ভাষার আহরণ-স্থান হইয়াছিল।'[৪] কবির প্রবন্ধটি ১৩২১ সালে 'মানসীর' পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সাত বৎসর পর ১৩২৮ সালের 'মোস্‌লেম ভারত'এর কার্তিক সংখ্যায় নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়। অনেকেই এ-কবিতায় মোহিতলালের প্রবন্ধের প্রভাব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু এ দুটিকে ধীরভাবে পাঠ করলে কিছু কিছু স্থলে ভাষাগত মিল তো স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায় এবং সামগ্রিকভাবে 'আমি'র বিরাট ও বিচিত্রচারী রূপমূর্তি-পরিস্ফুটনে দুজনের মধ্যে চমৎকার একটি ঐক্য অনুভূত হয়। অবশ্য নজরুলের আবেগ, ছন্দ ও বাক্‌রীতি ঐ প্রভাবের অধীনে হয়েও অনন্যতায় পৌঁছেছে—একথাও এই সঙ্গে স্বীকার করি। উদ্ধৃতির সাহায্যে এই প্রভাব দেখানো যেতে পারে।

"আমি বিরাট।......আমি ভীষণ,......শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি,......আমিই মহামারী।..... আমি মধুর...... দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহ-ধূমারুণলোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত,......প্রণয়িনীর সরম-সঙ্কোচের মত,......আমি ম্যাডনা। ..... আমি আনন্দ......আমি শ্মশানকূলবাহিনী জাহ্নবী......আমি রহস্যময়। ......আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার......আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন, আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। .. ...আমি মানব-হৃদয়ের প্রেম,—মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব,......আমি...তন্দ্রাতুর-স্বপ্নবিলাসী, কখনো কর্ম্মবীর্য্যের অবতার .....আমি উন্মাদ! আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি...... কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।" ('আমি' মোহিতলাল—'জীবন জিজ্ঞাসা')। এর সঙ্গে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি বা পদবিশেষের মিল আছে। যেমন—'আমি চিরদুর্দম দুর্বিনীত নৃশংস'......'আমি ধূর্জটি, আমি ঘূর্ণি'......'আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি, চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর থর থর প্রথম পরশ কুমারীর,'......'আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন চিত্তে চেতন,'......'আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে" (বিদ্রোহী)।

নজরুলের সঙ্গে মোহিলালের প্রথমদিকে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও মধুর ছিল। মোহিতলাল ঐ প্রবন্ধটি যে নজরুলকে পাঠ ক'রে শুনিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে।[৫] মোহিতলাল তাঁর দীর্ঘকালের কাব্য-সাধনায় প্রেমকে অতিশয় উচ্চ আসন দিয়েছিলেন—কিন্তু প্রেমের পাত্র-পাত্রীর যৌবন-ক্ষণিকতার বেদনায় শেষের দিকে তিনি কাতরতার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন। 'স্মরগরল' কাব্যের 'দিনশেষে' 'বসন্ত-বিদায়', 'নির্ব্বাণ' কবিতায় এর পরিচয় আছে। আবার কামনার যে শেষ নেই, তা যে দুর্বার একথা তিনি নানাস্থানে বলেছেন। কবির এই সমস্ত চিন্তা নজরুলের মধ্যেও বিছিন্নভাবে অনেক চরণে ফুটে উঠেছে।

> "প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
> জন্ম যা'র কামনার বীজে
> কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
> দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান
> ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।"
>
> (অ-নামিকা—সিন্ধু হিন্দোল)

মোহিতলাল ও নজরুল দুজনেরই 'পাপ' নামক কবিতা আছে। ভাবে ও

ভাষায় এ দুটি কবিতার মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। তথাপি মোহিতলালের সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিতে পাপকে দেখবার প্রয়াস নজরুলকে গৌণভাবেও প্রভাবিত করেছিল—এরূপ মনে করা যেতে পারে। নর-নারীর পারস্পরিক আকর্ষণ—যার ফলে সৃষ্টিধারা অব্যাহত, তাকে মোহিতলাল পাপ বলতে পারেন নি। নজরুলও ঐ নারীর আকর্ষণে দেবতা এবং ঋষিদেরও পদস্খলনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সকলকেই পাপী সাব্যস্ত ক'রে পাপকে সংস্কারহীন দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন।

"এ পাপ মুলুকে পাপ করে নিকো কে আছে পুরুষ-নারী ?
আমরা তো ছার ;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী।"

(পাপ—সর্ব্বহারা)

দৈবের দাসত্ব ও মধ্যযুগীয় অন্ধ কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্যে মোহিতলাল যেমন 'কালাপাহাড়'কে আহ্বান করেছেন—নজরুলও মানুষের শুভ-বুদ্ধি-উদ্বোধনে গেয়ে উঠেছেন—

"কোথা চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙ্গে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।"

(মানুষ—সর্ব্বহারা)

মোহিতলালের নাদিরশাহ যেমন বলেছিল 'কত বড় আমি—একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই'—নজরুলের 'আমি' সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই বলে উঠেছে—

"হেসোনা বন্ধু। আমার আমি যে কত অতল অসীম
আমিই কি জানি, কে জানে কে আছে
আমাতে মহামহিম।"

(মানুষ—সর্ব্বহারা)

মোহিতলাল যেমন 'দেহের দেউলে দেবতা নিবসে তার অপমান দুর্বিষহ'-এর কথা বলেছেন, নজরুলও তেমনই মানুষের বুকে জাগ্রত ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে লিখেছেন—

'তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।'

(মানুষ—সর্ব্বহারা)

নজরুলের ওপর মোহিতলালের প্রভাব খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়েছে বলে

মনে করি না। নজরুলের অপরিমিত আবেগ ও সহজ সরল ভাষা এবং ছন্দের ওপর মোহিতলালের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ।

অতঃপর অতি আধুনিক কবিদের কথা। মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশের কাল পর্যন্ত আধুনিক কবিরা তাঁর কিরূপ ভক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রশস্তিসূচক উক্তিতেই তার প্রমাণ আছে।[৬] তাছাড়া কবির 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' কাব্য সেকালের অতি আধুনিক কবিদের নিকট কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল তারও উল্লেখ আছে।[৭]

অতি-আধুনিক কাব্য কল্লোল যুগে পরিপুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে যুগমানসের সঙ্গে সামঞ্জস্য সূত্রে হতাশা, ক্লান্তি, মনন, বিষাদ, দেহগত প্রেম, অবচেতন মন, শ্রেণীসংগ্রাম, গণচেতনা, মার্কসবাদ, কঠোর সত্যনিষ্ঠা, বস্তুভিত্তিক রোমান্টিকতা, সমাজতন্ত্রবাদ, নাস্তিকতা—প্রভৃতি বিভিন্ন ভাববস্তুকে আশ্রয় করেছে। ভাষায় জটিলতা, শব্দগত দুরূহতা এবং ছন্দের চিরাগত ঐতিহ্যকে বর্জন-প্রয়াসও এই কাব্যের মধ্যে লক্ষণীয়। এগুলির সমস্ত না হলেও জীবনে দেহ-বাস্তবের স্বীকৃতি, দেহগত প্রেমের মহিমা, বুদ্ধির দীপ্তি, বস্তুভিত্তিক রোমান্টিকতা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, কাব্যে তৎসম শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা, কাব্যে নাটকীয় গুণ সঞ্চারের চেষ্টা, স্টাইলের আভিজাত্য—প্রভৃতি মোহিতলালের বৈশিষ্ট্যগুলি অতি-আধুনিক কবিদের মনোগহনে সক্রিয় থেকে তাঁদের কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে মোহিতলালের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা আজ সহজ নয়। তথাপি অতি-আধুনিক কাব্যে তাঁর এই নিগূঢ় প্রভাবের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। মোহিতলালের ক্ল্যাসিক কৌলীন্য-দীপ্ত স্টাইল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের মধ্যে আরও বেশী সংহতি ও সংসক্তি লাভ করেছে—একথা বলা দোষের নয়। কবির বিশিষ্ট জীবনবাদ বা বস্তু সচেতন ভোগবাদের স্বরূপ অনেকেই সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও তাঁর 'দেহাত্মবাদ' সেকালের বহু-কবিকেই আকৃষ্ট করেছিল। এঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দ দাশের কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। প্রথমেই বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে প্রভাবের প্রসঙ্গটি আলোচিত হচ্ছে।

দেহ ও দেহগত কামনাকে মোহিতলালের অতিরিক্ত গুরুত্বদানের দিকটি 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের কবি বুদ্ধদেব বসুকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছে। মোহিতলালের 'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা', 'নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালবেসে বক্ষে লই টানি', 'হায় দেহ! নাই তুমি ছাড়া কেহ জানি

তাহা প্রাণে প্রাণে',—প্রভৃতি উক্তির সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'মোহমুক্ত' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির সাদৃশ্য স্পষ্ট।

"একমাত্র কামনা অমর,—
এই দেহ সত্য শুধু, সত্য এই রক্তের পিপাসা"
(মোহমুক্ত—বন্দীর বন্দনা)

কিংবা

"এতদিনে আমি বুঝিলাম—
ওগো নগ্নদেহা নারী—তোমার কি দাম!
কবির কল্পনা নহ, চিরন্তন অশ্লীলতা তুমি বিধাতার,
অনঙ্গ বিহার ভূমি, তুমি মূর্ত্তি মর্ত্ত্য কামনার।
আর কিছু চাহি নাকো,—জানি জানি তব চক্ষে নাহি স্বর্গজ্যোতি
তপ্ত তনু নিঙাড়িয়া পরিতৃপ্তি ঢেলে দাও, হে জন্ম অসতী।" (ঐ, ঐ)

দেহের প্রতি বুদ্ধদেবের এই আকর্ষণ 'প্রেমিক' কবিতাতেও দুর্লক্ষ্য নয়। তিনি বলেছেন—

"আর আমি ভালবাসি, নতুন ননীর মতো তরুলতা তব"।
(প্রেমিক—বন্দীর বন্দনা)

দেহগত প্রেমই যেমন কবি মোহিতলালের কাছে, 'অমৃতবল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা' (বুদ্ধ—স্মরগরল), তেমনই বুদ্ধদেবের কাছে এই প্রেমই 'মানুষের হৃদয়ের শেষ সার্থকতা'। (প্রেম ও প্রাণ—বন্দীর বন্দনা) প্রেমের স্পর্শ না পেলে 'মানুষ মাংসের পিণ্ড, পঙ্কভাণ্ড প্রবৃত্তির স্তূপ, (ঐ) এবং প্রেমের 'সুরার স্পর্শে ফোটে তার স্ফটিকের রূপ' (ঐ)। 'নারীস্তোত্র' কবিতায় মোহিতলাল যেমন নারী সম্পর্কে লিখেছেন—

"নিঃশেষে বিলায়ে দেহ, হয় তার স্নেহ-উদ্দীপনা,
যে-তার সর্ব্বস্ব হরে—সেই পতি, তারি কণ্ঠে সুচির-লগনা!"
(নারীস্তোত্র)

বুদ্ধদেবও অনেকখানি এই সুরেই 'অপর্ণার শত্রু' কবিতায় অপর্ণাকে বলেছেন—

"তিলে তিলে আমি তব মৃত্যু হবো,
নিঃশেষ করিবো তোমা নির্ম্মম আশ্লেষ-নিপীড়নে।" (ঐ)

কিংবা

"আমি তব জীবনের একমাত্র ক্রূর, অভিশাপ,
তবু তুমি চেয়ে থাকো মোর পথ পানে।" (ঐ)

মোহিতলাল যেমন তাঁর চিরকালের অধরা প্রিয়তমার উদ্দেশে আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

"অয়ি সুন্দরী ভুবনেশ্বরী! আমি যে তোমারে চিনি,—
আমার জগতে তবু তুমি হায়, বাণী-রাগ-রঙ্গিণী।"

(শেষ-আরতি)

বুদ্ধদেব বসুও তেমনই লিখেছেন—

'মোরা কবি কাব্য সরস্বতী,
আমাদের চির প্রিয়তমা।' (কোনো বন্ধুর প্রতি—বন্দীর বন্দনা)

যৌবনের ক্ষণ-অস্তিত্বের বেদনা এবং মৃত্যুর ভাবনা যেমন মোহিতলালকে পীড়িত করেছে, বুদ্ধদেবের মধ্যেও সেই বেদনা 'কালস্রোত' কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। একদিন পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, আর "সমস্ত জীবন ভরি' রবে শুধু মৃত্যুর ম্লানিমা"।

"তাই এই গানে-প্রাণে-দানে ভরা দিন রাত্রিগুলি—
ছেড়ে দিতে চাহে নাকো মন।

(কালস্রোত—বন্দীর বন্দনা)

বিষয়টি বুদ্ধদেবের কাছে আরও বেদনাদায়ক এই কারণে যে—

"দিনগুলি চলে যাবে, রাত্রি যাবে কেটে—
কে তাহারে রাখিবে বাঁধিয়া?
আমি শুধু পড়ে রবো বেদনার কূলে।" (কালস্রোত—ঐ)

জীবনের এই ক্ষণ-অভিনয়ের মাধুর্য স্মরণ ক'রে মোহিতলাল লিখেছেন—

"সংসার তো তারেই বলে—নিত্য-ঝরা পল্‌কা বোঁটার ফুল,
একটু আছে গন্ধ-মধু, তাতেই করে অমর।" (মৃতপ্রিয়া)

আর ঠিক এই সুরেই বুদ্ধদেব লিখেছেন—

"তবু মোরা মিলিয়াছি আজ,
পরিয়াছি উৎসবের সাজ।
ক্ষণিকের অ-নন্দনে ছুটুক অমৃত-মন্দাকিনী"। (ক্ষণিকা—ঐ)

'স্বপনপসারী'র কবি মোহিতলালের সচেতন মনে ঈশ্বর সম্পর্কে যখন কতকটা সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি লিখেছিলেন—

"কে চিনে তোমারে কিসের করুণা? বলি নাই দয়া কর।"

(পরাজয়)

পরেই অবশ্য অবচেতন মনের বিশ্বাস-বলে তিনি ঐ সংশয় কাটিয়ে ওঠেন।

ঠিক এইরূপ ভাববিস্তা বুদ্ধদেব বসুর 'হে বিধাতা, আর কিছু নহে' কবিতায় লক্ষণীয়। সেখানে তিনি বিধাতাকে বলেছেন—

"তবু আমি কোনোদিন
করুণা কামনা করি কাঁদি নাই, এ মোর গৌরব।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-কবিতাতে 'মরণের লগনে' এই ধরণীর বুকে সমস্ত উদ্‌গীত সঙ্গীতের স্মৃতি ভগবানের চরণে উজাড় ক'রে ঢেলে দেবার জন্যে তাঁর চিত্ত-ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়।

মোহিতলালের 'পথিক' কবিতায় পথিকের অন্তহীন চলা ও ক্ষণিকের সুখে মর্ত্যজীবনে মেতে ওঠার ভাবটি বুদ্ধদেবের 'ক্ষণিকা' কবিতায় যে ছায়া ফেলেছে, কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই তা লক্ষ্য করবেন। আবার রবীন্দ্রকাব্যধারার পার্শ্বে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যযুক্ত কাব্যসাধনা যে অনেকখানি অশোভন একথা মনে ক'রে অভিমানভরে মোহিতলাল যা বলেছেন, যেমন—'জানি সে আলোক-শিখার সকাশে ভুলিবেনা মোর ভুল'—ঠিক তেমনই আজ থেকে শতবর্ষ পরেও রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকবেন—একথা স্মরণ ক'রে বুদ্ধদেব আক্ষেপ করেছেন—

"বিশাল স্রোতের বুকে লোষ্ট্র-সম
ডুবে গেছে আমাদের নাম। আমরা হারায়ে গেছি
অসীমের জনারণ্যে"। (কোনো বন্ধুর প্রতি—বন্দীর বন্দনা)

বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য গ্রন্থটির কবিতাগুলি ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ এর মধ্যে লিখিত। আর এইকালে মোহিতলালের 'স্মরগরল'এর কবিতাগুলি 'কালিকলম' 'উত্তরা' ও 'প্রবাসী'তে বের হচ্ছিল। কাজেই তাঁর 'স্বপনপসারী' এবং 'স্মরগরল'এর কবিতাগুলির প্রভাব বুদ্ধদেবের মধ্যে যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কাব্যগুলিতে ভাবগত এই প্রভাব বুদ্ধদেব অনেকখানি কাটিয়ে উঠে মৌলিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে তাঁর 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের 'দময়ন্তী' 'বিরহ' প্রভৃতি কবিতায় অপগত যৌবনের জন্যে বিষন্নতা 'স্মরগরল'এর কবি মোহিতলালের অনুরূপ বিষন্নতার কথা স্মরণে আনে।

প্রত্যেক কবির স্টাইল স্বতন্ত্র এবং এক হিসেবে তা অননুকরণীয়। সেই জন্যে মোহিতলালের স্টাইল বুদ্ধদেব কেন কেউই গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে এবং ছন্দের প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসুর ওপর মোহিতলালের প্রভাব কিছু আছে। কবির কতকগুলি প্রিয় ও সুচয়িত শব্দ ও বাক্য 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে কি ভাবে গৌণ প্রভাব সূত্রে প্রবেশ করেছে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

চির জ্যোতিষ্মান্ (অমিতার প্রেম), রঙ্গিণী (মৈত্রেয়ীর প্রত্যাখ্যান), নভস্তল (ঐ), কটাক্ষ-ঈক্ষণে (ঐ), শৃঙ্গাররভসে (ঐ), গুরু উরু (কোনো বন্ধুর প্রতি), দেহপাত্র (মোহমুক্ত), গণ্ডূষে লইব পান করি (ঐ), পৃথ্বী, দুকূল, চন্দ্রিকা (প্রেম ও প্রাণ), জীবন-জাহ্নবী (মোরা তার গান রচি), 'তুমি এই জীবনের—তবু তুমি জীবন অধিক' (প্রেম ও প্রাণ) প্রভৃতি।

মোহিতলালের সনেট রচনার রীতিটি কবি বুদ্ধদেবও অনেকখানি অনুসরণ করেছেন। 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যে 'প্রেম ও প্রাণ' নামক কবিতায় মোহিত-লালের মতো ইনিও দশটি সনেট-পরম্পরা (Sonnet Sequence) লিখেছেন এবং প্রতি পঙ্‌ক্তিকে চৌদ্দমাত্রা বিশিষ্ট না ক'রে মোহিতলালের মতো আঠার মাত্রায় করেছেন। তাছাড়া অষ্টক ও ষটকের মিলবিন্যাসে মোহিতলালের সেই পেত্রার্কার আদর্শ ই এখানে অনুসৃত হয়েছে। প্রথম অষ্টকে কখখক, কখখক এবং ষটকে গঘগঘগঘ এরূপ মিলবিন্যাস-রীতি অবলম্বিত হয়েছে।

তাছাড়া মোহিতলালের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছন্দ 'অক্ষরবৃত্ত'এর মহিমা কাব্যসাধনায় বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তিনিও এ ছন্দে বহু কবিতা রচনা করেছেন। 'দময়ন্তী' নামক কাব্যগ্রন্থে এ-বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি[৮] মোহিতলালের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ আলোচনার কথা মনে আনে। সে যাই হোক, মোহিতলালের ভাব ভাষা ও ছন্দ আধুনিক কবি বুদ্ধদেবের ওপর প্রত্যক্ষ, গৌণ ও নিগূঢ় প্রভাব যে নানাভাবে বিস্তার করেছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেবই মোহিতলাল কর্তৃক সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত।

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মূলত প্রেমের কবি। আর তাঁর প্রেম কিছু অতীন্দ্রিয়ও নয়—এ হল পরিপূর্ণরূপে দেহজ প্রেম। দেহগত প্রেমের বর্ণনায় মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর অনেকস্থলেই সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা' অপেক্ষা 'প্রিয়া ও পৃথিবী' কাব্যেই এ প্রভাব স্পষ্ট। 'প্রেম' নামক কবিতায় মোহিতলালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন—

> "প্রেম নহে কায়াহীন কথার ছলনা।
> আমার এ প্রেম, সখি, কামনা সে নিরবগুণ্ঠনা,
> উদ্বেজিত উদধির ফেনিল রুধির ; মোর গান
> দেহের দুর্দান্ত দাহ, অস্থিময় অস্তিত্ব চেতনা ;
> আমার শরীরে সখি, সীমাহীন প্রেমের প্রমাণ।"

(প্রেম—প্রিয়া ও পৃথিবী)

মোহিতলালের নারী আসক্তির প্রসঙ্গটি অচিন্ত্যের 'সার্থক' কবিতায় সুন্দর ছায়া ফেলেছে। এ কবিতায় অচিন্ত্যকুমার প্রিয়তমা যে একান্তভাবে তাঁরই—এই মধুর চিন্তার মধ্যে প্রিয়তমার সকল ত্রুটি, সকল অপরাধ মার্জনা করেছেন। প্রিয়তমার ভাণ্ডার শূন্য জেনেও কবি তাকে আহ্বান ক'রে বলেছেন—

"তুমি আছো, আমি আছি, আর আছে দেহ-ভোগবতী
সুন্দরী অসতী।" (সার্থক)

'দিনশেষে' কবিতায় কবি মোহিতলাল 'নীল নভ-তল'কে রক্তিম হয়ে শেষে বর্ণাভ হতে দেখে বেদনা অনুভব করেছেন। প্রিয়তমাকে সম্বোধন ক'রে কবি বলেছেন—

"সখি, এ সন্ধ্যা বড় মধুময়
দিনশেষে তবু কেন মনে হয়—
এখনো যেটুকু রয়েছে সময়
লই মোরা ভালবেসে,
এস, কাছে এস, চুম্বন করি সুগন্ধ কালো কেশে।"

আর অচিন্ত্যকুমার 'দূরের মেয়ে' কবিতায় দূরবর্তিনীকে ডাক দিয়ে বলেছেন—

"জান তো মোদের নেই বেশী ক্ষণ,
আসবেই যদি, এসো না এখন,
বিকেলের আলো ফিকে হ'য়ে আসে,
ঘন, ঘোলাটে,
তুমি না আসিলে কী ক'রে বলো এ
সময় কাটে ?" (দূরের মেয়ে)

প্রিয়তমাকে নিয়ে কবিমনের বিচিত্র খেয়ালের কবিতা হিসেবে মোহিতলালের 'ভাদরের বেলা' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। ঐ কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"নীল শাড়ি খুলি পোরোনা খয়েরী খানি।
খয়েরের টিপে, ভুরু ভেঙ্গে দাও, রাণি।"

'অমাবস্যা' কাব্যে অচিন্ত্যকুমারের প্রিয়তমাকে অবলম্বন ক'রে খেয়ালও অনেকটা একই প্রকার।

"হৃদয়ের লালে চরণ রাঙিয়ো, ভুরু ভেঙো নীল-টিপে,
খেলো সে খয়েরী শাড়িখানি পোরো মানাবে সন্ধ্যাদীপে।
(অমাবস্যা)

প্রিয়তমাকে 'শেষ আরতি' কবিতায় মোহিতলাল 'বাণী-রাগরঙ্গিণী' বলেছেন। বুদ্ধদেবের মতো অচিন্ত্যকুমারেরও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়েছে।

"গৃহ নাই, গৃহদীপ নহ তুমি, অবকাশ-রঙ্গিণী ;
বাহু বন্ধনে নহে গো, ছন্দে করিলাম বন্দিনী।" (অমাবস্যা)

মোহিতলাল যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে দুর্দম পিপাসায় চিরন্তন অতৃপ্তিকে অনুভব ক'রে তারই মাধুর্যে বিহ্বল হয়েছেন, অচিন্ত্যকুমার যেমনই সংকেতময়ী নারীর প্রেমে নিজ জীবন-মহিমা উপলব্ধি করতে চেয়ে লিখেছেন—

"এতদিন শুধু স্বপ্ন দেখেছি—তাই কোরো আভরণ।
অপার সে পারাবার—
গভীর অগাধ স্বাদ নিয়ে এসো অপরিপূর্ণতার।" (অমাবস্যা)

ভাবগত এই প্রভাব ছাড়াও অচিন্ত্যকুমারের ওপর মোহিতলালের কিছু শব্দগত ও চিত্রগত প্রভাব আছে। কিন্তু ছন্দের দিক দিয়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে বেশী অনুসরণ করেছেন। তাই ছন্দোগত প্রভাব এ-ক্ষেত্রে মোটেই উল্লেখ-যোগ্য নয়। ভাষা ও চিত্রগত প্রভাবের কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

শিথিল শিথান, ব্রীড়ায় বেপথুমতী, তনুতট-উচ্ছল (অমাবস্যা, পৃঃ ৩০), মদিরেক্ষণা, সিঁথির সীমায় (ঐ পৃঃ ৩১), দেহদীপাধার (ঐ পৃঃ ৩৫), 'কুহূ অমানিশি' (ঐ পৃঃ ৩৬), স্খলদঞ্চলা (ঐ, পৃঃ ৩৮), প্রজ্ঞা পারমিতা (দুইজন—প্রিয়া ও পৃথিবী), প্রেম পরমায়ু মোর অনন্ত পাথেয়, আঁখিতে আঁকিয়া দাও (দোসরা আশ্বিন—ঐ পৃঃ ৩৫), উদধির ফেনিল রুধির (প্রেম—ঐ, পৃঃ ৩৮), দুরন্ত দুরাশা (প্রাণজাহ্নবী—ঐ পৃঃ ৪২), সান্ত্বনার হেমপাত্র উরসের যুগ্ম-কোকনদ (লীলাবধূ ও আত্মাবধূ—ঐ পৃঃ ১৩), গ্রন্থিল জটিল (প্রাণ জাহ্নবী—ঐ পৃঃ ৪৩) প্রভৃতি।

আর একজন শক্তিমান আধুনিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্য 'প্রথমা'র ওপর আমরা মোহিতলালের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। প্রেমেন্দ্রের এ-কাব্যে দেহ-প্রশস্তি, রূপ ও যৌবনের অচির-স্থায়িত্ব-বোধ, মোক্ষ-কটাক্ষ, বলবানের ভোগাধিকার-স্বীকৃতি এবং ভোগানন্দের উল্লাস—সমস্তই মোহিত-লালের সুরেই ব্যক্ত হয়েছে। 'কবি-নাস্তিক' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

"ওষ্ঠে প্রিয়ার ভণ্ডামি নাই, নাই পেয়ালায় বুজরুকি,
পরকালের পুঁথি ফেলে, আয় রে হতাশ আয় দুখী।

... ...

যথের কড়ি আগলে আছিস্ মোক্ষ-আশায়, মূর্খ কে ?

অর্ঘ্য দে।

এই দেহ তোর দেবতা শুধু,

দিন দুয়েকের স্বর্গ রে।

অর্ঘ দে।" (ইহবাদী—প্রথমা)

অথবা

"রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে

দু'দিন মেয়াদ যৌবনের ;

প্রিয়ার ঠোঁটের গুলবাগে ভাই,

ইজারা যে দুই দিনের।" (ইহবাদী—প্রথমা)

তাই কবি 'মধুমাসের মহোৎসবে দস্যু হয়ে লুট' করবার জন্যে শক্তিমানদেরই শুধু আহ্বান করেছেন।

ধরণীর প্রতি সুনিবিড় মমতায় কবি মোহিতলাল জন্মান্তরে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে এসে 'হৃদয় বাঁশরীখানি দেহ পঞ্চবটীতলে' অশ্রুসিক্ত হয়ে বাজাতে পারবেন কিনা এই সংশয়ে যেমন কাতর হয়েছেন, অনুরূপ সংশয়-জনিত ভাবনা প্রেমেন্দ্রের 'প্রথমা'র একটি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

"এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হলো নাকো,

যত খেলা রয়ে গেল বাকি,

ফিরে আর পাব তাহাদের ?

... ...

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,

এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি,

আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্ব্বজনে ?"

(ফিরে আসি যদি—প্রথমা)

মোহিতলালের দুঃখবাদের ভাবনা 'প্রথমা'র কবি প্রেমেন্দ্রকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। মোহিতলাল জীবনের দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণাকে অনিবার্য নিয়তি বলেই জেনেছিলেন। একে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মূঢ়তা। মানুষকে আত্ম-শক্তির দ্বারাই সেই ব্যথা ও বেদনাকে জয় করতে হবে। জীবনে দুঃখ-জ্বালা থাকা সত্ত্বেও জীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'অপূর্ণ' কবিতায় মানবজীবনের দুঃখ-দুর্গতিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে যা

বলেছেন, তার মূলে মোহিতলালের প্রভাব থাকা কিছু বিচিত্র নয়। প্রেমেন্দ্রের বিশ্বাস ভগবান যতদিন আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চলতার মধ্যে ছিলেন, ততদিন তিনি ছিলেন পূর্ণ। কিন্তু কান্না, হাহাকার দীর্ঘশ্বাসের জন্যেই তো তাঁর মানবসৃষ্টি। মানুষের জীবনের সমস্ত ব্যথা-বেদনার সঙ্গে স্বয়ং ভগবানও তো চোখের জল ফেলছেন। এ তাঁর খেলারই একরূপ ছলমাত্র। এ যদি সত্য হয়, তাহলে—

"যত কান্না ধরণীতে
তার মাঝে তুমি কাঁদো এই শুধু জানি—
আর ধন্য আপনারে মানি।" (অপূর্ণ—প্রথমা)

অতএব প্রেমেন্দ্রের ধারণা মানুষের দুঃখ ভগবানেরই দান। ভগবানের এই খেলা 'অদ্ভুত ভীষণ বুদ্ধির অতীত।' দুঃখকে বিধিদত্ত পুরস্কাররূপে জেনে মানুষের আশ্বস্ত হওয়া উচিত। মোহিতলালের কাব্যের বস্তুবাদ বা দেহ-বাস্তবের স্বীকৃতিও প্রেমেন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। জীবন-মহাদেবের নৃত্যের প্রসঙ্গে কবি যখন বলেন—

"জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কি রে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে।
বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে।
(নটরাজ—প্রথমা)

—তখন মুগ্ধ কবির মোহভঙ্গের ইঙ্গিতও যেমন লক্ষ্য করি, তেমনই অনুভব করি জগৎ ও জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে কবির অতিরিক্ত সচেতনতা। ভীষণে-কোমলে কুৎসিত-সুন্দরে মিলে যে পূর্ণ-জীবন, তারই পূজারী এই কবি। আর এরই ইঙ্গিত তো প্রেমেন্দ্রের অগ্রজ কবি মোহিতলালের কাব্যে স্পষ্ট।

কবি মোহিতলাল যেমন নিখিল সৃষ্টিধারার গতিকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে নারীর প্রতি পুরুষের আকর্ষণকে অগৌরবের মনে না ক'রে তাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে জেনেছিলেন, কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রও 'প্রথমা'র একটি কবিতায় প্রায় অনুরূপ কথা বলেছেন—

"চুপে চুপে যে কথাটি
শিখাইছে মাটি
প্রতি নবাঙ্কুরে,

ইঙ্গিতে যে কথাটিরে গ্রহতারা বলে ঘুরে ঘুরে
আলোকের অর্দ্ধস্ফুট সুরে,
সৃষ্টির প্রথম প্রাতে বিধাতার মনে
যে কথাটি ছিল সংগোপনে,
সে গোপন বারতাটি করিব প্রকাশ,
এস নারী, এল আজ জীবনের দখিনা-বাতাস।"

(এস নারী—প্রথমা)

মোহিতলালের মতো মৃত্যুর ভয়াবহতাকে তুচ্ছ ক'রে জীবনের রসে উন্মত্ত হওয়ার কথা প্রেমেন্দ্র 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে' (প্রথমা) কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। মোহিতলাল বলেছেন 'দুঃখেরে ডরেনা কেহ দুঃখে তবু হাসিছে সংসার'—প্রেমেন্দ্র মিত্রও বলেছেন—

"হাসি-অশ্রু উচ্ছলিত তবুও রঙীন
এ-বিস্বাদ জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি ধরি
নিঃশেষিয়া যাব পান করি,—
শুধু তার সঘন অনুরাগ স্মরি
জীবন-শিয়রে বসি দোলা দেয় যে স্বপ্ন-সুন্দরী।

(স্বপ্ন দোল—প্রথমা)

সর্বোপরি বিজ্ঞানের যুগে লালিত হওয়া সত্বেও মোহিতলালের কাব্যে যেমন শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রেও ঠিক তাই। আধ্যাত্মিক চেতনার বশে তিনিও অমৃতবাদে আস্থাশীল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছন্দে স্টাইলে বা কবিভাষায় মোহিতলালের প্রভাব নেই বললেই চলে। তবে শব্দ ও চিত্রগত প্রভাব যৎসামান্য লক্ষণীয়। 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ইন্দ্রধনু রচি ইন্দ্রজালে (স্বপ্নসুন্দরী), বাসনার ঝড়ে (আজ আমি চলে যাই), মৃত্যুশোক—স্তব্ধ গৃহদ্বারে (মৃত্যুরে কে মনে রাখে), দেহদীপ হতে ওঠে শিখাসম (নমো নমো ঐ) দিল দরদী ডাক (বাদল বিলাস) ইত্যাদি।

কবি জীবনানন্দ দাশ 'নিশ্চেতনার কবি', 'নির্জনতা'র কবি বা প্রকৃতির কবি প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে নিজেই বলেছেন যে তাঁর সম্পর্কে ঐ সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।[৮] বলা বাহুল্য কবিধর্মে জীবনানন্দ দাশ প্রায় সকল অতি-আধুনিক কবি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টিশক্তির

মৌলিকতা ও চিত্রকল্প সৃজনের অনন্যতা কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তথাপি জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'এ তাঁর স্বকীয়তার লক্ষণ খুবই কম। এই কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের প্রভাব নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও এ প্রভাব কিছু আছে। 'স্বপনপসারী'র কালে মোহিতলালের যাযাবরী 'বেদুঈন' জীবন-প্রীতি দেখা যায় এবং 'বিস্মরণী'তে মানুষের অন্তরস্থিত দেবতার দুর্বিষহ অপমানে তীব্র ক্ষোভ দেখা যায় (কালাপাহাড় কবিতা)। জীবনানন্দের 'ঝরাপালকে'র একটি কবিতায় দুটি বিষয়ই লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

"আমরা অশ্বারোহী
যাযাবর যুবা বন্দিনীদের ব্যথা মোরা বুকে বহি,
মানবের মাঝে যে দেবতা আছে আমরা তাহারে বরি,
মোদের প্রাণের পূজায় দেউলে তাহার প্রতিমা গড়ি ,"

(নব নবীনের লাগি।)

বাঙলা ১৩৩৩ সালের 'শ্রাবণ' সংখ্যার 'কালিকলম'এ জীবনানন্দের 'শেষ শয্যায়' কবিতাটি বের হয়। এ-কবিতায় জীবন ও মরণ কবির দ্বারে দণ্ডায়মান হলে কবি কাকে বরণ করবেন—এ চিন্তায় ক্ষণিকের জন্যে পীড়িত হয়েছেন। নিমেষের মধ্যেই কবি জীবনের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মৃত্যুর আবির্ভাবকে অবাঞ্ছিত বলে ভেবেছেন। কবির পিপাসার্ত প্রাণের একটি আকিঞ্চনও যখন পূর্ণতা পায় নি, তাঁর যৌবন-শতদলের মধু যখন উৎসব-লুব্ধ অলিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে নি, কামনার কলি যখন কীটের আঘাতে শুষ্ক হয়ে গেছে, তখন মৃত্যুকে কি তিনি বরণ করতে পারেন? আবার শুধুই কি আকস্মিক উপদ্রবের মতো জীবনাকাশে মৃত্যুর প্রকাশ? দুঃখবেদনা ও জ্বালা-যন্ত্রণাতেও জীবন প্রতি মুহূর্তে জর্জর। তথাপি মৃত্যুর বিভীষিকা এবং দুঃখকষ্টের তাড়না সত্ত্বেও জীবন মধুময়, সুন্দর ও পরম রমণীয়।

"হেরিলাম দূরে বালুকার 'পরে রূপার তাবিজ প্রায়
জীবনের নদী কলরোলে বয়ে যায়!
কোটি শুঁড় দিয়ে দুখের মরভূ নিতেছে তাহারে শুষে,
ছলা-মরীচিকা জ্বলিতেছে তার প্রাণের খেয়াল খুশে,
মরণ সাহারা আসি'
নিতে চায় তারে গ্রাসি'
তবু সে হয়না হারা,

ব্যথার রুধির ধারা
জীবন মদের পাত্র জুড়িয়া তার
যুগ যুগ ধরি অপরূপ সুরা গড়িছে মশলাদার।" (শেষ শয্যায়)

—এরই সঙ্গে মোহিতলালের মৃত্যুভীতি, অজস্র দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও জীবন-প্রেম এবং 'সহস্র মৃত্যুর পরে উড়িতেছে জীবন নিশান' (পান্থ-বিস্মরণী) মিলিয়ে পড়লে প্রভাবের বিষয়টি বোঝা যাবে।

আবার দূরবিস্তৃত বালুচরে দুর্ধর্ষ বেদুইনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যে নব রোমান্টিকতার আমেজে মোহিতলাল তাঁর 'বেদুঈন' কবিতাটিকে অপরূপতা দান করেছেন, তার সঙ্গে ১৩৩৩ 'প্রবাসী'র শ্রাবণসংখ্যায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'বেদিয়া' কবিতার এক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে।

"চুলি চালা সব ফেলেছে সে ভেঙে পিঞ্জরহারা পাখী
পিছু ডাকে কভু আসেনা ফিরিয়া কে তাবে আনিবে ডাকি ?
... .
তার চেয়ে ভালো বেদিয়া বালার ক্ষিপ্র হাসির ছটা
কি ভাষা বলে সে কি বাণী জানায়, কিসের বারতা বহে
মনে হয় যেন তারি তরে তবু দু'টি কান পেতে রহে।" (বেদিয়া)

'ঝরাপালক' কাব্যের 'জীবন-মরণ দুয়ারে আমার' এবং 'আলেয়া' নামক কবিতা দুটিতে মোহিতলালের প্রভাব আছে। মোটের ওপর 'ঝরাপালক' কাব্যে দেহবাদ, ও যৌবনবন্দনা, আরবী ও ফারসী শব্দ প্রয়োগে ইন্দ্রিয়ঘন প্রতিবেশ সৃষ্টি, সংস্কারমুক্ত চিত্ত ও বিদ্রোহাত্মক মনোভাব—প্রভৃতি যে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তার মূলে মোহিতলালের প্রভাব অনেকখানি। আত্মদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যৌবনাস্তিক প্রৌঢ় কবি মোহিতলাল 'স্মরগরল'এর 'প্রেম ও জীবন' কবিতায় শেষপর্যন্ত জীবনের মহিমা স্বীকার ক'রে লিখেছিলেন—

"তবু জানি মধুমাসে এই দেহ মাধবী বল্লরী
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল পরাগ-রভসে।
... ...
—বৃন্দাবন চির-পরিপরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ পরশে,"—ঠিক এইরূপ কথা

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একটি কবিতায় জীবনানন্দও বলেছেন—

"আগুন জ্বলিয়া গেলে অঙ্গারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ জীবন।" (প্রেম)

'বিস্মরণীর' 'মোহমুদগর' কবিতায় মোহিতলাল নিরতিশয় জীবনানুরাগ ও মর্ত্যপ্রেমবশত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন যে আবার তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন কিনা—আবার তিনি 'দেহপঞ্চবটীতলে হৃদয়বাঁশরী' বাজাবার সুযোগ পাবেন কিনা—জীবনানন্দও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আর একটি কবিতায় প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন—

> "আবার পাব কি আমি ফিরে'
> এই দেহ।—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
> রক্তের তাপ ঢেলে' আমি
> আসিব কি নামি'" (পিপাসার গান—ধূসর পাণ্ডুলিপি)

জীবনানন্দের 'যে কামনা নিয়ে' কবিতাটি পাঠ করতে করতে বার বার মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্যের 'দীপশিখা' কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ মনে আসে। উভয় কবিতার পরপর কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

> "আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
> আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃদ্‌স্পন্দন শুনি।" (দীপশিখা)
> "আমি গো লালিমা, গোধূলির সীমা—বাতাসের লালাফুল
> ... ...
> আমি খুশরোজা—আমি গো খেয়ালী
> চঞ্চল বুলবুল।" (যে কামনা নিয়ে)

জীবনানন্দের 'শ্মশান' 'মরুবালু' 'আলেয়া' প্রভৃতি কবিতাগুলির প্রেক্ষাপটে মৃত্যুচেতনার অস্তিত্বের মূলে মোহিতলালের মৃত্যুভাবনার সংস্কারই সক্রিয়। জীবনানন্দেরও অধিকাংশ সার্থক কবিতা মোহিতলালের অতিপ্রিয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই রচিত। এই ছন্দ জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রিয় হওয়ার মূলে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ছন্দের সঙ্গে মোহিতলালের ছন্দের কথাও মনে রাখা উচিত। মোহিতলালের অতিপ্রিয় 'উদধি' এবং 'অতিদূর' শব্দ দুটি জীবনানন্দেরও প্রিয় ছিল।

অতি-আধুনিক কবিদের কাব্যে যে-প্রভাবের কথা আলোচিত হল, তাতে দেখা যায় যে অধিকাংশ কবি তাদের কাব্যজীবনের প্রথম দিকেই মোহিতলালের ভাব, ভাষা ও শব্দকে অনেকখানি অনুসরণ করেছেন। কবি-স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁরা বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। অবশ্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গুরুত্ব জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব এবং সুধীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। এই অনুভবের পশ্চাতে মোহিতলালের দীর্ঘকালীন বিশিষ্ট এই ছন্দে কাব্যানুশীলন-প্রয়াস

তাঁদের নিশ্চয়ই অনুপ্রেরিত করেছে। তাছাড়া অতি-আধুনিক কাব্যের বস্তুবাদ বা দেহবাদ মনন বা বুদ্ধিবাদের মূলে মোহিতলালের নিগূঢ় প্রভাব অনুমান করা যায়। কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে মোহিতলালের সচেতনতা আরও বেশী ঘনীভূত হয়ে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথে পরিণতিলাভ করেছে—এখানে মোহিতলালের পরোক্ষ প্রভাব। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সনেট রচনার আগ্রহের অন্তরালে মোহিতলালের গৌণ প্রভাব আছে বলে মনে করি। মোহিতলালের তৎসম শব্দবহুল দীর্ঘ চরণ-প্রীতি এবং জীবন, মৃত্যু, প্রেম, দেহ, নিয়তি—প্রভৃতি মানুষের আদিম দিকগুলিকে কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ সুধীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত ক'রে থাকবে।

এই সমস্ত প্রভাব সম্মিলিতভাবে আধুনিক বাঙলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে এই প্রভাবের ভাবগত দিকটি নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। কারণ অতি-আধুনিক কবিদের কাব্যে বস্তুবাদের উগ্রতা, দেহবাদের অতিশায়ন, জীবনের মূল্যায়নে নিরর্থকতা, এবং তজ্জনিত হতাশা ও বিষণ্ণতার মর্মান্তিক আর্তধ্বনি, লরেন্স ও ফ্রয়েডের জীবনদর্শনের আলোকে শিশ্নোদরপরায়ণতা এবং অবলোকিতেশ্বরের জয়ধ্বনি, জীবনজিজ্ঞাসার আতিশয্যে শাণিত নির্মম বিদ্রূপ, শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের ধ্যানভঙ্গ, মার্কসীয় দৃষ্টিতে জীবনের ব্যাখ্যা, পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিদের অনুকরণে কাব্যে দুরূহ চিত্রকল্প, প্রতীক ও উল্লেখের (allusion) এর ব্যবহার, নাস্তিকতা—প্রভৃতির সঙ্গে মোহিতলালের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিক কবিদের কাব্যে এই সমস্ত বিষয় প্রাদুর্ভাবের মূলে পর পর দুই মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, বিদেশী সাহিত্য এবং সমাজমানসের প্ররোচনা যে-প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন, এঁরা কেউই মনোধর্মে মোহিতলালের ঠিক সমকক্ষ ছিলেন না। বিশ শতকের কবি হলেও যুগের ঝটিকা তাঁর অন্তরের তলদেশকে আলোড়িত করতে পারে নি। তিনি ক্ষণিক উত্তেজনা ও পরিবর্তনের দুকূলপ্লাবী বন্যায় ভেসে না গিয়ে চিরন্তন সত্য-সুন্দরকে আশ্রয় করেছিলেন। মানব জীবন, মানুষের নিয়তি, প্রেম, দুঃখ, সৌন্দর্য, প্রকৃতি—প্রভৃতি চিরন্তন ভাববস্তুকে উপজীব্য ক'রে তিনি এগুলির গভীরতর স্তরে আত্মলীন হয়েছেন। কবিধর্মে তাই তিনি সাময়িকতার উন্মাদনাকে বড় ক'রে দেখেন নি। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকীয় সুস্থ জীবনভাবনা, বলিষ্ঠ মানবিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল জীবনবাদ তাঁর কবিকল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল। 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থের পর কবি তাই অতি-আধুনিক কবিদের সান্নিধ্য ত্যাগ ক'রে স্বকীয় আন্তর প্রেরণার তাগিদেই

কাব্যানুশীলনে যত্নবান হন। তখন থেকেই আধুনিক কবিদের সঙ্গে মনোধর্মে তাঁর আর কোনো যোগ রইল না। মোহিতলালের কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাই 'বিস্মরণী'র পরবর্তী কাব্য থেকে অতি-আধুনিক কবিদের ওপর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে।

রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ও কালিদাস রায়ের ওপর মোহিতলালের কিছু প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। মোহিতলালের কয়েকটি কবিতায় নাটকীয় ভঙ্গীতে স্বগতোক্তি (Dramatic monologue) ব্যবহারের বিষয়টি রবীন্দ্র-অনুসারী যতীন্দ্রমোহনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া কবি হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং সেকালের 'প্রবাসী' 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক অনেক অখ্যাত কবি এই বিশিষ্ট ভঙ্গীকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।[10] মোহিতলালের 'নাদির শাহের শেষ' 'বেদুঈন' প্রভৃতি কবিতার প্রভাব এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। বাঙলা ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত যতীন্দ্রমোহনের 'মহাভারতী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কর্ণ', 'দুর্যোধন', 'প্রাচীনার প্রলাপ' প্রভৃতি কবিতার কথাই বলছি। মোহিতলালের বিশিষ্ট স্টাইল এবং বাক্‌ভঙ্গিমা যতীন্দ্রমোহনে অবশ্যই অনুপস্থিত। তথাপি তাঁর ঐ রীতিটি যে অনুসৃত এতে কোনো সন্দেহ নেই। যতীন্দ্রমোহন মোহিতলালের অগ্রজ কবি হলেও তাঁর 'মহাভারতী' 'বিস্মরণী'র পরে প্রকাশিত বলে আমরা প্রভাবের কথা বলেছি। যতীন্দ্রমোহনের স্বপ্নপ্রীতি 'ভারতী' পত্রিকার কবিদেরই একটি সাধারণ লক্ষণ। এক্ষেত্রে মোহিতলালের প্রভাব-কল্পনা অনুচিত। আবার দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল-মধুর চিত্রাঙ্কনে অনেকস্থলেই যতীন্দ্রমোহন ভাব ও ভাষায় যেখানে মোহিতলালের সমীপবর্তী, সেখানে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবের কথাই মনে রাখা উচিত। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় সমাসোক্তি অলংকার প্রয়োগের সাহায্যে প্রকৃতি ও মানবের নৈকট্যদান প্রসঙ্গে কে কাকে প্রভাবান্বিত করেছেন, বলা কঠিন। যতীন্দ্র-মোহনের 'অন্ধবধূ'র পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গলাভের জন্যে কাঙালপনা মোহিতলালের 'কলসভরা' কবিতাটির কথা মনে আনে। যতীন্দ্রমোহনের 'মাধবী' কবিতা ও মোহিতলালের 'বিস্মরণী' কাব্যের 'মাধবী' কবিতায় একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। যতীন্দ্রমোহনের ইরানি-রোমান্স-রস-সৃষ্টির মূলে মোহিতলালের 'বেদুঈন' কবিতার কিছু প্রেরণা থাকতে পারে। মোটকথা যতীন্দ্রমোহনের ওপর রবীন্দ্রনাথেরই প্রভাব সমধিক। সেইজন্যে এ-বিষয়ে অধিক বাগবিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

কবিশেখর কালিদাস রায় প্রাচীন ঐতিহ্যানুগ রবীন্দ্রভক্ত একজন শক্তিমান কবি। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব। তিনি মোহিত-লালের মতো শক্তিমান না হলেও একাধারে কবি ও সমালোচক। মোহিত-লালের মতো কাব্যের আঙ্গিক-পরিপাট্য বিষয়ে তিনিও অত্যন্ত যত্নশীল। সংস্কৃত তৎসম শব্দ ও ধ্বনিগম্ভীর বা ধ্বনিললিত শব্দ প্রয়োগের দ্বারা তিনি একটি বিশিষ্ট স্টাইলের অধিকারী। মোহিতলাল স্বয়ং কালিদাস রায়ের স্টাইলকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' আখ্যা দিয়ে প্রশংসা করেছেন।[১১] তাঁর আঙ্গিক সচেতনতা, তৎসম শব্দ প্রয়োগ এবং ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির মূলে মোহিতলালের নিগূঢ় প্রভাব অনুমান করা চলে। অবশ্য কবিধর্মে দুজনের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। মোহিতলাল শাক্ততান্ত্রিক—আর কালিদাস বৈষ্ণব। তথাপি উপর্যুক্ত বিষয়ে গূঢ়তর প্রভাব ছাড়াও মাঝে মাঝে শব্দ ও ভাষায় মোহিতলালের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩৩৪ সালে 'বিচিত্রা'র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত কালিদাস-রায়ের 'আদিত্য' কবিতার ওপর মোহিতলালের 'অগ্নি-বৈশ্বানর' কবিতার শব্দগত প্রভাব কিংবা 'মৃত্যু ও নচিকেতা' কবিতায় কিছু কিছু শব্দগত প্রভাব লক্ষ্য করা চলে। কবিতার ভাষায় বিশুদ্ধি রক্ষার শিক্ষক-সুলভ উৎসাহ কালিদাস রায় সম্ভবত মোহিতলালের নিকট থেকেই লাভ করেছেন।

এই প্রভাবের প্রসঙ্গে অল্প খ্যাত কবিদের কথা আলোচনা ক'রে লাভ নেই। আমরা আর একজন কবির কথা আলোচনা ক'রে এ-অধ্যায় শেষ করতে চাই। এই কবির নাম সুশীলকুমার দে। বাঙলাদেশে ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত, কৃতী অধ্যাপক ও সমালোচকরূপেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তিনি যে কবিও সেকথা অনেকের নিকটই অজ্ঞাত। এঁর সঙ্গে মোহিতলালের সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। সাহিত্য সাধনায় সুশীলকুমার মোহিতলালের সতীর্থ ও সহযোগী ছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।[১২] সাহিত্যের আদর্শ, বাঙালীর কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, সমকালীন সাহিত্য ও অতি-আধুনিক কাব্য সম্পর্কে মোহিতলাল ও সুশীল দের চিন্তাধারা অভিন্ন। সাহিত্য সমালোচনারও মূল সূত্রগুলি দুজনেরই এক। সুশীল দে তাঁর কবিমনের রোমান্টিক উৎকণ্ঠাকে ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। মোহিতলালের মতো ইনিও সনেট রচনায় অত্যন্ত আগ্রহী এবং সিদ্ধহস্ত আমাদের ধারণা কাব্যরচনায়-মোহিত-লালের প্রভাব সুশীল দের ওপর নানাস্থানে পড়েছে। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে এই প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। সুশীলকুমারের 'দীপালি' কাব্যগ্রন্থ কতকগুলি উৎকৃষ্ট সনেটের সংকলন। এই কাব্যের ভাবস্তর যে-পরিচয় মোহিতলাল একদা

দিয়েছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে তাঁর বিশিষ্ট জীবনবাদ বা দেহাত্মবাদ সুশীলকুমারকে কিরূপ প্রভাবান্বিত করেছে।

"এই কাব্যখানিতে কবি প্রেমকে শুধুই চিন্তালেশহীন, আবেগমূলক গীতোচ্ছ্বাসের বস্তুরূপে কল্পনা করেন নাই।... এই প্রেম দেহ এবং আত্মা এই দুয়েরই দাবী সমান করিয়া মিটাইতে চায়—একটা আগে একটা পরে নয়। প্রথম হইতেই এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ এবং তজ্জনিত সংশয় ফুটিয়া উঠিয়াছে—মিলনে বিরহ এবং বিরহে মিলন, ভোগের অতৃপ্তি এবং ত্যাগের ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলিকে নানাভাবে রঞ্জিত করিয়াছে।... রক্ত মাংসের ক্ষুধার মধ্যেই বৃহত্তর ক্রন্দন রহিয়াছে। দেহ বাদ দিয়া আত্মা নয়, আত্মাকে বাদ দিয়াও দেহ নয়—কবি এই সত্যটিকে কখনো অস্বীকার করিতে প্রস্তুত নন—অন্তরের এই হোমাগ্নি শিখায় তিনি এই 'দীপালি' সাজাইয়াছেন।"[১৩]

সুশীলকুমারের 'দীপালি'র এই ভাববস্তুর সঙ্গে 'বিস্মরণী'র জীবনবাদের সম্পর্ক কিরূপ গভীর, তা আর রসিক পাঠককে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। সুশীলকুমারের ভাষা ও ছন্দেও মোহিতলালের যথেষ্ট প্রভাব আছে। দু'একটির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে। 'কালিকলম'এর ১৩৩৪এর আষাঢ় সংখ্যায় 'স্মরগরল' কাব্যের 'রুদ্র-বোধন' কবিতাটি বের হয়। এর পাঁচ বৎসর পরে ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে সুশীলকুমারের 'উমা' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকটি এইরূপ—

> "চির অরূপের ধেয়ানে মগন, দিগম্বর,
> বর্ণবিহীন মহাকাল তুমি, শ্মশানচর;
> রূপ কেঁদে কয় অরূপের দ্বারে, রূপসী ধরণী শিহরি কাঁপে
> ভাঙে যবে তার রূপের হর্ম্য তব সংহার শূলের চাপে।"

সপ্তম স্তবকে দেখি—

> "কি ফল লভিলে করিয়া শুষ্ক শবের উপরে অধিষ্ঠান?
> রূপ-সায়রের মন্থনে তুমি শুধু কালকূট করিলে পান।"

এর সঙ্গে মোহিতলালের—

"চিতার ভস্ম ভালবাস, তাই ধূর্জ্জটি! তুমি, শ্মশানচর,' 'পিনাক তোমার ধূলায় লুটায় কোথা গঙ্গাজিন, দিগম্বর?" 'এই মিথ্যারে মন্থন করি' কালকূট পুনঃ করিবে পান', 'জাগো মহাকাল! রুদ্র দেবতা। বর্ণবিহীন বিভূতিময়।' 'সৃষ্টির ভরা ভারী হয়ে এল, ভেঙে যায় বুঝি রূপের চাপে'—

প্রভৃতি চরণগুলির মিল অতি সহজেই নজরে পড়ে। আর এ কবিতার ছন্দ ও ভাষার সঙ্গেও 'উমা' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আবার 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার ১৩৪০ এর আষাঢ় সংখ্যায় সুশীলকুমারের 'বসন্ত সেনা' শীর্ষক যে দীর্ঘ কবিতাটি বের হয়, তা পাঠ করতে করতে অনেক সময় এটিকে মোহিতলালের রচনা বলেই আমাদের ভ্রম হয়। সুশীলকুমারের এরূপ অনেক কবিতাকে মোহিতলালের গ্রন্থভুক্ত করলে সাধারণের পক্ষে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। 'বসন্তসেনা' কবিতাটির একটি স্তবক উদ্ধৃত করলে এই বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধ হবে।

"দুঃখ পুড়িল সুখ নিশ্বাসে কদম্ব শিহরণে,
ভরিল অঙ্গ, মুরছিল সুখ দুঃখের স্পন্দনে,
হয়ে দিশেহারা জাগে বিস্ময়—
স্বপ্নে একি বা মোহ মায়াময়!
মাধুরী-মদিরা করে মাতোয়ারা গৌরব-উপায়নে,
আঁধার শ্রাবণে দুটি দেহতটে প্রাণের বিপ্লাবনে।" (বসন্তসেনা)

স্তবকটির ছন্দ ও ভাষাতেই নয়, ছেদ চিহ্নাদির প্রয়োগেও মোহিতলালের প্রভাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাঙলা কাব্যে মোহিতলালের প্রভাবের আলোচনা এই পর্যন্ত। এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কবিধর্মে মোহিতলালের যে স্বাতন্ত্র্য এবং অতিরিক্ত ব্যক্তিকতায় যে বিশিষ্টতা, তাতে সমকালীন বা পরবর্তী কবিদের পক্ষে তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অনুসরণ কঠিন ছিল। সেইজন্যে কবি হিসাবে শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কবি সমাজের তিনি ঠিক আপনজন হতে পারেন নি। বাঙলার কাব্যাকাশে অতিশয় উজ্জ্বল একটি গ্রহরূপে চিরকালই তিনি পরবর্তী কবিসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। কিন্তু তাঁর কাব্যাদর্শ বা বিশিষ্ট জীবনদর্শন অনুস্যূতির সংকেত জানালেও অনুকৃত হওয়ার নয়। বিষয়টি সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। 'স্মরগরল' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের সম্বন্ধে ল্যাণ্ডরের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তিনি যে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"I shall dine late, but the dining room will be well lighted, the guests few and select' তা পরবর্তী কবিদের সম্পর্কেও নির্মমভাবে প্রযোজ্য।

উল্লেখপঞ্জী

১ মোহিতলালকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অনেকেই আখ্যাত করেছেন—যদিচ কেউই তাঁর কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ১৩৪৩ সালের 'প্রবাসী'র পৌষ সংখ্যায় মোহিতলালের 'আধুনিক বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনায় মন্তব্য করেছিলেন—"মোহিতবাবু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, আবার তিনি সমালোচনা সাহিত্যেরও প্রধান পথ প্রদর্শক'। কালিদাস রায়ের 'পদাবলী-সাহিত্য' গ্রন্থটির পরিচায়িকায় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মোহিতলালকে কবিকৃতিতে 'শ্রেষ্ঠ মৌলিকতা'র অধিকারী বলেছেন। 'প্রগতি' সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত শনিবারের চিঠি'র প্রশংসাসূত্রে মোহিতলালকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন। (সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতি ১ম, পৃঃ ২৬৪)

২ ১৩৩৪ সালের 'প্রগতি' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কাছে অতি আধুনিক কবিদের ঋণ স্বীকার ক'রে লিখেছিলেন—"কিন্তু এ দুটির মাঝামাঝি—খুব সম্ভবতঃ এ দুটির সম্মিলিত প্রভাবে আর একটি ভাবধারা বাংলাসাহিত্যে গড়ে উঠছে যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট ও অভিনব এবং সেহেতু 'অতি-আধুনিক'।"

৩ কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায়—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৪ 'জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'।

৫ 'কাজী নজরুল প্রসঙ্গে' (স্মৃতিকথা) গ্রন্থের লেখক মুজফফর আহ্‌মদ বলেছেন যে মোহিতলাল তাঁর 'আমি' প্রবন্ধটি নজরুলকে পাঠ করে শোনানোর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন।

৬ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রমুখ অতি-আধুনিক কবিরা মোহিতলালের একদা অন্ধ ভক্ত ছিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' (১ম সং) গ্রন্থে লিখেছেন—'কোন জন্মে ভুলব না আমরা। সে কবিতার কত বড় ভক্ত ছিলাম তাঁর কত কবিতার লাইন আমাদের মুখস্থ ছিল। ফুটপাথের উপর গ্যাসপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে তিনি যখন আমাদেরকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পড়ে শোনাতেন, তখন আবৃত্তির বিহ্বলতায় তাঁর দুই চোখ বুজে যেত। ...যদি মুহূর্তমাত্র চোখ খুলে দেখতেন, সামনে দেখতে পেতেন আমাদের মুখে লেশমাত্র বিরক্তি নেই বরং শ্রদ্ধায় নম্রতায় সমস্ত মুখচোখ গদগদ হয়ে উঠেছে।" বুদ্ধদেব বসু এই সময়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে একখানি চিঠিতে লেখেন—"এবারকার 'কল্লোল'-এ শৈলজার ছবি দিয়েছ দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তাদের যথাযোগ্য সম্মান করবার সময় বোধহয় এসেছে। তাহলে, কিন্তু এবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয়। কারণ আজকের দিনে কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি মোহিতলাল নয় কি? ('কল্লোল যুগ' এ উদ্ধৃত বুদ্ধদেব বসুর পত্র)

৭ 'বিস্মরণী' প্রকাশিত হবার পর ১৩৩৪ সালের 'কালিকলম' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় আনন্দকুমার ঠাকুরের এই গ্রন্থ সমালোচনার মন্তব্য থেকে জানা যায় যে 'স্বপনপসারী' ও 'বিস্মরণী' তৎকালে কিরূপ সমাদৃত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন—"পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন মোহিতবাবুর প্রথম কবিতা-গ্রন্থ স্বপনপসারী বাহির হয়, তখন রসিক সমাজে তাহার বিশেষ আদর হইয়াছিল। কবিযশপ্রার্থী মোহিতবাবু উপহসিত হইয়া ফিরেন নাই।" ১৩৩৪ সালের প্রগতির পৌষ সংখ্যায় সম্পাদকদ্বয় অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন—'বিস্মরণী প্রকাশিত হবার পর এ-কথা বলা বাহুল্য যে বাংলার কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যুগ আর নেই।"

৮ ১৯৪৩-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থের শেষে কবি নিজেই লিখেছেন—"দময়ন্তীর বেশীর ভাগ কবিতাই পয়ার জাতীয় ছন্দে রচিত। এটা দৈবাৎ হয়েছে তা বলতে পারিনে। কেন না নানা সময়ে নানা কবিতা লিখতে ব'সে এই ধারণাই আমার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে যে বাক্‌রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন।...পয়ারকে নিয়ে কি যে করা যায়, আর কি যে করা যায় না তার কোন সীমানা আছে বলে মনে হয় না।"

৯ 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-গ্রন্থে কবির নিজের স্বীকারোক্তি।

১০ ১৩৩৪ সালের 'বিচিত্রা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যার লেখক সোমবর্মা এ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন—"এক বিষয়ে কিন্তু মোহিতলালের ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব, তাঁর objective vision আছে—যেটা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে নবীন কবিদের মধ্যে কারু আছে কিনা সন্দেহ।...কিন্তু মোহিতলালের অনুকরণে যাঁরা নাদিরশাহের জাগরণ, বেদুইন, নুরজাহানের মতো কবিতা লেখবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের কবিতায় ওটার অভাব অত্যন্ত বেশীভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।"

১১ কবিবন্ধু কালিদাস রায় সম্পর্কে মোহিতলাল লিখেছিলেন—"তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কার-প্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনই সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিশিয়া তাঁহার কাব্যে খাঁটি ক্লাসিক্যাল ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিয়াছে।" (বঙ্গদর্শন, ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ-চিত্র-পরিচয়)

১২ ডঃ সুশীলকুমার দে রচিত 'দীপালি' শীর্ষক সনেট কাব্যের সমালোচনায় মোহিতলাল বলেছিলেন—"সাহিত্যসাধনায় লেখক (সুশীলকুমার) আমার সহযোগী ও সতীর্থ। কাব্য ও সাহিত্যের আদর্শ আমার জীবনে আমি যেটুকু ধরিতে পারিয়াছি, তাহার মূলে এই নীরব নিস্পৃহ আত্মগোপনকারী বন্ধুটির যথেষ্ট সাহচর্য আছে।" ('সনেটকাব্য ও দীপালি,' প্রবাসী ১৩৩৫ চৈত্র, সত্যসুন্দর দাস পৃঃ ৮৮৮)

১৩ 'সনেটকাব্য ও দীপালি'—প্রবাসী, ১৩৩৫ চৈত্র, সত্যসুন্দর দাস, পৃঃ ৮৮৮

নাম-নির্দেশনী